দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার

রথীন্দ্রনাথ রায়

সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৬

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত

পূজনীয়েষু

খুলে দিও দ্বার!—ভেসে পড়ে যেন মুখে এসে
নির্মুক্ত বাতাস, আর আকাশের আলো,
দেখি যেন শ্যাম ধরা শস্যভরা, পুষ্পভরা
এতদিন যাহাদিগে বাসিয়াছি ভালো,
আসে যদি মৃদুমন্দ পবনে, চামেলি গন্ধ,
একবার বসন্তের পিকবর গাহে,
হয় যদি জ্যোৎস্নারাত্রি, আমিও পারের যাত্রী
যাইব পরম সুখে জ্যোৎস্নায় মিলায়ে।

—দ্বিজেন্দ্রলাল

লেখকের কথা

বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। মাত্র পঞ্চাশ বছর আয়ুষ্কালের মধ্যে (১৮৬৩-১৯১৩) তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রবীন্দ্রযুগের প্রথমার্ধে বাংলা কাব্যের ভাব-ভাবনা, কাব্যরীতি ও কলাবিধি—নানাদিকেই তাঁর নিজস্ব কাব্যাচরণের ছাপ পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজে দ্বিজেন্দ্রলালের অভিনব কবিশক্তিকে সাদর অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তিনি 'আর্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগ, 'আষাঢ়ে' ও 'মন্দ্র' কাব্যের সমালোচনায় (তিনটি প্রবন্ধই 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে) অকুণ্ঠিতচিত্তে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করেছেন। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের তিনটি প্রবন্ধই কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কবিমানসের স্বরূপধর্ম নির্ণয় করেছে। 'মন্দ্র' কাব্যের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ যে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন দ্বিজেন্দ্রকাব্যের তার চেয়ে যথার্থ বিচার আর কিছু হতে পারে না। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা ও ছন্দ, হাস্যরস, দ্বিজেন্দ্রমানসে লিরিসিজম ও স্যাটায়ারের বিচিত্র মিশ্রণের কথাও তিনি তাঁর তিনটি প্রবন্ধে প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথের এই অকুণ্ঠ অভিনন্দন সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রকাব্যের তেমন বেশি আলোচনা হয় নি। তার প্রধান কারণ সম্ভবত দুটি। প্রথমত, দ্বিজেন্দ্রলাল তার সাহিত্যিক জীবনের শেষ দশকে নাটক রচনার দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ঐতিহাসিক নাটকের জনপ্রিয়তার অন্তরালে সেদিন তাঁর কবিখ্যাতি চাপা পড়েছিল। দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাহিত্যিক বিরোধ ও মতানৈক্যও তাঁর কাব্য-প্রতিভার যথার্থ বিচারের অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল।

কিন্তু ত্রুটিবিচ্যুতি ও অপূর্ণতা সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যপ্রতিভাকে অস্বীকার করা যায় না। ইংরেজী নাটকের সঙ্গে সুগভীর পরিচয় থাকার ফলে তিনি বাংলা নাটকে ইংরেজী নাটকের টেকনিক সার্থকতরভাবে প্রয়োগ

করার চেষ্টা করেছেন। চরিত্ররচনার ক্ষেত্রেও তিনি তীব্রতর অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছেন। নাটকীয় গতিবেগ ও ঘাতপ্রতিঘাত সৃষ্টির মধ্যেও তিনি অনেক ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। কাব্য ও কথাসাহিত্যের তুলনায় বাংলা নাট্যসাহিত্য দুর্বল। সেখানে যে কয়জন নাট্যকার বাংলা নাটকের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁদের মধ্যে অন্যতম। শেক্সপীয়রের সঙ্গে তাঁর তুলনা করে লাভ নেই। কারণ শেক্সপীয়র ইংরেজী সাহিত্যেও একজনই ছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পরে তাঁর অন্যতম গুণগ্রাহী কবি দেবকুমার রায়চৌধুরী তাঁর একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখেন (প্রথম সংস্করণ ১৩২৪)। আর-একখানি সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখেন নবকৃষ্ণ ঘোষ। উপাদান সম্পর্কে এই দুটি গ্রন্থই মূল্যবান। কারণ দ্বিজেন্দ্রজীবনী সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য ও মূল্যবান উপকরণ এই দুটি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এই দুটি গ্রন্থ থেকে বর্তমান লেখক বহু উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে যে সমস্ত আলোচনা হয়েছে তাও বর্তমান আলোচনার পথনির্দেশের সহায়তা করেছে। কবিপুত্র দিলীপকুমার রায়ের "উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল" গ্রন্থটিও মূল্যবান নির্দেশ দিয়েছে। কবি-সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেনের "বঙ্গবীণা" ও "বাণীমন্দির" গ্রন্থদ্বয়ে কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের যে অন্তর্জীবনের আলোচনা আছে তাও বর্তমান সমালোচককে অনুপ্রাণিত করেছে। সাম্প্রতিক কালের আলোচনার মধ্যে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'দ্বিজেন্দ্রলালের স্বরবৃত্ত ছন্দ' (উদয়ন, ১৩৪০ আশ্বিন), শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের 'কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়' (ভৈরব, ১৩৫০ আশ্বিন), শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর 'কবি দ্বিজেন্দ্রলাল' (রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২শে পৌষ ও ২৯শে পৌষ, ১৩৬৪), ডক্টর সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (দ্বিতীয় খণ্ড), ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস', ডক্টর অজিত-কুমার ঘোষের 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', ডক্টর সাধনকুমার ভট্টাচার্যের 'নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার' প্রভৃতি প্রবন্ধ ও গ্রন্থ বর্তমান গ্রন্থরচনায় সাহায্য করেছে। পাদটীকায় তাঁদের কথা যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রসংগীতসম্পর্কিত অধ্যায়টিতে বিস্তৃততর আলোচনার অবকাশ ছিল। কিন্তু তা বর্তমান গ্রন্থের পরিকল্পনার অন্তর্ভূত না হওয়ার জন্য এ সম্পর্কে কয়েকটি মূলসূত্র নির্দেশ করা হয়েছে মাত্র। দ্বিজেন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি।

যিনি আমাকে এই দুরূহ কার্যে ব্রতী করে নানাভাবে সেই পথের নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি আমার পূজনীয় শিক্ষাগুরু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহোদয়। কিঞ্চিদধিক তিন বছর আগে তিনিই আমাকে দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করতে উৎসাহিত করেন। আমার চিন্তা ও রচনার নানা অপূর্ণতা তিনি তাঁর মূল্যবান নির্দেশ ও উপদেশ দিয়ে সংশোধন করেছেন। তাঁর স্নেহশাসন ব্যতীত বর্তমান গ্রন্থটি রচিত হওয়া সম্ভব ছিল না। এই গ্রন্থটি তাঁকে উৎসর্গ করে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই গবেষণাটির জন্য আমাকে ডক্টর অব ফিলজফি উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছেন। ডক্টর দাশগুপ্ত ছাড়া অপর দুজন পরীক্ষক ছিলেন ডক্টর সুশীলকুমার দে এবং অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন। তাঁদের সাগ্রহ অনুমোদন লাভ করে বর্তমান লেখক অনুগৃহীত হয়েছেন। এই উপলক্ষে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

কবিপুত্র দিলীপকুমার রায় সাক্ষাতে ও পত্রমারফত বর্তমান লেখককে উৎসাহিত করেছেন। তিনি কয়েকটি মূল্যবান নির্দেশ দিয়ে ও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে 'মেবার পতন'-এর অনুবাদ 'ফল্ অব মেবার' গ্রন্থটি পাঠিয়ে আমার কাজকে অনেকখানি সুগম করে দিয়েছেন। আমার প্রতি তাঁর এই প্রীতি ও সস্নেহ আনুকূল্যকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর অমিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় এই গবেষণার ব্যাপারে নানাভাবে উৎসাহিত ও সাহায্য করেছেন। ব্যক্তিগত সংগ্রহের দুখানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে তিনি আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন। উক্ত কলেজের পরিচালকমণ্ডলী আমাকে দেড়মাস ছুটি দিয়ে গবেষণাকার্যের সুযোগ দিয়েছেন। তাঁদের আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার সহকর্মী অধ্যাপক শচীনাথ ভট্টাচার্য দু-একটি বিষয়ে মূল্যবান নির্দেশ দিয়ে আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। অধ্যাপক কালীপদ সেন ও অধ্যাপক অচিন্ত্যানন্দ রায়—আমার এই দুইজন শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক তাঁদের সস্নেহবাক্যে আমার কর্মশক্তিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। অধ্যাপক পাঁচুগোপাল দত্ত ও অধ্যাপক রবীন্দু গুপ্ত প্রতিনিয়ত তাঁদের আশ্বাস ও উৎসাহ দিয়ে আমার কাজকে সহজ করে দিয়েছেন। অধ্যাপক সুকুমার সেনগুপ্ত মহাশয় অশেষ পরিশ্রম করে এই সুদীর্ঘ গ্রন্থটির পূর্ণাঙ্গ নির্ঘণ্ট প্রস্তুত

করেছেন। এ ছাড়াও তিনি একটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ব্যবহার করতে দিয়েছেন। তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

ডক্টর সাধনকুমার ভট্টাচার্য, ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ ও অধ্যাপক হেরম্ব চক্রবর্তীর সঙ্গে নানা বিষয় আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি। অধ্যাপক মদনমোহন কুমারের স্বতঃপ্রণোদিত আনুকুল্যের কথা চিরদিন মনে থাকবে। উত্তরপাড়া রাজা প্যারীমোহন কলেজের গ্রন্থাগার থেকে বহু গ্রন্থ ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে উপকৃত হয়েছি। উক্ত কলেজের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।

'সুপ্রকাশ'-এর কর্তৃপক্ষের কাছে আমাব কৃতজ্ঞতার অবধি নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাগ্রন্থ হিসাবে দাখিল করার জন্য মুদ্রিত পুস্তক প্রায় এক বছর প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। এই অসুবিধার কথা জেনেও তাঁরা মুদ্রণব্যাপারে পশ্চাৎপদ হন নি। গ্রন্থটিকে সুন্দর ও শোভন করার কোনো ত্রুটিই তাঁরা করেন নি। তাঁরা এই গুরুদায়িত্ব না নিলে এত অল্প সময়ের মধ্যে থিসিস দাখিল করা সম্ভব হত না।

বর্তমান গ্রন্থখানিতে দ্বিজেন্দ্রলালকে কেন্দ্র করে প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যের একটি যুগজীবনের ইতিহাসই আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যকীর্তির মূল্য নির্ণয় করতে গেলে এই যুগের বাংলা সাহিত্যের স্বরূপধর্ম ও অন্তঃপ্রকৃতির বিচার করা ছাড়া তা সম্ভবপর নয়।. তাই দ্বিজেন্দ্রসাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলাদেশের একটি কাল, বাংলা সাহিত্যের একটি যুগ ও বাঙালীর রসরুচির একটি অধ্যায়কেই আলোচনা করতে হয়েছে। রবীন্দ্রযুগের প্রথমার্ধে রবীন্দ্রসাহিত্যের পাশে রবীন্দ্রবিরোধী ধারাও যে ছিল সেই বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়টিকে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করা হয়েছে। তা ছাড়া বাংলা কাব্যের রোমান্টিক কল্পবৃত্তির (রোমান্টিক ইমাজিনেশন) ইতিহাসে দ্বিজেন্দ্রলালের ভূমিকা কি, তাও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই আলোচনায় দ্বিজেন্দ্রমানস ও দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য যদি রসিকজনের মনে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে তবেই বর্তমান লেখকের শ্রম সার্থক হবে।

খ্রীষ্টজন্মদিবস, ১৯৫৯ — রথীন্দ্রনাথ রায়

৬সি রামকৃষ্ণ লেন,
কলকাতা-৩

সূচীপত্র

লেখকের অন্যান্য বই :

বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী

সাহিত্য-বিচিত্রা

ছোটগল্পের কথা

আটজন কবি (যন্ত্রস্থ)

কবিজীবনী

কাব্যবিচারে কবির অন্তর্জীবনই মুখ্যস্থান অধিকার করে, বাইরের প্রবহমান ঘটনা বা তথ্যপুঞ্জের দ্বারা কবিচরিতের নিগূঢ় অভিপ্রায়কে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ টেনিসনের জীবনচরিত পড়ে কবিজীবনী সম্পর্কে সাধারণভাবে মন্তব্য করেছিলেন: "ইহা টেনিসনের জীবনচরিত হইতে পারে, কিন্তু কবির জীবনচরিত নহে। আমরা বুঝিতে পারিলাম না, কবি কবে মানবহৃদয়-সমুদ্রের মধ্যে জাল ফেলিয়া এত জ্ঞান ও ভাব আহরণ করিলেন এবং কোথায় বসিয়া বিশ্বসংগীতের সুরগুলি তাঁহার বাঁশিতে অভ্যাস করিয়া লইলেন।" রবীন্দ্রনাথ কবিজীবনীর অন্তর্ময়তার দিকটিই বিশেষভাবে নির্দেশ করেছিলেন। কিন্তু কবির বহির্জীবনের ঘটনাকেও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা যায় না। বাইরের জগৎ কবির ভাবজীবনের উপর অনেক সময় সুচিরস্থায়ী ছায়া বিস্তার করে। তাই আধুনিককালের জীবনীলেখকেরা ডায়েরি চিঠিপত্র প্রভৃতি থেকেও কবির ভাবজীবনের স্বরূপ নির্ণয় করেন। ইংরেজী সাহিত্যের রোমান্টিক কবিদের মধ্যে কীটস সাময়িক ঘটনার দ্বারা সবচেয়ে কম প্রভাবিত হয়েছেন, তা ছাড়া তাঁর জীবন মোটেই ঘটনাবহুল নয়। তবু তাঁর কবিচরিত-রচয়িতারা ফ্যানি ব্রাউনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটির উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করে নূতন তাৎপর্য নির্দেশ করার চেষ্টা করেছেন। আবার এমন কবিও আছেন, যাঁর ব্যক্তি-জীবন ও কাব্য-জীবন অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত—একটিকে বাদ দিয়ে আর-একটির পূর্ণ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ বায়রন, মধুসূদন প্রভৃতি কবির কথা উল্লেখ করা যায়। 'কবিজীবনী' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর কবির কথাও উল্লেখ করেছেন: "কাব্যকে তাঁহাদের জীবনের সহিত একত্র করিয়া দেখিলে, তাহার অর্থ বিস্তৃততর ও ভাব নিবিড়তর হইয়া উঠে।" কাব্যের বিচিত্র অভিব্যক্তির পক্ষে বহির্জীবনের যে-সমস্ত ঘটনাবলী বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য, তা কবিচরিত রচনার অনিবার্য উপাদান হয়ে ওঠে। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিচরিত আলোচনা করতে হলে তাঁর ব্যক্তি-জীবনকে উপেক্ষা করা যায় না।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯এ জুলাই (১২৭০, ৪ঠা শ্রাবণ) কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম হয়। তাঁর পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় কৃষ্ণনগরের দেওয়ান ছিলেন, আর মাতা প্রসন্নময়ী দেবী ছিলেন অদ্বৈতপ্রভুর বংশধর কালাচাঁদ গোস্বামীর ভগিনী। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র। দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তি-জীবন ও কবি-জীবনের উপর তাঁর স্বনামধন্য পিতা কার্তিকেয়চন্দ্রের প্রভাব কম নয়। সুকণ্ঠ গায়ক, সুরসিক, তেজস্বী ও উন্নতচরিত্র কার্তিকেয়চন্দ্র তৎকালের কৃষ্ণনাগরিক সমাজে নিজেই একটি প্রতিষ্ঠানে (Institution) পরিণত হয়েছিলেন। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'সুরধুনী কাব্যে' জলাঙ্গী নদীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন :

কার্তিকেয়চন্দ্র রায় অমাত্যপ্রধান,
সুন্দর, সুশীল, শান্ত, বদান্য, বিদ্বান ,
সুললিত স্বরে গীত কিবা গান তিনি,
ইচ্ছা করে শুনি হয়ে উজানবাহিনী।

কার্তিকেয়চন্দ্র সংস্কৃত 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত' গ্রন্থের আদর্শে 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত' নাম দিয়ে কৃষ্ণনগর রাজবংশের একটি প্রামাণিক ইতিহাস রচনা করেছিলেন। তাঁর 'আত্মজীবনচরিত' বাংলা সাহিত্যের আত্মচরিত-রচনার আদিপর্বের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই দুটি গ্রন্থেই তৎকালীন বাংলার সামাজিক ইতিহাসের প্রচুর উপাদান পাওয়া যায়। তা ছাড়া ১২৮৫ সনে তিনি 'গীতমঞ্জরী' নামক একখানি স্বরচিত গীতিসংগ্রহও প্রকাশ করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কার্তিকেয়চন্দ্র সম্পর্কে বলেছেন : "আত্মীয়-স্বজন পোষণ, গুণিজনের উৎসাহদান, সাধুতার সমাদর, বিপন্নের বিপদুদ্ধার, এ-সকল যেন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। এই-সকল গুণেই তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি স্বদেশহিতৈষী, স্বজাতিপ্রেমিক মহাজনগণের বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। ইহার বিষয় বলিতে সুখ হয়, ভাবিলেও মন উন্নত হয়।"[১]

১। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ, নিউ এজ সং, ভাদ্র ১৩৬২) পৃঃ ৩০।

চরিত্রের আভিজাত্য, তেজস্বিতা, সঙ্গীতানুরাগ প্রভৃতি গুণ দ্বিজেন্দ্রলাল উত্তরাধিকারসূত্রেই পেয়েছিলেন। এই চরিত্রটি সম্মুখে রেখেই দ্বিজেন্দ্রলাল দুর্গাদাস-চরিত্র অঙ্কন করেন। 'দুর্গাদাস' নাটকের উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেছিলেন: "যাঁহার দেবচরিত্র সম্মুখে রাখিয়া আমি এই দুর্গাদাস-চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছি, সেই চিরআরাধ্য পিতৃদেব ৺কার্তিকেয়চন্দ্র রায় দেবশর্মার চরণকমলে এই ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলাম।" কবি তাঁর পিতার চরিত্রের কথা স্মরণ করে গর্ব অনুভব করতেন।[২] দ্বিজেন্দ্রলালের শৈশব ও বাল্যকালের পরিবেশটিকে তাঁর সেজদা জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন: "কৃষ্ণনগরে আমাদের সেই নগর-প্রান্তস্থিত উদ্যান। অস্তগামী সূর্যের আভায় গাছের পাতা রাঙা হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখী ক্ষুদ্র গাছে জমিয়া কলরব করিয়া পরস্পরকে সাদর সম্ভাষণ করিতেছে। একটি বালক কখন-বা ফল তুলিতে দুলিয়া দুলিয়া দৌড়িতেছে, কখন-বা পাখীর পিছনে ছুটিতেছে। এই ক্ষুদ্র বালক আমাদের দ্বিজেন্দ্র। ..... এখানে দ্বিজেন্দ্রকে দেখুন সৌন্দর্য-পরিবেষ্টিত। সুন্দর ক্ষুদ্র বিহঙ্গগুলি যেমন পুষ্পের মধুপান করিত তেমনি বালক দ্বিজেন্দ্র এই উদ্যান-সৌন্দর্যের মধুপান করিত। অন্যদিকে দ্বিজেন্দ্রের পিতৃদেব সঙ্গীতবিশারদ ছিলেন। ক্ষুদ্র বালকের সঙ্গীতপ্রিয় হৃদয় সেই সঙ্গীতের উচ্ছ্বাসে স্বর্গসুখ অনুভব করিত।......একদিকে দ্বিজেন্দ্র অন্তর্জগতের ও বহির্জগতের সৌন্দর্যের ক্রোড়ে লালিত, অপর দিকে মনুষ্যকণ্ঠের বাদ্যযন্ত্রের ও বিহঙ্গের ত্রিবিধ সম্মিলিত সঙ্গীতে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা উদ্বোধিত হইয়াছিল।"[৩] দ্বিজেন্দ্রলালের শৈশব ও বাল্যকালের এই পরিবেশটি তাঁর সাহিত্যিক-জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

কার্তিকেয়চন্দ্রের বাসভবনে তখনকার কালের অনেক জ্ঞানী-গুণী ও খ্যাতনামা ব্যক্তি সমবেত হতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, অক্ষয়কুমার,

২। দিলীপকুমার রায় তাঁর পিতৃস্মৃতি সম্পর্কে লিখেছেন: "প্রায়ই বলতেন: 'ওরে, জানিস আমি কার ছেলে? কার্তিক দেওয়ানের।' বলে বলতেন প্রায়ই: 'বাবা যখন মৃত্যুশয্যায় তখন এক বৃদ্ধ এসে তাঁকে বলেন: 'দেওয়ানজি, ভয় কি?' তাতে তিনি বলেছিলেন হেসে: 'আমার ভয়?' তাঁর ভয় ছিল না, কেননা জীবনে তিনি সত্যনিষ্ঠ বলে নিজেকে জানতেন।"—উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ১৭।

৩। নব্যভারত: আষাঢ়, ১৩২০।

বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেবচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, মধুসূদন, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি সাহিত্য- ও সংস্কৃতি -ক্ষেত্রের অনেকেই 'কার্তিকেয়চন্দ্রের গুণমুগ্ধ, অকৃত্রিম ও সমপ্রাণ বন্ধু ছিলেন।' এঁদের মধ্যে অনেককেই বালক দ্বিজেন্দ্রলাল মধুসূদন হেমচন্দ্র প্রভৃতি কবির কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন।[৪] নিতান্ত বালক বয়সেই দ্বিজেন্দ্রলাল পিতার সঙ্গীত-পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন। কবিতাপাঠ ও সঙ্গীতচর্চার অনুকূল পরিবেশ তাঁর কাব্যজীবন উন্মেষের সহায়ক হয়েছিল। অল্প বয়সেই তিনি কাব্য রচনা শুরু করেন, শুধু তাই নয়, তিনি স্বরচিত গানেও সুর-সংযোগ করতেন। পরবর্তীকালে তিনি যে গীতিকার ও সুরকার হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন, বাল্যকালেই তার উন্মেষ-লগ্ন। এই যুগের কথা স্মরণ করে তিনি পরবর্তীকালে লিখেছিলেন : "শৈশব হইতেই গীতিরচনায় আমার আসক্তি ছিল। শৈশব হইতেই প্রকৃতি-সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হইয়া গীতিরচনা করিয়া দেবীকে উপহার দিতাম। সে-সব গীত তখন কোন শাস্ত্রতঃ সুরে গীত হইত না। যখন যে সুর ভাল লাগিত, তখন সেই সুরেই গাইতাম।"[৫]

সেকালে কৃষ্ণনগরে একটি সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল। এই পরিবেশের মধ্যমণি ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়। কার্তিকেয়চন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীর মধ্যে এই পরিবেশের বর্ণনা করেছেন। মার্গসঙ্গীতের সেই অনুকূল পরিবেশের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীত-মুগ্ধ মনোজীবন গড়ে উঠেছিল। সেকালের কৃষ্ণনগরের এই সাঙ্গীতিক পরিবেশের বর্ণনা করতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন : "...দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা কার্তিক দেওয়ানের অনেক গান শুনেছি। তিনি ছিলেন অতি সুকণ্ঠ ও সঙ্গীত-বিদ্যায় সুশিক্ষিত। তিনি বোধ হয় বাঙ্গালা হিন্দী দু-ভাষারই গান গাইতেন কিন্তু কি যে গাইতেন আমার মনে নেই।"

"দ্বিজেন্দ্রলালও গাইয়ে বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি সভাসমিতিতে গান গাইতেন ছোকরা বয়সেই। বোধ হয় কণ্ঠসঙ্গীত তাঁর পিতার কাছ

৪। "মহারাজ সতীশচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার পিতার বন্ধুগণ কৌতূহলী হইয়া দ্বিজেন্দ্রের কবিতা আবৃত্তি শুনিয়া তাঁহাকে কবিতা-পাঠে উৎসাহিত করিতেন।"

—দ্বিজেন্দ্রলাল : নবকৃষ্ণ ঘোষ, পৃঃ ১০।

৫। আর্যগাথার (প্রথম ভাগ) ভূমিকা।

থেকেই শিক্ষা করেছিলেন। আরও দুচার জনের মুখে অতি মিষ্টি গান শুনেছি, তাঁদের নামও মনে আছে।"[৬]

প্রমথ চৌধুরীর এই স্মৃতিকথা থেকেই কৃষ্ণনগরের মার্গসঙ্গীতচর্চার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র পাওয়া যায়। সঙ্গীতজ্ঞ পিতার সাহচর্য ও সঙ্গীত-সংস্কৃতিময় পরিবেশের অকুণ্ঠ দাক্ষিণ্যে বালক দ্বিজেন্দ্রলালের মনোজীবনের সুপ্ত সম্ভাবনা মুকুলিত হয়েছিল। কৃষ্ণনগরের 'কার্তিক-ভবন' সেকালের সাংস্কৃতিক জীবনের এক মহাতীর্থে পরিণত হয়েছিল। উনিশ শতকের মনীষীদের মধ্যে অনেকেই কার্তিক-ভবনে পদার্পণ করেছেন। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি যুগ-নায়কদের সাহচর্য কার্তিকেয়চন্দ্রের পারিবারিক জীবনের উপরও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বালক দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর সঙ্গীতের দ্বারা মহামান্য অতিথিদের পরিতৃপ্ত করতেন।

পিতৃচরিত্র ও কৃষ্ণনগরের সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাব ছাড়াও আর একটি বিষয়ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'সেজদা' জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, 'রাঙাদা' হরেন্দ্রলাল রায় ও 'রাঙাবৌদি' মোহিনী দেবীর সস্নেহ লালন ও উৎসাহবাক্য দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক প্রতিভাকে পরিপুষ্ট করেছিল। তাঁর তৃতীয় অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ই তাঁকে ইংরেজী সাহিত্যে দীক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট ইস্কুলের ইংরেজীর শিক্ষক। দ্বিজেন্দ্রলালের বড়দা রাজেন্দ্রলাল রায় মেহেরপুর আদালতের পেশকার ছিলেন। ইস্কুলের ছুটি হলে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর কাছে যেতেন। তিনি ছিলেন ইংরেজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত। দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছিলেন: "তিনি এই অতি অল্পকালের মধ্যে আমাকে এমনি আশ্চর্য কৌশলে ও বিচিত্র নৈপুণ্য-সহকারে ইংরেজী ভাষায় সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ করিয়া তুলিলেন যে, সেই গোড়ার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই আমি অতি অনায়াসে, নিতান্ত অসুস্থ শরীর লইয়া এবং মনোযোগের সহিত বেশীদিন অধ্যয়ন করিতে না পারিয়াও, পরে এম্-এ পরীক্ষায় তবু যা-হোক একটু সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।"[৭] পরবর্তীকালেও তিনি

৬। আত্মকথা: প্রমথ চৌধুরী, পৃঃ ৩০।

৭। দ্বিজেন্দ্রলাল: দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৭১।

বলেছেন : "বড়দাদা এবং সেঝদাদা আমাকে ইংরাজী সাহিত্যের অভিজ্ঞতা-অর্জনে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন।"[৮]

জ্ঞানেন্দ্রলাল সুলেখক ছিলেন। তৎকালীন নানা পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হত। 'সুরভি', 'পতাকা', 'Telegraph', 'Bengalee' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। তাঁর আত্মস্মৃতিমূলক রচনার বহু বিচ্ছিন্ন উপাদান দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যজীবন আলোচনার পক্ষে অপরিহার্য। দ্বিজেন্দ্রলালের ভ্রাতা হরেন্দ্রলাল রায় 'নবপ্রভা' নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তিনিও সুলেখক ছিলেন। হরেন্দ্রলালের স্ত্রী মোহিনী দেবীও সুলেখিকা হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। পুরাতন পত্রিকার মধ্যে তাঁর পারিবারিক জীবনের স্মৃতিচিত্রগুলিও দ্বিজেন্দ্র-মানস-পরিক্রমার মূল্যবান পাথেয়। কৃষ্ণনগরের বিদগ্ধ পরিবেশ, পিতৃদেবের ঋজু-বলিষ্ঠ চরিতশ্রী ও পারিবারিক জীবনের সাহিত্য-সঙ্গীতময় সুকর্ষিত পরিমণ্ডল দ্বিজেন্দ্রলালের মনোজীবনকে লালন করেছিল। তাঁর রাঙাবৌদি মোহিনী দেবীও প্রতিভাশালিনী গায়িকা ছিলেন—সাহিত্য ও সঙ্গীতের যুগ্মবেণীবন্ধনে তাঁর মনোজীবন সমৃদ্ধ ছিল। রায়-পরিবারের এই বিদুষী বধূটি পারিবারিক জীবনের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তার পরিচয় দিয়েছেন দিলীপকুমার রায় : "তাই তো এলেন ঠিক এই সময়ে আমার রাঙা জেঠামহাশয় ৺হরেন্দ্রলাল রায় ভাগলপুর থেকে কলকাতায় ওকালতি করতে। জেঠাইমা ছিলেন বিখ্যাত গায়ক প্রতিভার অবতার ৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের বোন। চমৎকার কণ্ঠস্বর ছিল তাঁর।"[৯] শৈশবে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে হাতেখড়ি হলেও পরবর্তীকালে তিনি বিলিতি গানের অত্যন্ত ভক্ত হয়ে ওঠেন। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারই নাকি তাঁকে ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনেন।

৮। দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৭১।

৯। উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল : দিলীপকুমার রায়, পৃঃ ২৯।

॥ ২ ॥

ছাত্র হিসেবে দ্বিজেন্দ্রলাল অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। কিন্তু একাধিক বার দুরারোগ্য ব্যাধি হওয়ার ফলে তিনি পরীক্ষায় আশানুরূপ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। তবুও এম্-এ পরীক্ষায় তিনি ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য-জীবনের ইতিহাসে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট ইস্কুলের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এখান থেকেই তাঁর কবিত্ব-প্রতিভার উন্মেষ ঘটেছে। মাত্র বারো বছর বয়সেই তিনি কবিতা ও গান রচনা শুরু করেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন: "১২ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে আমি কবিতা ও গান রচনা করিতাম। ১২ হইতে ১৭ বৎসর পর্যন্ত রচিত আমার গীতগুলি ক্রমে 'আর্যগাথা' নামক গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়। তখন কবিতাও লিখিতাম। কিন্তু তখন কোনো কবিতা প্রকাশিত হয় নাই। কেবল "দেওঘরে সন্ধ্যা" নামক মৎপ্রণীত একটি কবিতা "নব্যভারত"-এ প্রকাশিত হয়।"[১০] ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে 'আর্যগাথা' (প্রথম ভাগ) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের প্রকৃতি ও দেশপ্রেমের কবিতাগুলি উচ্চপ্রশংসা লাভ করেছিল। প্রায় এই-সব সময়েই তৎকাল-প্রচলিত প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা "নব্যভারত", "আর্যদর্শন", "বান্ধব" প্রভৃতিতে তাঁর কয়েকটি কবিতা এবং প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু 'আর্যগাথা' (প্রথম ভাগ) প্রকাশিত হওয়ার পর প্রায় দশ বছর অন্য কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। অবশ্য বিলাত যাওয়ার আগে কিছু লেখা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত যাত্রা করেন। আপাতদৃষ্টিতে বিলাত-যাত্রা একটি সাধারণ ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যিক-জীবনের পক্ষে বিলাত-প্রবাসের ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যমূলক। তিনি তাঁর প্রবাসী জীবনের অভিজ্ঞতাকে "বিলাতপ্রবাসী" নাম দিয়ে "পতাকা" পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেন।[১১] দ্বিজেন্দ্রলালের অগ্রজদ্বয় জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় ও হরেন্দ্রলাল রায় কলকাতা থেকে "পতাকা" নামক

১০। নাট্যমন্দির: শ্রাবণ, ১৩১৭।

১১। ১২৯১ ও ১২৯২ সালের পতাকায় দ্বিজেন্দ্রলালের "বিলাতপ্রবাসী" প্রকাশিত হয়।

একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রাবলী দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্য রচনার একটি মূল্যবান নিদর্শন। পরবর্তীকালে নাটকের গদ্য সংলাপের সঙ্গে এই গদ্যরচনাটি মিলিয়ে পড়লে দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্যরচনার একটি সমগ্র পরিচয় পাওয়া যাবে। লেখকের ব্যক্তিত্বও এই রচনাগুলির মধ্যে সুস্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। নিপুণ পর্যবেক্ষণশক্তি, হাস্যপরিহাসপ্রবণতা, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, স্বদেশ- ও স্বজাতিপ্রীতি, চারিত্রিক তেজস্বিতা প্রভৃতি ব্যক্তি ও সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলালের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য এই পত্রাবলীতে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। তথ্যের দিক থেকেও রচনাগুলি মূল্যবান। ইংরেজদের পারিবারিক জীবন, গৃহজীবন, সামাজিক আচার-আচরণ, গ্ল্যাডস্টোন-শাসিত ইংলণ্ডের রাজনৈতিক জীবন ও অন্যান্য বহু জ্ঞাতব্য তথ্য এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে; উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের ইংলণ্ডের জীবনচর্যার কয়েকটি সুন্দর খণ্ডচিত্র আন্তরিকতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। এই চিঠিগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা হল রচয়িতার ভাবজীবনের আন্তরিক প্রকাশ। এই আবেগকম্পিত ভাবসূত্রই পত্রগুলিকে একটি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করেছে। তরুণ মনের কৌতূহল, বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য, বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচনা ও আত্মমুগ্ধ ভাবাকুলতা চিঠিগুলিতে সাহিত্যিক রস সঞ্চারিত করেছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের বিলাত-প্রবাসের মধ্যে দুটি ব্যাপার উল্লেখযোগ্য, কারণ দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্য আলোচনার পক্ষে এই দুটি প্রসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা আছে। বিলাত-প্রবাসকালে তিনি বিলিতি সঙ্গীত শিখেছিলেন। সিসিটার কলেজে দ্বিজেন্দ্রলালের সহাধ্যায়ী বঙ্গবাসী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় বলেছেন: "তারপর সেখানে অল্পদিনের মধ্যেই জানিতে পারিলাম,—দ্বিজু একজন Embryo (কোরক) কবি;—ইতিপূর্বে "আর্যগাথা" রচিয়া স্বদেশের কবিজগতে প্রবেশলাভ করিয়া আসিয়াছেন। গীতবাদ্যেও যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ তাহাও শীঘ্রই প্রকাশ পাইল। একদিন কথায় কথায় গল্পচ্ছলে তিনি বলিলেন—যাঁহার কাছে তিনি গান শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন সে রমণীটি তাঁহার নাকি সুরের সংস্কার ও ভরাট গলার চর্চা করার জন্য তাঁহাকে বহুবার বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। সেই অনুরোধের পরিণামে, পরে যে কি ফল ফলিয়াছিল তাহা আজ বঙ্গবাসী কাহারও অজ্ঞাত নাই। যিনিই তাঁহার গান একবার শুনিয়াছেন তিনিই জানেন দ্বিজুর গলা কিরূপ ভরাট

ছিল এবং পরে তাঁহার স্বরের সঙ্গে অণুমাত্র নাকের সংস্রব ছিল না।"[১২] ইউরোপীয় সঙ্গীতচর্চা পরবর্তীকালে গীতিকার ও সুরকার দ্বিজেন্দ্রলালের উপর গভীর প্রভাব বিস্তৃত করেছিল।

দ্বিজেন্দ্রলালের বিলাত-প্রবাসকালের আর-একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, "Lyrics of Ind" নামক ইংরেজী কাব্যের প্রকাশ। তিনি পরবর্তীকালে আর কোনো ইংরেজী কাব্য প্রকাশ করেন নি। কিন্তু এই কাব্যেও তাঁর প্রতিভার গীতিধর্মিতা ও সুগভীর স্বদেশপ্রেমের পরিচয় আছে। ইংরেজী ভাষায় রচিত হলেও এই কাব্যগ্রন্থটির সঙ্গে তাঁর পরবর্তীকালের বাংলা কবিতা ও গানের একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে। পাশ্চাত্ত্য কাব্য ও নাটকের যে সুগভীর আকর্ষণ তাঁর হৃদয়ে এতকাল সুপ্ত অবস্থায় ছিল, তারই বহিঃপ্রকাশ হয়েছে এই কাব্যে। পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলাল এই কাব্য সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য :

"বাল্যাবধি কবিতা ও নাটকপাঠে আমার অত্যন্ত আসক্তি ছিল। এত অধিক ছিল যে বিদ্যাভ্যাসকালে বায়রনের Manfred ও Childe Herold-এর দুই canto এবং মেঘদূত ও উত্তরচরিতের কাব্যাংশ আমি মুখস্থ করিয়াছিলাম। বিলাতে গিয়া ক্রমাগত Shelley পড়িতাম এবং তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া ক্রমাগত Wordsworth ও Shakespeare বার বার পড়িতাম।..বিলাতে গিয়া ইংরাজীতে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করি এবং সেই কবিতাগুলি একত্রিত করিয়া স্যার এডুইন আর্নল্ডকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি চাহি এবং তৎসঙ্গে কবিতাগুলির পাণ্ডুলিপি পাঠাই। তিনি কবিতা প্রকাশ সম্বন্ধে আমাকে উৎসাহিত করিয়া পত্র লেখেন ও সে কবিতাগুলি তাঁহাকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি সাগ্রহে দান করেন। তখন সেই কবিতাগুলিকে Lyrics of Ind আখ্যা দিয়া প্রকাশ করি।"[১৩] কাব্যটি দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকায় উচ্চপ্রশংসিত হয়েছিল। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-প্রবণতা ও পরিহাস-রসিকতাই যে দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার সবটুকু নয়, এই কাব্যেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'আর্যগাথা' (প্রথম ভাগ) কাব্যে যার অস্পষ্ট ও অপরিস্ফুট প্রকাশ,

১২। দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ১৬৮—১৬৯।

১৩। নাট্যমন্দির : শ্রাবণ, ১৩১৭।

এ কাব্যে তারই রূপ সুস্পষ্ট ও পূর্ণতর হয়ে উঠেছে। আত্মমগ্নতা ও আত্মভাব-বিভোরতা প্রবাসী কবিচিত্তকে স্মৃতি-বেদনায় ব্যাকুল করে তুলেছিল :

When Nature sleeps in Night's soft arms,
The heavens with starry rapture glow,
Sad visions flit across my sight,
The dreams of days—long long ago.[১৪]

স্মৃতি-রোমাঞ্চিত কবি-মনের অকুণ্ঠ আন্তরিকতা এখানে কাব্যরূপ পেয়েছে।

॥ ৩ ॥

বিলাতি সঙ্গীত শিক্ষা, ইংরেজী কাব্যরচনা দ্বিজেন্দ্রলালের বিলাত-প্রবাসের প্রধান দুটি সঞ্চয়। বিলাতে 'বহু রঙ্গমঞ্চে বহু অভিনয়' দেখেছিলেন। নাট্য-রচনার আকাঙ্ক্ষাও সেই সময়েই অঙ্কুরিত হয়েছিল। তিনি নিজে লিখেছেন : "বিলাত যাইবার পূর্বে আমি 'হেমলতা' নাটক ও 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলাম মাত্র, আর কৃষ্ণনগরের এক সৌখীন অভিনেতৃদল কর্তৃক অভিনীত 'সধবার একাদশী' ও 'গ্রন্থকার' নামক একটি প্রহসনের অভিনয় দেখি, আর Addision-এর Cato এবং Shakespeare-এর Julius Caesar-এর আংশিক অভিনয় দেখি। সেই সময় হইতেই অভিনয় ব্যাপারটিতে আমার আসক্তি হয়। বিলাতে যাইয়া বহু রঙ্গমঞ্চে বহু অভিনয় দেখি। এবং ক্রমে অভিনয় ব্যাপারটি আমার কাছে প্রিয়তর হইয়া উঠে।"[১৫]

প্রায় দীর্ঘ তিন বৎসর পর দ্বিজেন্দ্রলাল দেশে ফিরে এলেন। ফিরে আসার পরে এমন দু-একটি ঘটনা ঘটেছিল, যা দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিজীবনকেই শুধু নয়, সাহিত্যিক জীবনকেও নিয়ন্ত্রণ করেছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টভাষী ও স্বাধীনচেতা। সুতরাং শাসক-সম্প্রদায় যে তাতে খুব সন্তুষ্ট হতে পারেন নি, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং কর্ম-জীবনের প্রথম থেকেই

১৪। Stream : Lyrics of Ind.

১৫। আমার নাট্য-জীবনের আরম্ভ : নাট্যমন্দির, শ্রাবণ, ১৩১৭

তাঁর মনে একটি বিক্ষোভ ছিল। এমনকি এক সময় তিনি চাকুরি ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছেও করেছিলেন।[১৬] তাই এক সময় তিনি গভীর পরিতাপের সঙ্গে ও স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেছিলেন :

হায় শুদ্ধ অন্নচিন্তা যদি না থাকিত, ও অন্ততঃ
দিবায় ছয়টি ঘণ্টা পরদাস্য না করিতে হত ;[১৭]

বিলাত-ফেরত হয়ে আসার পর দ্বিজেন্দ্রলালকে সামাজিক নির্যাতনও সহ্য করতে হয়েছিল। আজ থেকে প্রায় পঁচাত্তর বছর আগের কথা। তখনকার কালের সামাজিক অবস্থাও অন্যরকম ছিল। বিলাত যাওয়া তখনকার কালেও ঘোরতর অশাস্ত্রীয় ও অসামাজিক ব্যাপারের মধ্যেই গণ্য ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকার এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

—"ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর অদর্শনের পর দ্বিজেন্দ্রলালকে পাইয়া তদীয় স্বজনগণ যদিও মুখে খুব সন্তোষ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু কার্যতঃ সামাজিক ও আনুষ্ঠানিক ব্যবহারে তাঁহারা বিশেষ সাবধানে একটু স্বাতন্ত্র্য ও ব্যবধান রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন। 'পাতানো' সম্পর্কের স্থলে বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হইতে এবংবিধ আচরণ তিনি হাস্যমুখে, অবজ্ঞাভরে অগ্রাহ্য করিতেও প্রস্তুত ছিলেন ; কিন্তু যখন প্রকাশ পাইল যে, প্রকৃত অবস্থা শুধু তাহা নহে, তদপেক্ষা বহুল পরিমাণেই শোচনীয় ও সাংঘাতিক, অর্থাৎ বিলাত যাওয়ার জন্য তদীয় আত্মীয়গণের মধ্যেও কেহ-কেহ সামাজিক হিসাবে তাঁহাকে বর্জন করিতে কৃতনিশ্চয়—তখন অসহায় ও বড়-অভিমানী দ্বিজেন্দ্রলালের ভাব-প্রবণ কোমল হৃদয় আর-একবার তাঁহার পিতামাতার কথা স্মরণ করিয়া হাহাকারে কাঁদিয়া উঠিল !—এই অভাবিত প্রচণ্ড আঘাতে তিনি স্তম্ভিত, আহত ও মুহ্যমান হইয়া গেলেন।"[১৮]

যুক্তিবাদী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী দ্বিজেন্দ্রলাল এই-জাতীয় আচরণে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। কেউ কেউ আবার তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করার পরামর্শও দিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের যুক্তিবাদী মন এই-জাতীয় বিধান মেনে নিতে পারে নি। কারণ বিলাত-যাত্রা যে কোনো পাপকার্য

১৬। দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী ; পৃঃ ২৪২।
১৭। সমুদ্রের প্রতি : মন্দ্র।
১৮। দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী ; পৃঃ ২০৩—২০৪।

বা অবৈধ ব্যাপার, এ কথা তিনি মানতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। বিলাত-প্রবাসকালের ডায়েরিগুলির মধ্যেই তাঁর এই স্বাধীন মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়: "আমি জানি, আমার এ প্রস্তাবে অনেকেই অন্তরে সম্মত। কিন্তু লোকাচার ছাড়িতে অনেকেই সম্মত নহেন। অনেকেই সমাজচ্যুত হইবার ভয়ে ভীত। আমি জানি না, এ-আশঙ্কার কারণ কি? সমাজ? কেন, প্রতি মনুষ্য লইয়াই ত সমাজ। সমাজ আমাকে চ্যুত করিবে? তাহাতে কি ক্ষতি আমারই? তাহার নয়? সমাজ কি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজেও হীনবল হইল না? সমাজ আমাকে পরিত্যাগ করিল, আমি কি সমাজকে পরিত্যাগ করিলাম না? অবশ্য প্রথমে ক্ষতি আমার, কিন্তু পরিণামে ঐ সমাজের ক্ষতি। নূতন সমাজ সংগঠিত হইবে, নূতন ও সভ্যতর আচার অনুষ্ঠিত হইবে। সমাজ সর্বত্রই সংস্কারের প্রতি খড়্গহস্ত!"[১১] দ্বিজেন্দ্রলাল যেদিন বিদেশে বসে এই পত্র লিখেছিলেন, সেদিন নিশ্চয়ই তাঁর অদৃষ্টদেবী বিদ্রূপের নির্মম হাসি হেসেছিলেন। তিন-চার বছর আগে যে সামাজিক সমস্যার উপর তিনি আলোকপাত করেছিলেন, তাই পরবর্তীকালে বাস্তবের ক্ষমাহীন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

সামাজিক উৎপীড়ন ও নির্মম আচরণ দ্বিজেন্দ্রলালের সংবেদনশীল তরুণ মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল—সেই প্রতিক্রিয়ার বহ্নিজ্বালাময় রূপ তাঁর 'একঘরে' পুস্তিকায় আত্মপ্রকাশ করেছে। 'একঘরে' পুস্তিকাটিকে ঠিক প্রবন্ধ বলা যায় না, বড় জোর একটি ইস্তাহার বলা যায়। তৎকালীন 'সমাজ-সংরক্ষকদের' প্রতি অব্যর্থ-লক্ষ্য বিষবাণ বর্ষিত হলেও খণ্ডকালের সামাজিক উত্তেজনার মধ্যেই এর গতি সীমাবদ্ধ। হিন্দুসমাজকে তীব্রভাবে আক্রমণ করা হয়েছে—তাতে সঙ্গতিহীনতা ও একদোষদর্শিতাই উগ্র হয়ে দেখা দিয়েছে। সাময়িক উত্তেজনায় ক্রোধান্ধ হয়ে তিনি ভাষা ও ভাবগত সংযম পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছেন। তীব্র বিদ্রূপ, মর্মান্তিক শ্লেষ ও তীক্ষ্ণ-দীপ্ত বাক্যবাণ রচনাটির বিশেষত্ব, কিন্তু লেখক নিজেই অভিভূত হয়ে তাঁর সংযমের বাঁধ হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি যে কতদূর অভিভূত

১১। ইংরাজ ও এদেশবাসীর আহার্য-বিচার ও কর্তব্য-নির্ণয়: বিলাতপ্রবাসী (বিলাতযাত্রী)।

হয়েছিলেন, তার প্রমাণস্বরূপ পুস্তিকাটির একটি অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে:

—"মহাশয়, এ ভাষায় আর লিখিতে পারি না। এ সমাজের বিষয় আর এ বিদ্রূপের ভাষায়, আচ্ছাদিত ক্রোধে লেখা অসম্ভব। ইহার ভাষা ঠাট্টার ভাষা নহে। ইহার ভাষা অন্যায়ক্ষুব্ধ তরবারির বিদ্রোহী ঝনৎকার, ইহার ভাষা পদদলিত ভুজঙ্গমের ক্রুদ্ধ দংশন, ইহার ভাষা অগ্নিদাহের জ্বালা। এ ভীরুতার রাজত্বের, এ অন্যায়ের ধর্মশালার, এ প্রবঞ্চনার রাজনীতির বিষয় বলিতে—যদি শতশেলময়ী, দাবানলের স্ফুলিঙ্গময়ী, নরকের জ্বালাময়ী ভাষা থাকে, তাহাই ইহার উপযুক্ত ভাষা।"[২০]

'একঘরে' দ্বিজেন্দ্রলালের কোনো উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য প্রতিভার নিদর্শন নয়। কিন্তু শুধু ঐতিহাসিক মূল্যের দিক থেকেই যে এর নাম উল্লেখযোগ্য, এ কথাও বলা যথার্থ নয়। নকশাটি দ্বিজেন্দ্রলালের সুপ্ত স্যাটারিস্টের প্রতিভাই যেন জাগিয়ে তুলেছে। দ্বিজেন্দ্র-মানসে রোমান্টিক ভাবাবেগের সঙ্গে ব্যঙ্গবিদ্রূপ-প্রবণতাও জড়িত ছিল। সাময়িক উত্তেজনার একটি প্রবল আলোড়নে যেই যবনিকাপ্রান্ত একটু অপসারিত হয়েছে, অমনি বিদ্রূপ-নিপুণ দীপ্ত বলিষ্ঠ ভাষা 'পদদলিত ভুজঙ্গমের' মতো উদ্যতফণা বিস্তার করেছে। ধৈর্যচ্যুত লেখকের ভাষাগত অসংযম যতই থাকুক না কেন, তবুও এই ক্ষীণকলেবর পুস্তিকাটি যে দ্বিজেন্দ্রলালের পরিহাস-ক্ষমতা ও ব্যঙ্গবিদ্রূপ-প্রবণতার পরিচয় দিয়েছে, এ কথা তৎকালীন কোন কোন পত্র-পত্রিকাও স্বীকার করেছেন।[২১] সামাজিক অসঙ্গতি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে তিনি পরবর্তী বহু হাসির গান ও প্রহসন রচনা করেছেন। 'একঘরে' যতই দুর্বল হোক না কেন, দ্বিজেন্দ্রলালের যে নিপুণ বিদ্রূপ-প্রবণতা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ছিল, তাকেই যেন আকস্মিক আঘাতে সচকিত করে তুলেছে—বাধামুক্ত পার্বত্য-তরঙ্গিণীর মতো সেই নব-জাগ্রত শক্তি দুর্বার প্রাণচাঞ্চল্যে ও কলহাস্যে বাংলা সাহিত্যকে প্লাবিত করেছিল। 'একঘরে' দ্বিজেন্দ্র-মানসের এক অনাবিষ্কৃত ভূখণ্ডের সর্বপ্রথম আবিষ্কার—অনাগত সম্ভাবনার অপরিণত

২০। একঘরে।

২১। "দ্বিজেন্দ্রলালের পরিহাস ক্ষমতার—বিদ্রূপপ্রিয়তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।"
—(আর্যাবর্ত: জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০)

ইঙ্গিত। তা ছাড়া দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসের স্বরূপ-ধর্ম ও মূল প্রকৃতিও এই পুস্তিকায় আত্মপ্রকাশ করেছে। 'একঘরে'-র কলাকৌশলবর্জিত ও আতিশয্য-ধর্মী ব্যঙ্গই 'হাসির গান'-এ নিপুণ হাতের স্পর্শে শব্দার্থ-ভ্রূভঙ্গিময় তির্যক কটাক্ষে পরিণত হয়েছে :

যবে কেউ বিলেত থেকে ফিরে বেঁকে
প্রায়শ্চিত্ত করে ,
যবে কোন মতিভ্রান্ত, ভেড়াকান্ত
ধর্ম ভাঙ্গে গড়ে,
যদি কোন প্রবীণ ষণ্ড মহাভণ্ড
পরেন হরির মালা,
তখন ভাই, হাসি চেপে নাহি ক্ষেপে
রইতে পারে কোন—।[২২]

'একঘরে'-র বিদ্রূপাত্মক কবিকণ্ঠই যে অধিকতর নৈপুণ্য ও অনায়াস সাবলীলার সঙ্গে এখানে উচ্চারিত হয়েছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

॥ ৪ ॥

১২৯৪ সালের বৈশাখ মাসে (১৮৮৭) দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরবালা দেবীর বিবাহ হয়। সুরবালা দেবী দ্বিজেন্দ্র-কবি-মানসের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের বিবাহ-প্রসঙ্গেও একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জ্ঞানেন্দ্রলাল লিখেছেন : "কৃষ্ণনগরের কয়েকটি সম্ভ্রান্ত হিন্দু দ্বিজেন্দ্রের বিবাহে আমাদের সহিত বরযাত্রী গিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহে পূর্বে কোন প্রবল পক্ষ, যাঁহারা এই বিবাহে যোগ দিবেন, তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করিবার চেষ্টা করিবেন, এই সংবাদ পাইয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। যাহা হউক, বিবাহ হইয়া গেলে আমরা ভ্রাতাগণ দ্বিজু ও তাঁহার নবোঢা বধূকে সঙ্গে করিয়া কৃষ্ণনগরে লইয়া আসিলাম; দ্বিজেন্দ্রের এই বিবাহে আমরা যোগ দেওয়া সত্ত্বেও কেহ আমাদিগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন

২২। বলি ত হাসব না : হাসির গান।

না। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে দ্বিজেন্দ্রের সহিত তখন কেহ চলিতে স্বীকৃত হইলেন না।"[২৩]

বিলাত-প্রত্যাগত হওয়ার পর দ্বিজেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে যে সামাজিক প্রতিক্রিয়া তীব্র হয়ে উঠেছিল, বিবাহ-ব্যাপারে তাই চূড়ান্ত শীর্ষে আরোহণ করেছিল। সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে উত্তপ্ত তিনি যেমন 'একঘরে' নকশার ভেতর দিয়ে তার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন, তেমনি অন্যদিকে নব-পরিণীতা পত্নীকে ঘিরে তাঁর হৃদয়োচ্ছ্বাস গীতি-কবিতার স্ফটিক-পাত্রে স্বর্ণ-মদিরার মতো বিহ্বল ও উজ্জ্বল হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের মানস-জীবনে এই দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। একদিকে আত্মমুগ্ধ প্রেম-বিহ্বল স্বপ্নাতুর কবিচিত্ত, আর-একদিকে সামাজিক অসঙ্গতি-ক্ষুব্ধ সামাজিক মানুষ। কখনও কখনও এই দুটি বিরুদ্ধ ধারা একত্রিত হয়ে কবিতার ভাব ও রূপের ক্ষেত্রে বিচিত্রমুখী জটিলতার সৃষ্টি করেছে। অবশ্য এ দুটি ধারাই কবির স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। পত্নী সুরবালার প্রেম ও দাম্পত্য-রস ও অপর কোটিতে সামাজিক নির্যাতন—এই দুটি ব্যাপার একত্রিত হয়ে কবি-মানসের এই স্বরূপ-ধর্মকে তীব্রতর ও ত্বরান্বিত করেছে। 'আর্যগাথা' (প্রথম খণ্ড) বিবাহের পাঁচ বছর আগে লেখা। কিন্তু সেই অপরিণত কবিতাগুচ্ছের মধ্যেও কবি-হৃদয়ের গীতি-উচ্ছ্বাস ও সূক্ষ্ম-সংবেদনশীল বাসনালোকের মৃদু-মূছনা একেবারে অনুপস্থিত নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'আর্যগাথা' (দ্বিতীয় ভাগ) ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যের সহজ ও অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেমস্বপ্ন ও সুখ মাধুর্যময় দাম্পত্য-জীবনকেই কাব্যমণ্ডিত করে তুলেছে। কাব্যটির 'উৎসর্গ' অংশেই কবির প্রিয়া-বন্দনার নিবিড় সুর নিঃসংশয়িত হয়ে উঠেছে :

নয় কল্পিত সৌন্দর্যে ,—নয়
কবির নয়নে দেখা—পরীস্বপ্নসম ,—
এসেছ প্রত্যক্ষ স্বীয় দেবীরূপ ধরি।

'আর্যগাথা' (দ্বিতীয় ভাগ) আর-একটি কারণে দ্বিজেন্দ্রলালের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। অল্প বয়সেই তাঁর সাঙ্গীতিক প্রতিভার উন্মেষ হয়। কিন্তু এখানে সুরকার, গীতিকার ও কবির সর্বপ্রথম যথার্থ মিলন ঘটেছে।

২৩। নব্যভারত : শ্রাবণ, ১৩২০।

'আর্যগাথা' কাব্যের প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে কালগত ব্যবধান প্রায় দশ বৎসর। কিন্তু এই দশ বছরের মধ্যে কবি-জীবনের এক বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তন সম্পর্কে কবিও সচেতন ছিলেন। তিনি এই কাব্যের ভূমিকায় বলেছেন: "দশ বৎসরে আমার জীবনে যুগান্তর হইয়াছে—কাহার না হয়? আজ আমি আর সে পাঠাধ্যায়ী, অনূঢ়, জগতের দূরস্থ পরিদর্শক নাই।—

'আজ যেন রে প্রাণের মতন কাহারে বেসেছি ভাল;
উঠেছে আজ নূতন বাতাস, ফুটেছে আজ নূতন আলো।'

মলয়ানিলসম্পৃক্ত, প্রেমোদ্ভাসিত আমার হৃদয়কুঞ্জে তাই এই কৃতজ্ঞ অস্ফুট কুহুধ্বনি।" 'আর্যগাথা'-র (দ্বিতীয় ভাগ) প্রথমাংশের কবিতাগুলি প্রেম ও যৌবনস্বপ্নের, কবিজায়াই তার অবলম্বন। দ্বিতীয়াংশ পাশ্চাত্ত্য কবিদের গীতের অনুবাদ। এই সংকলনটিতে দ্বিজেন্দ্রলালের রোমান্টিক কবিস্বপ্ন ও গীতিকাব্যের প্রতিভা পরিস্ফুট হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য-জীবনকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। স্ত্রী-বিয়োগের পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রথমার্ধ, স্ত্রী-বিয়োগের পরবর্তীকাল থেকে কবির মৃত্যুকাল পর্যন্ত দ্বিতীয়ার্ধ। বিবাহের পর ষোলো বছর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় দাম্পত্যজীবনের সুধাস্নিগ্ধ ধারা দ্বিজেন্দ্রলালের মনোজীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। প্রহসন, ব্যঙ্গকবিতা, হাসির গান, নাট্যকাব্য, রোমান্টিক গীতিকবিতা প্রভৃতি বিচিত্র সৃষ্টি-সাফল্যের প্রাচুর্যে কবি-জীবন তখন পূর্ণোচ্ছ্বসিত। জীবনের এই চরম মুহূর্তেই এল তীব্রতম আঘাত। একটি মৃতা কন্যা-সন্তান প্রসব করে পত্নী সুরবালা দেবীর মৃত্যু হল। (২৯ নভেম্বর, ১৯০৩)। দ্বিজেন্দ্রলাল তখন সরকারী কাজের জন্য মফস্বলে গিয়েছিলেন—তারযোগে সংবাদ পেলেন যে স্ত্রী মরণাপন্না, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি তাঁকে জীবিত দেখতে পারেন নি।

আপাতদৃষ্টিতে স্ত্রী-বিয়োগের এই বেদনাময় কাহিনীটিকে দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কাহিনী বলেই মনে হবে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক জীবন ও কবি-মানসের পক্ষে স্ত্রী-বিয়োগের ব্যাপারটি একটি বহিরাশ্রয়ী ঘটনাই নয়। ব্যক্তিগত জীবনে কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীকে হারিয়ে ও মাতৃহারা শিশুসন্তানদের ম্লান মুখের দিকে চেয়ে তাঁর বেদনার অন্ত

ছিল না। কিন্তু শিল্প-জীবনে তার চেয়েও গভীর পরিবর্তন ঘটেছিল। স্ত্রী-বিয়োগের পূর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রধানত কবি ও প্রহসন-রচয়িতা। একদিকে উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগপূর্ণ গীতিকবিতা, অন্যদিকে ব্যঙ্গবিদ্রূপপূর্ণ কবিতা ও প্রহসন—এই দুইয়ের টানাপোড়েনে এই পর্বে দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য-জীবন সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। 'আর্যগাথা' (১ম ও ২য়) ও 'মন্দ্র' কাব্য, 'হাসির গান' ও 'আষাঢ়ে' ব্যঙ্গকবিতা সঙ্কলন, 'কল্কি-অবতার', 'বিরহ', 'ত্র্যহস্পর্শ' ও 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রহসন চতুষ্টয় এই কালের মধ্যেই রচিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য-জীবনের প্রথম পর্বে তাঁর জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটকগুলি রচিত হয় নি—যদিও নাটকের প্রতি তাঁর আকর্ষণ আবাল্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রহসনগুলি বাদ দিলে এই পর্বে তিনি দুখানি নাটক রচনা করেন—'পাষাণী' ও 'তারাবাই'। নাট্যকার নিজেই 'পাষাণী'কে 'গীতি-নাটিকা' বলেছেন। নাট্যবিচারেও দেখা যাবে যে এই 'গীতি-নাটিকা'টিতে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল মুখ্য হয়ে উঠেছেন, শুধু তাই নয়, নাট্যকারের বস্তুধর্মটি ক্লিষ্ট করে গীতিকবির আত্মভাবমুগ্ধ উচ্ছ্বসিত হৃদয়টিই প্রাধান্য লাভ করেছে। 'তারাবাই' নাটকের শ্রেষ্ঠ সংলাপগুলিও কবিতায় রচিত। স্ত্রী-বিয়োগের পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে ঐতিহ্যপ্রীতি, দেশপ্রেম ও স্বাজাত্যানুভূতির যে তীব্রতা প্রকাশিত হয়েছে, 'তারাবাই' নাটকে তা অনুপস্থিত। তা ছাড়া 'তারাবাই' নাটকের কেন্দ্রীয় রস স্বতন্ত্র। তাকে জাতীয়-ভাবোদ্দীপক নাটক বললে বিভ্রান্তি ঘটার সম্ভাবনা।

দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় পর্ব মুখ্যত জাতীয়-ভাবোদ্দীপক নাট্যরচনার যুগ হিসেবে অভিহিত হতে পারে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে জাতীয়তাবোধ প্রসারিত হয়েছিল, দ্বিজেন্দ্রলালের এই পর্বের নাটকগুলি তাকেই ভাষা দিয়েছিল। স্ত্রী-বিয়োগবিধুর দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর শূন্য হৃদয়ের হাহাকারকে যেন এই বহিরাশ্রয়ী উন্মাদনা ও উত্তেজনা দিয়ে অনেকটা পূরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্র-মানসের এই পট-পরিবর্তনগুলির উপরে চমৎকার আলোকপাত করেছেন সমালোচক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী :

" 'তারাবাই' ব্যতীত তাঁহার যাবতীয় জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটকের সৃষ্টি স্ত্রী-বিয়োগের পরে। নাটক-পাঠে, নাটকের অভিনয় দেখায়, নাটক-

রচনায় তাঁহার ঝোঁক গোড়া হইতেই ছিল। কিন্তু এই সময়কার নাটকগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলি রঙ্গমঞ্চের চাহিদা অনুসারে লিখিত। এমন হইবার অনেক কারণ থাকা সম্ভব। প্রথম, অভিনয়যোগ্য নাটকের চাহিদা। দ্বিতীয়, বঙ্গভঙ্গ-জনিত জাতীয়তাবোধের প্রসার। আরও একটি কারণ থাকাও অসম্ভব নয়। স্ত্রী-বিয়োগের পরে সংসারের ও মনের হঠাৎ-শূন্যতা পূরণ করিবার জন্য বাহিরের উত্তেজনার কিছু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল তাঁহার পক্ষে। রঙ্গালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সেই শূন্যতা পূরণ করিতে পারে আশায় তিনি মঞ্চোপযোগী নাটক রচনায় উদ্যোগী হইয়া উঠিয়াছিলেন এমন খুবই সম্ভব।"[২৪]

দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য-জীবনের কিছু কিছু আপাত-বিরোধী ধারা লক্ষণীয়। সেই বিরোধের মধ্যে সমন্বয়-সূত্র নির্দেশ করে কবি-মানসের মৌলিক অভিপ্রায় আবিষ্কার করা সমালোচকের একটি প্রধান কর্তব্য। পত্নী-প্রসঙ্গ দ্বিজেন্দ্র-মানসের এই বিচারের উপর নিঃসন্দেহে আলোকপাত করবে।

॥ ৫ ॥

দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গকবিতা ও প্রহসনগুলির সঙ্গে তাঁর কর্মজীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কিছু সংযোগ আছে বলে মনে হয়। বিলাত থেকে ফিরে এসে তিনি ছোটলাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, কিন্তু স্বাধীনচেতা দ্বিজেন্দ্রলালের কথাবার্তায় তিনি মোটেই খুশী হতে পারেন নি। জ্ঞানেন্দ্রলাল লিখেছেন : "তিনি (দ্বিজেন্দ্রলাল) দেশে আসিয়া ছোটলাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ছোটলাটের সহিত যেরূপ স্বাধীনভাবে কথাবার্তা কহিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ভাল চাকুরী পাইলেন না। তাঁহার ন্যায় কৃষি-শিক্ষা করিয়া একজন বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালী statutory civilian হইলেন আর দ্বিজেন্দ্র ডেপুটি হইলেন!"[২৫] এমনকি যে কৃষিবিদ্যায় তিনি বিশেষজ্ঞ হয়ে এসেছিলেন, তাও কার্যক্ষেত্রে তেমন ভাবে প্রয়োগ করতে পারেন নি। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে

২৪। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল : রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা : ২৮শে পৌষ, ১৩৬৪।

২৫। নব্যভারত : ভাদ্র, ১৩২০।

তিনি বর্ধমান স্টেটের সুজামুটা পরগনায় সেটেলমেণ্ট অফিসার নিযুক্ত হন। এই কার্যোপলক্ষে ছোটলাটের সঙ্গে তার বিরোধ হয়। এই ঘটনায় দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিচরিত্রের পরিচয়ও পাওয়া যায়। তিনি নিজেই এ ঘটনা সম্পর্কে বলেছেন :

"উক্ত সেটেলমেণ্ট-সংক্রান্ত একটি ঘটনা ঘটে, যাহাতে বঙ্গদেশে একটি উপকার সাধিত হয়। আমার পূর্ববর্তী সেটেলমেণ্ট অফিসারেরা জরীপে জমি বেশী পাইলেই খাজনা বেশী ধায করিয়া দিতেন। আমি সুজামুটা সেটেলমেণ্টে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করি যে এরূপ খাজনা বৃদ্ধি করা অন্যায় ও আইন-বিরুদ্ধ।...ঐ রায় হইতে জজের নিকট আপীল হয় এবং তাহাতে জজসাহেব উক্ত রায় উল্টাইয়া প্রজাদিগের খাজনা বৃদ্ধি করিয়া দেন। এই সময় স্যর চার্লস এলিয়ট বঙ্গদেশের লেপ্টনাণ্ট গভর্নর ছিলেন। তিনি উক্তরূপ বিভ্রাট দেখিয়া উক্ত বিষয় তদন্ত করিয়া স্বয়ং মেদিনীপুর আসেন ও কাগজপত্র দেখিয়া আমাকে যথোচিত ভৎসনা করেন। আমি আমার মত সমর্থন করিয়া বঙ্গদেশীয় সেটেলমেণ্ট আইন বিষয়ে তাঁহার অনভিজ্ঞতা বুঝাইয়া দিই। ছোটলাট ক্রুদ্ধ হইয়া আমার পূর্ব ইতিহাস জানিতে চাহেন ও তাহা অবগত হইয়া কলিকাতায় গিয়া ভবিষ্যতে সেটেলমেণ্ট অফিসারদিগের কর্তব্য বিষয়ে এক দীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং তাহাই আইনে ঢুকাইয়া দেন। ইত্যবসরে জজের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হয়; হাইকোর্ট জজের রায় উল্টাইয়া দিয়া আমার মতের সহিত ঐক্য প্রদর্শন করেন এবং সেই হাইকোর্টের "রুলিং" অনুসারে এখন সমস্ত বঙ্গদেশে সেটেলমেণ্ট কার্য চলিতেছে।...ইত্যবসরে হাইকোর্টের আর-একটি আপীলে স্যর চার্লসের উক্ত মন্তব্যও নির্দয়ভাবে সমালোচিত হয়। তাহাতে তিনি সেগুলি সেটেলমেণ্ট হইতে উঠাইয়া লইতে বাধ্য হন।

...আমি সত্যই ইহা শ্লাঘার বিষয় বিবেচনা করি যে, আমি এই ক্ষুদ্র ক্ষমতাতেই উক্ত কার্যে নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিলেও সমস্ত বঙ্গদেশব্যাপী একটি উপকার সাধিত করিয়াছি—নিরীহ প্রজাদিগকে অন্যায় করবৃদ্ধি হইতে বাঁচাইয়াছি। ভবিষ্যতে এরূপ কার্য আর যে করিতে পারিব তাহার আশা নাই।"[২৬]

২৬। জন্মভূমি: কার্তিক, ১৩০৪।

চাকুরি-জীবনের দুঃসহ ও তিক্ত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের এই মন্তব্যটি তাঁর ব্যক্তিচরিত্রের উপর আলোকপাত করেছে। চাকুরির প্রথম ক বছর তিনি নানা ঝঞ্ঝাটে ছিলেন। ছ-সাত বছর পরে 'আর্যগাথা' (দ্বিতীয় ভাগ) প্রকাশিত হয়। কিন্তু বিলাত-প্রবাস, বিবাহ ও চাকুরি-ঘটিত নানা বিবাদ-বিসংবাদ তাঁর সাহিত্য-জীবনের উপরেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৮৯৫ থেকে ১৯০২-এর মধ্যে চারখানি প্রহসন ও দুটি ব্যঙ্গ কাব্যের সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। কবি তাঁর ব্যঙ্গকবিতায় চাকুরি-জীবনের বিড়ম্বনার কথা কৌতুকের সঙ্গে বলেছেন :

খেটে খেটে খেটে—
রোজই আসি মুনিবের শ্রীপদযুগ চেটে ,—
দীনমূর্তি দেখিলেই মুনিবও যান ক্ষেপে,
রুদ্রমূর্তি দেখিলেই ভৃত্য উঠে কেঁপে ,
তদীয় এক তাড়ায়
যেন বা ভূত ঝাড়ায় ,
ইচ্ছা হয় যে চলে' যাই—দ্যুৎ। ছেড়ে এই পাড়াস ,
স্ত্রীর উপরে হয় বিরাগ , জীবনে হয় ঘৃণা ;
সংসারও হয় অসহ্যপ্রায় গুড়্‌গুড়ি বিনা।[২৭]

স্ত্রী-বিয়োগের আগে যে চারখানি প্রহসন (কল্কি অবতার, বিরহ, ত্র্যহস্পর্শ ও প্রায়শ্চিত্ত) ও দুটি ব্যঙ্গকবিতার সঙ্কলন (আষাঢ়ে ও হাসির গান) প্রকাশ করেন—এদের মধ্যে একটি গভীর আত্মিক সম্পর্ক আছে। তাঁর হাসির গানগুলি যে প্রহসনগুলির ভিত্তি এ কথা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন :

"বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি কলিকাতার রঙ্গমঞ্চসমূহে অভিনয় দেখি এবং সেই সময়েই বঙ্গভাষায় লিখিত নাটকগুলির সহিত আমার পরিচয় হয়। প্রথমতঃ প্রহসনগুলির অভিনয় দেখিয়া সেগুলির স্বাভাবিকতায় ও সৌন্দর্যে মোহিত হইতাম বটে, কিন্তু সেগুলির অশ্লীলতা ও কুরুচি দেখিয়া ব্যথিত হই। ঐ সময়ে—কল্কি অবতার একখানি প্রহসন গদ্যেপদ্যে রচনা করিয়া ছাপাই। পরে আমার পূর্বরচিত কতকগুলি হাসির গান একত্রে

২৭। কেরানী : আষাঢ়ে।

গাঁথিয়া "বিরহ" নাটক রচনা করি। এবং ক্রমে সে নাটক স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। তৎপরে উক্তরূপ ত্র্যহস্পর্শ রচনা করি এবং সেখানি ক্লাসিকে অভিনীত হয়।"[২৮]

(সাহিত্য-জীবনের এই পর্বের 'মন্দ্র' গীতিকাব্যটি 'শব্দনির্বাচনে', 'ছন্দো-রচনায়' ও 'ভাববিন্যাসে' যে অভিনবত্বের সৃষ্টি করেছিল, তা এক সময় রবীন্দ্রনাথের সপ্রশংস অভিনন্দন লাভ করেছিল।[২৯] 'মন্দ্র' কাব্যখানির বিচিত্র রসোৎসবের মধ্যে হাসির গানের কবিও অনুপস্থিত নন। দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-মানসের দুটি আপাতবিরোধী ভাববৃত্তি 'মন্দ্র' কাব্যে এক নূতন ধরনের শিল্পরূপের সৃষ্টি করেছে। ভাবাবেগরঞ্জিত রোমান্টিক উচ্ছ্বাস ও ব্যঙ্গাত্মক তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি—আপাতবিরোধী দুটি প্রবাহই কাব্যটিতে অবিরোধে স্থান পেয়েছে।)

স্ত্রী-বিয়োগের পরে দ্বিজেন্দ্রলাল দুখানি নাটক রচনা করেন—'পাষাণী' (১৩০০) ও 'তারাবাই' (১৩০৩)। পরবর্তীকালের গদ্য সংলাপ-মুখ্য ঐতিহাসিক নাটকের সঙ্গে এই দুটি নাটকের একটি আস্বাদনগত পার্থক্য আছে। 'পাষাণী'কে নাট্যকার নিজেই 'গীতি-নাটিকা' বলেছেন—দ্বিজেন্দ্রলালের রোমান্টিক প্রতিভাই এখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু 'তারাবাই' বিষয়-বস্তুর দিক থেকে পুরাণাশ্রয়ী নয়, টডের রাজস্থান-কাহিনী থেকে তিনি উপাদান সংগ্রহ করেছেন। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক নাটকের সঙ্গে 'তারাবাই' নাটকের পার্থক্যটি সুস্পষ্ট। 'তারাবাই' নাটকে পৃথ্বীরাজ ও তারাবাইয়ের রোমান্টিক কাহিনীকে অবলম্বন করা হয়েছে, কিন্তু 'প্রতাপ সিংহ' থেকে যে ঐতিহাসিক নাটকগুলি রচিত হয়েছে, তার মূলে ছিল নাট্যকারের জাতীয়তাবোধ। স্ত্রী-বিয়োগের পরবর্তীকালে বঙ্গভঙ্গের পটভূমিকায় বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলনের উন্মাদনা তাঁর হৃদয়ের শূন্যস্থানকে পূরণ করেছিল। জাতীয় জীবনের এই উন্মাদনাই দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির ভিত্তিভূমি—এইখানেই 'তারাবাই' নাটকের সঙ্গে পরবর্তী ঐতিহাসিক নাটকগুলির মৌলিক পার্থক্য।

২৮। নাট্যমন্দির শ্রাবণ, ১৩১৭।

২৯। মন্দ্র আধুনিক সাহিত্য।

॥ ৬ ॥

১৮৯৮ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত দ্বিজেন্দ্রলাল কলকাতায় ছিলেন, অবশ্য মাঝে মাঝে তাঁকে কার্যোপলক্ষে মফস্বলে যেতে হত। কিন্তু এই সাত বছর কাল তিনি প্রধানত কলকাতাতেই কাটিয়েছেন। প্রথমে বেচু চাটুজ্জে স্ট্রীটে, পরে ১নং ঝামাপুকুর লেনে তাঁর বাসা ছিল। স্ত্রী-বিয়োগের পর ৫নং সুকিয়া স্ট্রীটে বাসা করেন। মৃত্যুর চার বছর আগে ২নং নন্দকুমার চৌধুরী লেনে তিনি পত্নীর নামানুযায়ী একটি অট্টালিকা তৈরি করেছিলেন, এই বাড়ির নাম ছিল 'সুরধাম'। এই নামকরণ-প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছিলেন "এ যে তাঁরই যত্নসঞ্চিত অর্থের পুণ্যমন্দির। এখানে আমি তাঁর দিব্যস্মৃতির আশ্রয়চ্ছায়ায় আমার এ শূন্য জীবনটা কাটিয়ে দেব।"[৩০]

দ্বিজেন্দ্রলালের ৫নং সুকিয়া স্ট্রীটের বাসা তখনকার কালে এক সাহিত্য-তীর্থে পরিণত হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল সদালাপী ও মজলিশী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। অনেক গুণমুগ্ধ জ্ঞানীগুণী, সঙ্গীত- ও সাহিত্য- রসিক তাঁর এই বাসায় যাতায়াত করতেন। স্ত্রী-বিয়োগের পর থেকে বন্ধুবান্ধব ও সাহিত্যিকদের যাতায়াত আরও বেড়ে ওঠে—বন্ধুবান্ধবদের সাহচর্যে ও নানা আলোচনায় তিনি হয়তো স্ত্রী-বিয়োগের দুঃসহ ব্যথাকে একটু ভুলে থাকতেও চাইতেন। তাঁদের আপ্যায়িত করবার জন্য তিনি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে 'পূর্ণিমা-মিলন' নামক একটি সম্মেলনের প্রতিষ্ঠা করেন। 'পূর্ণিমা মিলন' এর অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি একখানি পত্রে লিখেছেন :

"এক নূতন খেয়াল মাথায় আসিয়াছে। আমি (অর্থাৎ আমরা) ইচ্ছা করিয়াছি, প্রতি পূর্ণিমায় দেশসুদ্ধ সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগীদের একত্র করিয়া এক-এক স্থানে এক-একবার প্রতি পূর্ণিমা উপলক্ষে 'মিলন' করা যাইবে। নাম হইবে "পূর্ণিমা-মিলন"। ইহাতে কলিকাতাস্থ সমুদয় সাহিত্যিকদের মধ্যে অবারিতভাবে মেলামেশা, ভাববিনিময়, প্রীতিবর্ধন ও পরিচয়াদি হইবে, আর তাহার সঙ্গে সেখানে (যেখানে যখন হইবে) গৃহস্বামীর প্রবৃত্তি এবং সামর্থ্যানুসারে, অল্প কিছু জলযোগ—এই ধর যেমন চা, সরবত প্রভৃতি ও চুরুট-তামাকের (সিগারেটরও!) ব্যবস্থা থাকিবে।

৩০। দ্বিজেন্দ্রলাল দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৫৪১।

আগামী দোল-পূর্ণিমার সন্ধ্যায় প্রথমে আমার গৃহে এই মিলন। তারপর প্রতি পূর্ণিমায় (যদি কেহ চান ত তাঁর বাড়িতে নহিলে আমারই এখানে) মাতৃভাষার সেবকগণ—আমাদের জাতভাইরা—একত্র হইবেন।”[৩১]

বলা বাহুল্য 'পূর্ণিমা-মিলনের' প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল দ্বিজেন্দ্রলালের সুকিয়া স্ট্রীটের বাসায়। 'পূর্ণিমা-মিলন' প্রায় দু বছর ধরে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময় দ্বিজেন্দ্রলাল খুলনায় বদলি হন। তার পরেই 'পূর্ণিমা-মিলনের' অনুষ্ঠান অনিয়মিত হয়ে পড়ল, শেষে একেবারে বন্ধই হয়ে গেল। 'পূর্ণিমা-মিলন' স্বল্পায়ু হলেও তৎকালীন সংস্কৃতিবান বাঙালীর ভাববিনিময়ের একটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল ছাড়া আরও অনেকের বাড়িতে 'পূর্ণিমা-মিলনের' অধিবেশন হয়েছে। তার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের বাল্যবন্ধু ললিতচন্দ্র মিত্র (নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র), ডাক্তার কৈলাসচন্দ্র বসু, ঔপন্যাসিক দামোদর মুখোপাধ্যায়, 'রসরাজ' অমৃতলাল বসু, সারদাচরণ মিত্র, অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু, দ্বিজেন্দ্রলালের শ্যালক ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার, ব্যোমকেশ মুস্তফী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সঙ্গীত, আবৃত্তি, হাসির কবিতা-পাঠ প্রভৃতি এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য অঙ্গ ছিল। 'পূর্ণিমা-মিলনের' প্রথম অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত হয়ে তার স্বরচিত "সে যে আমার জননী" গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। শুধু এই ঘটনাই নয়, 'পূর্ণিমা-মিলন'কে কেন্দ্র করে এমন কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে যা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ললিতচন্দ্র মিত্রের বাড়িতে অনুষ্ঠিত 'পূর্ণিমা-মিলনের' দ্বিতীয় অনুষ্ঠানে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতাটি আবৃত্তি করেন। ডাক্তার কৈলাস বসুর বাড়িতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় অধিবেশনে ঐ মিলনোৎসবের জন্যই দ্বিজেন্দ্রলাল "এটা নয় ফলার ভোজের নিমন্ত্রণ" গানটি রচনা করেন। পরবর্তীকালে এই বিখ্যাত গানটি 'হাসির গান'-এ সন্নিবেশিত হয়েছে। ঐ অধিবেশনে নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র 'মেঘনাদবধ কাব্য' থেকে সীতা ও সরমার কথোপকথন অংশটি আবৃত্তি করে শোনান। ষষ্ঠ অধিবেশনে

৩১। দেবকুমার রায়চৌধুরীর কাছে লিখিত পত্র দ্বিজেন্দ্রলাল দেবকুমার রায় চৌধুরী, পৃঃ ৪১০—১১।

জজ সারদাচরণ মিত্রের বাড়িতে কান্তকবি রজনীকান্ত সেন স্বরচিত গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। ঐ অধিবেশনেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে দ্বিজেন্দ্রলাল "সাধে কি বাবা বলি" গানটি গেয়েছিলেন। সপ্তম অধিবেশনে অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসুর বাড়িতে দ্বিজেন্দ্রলাল "আমার দেশ" গানটি গেয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকার কবি দেবকুমার রায়চৌধুরীর বাড়িতে অনুষ্ঠিত একটি অধিবেশনে দ্বিজেন্দ্রলাল একটি স্বরচিত ইংরেজী হাসির গান করেন এবং তাঁর শিশুপুত্র ও কন্যা "ইরান দেশের কাজী" ও "সাধে কি বাবা বলি" গান গেয়ে সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করেছিলেন। 'পূর্ণিমা-মিলনের' দোললীলা উপলক্ষে একবার আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের "শুভ্রকেশ লালে লাল" হয়ে উঠেছিল।

'পূর্ণিমা-মিলনের' সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পবিবেশ তৎকালীন বাংলাদেশের একটি বিশিষ্ট রূপকেই উদ্ঘাটিত করেছে। এই জাতীয় সামাজিক মেলামেশার মধ্যে যেমন একদিকে পরস্পরের মধ্যে প্রীতিমুগ্ধ সহৃদয় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তেমনি পরস্পরের ভাববিনিময়ের ভিতব দিয়ে সৃষ্টিশীল প্রাণের নূতন উদ্দীপনাও অলক্ষ্যগোচর নয়। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন এর মধ্যমণি। বন্ধু-বাৎসল্যে, সহৃদয় অতিথি-পরায়ণতায়, আলাপে আলোচনায় তিনি ছিলেন একাই একশো। অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে একটি অখণ্ড সাহিত্যিক ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলাই ছিল তাঁর আসল উদ্দেশ্য।[৩২] তা ছাড়া দ্বিজেন্দ্রলালের মধুর ব্যক্তিত্বের স্পর্শলাভ করাও কম লোভনীয় ছিল না। তাঁর বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই এই সুখস্মৃতির কথা পরবর্তীকালে নানাভাবে স্মরণ করেছেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি পত্রাংশ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

"তার (দ্বিজেন্দ্রলালের) তুল্য বন্ধু এ যুগে আর বোধ হয় জন্মাইবে না। তার নিজের কোন পৃথক অস্তিত্ব ছিল না; বন্ধুর কাছে সে আপনাকে একেবারে বিনামূল্যে বিকাইয়া দিয়াছিল। তাহার গৃহ আমাদের জুড়াইবার ঠাঁই ছিল। তার আসবাবপত্র আমাদের ব্যবহারের বস্তু ছিল তাহার চুল্লী

৩২। 'পূর্ণিমা-মিলন'-সম্পর্কিত একটি গানে তিনি বলেছিলেন :

(আজ) সাহিত্যিক সব ছোট-বড়, এইখানে সব হয়ে জড়,
আনন্দে ও ভ্রাতৃভাবে করতে হবে কালহরণ।

আমাদের চা ও রসনাতৃপ্তির রসদ যোগাইত, তার হৃদয় আমাদের বিলাসের কাম্যকানন ছিল। সে যে কি ছিল তা শুধু আমরাই জানি আর কেহ তা জানিবে না, বুঝিতেও পারিবে না।"[৩৩]

॥ ৭ ॥

স্ত্রী-বিয়োগের পরে যে দশ বৎসর দ্বিজেন্দ্রলাল জীবিত ছিলেন, তাকে সাধারণ ভাবে তাঁর নাটক-রচনার যুগ বলা যায়। 'আলেখ্য' (১৯০৭) ও 'ত্রিবেণী' (১৯১২) ছাড়া এই যুগে তাঁর অধিকাংশ রচনাই নাটক ও প্রহসন। দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় প্রহসন 'বিরহ' তাঁর রঙ্গমঞ্চে অভিনীত প্রথম নাটক।[৩৪] কিন্তু রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তাঁর যথার্থ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল তারও পরে—'প্রায়শ্চিত্ত' যখন ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত হয়, সেই সময় থেকে। তাঁর শেষ দশ বছরের নাটকগুলি আলোচনা করলে দেখা যায় যে ঐতিহাসিক নাটক রচনার দিকেই তাঁর প্রধান আকর্ষণ। তৎকালীন দেশকালের পটভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলালের এই নাটকগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এর শিল্পাংশ ছাড়াও আর-একটি বড় দিক আছে। স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তা-বোধ তাঁর কবিতায় প্রথম থেকেই লক্ষ্য করা যায়। 'আর্যগাথা' (প্রথম ভাগ) কাব্যে ও বিলাত-প্রবাসকালে রচিত 'Lyrics of Ind' কাব্যগ্রন্থে দেশপ্রেমের কবিতাগুলিতে এর পরিচয় আছে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালীর জাতীয় চেতনা অভিনব প্রাণমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিল। এই যুগের জাতীয় আবেগ ও উৎকণ্ঠাকে যাঁরা রূপ দিয়েছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁদের অন্যতম। সঙ্গীতে ও কবিতায় যার স্বতঃস্ফূর্ত মূর্ছনা, ঐতিহাসিক নাটকে তারই বিচিত্রমুখী সম্প্রসারণ। এই জাতীয়তা-বোধকেই ভিত্তি করে দ্বিজেন্দ্রলাল সুস্থ মানবপ্রীতি ও বিশ্বমৈত্রীর স্বপ্ন দেখেছিলেন—'প্রতাপ সিংহ' নাটকে যার প্রারম্ভ, 'মেবার পতন' নাটকে তারই পরিণতি।

'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পরে

৩৩। দেবকুমার রায়চৌধুরীর কাছে লিখিত পত্র: দ্বিজেন্দ্রলাল: দেবকুমার রায় চৌধুরী পৃঃ ৪০৯।

৩৪। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা নভেম্বর তারিখে স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।

লিখেছিলেন : "দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু কবি নন, হাস্যরস-সমুজ্জ্বল মধুর গানের রচয়িতা নন, তিনি আমাদের জাতীয়তার পুরোহিত। তিনি বাঙালীর পথ-প্রদর্শক। তিনি স্বদেশী-তন্ত্রের কবি। তিনি একনিষ্ঠ ভগীরথের মত বাঙালীর অবদান-হিমাচলে অধিষ্ঠিত দেশাত্মবোধ-মহাদেবের জটাজট হইতে দেশভক্তি-ভাগীরথীর পবিত্র প্রবাহ আনিয়া কোটি-কোটি ভারতসন্তানের জীবমুক্তির সাধন করিয়া গিয়াছেন। এ ঋণ কি জাতি কখনও পরিশোধ করিতে পারিবে।"[৩৫]

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির মঞ্চ-সাফল্য ও জনপ্রিয়তার মূলে যে স্বদেশপ্রেমের উন্মাদনা অনেকখানি কাযকরী হয়েছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর নাট্য-সাফল্যের মূলে শুধু স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকাকেই দায়ী করা সঙ্গত হবে না। কারণ তখনও বাংলা নাটকের সর্বাপেক্ষা কৃতী পুরুষ গিরিশচন্দ্র জীবিত এবং তাঁর নাটক-রচনা অব্যাহতভাবেই চলেছে। তা ছাড়া ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদও আছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে জাতীয় ভাব ও জাতীয় চরিত্র বিকাশের অনুকূল উপাদান আছে, তা ছাড়া দূর অতীতকে নিয়ে ঐতিহাসিক রোমান্সকে বর্ণময় ভাষায় ও উচ্ছ্বাসদীপ্ত ভঙ্গিতে রূপায়িত করা হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের শেষ দশ বছরের নাট্য-প্রবাহের মধ্যে রচনাপরিধি ও জনপ্রিয়তার দিক থেকে ঐতিহাসিক নাটকগুলি মুখ্যস্থান অধিকার করলেও দুটি পৌরাণিক নাটক 'সীতা' (৬ই নভেম্বর, ১৯০৮) ও 'ভীষ্ম' (মৃত্যুর পর ৮ই জানুয়ারি, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়) এই পর্বে রচিত হয়। পৌরাণিক বিষয়বস্তু নিয়ে যে বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ ও মানবীয় ব্যাখ্যা 'পাষাণী' নাটকে সূত্রপাত করা হয়, তাই এ দুটি পৌরাণিক নাটকে অনেকখানি পরিণতি লাভ করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে শিল্পগত ও বিষয়গত পরিবর্তনও এই যুগে লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক জীবনের অসঙ্গতি নিয়ে তিনি এর আগে ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক প্রহসন রচনা করেন। কিন্তু আমাদের সমাজ-জীবনের সমস্যাগুলি যে শুধু প্রহসনের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়, এর পরিচয় দ্বিজেন্দ্রলালের দুখানি সামাজিক নাটক 'পরপারে' (১৯১২) ও 'বঙ্গনারী' (১৯১৬)-তে উদ্ঘাটিত হয়েছে। কিন্তু সামাজিক নাটকের

৩৫। বাঙ্গালী : ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০।

যবনিকা-প্রান্তটুকু অপসারিত করেই নাট্যকার পরলোকগমন করেন। 'পরপারে' ও 'বঙ্গনারী'র রচনাকাল প্রায় একই সময়। 'পরপারে' নাট্যকারের জীবিতকালেই প্রকাশিত হয়, কিন্তু 'বঙ্গনারী' প্রকাশিত হয় নাট্যকারের মৃত্যুর প্রায় দু বছর পর।

দ্বিজেন্দ্রলালের শেষ জীবনের আর-একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ না করলে তাঁর জীবনী অসম্পূর্ণই থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক বিতর্ক ও মতানৈক্য এই শতাব্দীর প্রথম দশকের বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র মতান্তর একটি সাধারণ ব্যক্তিগত ঘটনামাত্র নয়, এর পিছনে বাংলা সাহিত্যের একটি ঐতিহাসিক সংঘাত ও রুচিবোধের ইতিহাস আছে।[৩৬] ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই সাহিত্যে রবীন্দ্রানুগ ধারার সঙ্গে রবীন্দ্র-বিরোধী একটি ধারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি নব্য হিন্দু আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে মসীযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ 'মিঠেকড়া' (এপ্রিল, ১৮৮৮) নাম দিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের এক ব্যঙ্গাত্মক অনুকৃতি প্রকাশ করেন। রবীন্দ্র-বিরোধী দলের প্রধান পত্রিকা ছিল দুটি—সুরেশ সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' ও সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের নেতৃত্বেই সাহিত্যিক বিতর্ক ও রবীন্দ্র-বিরোধী দলের বক্তব্য চূড়ান্ত শীর্ষে আরোহণ করেছিল। অথচ এক সময় সাহিত্য-ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের যখন পরিচয় ছিল না তখন এই তরুণ কবিকে রবীন্দ্রনাথই বৃহত্তর সাহিত্যিক সমাজে পরিচিত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'আযগাথা' (দ্বিতীয় ভাগ), 'আষাঢ়ে' ও 'মন্দ্র' কাব্যকে রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দিত করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর 'বিরহ' প্রহসনটি রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করেন।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য সম্পর্কেই সপ্রশংস আলোচনা করেছেন, কিন্তু তাঁর জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটক

৩৬। "দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে মতান্তর তাহা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা-সংক্রান্ত নয়, ইহার মধ্যে বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ মনোবৃত্তি রুচিবোধের ইতিহাস নিহিত রহিয়াছে।" রবীন্দ্র-জীবনী (দ্বিতীয় খণ্ড) : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২৭৭।

প্রসঙ্গে ভালোমন্দ কোন মন্তব্যই করেন নি। কিন্তু এহো বাহ্য—দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যই রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র বিরোধের মূল কারণ। রবীন্দ্রনাথের আত্মভাবমুগ্ধ কল্পচারণা, সঙ্কেত-ব্যঞ্জনার আলোছায়া ও সুগভীর অধ্যাত্মদৃষ্টি দ্বিজেন্দ্রলালের সমর্থন পায় নি, কারণ কবি-মানসের দিক থেকে তিনি ছিলেন ভিন্ন মার্গের পথিক। যত্নকৃত কলাকৌশল, আঙ্গিক-সচেতনতা, স্পষ্টতা দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার প্রধান লক্ষণ। কবিতার মধ্যে গদ্যাত্মক কাব্যাংশ সংযোজিত করে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর কাব্যকে একটি নূতন রূপ দিয়েছিলেন। ১৩১১ সালে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের যে আত্মজীবনী মুদ্রিত হয়, তাকেই কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের বিরোধ তীব্রতর হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের অভিযোগ ছিল দুটি, প্রথমত, রবীন্দ্র-কাব্য দ্বিজেন্দ্রলালের মতে অস্পষ্ট, দ্বিতীয়ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্র-কাব্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতিরও অভিযোগ করেছিলেন।

বছর দুই এই দুই কবির প্রকাশ্য বিরোধ বন্ধ ছিল। ইতিমধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের এক সপ্রশংস সমালোচনা প্রকাশ করেন।[৩৭] তাতে অনেকেই এই বিরোধ-অবসানের আশা করেছিলেন। অবশ্য দু পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে তখনও মসীযুদ্ধের বিরাম ছিল না। ঘটনাটি চরমে উঠল দ্বিজেন্দ্রলালের 'আনন্দবিদায়' প্যারডি রচনার পর থেকে। এই প্যারডিতে তিনি রবীন্দ্রনাথকে নিতান্ত অশোভনভাবে আক্রমণ করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল 'আনন্দবিদায়'-এর ভূমিকায় অবশ্য তার সপক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন :

"একজন কবি অপর কোন কবির কোন কাব্যকে বা কাব্যশ্রেণীকে আক্রমণ করিলে যে তাহা অন্যায় ও অশোভন হয় তাহা আমি স্বীকার করি না। বিশেষত যদি কোন কবি কোনরূপ কাব্যকে সাহিত্যের পক্ষে অমঙ্গলকর বিবেচনা করেন তাহা হইলে সেরূপ কাব্যকে সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে চাবকাইয়া দেওয়া তাঁহার কর্তব্য। Browning মহাকবি Wordsworthকে এইরূপ চাবকাইয়াছিলেন এবং Wordsworth মহাকবি Shelley ও Byronকে এইরূপ কশাঘাত করিয়াছিলেন।"[৩৮]

রবীন্দ্রনাথকে কশাঘাত করার সপক্ষে দ্বিজেন্দ্রলাল যত যুক্তিই দেখান না

৩৭। বাণী : কার্তিক, ১৩১৭।

৩৮। 'আনন্দবিদায়'-এর (১৬ নভেম্বর, ১৯১২) ভূমিকা।

কেন, রঙ্গালয়ের দর্শকেরা কেউই সেদিন এই ব্যক্তিগত আক্রমণকে স্বীকার করে নিতে পারেন নি। দ্বিজেন্দ্রলালের মনেও একটি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল।[৩৯] 'আনন্দবিদায়' প্রকাশের প্রায় ছ মাস পরে দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল: "আমাদের শাসনকর্তারা যদি বঙ্গ সাহিত্যের আদর জানিতেন, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল Peerage পাইতেন ও রবীন্দ্রনাথ Knight উপাধিতে ভূষিত হইতেন।"[৪০] দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর মাত্র ছ মাস পরেই রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন।

রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র বিরোধ-কাহিনীর পরে আজ অর্ধ-শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে—সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পরে আজ এই কাহিনী ইতিহাস হয়ে উঠেছে। এই ঐতিহাসিক বিতর্কে কার দায়িত্ব কতখানি ছিল, এ বিচার করে কোন লাভ নেই। কিন্তু নিরপেক্ষ সমালোচকদের কাছে এ পর্বটির মূল্য কম নয়। রবীন্দ্র-জীবনের প্রথমার্ধে রবীন্দ্র-বিরোধী ধারাটি যে কতখানি সক্রিয় ছিল, এ ঘটনা থেকে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্র-সাহিত্য এ যুগের মূল রাগিণী হলেও সেদিনের বিচিত্র উৎসব-লীলায় যে আরও দু-একটি সুর ছিল, তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। এ যুগের একটি সামগ্রিক ইতিহাস রচনা করতে গেলে এর কোনোটিকেই অস্বীকার করা যায় না। দ্বিতীয়ত, এই মতবিরোধের ভিতর দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের মনোজীবন ও দৃষ্টিকোণের পরিচয় পাওয়া যায়। মনোজীবনের স্বাতন্ত্র্যই দ্বিজেন্দ্রলালের গান, কবিতা, নাটক, ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক রচনা ও কলাবিধির মূলভিত্তি। তাই এই ঐতিহাসিক বিরোধের ক্ষণদীপ্ত স্ফুলিঙ্গ দ্বিজেন্দ্র-কবিমানসের স্বরূপটিকেই অভ্রান্ত করে তুলেছে।

॥ ৮ ॥

স্ত্রী-বিয়োগের পর থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার গভীর পরিবর্তন ঘটে। শারীরিক ও মানসিক অবসাদ দূর করার জন্য বন্ধু-বান্ধবদের সহৃদয় সান্নিধ্য তাঁর সর্বদাই কাম্য ছিল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে

৩৯। এই প্রসঙ্গে দেবকুমার রায়চৌধুরীর 'দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থ (পৃঃ ৫৩৪-৩৫) দ্রষ্টব্য।

৪০। সূচনা: ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩২০।

মেট্রোপলিটান কলেজের কয়েকজন ছাত্র সুকিয়া স্ট্রীটে "ফ্রেণ্ডস ড্রামাটিক ক্লাব" নামে একটি ক্লাব গড়ে তোলেন। এই ক্লাবের সভ্যদের সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ায় হরিদাস চট্টোপাধ্যায় (বিখ্যাত পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র) ও প্রমথনাথ ভট্টাচার্য স্বতন্ত্রভাবে "কলিকাতা-ইভনিং ক্লাব" নামে নূতন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। কালক্রমে এই ক্লাব 'সুরধামে' স্থাপিত হল, দ্বিজেন্দ্রলাল হলেন তার সভাপতি। দ্বিজেন্দ্রলালের সযত্ন-শিক্ষায় ও নির্দেশে এই ক্লাবের সভ্যবৃন্দ প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অনেকগুলি নাটকের অভিনয় করেন। তার মৃত্যুর পর 'ইভনিং ক্লাব' উঠে যায়।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারি তিনি বাঁকুড়ায় বদলি হন। সেখানে তিনমাস কাজ করার পর আবার তিনি বদলি হন মুঙ্গেরে। বাঁকুড়া থেকে মুঙ্গের-যাত্রাকালে কলকাতায় এসে তিনি সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হন। মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ক্যালভার্টের চিকিৎসাধীন হয়ে তিনি এই দুরারোগ্য ব্যাধির জন্য একবছর ছুটি নিতে বাধ্য হন। চাকুরির উপর তিনি কোনদিনই সন্তুষ্ট ছিলেন না, তা ছাড়া দেহও ক্রমশ অপটু হয়ে আসছিল। ১৯১৩-এর ২২শে মার্চ তিনি অবসর গ্রহণ করেন। স্বাধীনচেতা ও তেজস্বী দ্বিজেন্দ্রলালের চাকুরির জীবন সুখের হয় নি, স্ত্রী-বিয়োগের পরে এই বেদনা চরমে উঠেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের শেষ জীবনের মানসিক অবস্থা একখানি চিঠিতে ফুটে উঠেছে :

"জীবনপথে যতই অগ্রসর হচ্ছি, চারদিক থেকে শুধু ঔদাস্য ও অবসাদ যেন আমায় ঘিরে ফেলছে। 'সংসার অসার' আগে বিচারে ও অনুমানে বুঝতাম, —এখন প্রতি পদে, হাড়ে হাড়েই বুঝছি। আপন মনের দিকে চেয়ে দেখি, সেখানে এ সংসারের উপরে অবিমিশ্র বিতৃষ্ণা ছাড়া আর তো কিছুই খুঁজে পাই না। আসক্তি বা ভোগলিপ্সা এখন আর তিলার্ধ নাই। তবে, কেন— কিসের জন্য এই পুঞ্জীভূত বিড়ম্বনা নিরন্তর ভোগ করে মরি ?"[৪১]

অবসরগ্রহণ করার কিছুকাল আগে দ্বিজেন্দ্রলাল একটি প্রথম শ্রেণীর সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। গুরুদাস

৪১। গয়া থেকে দেবকুমার রায়চৌধুরীকে লিখিত চিঠি (১৩ জানুয়ারি, ১৯০৭)
: দ্বিজেন্দ্রলাল, দেবকুমার রায়চৌধুরী।

চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স পত্রিকাটি প্রকাশ করার ভার নিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালকে সাহায্য করার জন্য সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হলেন পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। প্রথম সংখ্যার জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল (আষাঢ়, ১৩২০) 'সূচনা' অংশ লিখেছিলেন, তা ছাড়া ঐ সংখ্যায় প্রকাশযোগ্য রচনাগুলিও নির্বাচন করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পত্রিকাটি প্রকাশের পূর্বেই তিনি সন্ন্যাস রোগে মারাত্মক ভাবে আক্রান্ত হলেন (৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০, শনিবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকা)। রোগাক্রান্ত হওয়ার পর মাত্র সাড়ে চার ঘণ্টা পরে "শুক্ল দ্বাদশীর চন্দ্রকরোজ্জ্বল রাত্রি সাড়ে নয় ঘটিকায়" "সুর-ধামে" তাঁর মৃত্যু হয় (১৭ই মে, ১৯১৩)।

দ্বিজেন্দ্রলালের এই আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ বিদ্যুৎবেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তার আত্মীয় বন্ধু গুণগ্রাহীদের মধ্যে অনেকেই তাঁকে শেষবারের মতো দেখার জন্য 'সুর-ধামে' সমবেত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবনে যে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় (৪ঠা শ্রাবণ, ১৩২০), তার বিপুল জনসমাবেশ থেকেই দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা যায় "সেই জনতার বন্যা দেখিয়া স্বর্গীয় সাহিত্যিক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার (বঙ্গদর্শন—নবপর্যায়ের সম্পাদক) বন্ধুবর আমাকে বলিয়াছিলেন, —'আর সভার দরকার কি? এই ত হয়ে গেল। আর কি চান?' সত্যই সেই বিপুল জনসঙ্ঘ দর্শন করিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের গুণগ্রাহীদের মন, সেই বিষাদ বেদনার সময়েও, এক অপূর্ব আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল।"[৪২] মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি মনীষী সেই সভায় বক্তৃতা করেন, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, জলধর সেন, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রস্তাবগুলি উপস্থাপিত ও সমর্থন করেন। এই সভায় অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'আনন্দ-বিদায়' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৩২০ সালের ৯ই শ্রাবণ, রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে কলকাতা টাউন-হলে এক বিরাট স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার আলোচনা করেন। ইভনিং ক্লাবের সভ্যরা দ্বিজেন্দ্রলালের 'ভারতবর্ষ' সঙ্গীতটি শুনিয়ে শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেন।

৪২। দ্বিজেন্দ্রলাল নবকুমার ঘোষ, পৃঃ ৩৬৬।

সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক-প্রতিভা ও ব্যক্তি-জীবনের কিছু কিছু আলোচনা হয়েছিল। তখনকার বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রলালের প্রশস্তিমূলক অনেকগুলি কবিতাও প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাগুলিতে প্রধানত দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান ও দেশপ্রেমিকতার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। টাউন-হলের স্মৃতিসভায় ললিতচন্দ্র মিত্র-রচিত যে গানটি গাওয়া হয়, তা 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা' হলেও, সকলকে মুগ্ধ করে :

যদিও তোমার নিত্য বিরহে, নেহারি কেবল আঁধার ঘোর
কেটে যাবে মেঘ তোমারি গরিমা, মোহের রজনী করিবে ভোর।
আমরা পূজিব প্রতিমা তোমার,—মানুষ আমরা নহি ত মেষ,
জ্যোতি তোমার, ধর্ম তোমার, সাধনা তোমার ব্যাপিবে দেশ।"[৩]

৪৩। ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২০।

দেশ-কাল

দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন-পরিধি পঞ্চাশ বৎসর (১৮৬৩-১৯১৩)। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'আর্যগাথা' (প্রথম ভাগ) ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ প্রকাশিত হয়। সুতরাং তার সাহিত্যরচনার কাল-পরিধি প্রায় বত্রিশ বছর। দ্বিজেন্দ্র-জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরী কবির বাল্য-প্রতিভার কথাও উল্লেখ করেছেন। বাল্যকালে তিনি অত্যন্ত মুখচোরা ছিলেন—নিজনপ্রিয়তা ও বিষাদ তাঁর এই সময়ের অন্তঃপ্রকৃতির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। নিতান্ত বালক বয়স থেকেই তিনি গান লিখতে পারতেন।[১] এই সময় থেকে আরম্ভ করে 'আর্যগাথা' (প্রথম ভাগ) প্রকাশ-কাল পর্যন্ত সময়কে তাঁর কবি-জীবনের উন্মেষ লগ্ন বলা যায়। 'আর্যগাথা' (দ্বিতীয় ভাগ) থেকে কবি প্রতিভার বিকাশ-পর্ব শুরু হয়েছে। প্রত্যেক কালেরই একটি নিজস্ব ধর্ম থাকে। সমকালীন ঘটনা-প্রবাহ ও যুগানুভূতি সমসাময়িক সাহিত্য ও চিন্তাধারার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য-কৃতির উপরেও যুগ-জীবনের কিছু কিছু প্রভাব পড়েছে। সুতরাং তার সাহিত্য-বিচারের পক্ষে সমসাময়িক দেশ-কালের স্বরূপধর্ম নির্ণয় করা প্রয়োজন।

যেকালে দ্বিজেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন, তখন বাঙালীর এক আত্ম-সম্প্রসারণের যুগ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর নবজাগ্রত চৈতন্য জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে সংক্রামিত হয়েছিল। সঙ্কীর্ণ ও গণ্ডীবদ্ধ জীবনের অচলায়তন ভেঙে ফেলে এক সৃষ্টিশীল জীবনদ্রোহ বিচিত্র ধারায় ছড়িয়ে পড়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত

১। "এই সময়ে আট নয় বৎসরের বালক দ্বিজেন্দ্রের অন্তর্জগতে স্বপ্ন ও সঙ্গীতের ছন্দ-স্রোত যেন বিচিত্র বীচিবিভঙ্গে নাচিয়া বহিয়া চলিয়াছে। তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও স্বজনবর্গের মুখে ইহাও শুনিতে পাই যে, এই অল্প বয়সে তিনি যখন তখন যে কোন বিষয়ের উপরে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন।"—দ্বিজেন্দ্রলাল. দেবকুমার রায়চৌধুরী। পৃঃ ৪৯

হলেও তাঁর কোনও কোনও কবিতার রচনাকাল ১৮৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। *তিনি নিজেই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থটি সম্বন্ধে লিখেছেন:* "১২ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে আমি গান রচনা করিতাম। ১২ হইতে ১৭ বৎসর পর্যন্ত রচিত আমার গীতগুলি ক্রমে 'আর্যগাথা' নামক গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়। তখন কবিতাও লিখিতাম।"[২] 'আর্যগাথা'র (প্রথম ভাগ) ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর তৎকালীন মনোভাবকে প্রকাশ করেছেন: "যাহারা মনুষ্যপ্রেমগীতকেই গীত মনে করেন 'আর্যগাথা' তাঁহাদিগের জন্য রচিত হয় নাই, এবং তাঁহাদের আদর প্রত্যাশা করে না। যদি কেহ প্রকৃতির অপার্থিব সৌন্দর্য ও লাবণ্যে কখন কখন বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন, যদি কেহ শোকজরাসঙ্কুল জগতে দুঃখাবসন্ন হইয়া কখন কখন নীরবে অশ্রুবারি বিসর্জন করেন, যদি কাহার অধঃপাতিতা হতভাগিনী দুঃখিত মাতৃভূমির নিমিত্ত নেত্রপ্রান্ত কখন সিক্ত হইয়া থাকে, আর্যগাথা তাহারই আদর চাহে।"

'আর্যগাথা'র বিষয়নির্বাচনে দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টিভঙ্গি প্রণিধানযোগ্য। 'আর্যগাথা'র 'আর্যবীণা' অংশে কবি স্বদেশপ্রেমের কবিতা রচনা করেছেন। তার কারণ তিনি মনে করেন যে দীন দরিদ্র দেশে প্রেমসঙ্গীত শোভা পায় না:

> রেখে দেও রেখে দেও প্রেমগীত স্বরে রে।
> কেন ও কুহক আর ভারত-ভিতরে রে,
> যাও চলি পরাভূত, চাই না ও মৃদুগীত,
> গাও রে পাপিয়া তবে ভাসায়ে অম্বরে রে।
> শুনিয়া মুরলী গান, জাগিবে না আর্যপ্রাণ,
> ঢালিবে সে স্বপ্ন তার শ্রবণকুহরে রে।
> উঠ তবে পার যদি রে তরী গগনভেদী
> উঠ কাঁপি দূরাকাশে লহরে লহরে রে।

দ্বিজেন্দ্রলালের এই যুগের স্বদেশপ্রেমের কবিতার সঙ্গে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাতীয়-ভাবোদ্দীপক কবিতার একটি নিকট সম্পর্ক আছে। হেমচন্দ্রের গীতিকবিতার মধ্যে স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। বাংলা কাব্যের এই যুগে জাতীয়তাবোধের সুর প্রাধান্য লাভ করেছিল।

২। নাট্যমন্দির: শ্রাবণ, ১৩১৭।

হেমচন্দ্রের 'ভারত-সঙ্গীত' কবিতাটি সেকালে সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেছিল। 'ভারত-সঙ্গীত' ছাড়া 'ভারত-বিলাপ', 'ভারতভিক্ষা', 'বিন্ধ্যগিরি' প্রভৃতি ছোট ছোট কবিতায়, 'বীরবাহু' কাব্যে ও তাঁর অন্যান্য কাব্যের কোনও কোনও অংশে স্বদেশপ্রেমের উন্মাদনা ও পতিত ভারতবর্ষের জন্য খেদোক্তি প্রকাশিত হয়েছে। রঙ্গলাল-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের আখ্যায়িকা-কাব্যের একটি প্রধান সুর এই স্বদেশপ্রেমের। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় প্রিন্স অব ওয়েলসের আগমন উপলক্ষে কতকগুলি রাজভক্তিমূলক কবিতাও লেখা হয়েছিল। হেমচন্দ্রের 'ভারতভিক্ষা' ও নবীনচন্দ্রের 'ভারত-উচ্ছ্বাস' কবিতা দুটি ছাড়াও রাজকৃষ্ণ রায়ের 'ভারত-যুবরাজ', হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর 'ভারতে সুখ', অম্বিকাচরণ গুপ্তের 'ভারতলক্ষ্মী', গোপালচন্দ্র দের 'রাজোপহার' প্রভৃতি কবিতা থেকে সে যুগের বাংলা কাব্যের একটি বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।[৩] "উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা" সে যুগের কাব্যধারার একটি প্রধান লক্ষণ।[৪]

"উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগ' এই যুগের শুধু কাব্য-মানস নয়, জাতীয় মানসেরই একটি প্রধান ধর্ম। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ নানাদিক থেকে সক্রিয় হয়ে ওঠে। বিশেষত সিপাহী বিদ্রোহের পরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে শাসন-ব্যবস্থা মহারানীর হাতে এল। এই পরিবর্তন শুধু একটি বাইরের পরিবর্তন মাত্র নয়—ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর সম্পর্কেরও গভীর পরিবর্তন হল। ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষিত উপযুক্ত লোকের সংখ্যাধিক্যের জন্য ভালো কাজ পাওয়া কঠিন হল। শিক্ষিত সমাজের অসন্তোষ ক্রমবর্ধিত হল। দায়িত্বপূর্ণ কাজে ভারতীয়

৩। প্রিন্স অব ওয়েলসের আগমন উপলক্ষে তখন যে জাতীয় কবিতা রচনায় জোয়ার এসেছিল, তার বিস্তৃত পরিচয় আছে ডাঃ সুকুমার সেন রচিত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (২য় খণ্ড) গ্রন্থের ৪০২ পৃষ্ঠায়।

৪। রবীন্দ্রনাথ সুবিখ্যাত 'বিহারীলাল' প্রবন্ধে এই যুগের কবিদের যে মানস-প্রবণতার কথা উল্লেখ করেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। 'বিহারীলাল তখনকার ইংরেজি ভাষায় নব্যশিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনাসংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না, এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না—তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে, নিজের মনের কথা বলিলেন।'—বিহারীলাল : আধুনিক সাহিত্য।

নিয়োগের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, সে প্রতিশ্রুতিকে কার্যে পরিণত করার দিকে ইংরেজ প্রভুদের কোনো আগ্রহই ছিল না। শিক্ষিত বাঙালী ইংরেজ রাজপুরুষদের কাছে চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিলেন।[৫] শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সরকারী মনোভাবের অনুদারতায় অর্থ নৈতিক অবস্থারও আশঙ্কাজনক ক্রমাবনতি এই সময়ে বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠেছিল। বাংলাদেশে ও দাক্ষিণাত্যে কতকগুলি কৃষকবিদ্রোহও এই পর্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকের পশ্চাৎপটেও আছে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের নীলকর আন্দোলনের একটি রক্তাক্ত ইতিহাস। স্বাজাত্যবোধ, আত্মপ্রত্যয় ও জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি একটি গভীর অনুরাগ এই যুগের ইতিহাসকে গতি-মুখর করে তুলেছিল।

॥ ২ ॥

সেই স্বাদেশিকতা ও দেশপ্রেমিকতার প্রথম উচ্ছ্বাসের যুগে রাজনারায়ণ বসুর একটি প্রধান ভূমিকা ছিল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মেদিনীপুর থেকে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন।[৬] তিনি বলেছেন যে চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলার স্থাপয়িতা নবগোপাল মিত্র নাকি তাঁর এই পুস্তিকাটি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই 'হিন্দুমেলা' প্রতিষ্ঠা করেন।[৭] জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের আন্তরিক সহায়তায়, রাজনারায়ণ বসুর প্রেরণায় ও নবগোপাল মিত্রের উৎসাহে 'হিন্দুমেলা' স্থাপিত হয়। (দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ 'হিন্দুমেলার'

৫। 'Mukherjee's Magazine'-এ এ-বিষয়ে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য খবর পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটি হল. "In August 1869 an advertisement appeared in the *Monteur*", the official publication of the N. W. Provinces, inviting candidates for the post of translator and Head Clerk to a District Judges Court, on a pay of Rs. 120 per mensem which ends thus · "Bengali Baboos and youth fresh from college need not apply." (Mukherjee's Magazine, Page 83, 1875)

[ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদারের 'History of Political Thought' গ্রন্থের ৩২৪ পৃঃ থেকে উদ্ধৃত]

৬। 'Prospectus of a Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal.'

৭। রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মজীবনী', পৃঃ ২০৮

নেতৃস্থানীয় ছিলেন। হিন্দুমেলার প্রথম অধিবেশন হয় ১২৭৩ সালের চৈত্র-সংক্রান্তির দিন (১২ই এপ্রিল, ১৮৬৭) বেলগাছিয়ার ডনকিন সাহেবের বাগানে। নানা উপায়ে দেশবাসীর মনে দেশানুরাগ ও জাতীয়ভাব উদ্দীপ্ত করাই ছিল এ সভার প্রধান উদ্দেশ্য। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থানুকূল্যে নবগোপাল 'ন্যাশনাল পেপার' নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন। এই মেলার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মেলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছিলেন: "আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য—ইহা ভারত-ভূমির জন্য।" এই মেলা উপলক্ষে অনেকগুলি স্বদেশী গান রচিত হয়েছিল: সত্যেন্দ্রনাথের 'মিলে সব ভারতসন্তান', গণেন্দ্রনাথের 'লজ্জায় ভারতযশ গাহিব কি করে', দ্বিজেন্দ্রনাথের 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি'। এই মেলার নবম অধিবেশনে (১২৮১ মাঘ ৩০।১৮৭৫ ফেব্রুআরি ১১) বালক রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা আবৃত্তি করেন: হেমচন্দ্রের 'ভারত-সঙ্গীত' কবিতাটির প্রভাব তাতে লক্ষণীয়।[৮]

উনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশপ্রেমিকতার ইতিহাসে 'সঞ্জীবনী সভা'র একটি উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মাৎসিনি-গ্যারিবল্ডি-কাভুরের প্রচেষ্টায় ও কর্ম-সাধনায় বহুধা-বিভক্ত ইতালি ঐক্যবদ্ধ হয়ে বৈদেশিক শাসন-পাশ থেকে মুক্ত হয়েছিল। ইতালির এই সদ্যোজাগ্রত নবীন জাতীয়তাবোধ ও আমেরিকার ক্রীতদাস-মুক্তিকামীদের বিজয়বার্তা বাঙালীর জীবন-সমুদ্রকেও চঞ্চল করে তুলেছিল। এই সময় যুবক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের চাকুরি থেকে মুক্তিলাভ করে দেশের যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে মাৎসিনির কার্যকলাপ ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা দিতেন। তাঁর আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়েই যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় (ভাদ্র, ১২৮২) মাৎসিনির আত্মজীবনী অবলম্বনে "জোসেফ ম্যাটসিনী ও নব্য ইতালী" প্রবন্ধ প্রকাশ করতে শুরু করলেন।[৯]

৮। "...বালক রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাটি আবৃত্তি করেন তাহা কবিতা হিসাবে তুচ্ছ—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত-সঙ্গীত' কবিতার ক্ষীণ অনুকরণমাত্র।" [রবীন্দ্র-জীবনী (প্রথম খণ্ড) : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৪৫]

৯। A Nation In Making : Surendranath Banerjee, Page 43.

মাৎসিনির গুপ্ত সভার অনুকরণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ঠনঠনের এক পোড়ো বাড়িতে 'হামচুপামুহাফ' বা 'সঞ্জীবনী সভা' নামক এক গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হল। জাতীয় ভাবাদর্শে উদ্দীপ্ত-হৃদয় কবি-কিশোর রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে এই কবিতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' নাটকে সন্নিবেশিত হয়। বড়লাট লর্ড লিটনের শাসন-পর্বটি (১৮৭৬ এপ্রিল—১৮৭৭ জুন) নানা কারণে অত্যন্ত কুখ্যাত। ভারত-ব্যাপী যখন দুর্ভিক্ষ, সেই সময় তিনি দিল্লীতে মহাসমারোহ সহকারে এক সভা আহ্বান করেন (১৮৭৭, ১লা জানুআরি)। দেশীয় পত্রিকাসমূহের মুখ বন্ধ করার জন্য তিনি 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট'র প্রবর্তন করলেন। এই আইন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য শিশিরকুমার ঘোষ তাঁর দ্বিভাষী 'অমৃতবাজার পত্রিকা'কে রাতারাতি ইংরেজি পত্রিকায় পরিণত করেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে 'ইলবার্ট বিল'কে কেন্দ্র করে শিক্ষিত বাঙালীর হৃদয়ে ইংরেজ বিদ্বেষ আরও ঘনীভূত হয়ে ওঠে। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা এই সময়ের একটি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

> গেল রাজ্য, গেল মান, ডাকিল ইংলিশম্যান
> ডাক ছাড়ে ব্রানশন, কেশুয়িক, মিলার—
> নেটিভের কাছে খাড়া, "নেভার— নেভার।"

ইলবার্ট বিলের সেই উত্তপ্ত প্রহরে আদালত অবমাননার অপরাধে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দু মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হয় (৫ই মে থেকে ৪ঠা জুলাই, ১৮৮৩)। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স আহূত হয়। একটি জাতীয় ধনভাণ্ডারও স্থাপন করা হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হল। রাজনৈতিক চেতনার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের মধ্যেও তার স্বীকৃতি ছড়িয়ে পড়েছে। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কবিতায় যে দেশপ্রেমিকতার সুর ফুটে উঠেছে, তাই আরও প্রতিশ্রুতিময় ও তীক্ষ্ণ হয়ে ফুটেছে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ও বিবিধ গদ্যরচনায়। বঙ্কিমচন্দ্রের শেষজীবনের উপন্যাসত্রয়ী 'আনন্দমঠ' (১৮৮২), 'দেবীচৌধুরানী' (১৮৮৫) ও 'সীতারাম' (১৮৮৭) এই সময়ের মধ্যেই রচিত হয়েছে। এই জাতীয়তাবোধের উন্মাদনা শুধু

কলকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না—বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল।[১০]

এই নবজাগরণের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আন্দোলন তৎকালীন কৃষ্ণনগরের বুকেও আলোড়ন তুলেছিল। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, সঞ্জীবচন্দ্র, দীনবন্ধু, মধুসূদন, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি নবযুগের পুরোহিতবৃন্দ দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্রের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। দেওয়ানজী তাঁর 'আত্মজীবনচরিত' গ্রন্থে এই সমস্ত বন্ধুর সমাগম ও তাঁদের প্রভাবের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন।[১১] বাল্যকালের দেশ-কালের পরিবেশ ও জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন দ্বিজেন্দ্রলালের কবিচিত্তকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল তার প্রমাণ আছে 'আর্যগাথা'র (প্রথম ভাগ) কবিতা-গুলিতে। ছাত্র-জীবনেই তিনি জাতীয়তাবোধের অন্যতম পুরোহিত মনীষী রাজনারায়ণ বসুর স্নেহলাভ করেন। রাজনারায়ণ বসু তখন দেওঘরে; এম-এ পরীক্ষার আগে দ্বিজেন্দ্রলাল বায়ুপরিবর্তনের জন্য দেওঘরে যাওয়ার পর রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন।

সমকালীন দেশ-কালের প্রভাব দ্বিজেন্দ্রলালের মনোজীবনকে কতদূর নিয়ন্ত্রিত করেছিল তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাওয়া যায় বিলাত থেকে লিখিত পত্রগুচ্ছে। ফরাসী বিপ্লব, ইতালির স্বাধীনতা সংগ্রাম, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের অগ্নিগর্ভ বাণী তরুণ দ্বিজেন্দ্রলালের হৃদয়কে জাতির হিতসাধনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। তাই নিজের জন্মভূমি থেকে বহুদূরে বসেও তাঁর প্রাণ দেশের জন্য কেঁদে উঠেছে :

"আমি আরও বলিতে চাই—অসন্তোষই উন্নতির মূল, ইহা কাযকে উত্তেজিত করে, সভ্যতার পথ প্রশস্ত করে। কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক, কি পারিবারিক উন্নতি সকলেরই মূলে এই অসন্তোষ। বক্তা সুরেন্দ্রবাবু যথার্থই লিখিয়াছেন : "Our nation have yet to learn the great art of grumbling." অসন্তোষই সভ্যতার মূল। অসন্তোষই ফরাসী বিপ্লব

১০। "এই ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ সালের মধ্যে কেবল যে কলিকাতা সমাজ নানা তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছিল তাহা নহে। বঙ্গদেশের অপরাপর প্রধান প্রধান স্থানেও আন্দোলন চলিতেছিল।" [রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ. শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ ২৩১]

১১। স্বর্গীয় দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্রের আত্মজীবনচরিত, পৃঃ ১৮৯।

করিয়াছিল; অসন্তোষই বৃটিশ জাতিকে রাজার নিকট হইতে স্বত্ব কাড়িয়া দিয়াছে; অসন্তোষই ইটালীকে স্বাধীন করিয়াছিল; অসন্তোষই আবার ভারতীয়গণকে নূতন জাতি করিতে সক্ষম।"[১২] লণ্ডন থেকে প্রকাশিত (সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬) 'The Lyrics of Ind' কাব্যগ্রন্থেও তরুণ কবি আবেগ-বিহ্বল কণ্ঠে মাতৃভূমির বন্দনা করেছেন :

O my land ! can I cease to adore thee,
Though to gloom and to misery hurled ?
O dear Bharat ! my beautiful maiden,
O sweet Ind ! once the queen of the world.

And though wrecked is thy pride and thy glory,
Of it nothing remains but the name ;
Yet a beauty and sunshine still lingers,
And yet gleams through the mist of thy shame.[১৩]

এই কবিতাটির বাগ্-বিন্যাস ও আন্তরিক ভাবানুভূতি দ্বিজেন্দ্রলালের পরবর্তীকালের বিখ্যাত দেশপ্রেমমূলক সঙ্গীতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

॥ ৩ ॥

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে (১৮৭৫-১৯০০) বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপর জাতীয়তাবোধ ছাড়া প্রধানত তিনটি ভাবধারা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল—(ক) ব্রাহ্মধর্ম, (খ) নব-হিন্দুধর্মের উত্থান, (গ) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ। জাতীয়তাবোধকে বিশেষ কোনো সামাজিক বা ধর্মীয় চেতনার অন্তর্ভূত করা সঙ্গত হবে না। পরাধীন দেশকে অবলম্বন করে উনিশ শতকের রাজনৈতিক দৃষ্টি হিন্দুব্রাহ্মনির্বিশেষে একটি প্রচণ্ড আবেগের সৃষ্টি করেছিল।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন।

১২। বিলাতের পত্র : ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৮৪।

১৩। The land of the Sun : The lyrics of Ind.

তাঁর সহাধ্যায়ী প্যারীমোহন সেনের দ্বিতীয় পুত্র কেশবচন্দ্র তখন ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়েছেন। পুত্রাধিক প্রিয় এই প্রতিভাবান তরুণকে পেয়ে দেবেন্দ্রনাথ হৃদয়ে নূতন বল পেলেন। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে নূতন শক্তি সঞ্চারিত হল। প্রবীণ দেবেন্দ্রনাথ ও নবীন কেশবচন্দ্রের মিলিত শক্তিতে ব্রাহ্মসমাজের একটি গৌরবমণ্ডিত অধ্যায় আত্মপ্রকাশ করেছিল। ধর্মশিক্ষার জন্য ব্রাহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হল। প্রতি রবিবার সকালবেলায় ঐ বিদ্যালয়ের অধিবেশন হত। সেখানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বাংলায় ও কেশবচন্দ্র ইংরেজিতে উপদেশ দিতেন। তৎকালীন শিক্ষিত যুবকসম্প্রদায় ক্রমশ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠলেন। কেশবচন্দ্র তার অন্তরঙ্গদের নিয়ে একটি সুহৃদগোষ্ঠী স্থাপন করলেন, তার নাম হল 'সঙ্গত সভা'।

কেশবচন্দ্রের উৎসাহে ও দেবেন্দ্রনাথের অর্থানুকূল্যে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' নামে একটি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত হল। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে এই নবীন ব্রাহ্মগণের প্রচেষ্টা প্র.শংসনীয়। তারা "বামাবোধিনী পত্রিকা" নামক স্ত্রীপাঠ্য একটি মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত করলেন—১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্রাহ্মিকা-সমাজ' নামে নারীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র উপাসনা সমাজ প্রতিষ্ঠিত করলেন। মহর্ষির মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ সে যুগের স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম কর্ণধার ছিলেন। তিনি তাঁর পত্নীকে নিয়ে গভর্নর-জেনারেলের বাড়িতে মজলিশে যান।[১৪] কিন্তু কিছুদিন পরেই দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তরুণ ব্রাহ্মদের মতবিরোধ হল—নবীন ব্রাহ্মদের নেতা হলেন কেশবচন্দ্র। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে কেশবচন্দ্র নূতন সমাজ গঠন করলেন (১৮৬৬, ১৪ই নভেম্বর)। ১৮৬৬ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে এই ব্রাহ্মসম্প্রদায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে প্রচারকার্য শুরু করে দিলেন—পাঞ্জাব, সিন্ধু, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হল।

ব্রাহ্মধর্মের প্রসার কৃষ্ণনগরের সামাজিক জীবনকে কতদূর পরিবর্তিত করেছিল তার পরিচয় দিয়েছেন দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র

১৪। 'আমি প্রথমবার বোম্বাই থেকে বাড়ী এসে আমার স্ত্রীকে গবর্ণমেণ্ট হাউসে নিয়ে গিয়েছিলুম। সে কি মহা ব্যাপার। শত শত ইংরাজ মহিলার মাঝখানে আমার স্ত্রী—সেখানে একটি মাত্র বঙ্গবালা।...এইরূপে ক্রমে স্বাধীনতার পথ সহজ ও পরিষ্কৃত হ'য়ে এল।'

(আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস, পৃঃ ৪-৫ : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

রায়। কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মের উন্নতির জন্য বহু চেষ্টা করেছিলেন —তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে থেকে ব্রাহ্মধর্মের নিয়মাবলী আনিয়েছিলেন।[১৫] ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করার জন্য কৃষ্ণনগরে গিয়েছিলেন—সেখানে তাঁরা মনোমোহন ঘোষের বাড়িতে উঠেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তাদের সঙ্গী ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করাই ছিল কেশবচন্দ্রের মুখ্য উদ্দেশ্য।[১৬] কৃষ্ণনগর থেকে সত্যেন্দ্রনাথ একখানি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে কৃষ্ণনগরের সমাজের উপর কেশবচন্দ্রের বক্তৃতার অসাধারণ প্রভাবের কথা আলোচিত হয়েছে।[১৭]

দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিরোধ হওয়ার পর কেশবচন্দ্রের জীবনের ধারা পরিবর্তিত হল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-মন্দিরের ভিত্তিস্থাপনার দিনে কেশবচন্দ্র শিষ্যদের নিয়ে নগর-সংকীর্তনে বের হলেন। তাঁদের ঘোষণা ছিল :

"নরনারী সাধারণের সমান অধিকার,
যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাত বিচার।"

১৫। "...রাজা শ্রীশচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি কতিপয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সাহায্যে, সন্ধ্যার কাম্যভাগ ত্যাগ করিয়া, নিত্যভাগ যাহাতে শুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা আছে, তাহা স্বতন্ত্র করাইয়া এক পদ্ধতি প্রস্তুত করাইলেন, এবং তাহার এক এক খণ্ড আমাদিগকে দিলেন। আমি ঐ পদ্ধতি অনুসারে নিয়মিতকালে ভক্তিভাবে সন্ধ্যা করিতাম। কিছুদিন পরে তিনি কলিকাতায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে ব্রাহ্মধর্মের নিয়মাবলী আনাইয়া তাহাতে ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়, নীলমণি গড়গড়ি ও আমার স্বাক্ষর করাইলেন। রাজার ইচ্ছানুসারে, ব্রাহ্মধর্ম বিস্তারের জন্য দেবেন্দ্রবাবু হাজারি লাল নামক এক ব্রাহ্মধর্ম প্রচারককে কৃষ্ণনগরে পাঠাইলেন।"

—দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্রের আত্মজীবনচরিত, ৮৬।

১৬। কৃষ্ণনগর থেকে ৩১ বৈশাখ ১৭৮৩ শকে লেখা কেশবচন্দ্রের চিঠি: 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', শ্রাবণ, ১৭৮৩ শক।

১৭। "We are trying our best to promote the cause of the Brahmoism. ব্রহ্মানন্দজি's stirring lectures have set Krishnagar all in a flame. We had to fight hard with the missionaries here. .. one of the orthodox Pundits of Nuddea complimented us on our having disconsolated our common foe."

—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর. সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, পৃঃ ১০ : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আবেগের আতিশয্য, ভক্তিবিহ্বলতা কেশব সেনের শিষ্যদের মধ্যে প্রবল ভাবে দেখা দিল। তাঁদের মধ্যে পরস্পরের পদধূলিগ্রহণ, পাদপ্রক্ষালন ও ভাবাবেগে ক্রন্দন প্রভৃতি দেখা গেল। এই ভক্তির উচ্ছ্বাসের ফলে কেউ কেউ কেশবচন্দ্রের সংশ্রব ত্যাগ করলেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড গমন করেন। খ্রীষ্টান-সুলভ দয়া-দাক্ষিণ্য ও হৃদয়বত্তার সমৃদ্ধ উপকরণে কেশবচন্দ্র নূতন মানুষ হয়ে ফিরে এলেন। তিনি দেশে ফিরেই জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে সিবিল ম্যারেজ অ্যাক্ট পাশ হয়। কুচবিহার বিবাহ ব্যাপার অবলম্বন করে 'উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল'ও দুভাগে ভাগ হয়ে গেল।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ ঘটে। তার আগে দক্ষিণেশ্বরের এই অসাধারণ মানুষটির পরিচয় শিক্ষিত সমাজে অগোচরই ছিল। কেশবচন্দ্রই শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের অনেক আগে কেশবচন্দ্রই পরমহংসদেবের লোকোত্তর আধ্যাত্মিক জীবনে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পণ্ডিত ম্যাক্সমূলারের মতে কেশবচন্দ্র-প্রবর্তিত 'নববিধান' ধর্মের উপরে পরমহংসদেবের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। পরমহংসদেবের ভক্তি ও বিশ্বাসের সুর কেশবচন্দ্রের জীবনের শেষ দিকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

॥ ৪ ॥

হিন্দুধর্মের আভ্যন্তরীণ ত্রুটি-বিচ্যুতির নানাদিক এই সংস্কার-আন্দোলনের যুগে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। হিন্দুধর্মের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। নূতন শিক্ষা ও মুক্ততর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সাহায্যে হিন্দুধর্মকে নূতন ভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া শুরু হল। বুদ্ধি-মার্জিত বিশ্লেষণী দৃষ্টির মাধ্যমে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির নূতন রূপ উদ্‌ঘাটিত হল। ঐতিহাসিক দিক থেকে না হলেও প্রকারান্তরে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ হিন্দুধর্ম পুনরুত্থানের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য কালচিহ্ন। কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে যখন ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে ভাবাবেগের প্রাধান্য হল ও "নরপূজা" প্রবর্তিত হল তখন রাজনারায়ণ বসু, মতো চিন্তানায়কের মনেও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে

বক্তৃতা করেন। সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। তখনকার দিনে এই বক্তৃতার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। এমন কি সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার সভাপতি রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর রাজনারায়ণকে 'হিন্দু-কুল-শিরোমণি' আখ্যা দিলেন। কেউ কেউ তাঁকে 'কলির ব্যাস' বলেও সম্বোধন করেছিলেন।[১৮] সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের দুটি শাখার দ্বন্দ্বের মধ্যেও নব-হিন্দুধর্ম অভ্যুত্থানের বীজ নিহিত ছিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নব-হিন্দুধর্ম অভ্যুদয়ের যথার্থ সূচনা হয়। তৎপূর্বে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সামাজিক ও পারিবারিক প্রবন্ধাবলীতে হিন্দুসমাজের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বিস্তৃত ও বিশ্লেষণী আলোচনা করা হয়।

প্রাচীন ধর্ম ও পুরাণকে এই যুগে নূতনভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের শেষজীবনের 'উপন্যাসত্রয়ী', 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'কৃষ্ণচরিত্রে' এই ব্যাখ্যা আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রও তাঁদের কাব্যে প্রাচীন পুরাণের নূতন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। এ বিষয় নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ী—রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস—বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোমত-প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের মতের সঙ্গে গীতার বাণীর একটি সমন্বয় করে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের মধ্যে এক নূতন শক্তি সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন। প্রচলিত হিন্দুধর্মাদর্শের মধ্যে যে মালিন্য পুঞ্জীভূত হয়েছিল তার বিরুদ্ধেও তিনি সংগ্রাম করেছিলেন। বিচার, বিশ্লেষণ ও যুক্তিবাদই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্ম সংস্কারের মর্মমূলে। তাই তিনি দয়ানন্দ সরস্বতীর মতো অতীত জীবনাচরণ ও অতীত আদর্শে প্রত্যাবর্তন করার কোনও সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারেন নি।[১৯] ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে অধ্যাপক হেস্টির সঙ্গে তাঁর হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব সম্পর্কে যে বিতর্ক হয়, তাও উল্লেখযোগ্য। এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন্দ্র করে নবহিন্দুধর্মবাদীদের একটি গোষ্ঠী গড়ে

১৮। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ ২৮৬।

১৯। "Let us revere the past, but we must, in justice to our new life, adopt new life, adopt new methods of interpretation and adopt the eternal and undying truths to necessities of that new life."

[Letters on Hinduism, Second letter]

ওঠে। চন্দ্রনাথ বসুও এই দলের আর একজন বিশিষ্ট কর্ণধার ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শশধর তর্কচূড়ামণি কলকাতায় আসেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যস্থতায় সুধীসমাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। চন্দ্রনাথ বসু তর্কচূড়ামণির শিষ্যত্ব গ্রহণ করে হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন। তর্কচূড়ামণি তৎকালে তাঁর বাগ্মিতা ও হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যার জন্য গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।[২০] তর্কচূড়ামণির ব্যাখ্যার মধ্যে অনেক আতিশয্য ও অসঙ্গতি ছিল। তবু এই নূতন উন্মাদনার দিনে তিনি জনপ্রিয়ই হয়েছিলেন।

এই সময়ে দুটি পত্রিকা বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য ও মতবাদের প্রধান বাহন হয়ে উঠেছিল। এই দুটি পত্রিকা হল অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নবজীবন' (১২৯১, শ্রাবণ) ও বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা রাখালচন্দ্র সম্পাদিত 'প্রচার' (১২৯১, ১৫ই শ্রাবণ)। এই যুগে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে সমাজ-সংস্কার-সম্পর্কিত বিতর্ক প্রবল হয়ে ওঠে। অন্যদিকে কেশবচন্দ্রকে কেন্দ্র করে যে গুরুবাদের আশঙ্কা দেখা দিল, তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন একদল তরুণ সাম্যবাদী। এই সম্প্রদায়ের অন্যতম পুরোধা কৃষ্ণকুমার মিত্রের সম্পাদনায় 'সঞ্জীবনী' নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়—ফরাসী বিপ্লবের মূলমন্ত্র অনুসারে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতাকে তারা তাঁদের পত্রিকার আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সমাজ সংস্কার বিষয়ে তারা ছিলেন চরমপন্থী। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে আর একটি পত্রিকার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারপন্থীরা যেমন অতিরিক্ত উৎসাহের সঙ্গে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার মাধ্যমে যা-কিছু প্রাচীন তাকেই নির্মম আঘাত করতেন তেমনি হিন্দুসমাজের একদল সংস্কারক চূড়ান্ত রক্ষণশীলতার পরিচয় দিলেন। এই শেষোক্ত দলের মুখপত্র ছিল 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা (বঙ্গবাসী সাপ্তাহিক, ১২২৮, ২৬শে অগ্রহায়ণ) প্রথম প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গবাসী' এবং 'নবজীবন'-'প্রচার'—সবগুলি পত্রিকাই নবহিন্দুধর্মের সমর্থক ছিল। কিন্তু 'বঙ্গবাসী'র সঙ্গে

২০। প্রবীণ ভূদেব মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত তর্কচূড়ামণিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। ৯।৫।৯৩ তারিখে ভূদেব তাঁর তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রকৃত ভাল লোক। তিনি উৎকৃষ্ট বক্তা ও বঙ্গভাষায় উত্তম লিখিতে পারেন। তিনি অত্যন্ত লোকপ্রিয় এবং ভাল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত; কিন্তু তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দেওয়া হয় নাই।"—ভূদেব-চরিত (তৃতীয় ভাগ), পৃঃ ৩৯১।

'নবজীবন' ও 'প্রচারের' একটি মূলগত পার্থক্য ছিল। 'নবজীবন' ও 'প্রচার' পত্রিকায় হিন্দুধর্মের বুদ্ধিদীপ্ত ও কল্যাণ-পরিণাম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ ছিল, অপর পক্ষে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সমর্থকদের মধ্যে একটি চরম রক্ষণশীলতা ছিল। এই সংরক্ষণপন্থীরা হিন্দুসমাজের সব-কিছুকেই দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করলেন। 'প্রচার' ও 'নবজীবনে'র মধ্যে যে কল্যাণকামী ও প্রগতিশীল আদর্শ ছিল, 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা সে পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে উগ্র রক্ষণশীল নীতির প্রচারক হয়ে উঠেছিল। সুতরাং 'সঞ্জীবনী' ও 'বঙ্গবাসী' দুটি পত্রিকা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর অধিবাসী—দুটি পত্রিকাই ছিল দু অর্থে চরমপন্থী।

এই সময়েই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ধর্ম-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মসীযুদ্ধ হয়।[২১] বঙ্কিমচন্দ্রের মুখপত্র ছিল 'প্রচার' এবং রবীন্দ্রনাথের ছিল 'ভারতী'। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মসীযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। কিন্তু চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে যে বিতর্ক শুরু হয়, তা সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। তিনি 'নবজীবন' পত্রিকায় হিন্দু-জাতিভেদের গুণগান করেন। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত ও 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। যুক্তিহীন ধর্মবিশ্বাস তর্কচূড়ামণি ও তার শিষ্যবৃন্দকে নানা সামঞ্জস্যহীন ধর্মব্যাখ্যায় উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। নব্যহিন্দুধর্মের এই চরমপন্থীদের সঙ্গে তৎকালীন আদি ব্রাহ্মসমাজের তরুণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের মসীযুদ্ধ চলেছিল। নব্য-হিন্দুধর্মবাদীদের আতিশয্যকে আঘাত করার জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত 'কবিতা-পত্র', 'দামু-চামু', 'আর্য ও অনার্য' প্রভৃতি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা ও নাটিকা লিখেছিলেন। 'সঞ্জীবনী' সাপ্তাহিকে রবীন্দ্রনাথের 'দামু-চামু' প্রকাশিত হলে দেশের শিক্ষিতমণ্ডলে একটি আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। 'আর্য ও অনার্য' নাটিকায় তর্কচূড়ামণির সামঞ্জস্যহীন ধর্মব্যাখ্যা ও আর্যামিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করা হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ও ধর্মজীবন যখন দ্বন্দ্ব-মুখর সেই সময়ে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অধ্যাত্মবাদ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ হিন্দুসমাজের মধ্যে নূতন প্রেরণা সঞ্চারিত করেছিল। এঁদের শুধু বুদ্ধিসর্বস্ব বিশ্লেষণ নয়, সামঞ্জস্যহীন উদ্ভট ধর্মব্যাখ্যাও নয়, এক ভক্তি-বিশ্বাস ও

২১। রবীন্দ্র-জীবনী (প্রথম খণ্ড), পৃঃ ১৫৭-১৫৯ : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

প্রেমের জীবন্ত সত্য প্রত্যক্ষ করে হিন্দুসমাজের মধ্যে অভূতপূর্ব গতি সঞ্চারিত হল। স্বামী বিবেকানন্দের সেবাধর্ম ও মানবপ্রেম এক জাগ্রত জীবনের তরঙ্গলীলায় মুখর হয়ে উঠল। কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দ—দুজন মহামনীষী এই লোকোত্তর-চরিত মহাপুরুষের সমৃদ্ধ ভাব-জীবনের স্পর্শে নূতন বিশ্বাসকে ফিরে পেলেন। স্বামী বিবেকানন্দই আবেগ-বিহ্বল কণ্ঠে পশ্চিমের কাছে হিন্দুভারতের বিজয়বার্তা ঘোষণা করলেন।[২২] মিল-স্পেন্সার শুধু তাঁর সংশয়কেই বাড়িয়ে দিয়েছিল, ব্রাহ্মনেতৃবৃন্দও তাঁর পথ নির্দেশ করতে পারেন নি, দক্ষিণেশ্বরের সেই 'পাগল ঠাকুরের' কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করে পথ পেয়েছিলেন।

॥ ৫ ॥

স্ত্রী-বিয়োগ-পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য-জীবনের প্রথমার্ধকে প্রধানত বিদ্রূপাত্মক সাহিত্যরচনার যুগ বলা যায়। 'আর্যগাথা', 'পাষাণী' ও 'তারাবাই' এর ব্যতিক্রম। কিছু কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে এই যুগের কাব্য গান ও প্রহসনকে মোটামুটি ভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনা বলা যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের এই পর্বের রচনাগুলির মধ্যে তৎকালীন সমাজ জীবনের একটি সুস্পষ্ট প্রভাব আছে। বিলেত থেকে ফেরার পর দ্বিজেন্দ্রলালকে সামাজিক নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছিল। কৃষ্ণনগরের রক্ষণশীল সম্প্রদায় এক সময় রামতনু লাহিড়ীর মতো পূতচরিত্র মনীষীর বিরুদ্ধেও গো খাদক অপবাদ রটিয়েছিল।[২৩]

২২। "The only condition of national life, of awakened and vigorous national life, is the conquest of the world by Indian thought."—
[The Complete Works of Swami Vivekananda,
Vol VIII, Pages 276 277

২৩। "কলেজে বিধবা বিবাহের জন্য সভা হওয়াতে যে সকল আমলা মোক্তার প্রভৃতি বেশ্যাসক্ত ও প্রবঞ্চনা-ব্যবসায়ী 'এককালে ধর্ম বিনষ্ট হইল' বলিয়া চীৎকার ধ্বনি করিতেছিলেন, যাঁহারা এই গো-বৎস সংক্রান্ত জনরব শুনিলেন, এবং এই বিষয় অভিসন্ধি যতদূর অনুকূল হইতে পারে, তাহা করিয়া লইলেন। কয়েকদিবস পর গোয়াড়ীতে এই প্রবাদ উঠিল যে, রামতনু লাহিড়ী ও ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণনগরস্থ আর কয়েক ব্যক্তি, যাঁহাদিগকে আমরা ঘৃণা করিতাম, তাঁহারা এই সুযোগে গোয়াড়ীতে লোকের সহযোগী হ[illegible]লেন"...
[দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনচরিত, পৃঃ ১০২]

এই সামাজিক নির্যাতন ও অত্যাচারের জন্য তাঁকে সাময়িকভাবে কৃষ্ণনগর ত্যাগ করতে হয়েছিল।[২৪] বিলেত যাওয়ার জন্য তাঁর আত্মীয়-স্বজন তাঁকে বর্জন করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। কোন কোন হিতৈষী নাকি তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতেও পরামর্শ দিয়েছিলেন। যুক্তিবাদী ও তেজস্বী দ্বিজেন্দ্রলাল ঘৃণাভরে এই হীন প্রস্তাব অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর তৃতীয় অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রলালের দ্বিজেন্দ্র-স্মৃতিকথা থেকে সে সময়ের কৃষ্ণনগরের সামাজিক দলাদলির একটি পরিপূর্ণ ছবি পাওয়া যায় :

"দ্বিজেন্দ্র দেশে আসিলে মাননীয় ৺রায় যদুনাথ রায়বাহাদুর আমাকে নদীয়া জেলার একজন পদস্থ গণ্যমান্য পণ্ডিতের সাক্ষাতে বলিলেন যে, "আমরা দ্বিজেন্দ্রকে সমাজে লইব।" এই কথা বলিয়া উক্ত পণ্ডিতের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"কি বলেন ঠাকুর?" ঠাকুর যাহা বলিলেন তাহা লিখিতে লজ্জা হয়। ঠাকুর অম্লান বদনে বলিলেন, "তোমরা আমাকে কত টাকা দিবে?" ঐ ঠাকুর এবং অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-ঠাকুরের প্রকৃতি আমি পূর্বেই জানিতাম। তথাপি ঐ কথাটা শুনিয়া বড়ই ঘৃণাবোধ হইল। আমি রায়বাহাদুরকে বলিলাম—"এ-বিষয়ে আপনার যত্ন ও শ্রম করিবার আবশ্যক নাই। দ্বিজু কখনই প্রায়শ্চিত্ত করিবে না।"[২৫]

কৃষ্ণনগরের রক্ষণশীল সমাজ-বিধাতারা দ্বিজেন্দ্রলালকে প্রায়শ্চিত্ত-বিধান নির্দেশ করেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাঁরা দ্বিজেন্দ্রলালের বিবাহ ব্যাপারেও প্রবল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁরা সমাজচ্যুত করার ভয় দেখিয়ে যাঁরা বিবাহে যোগ দেবেন মনে করেছিলেন তাঁদেরও সরিয়ে দিলেন। এ সম্পর্কে জ্ঞানেন্দ্রলাল বলেছেন :

"কৃষ্ণনগরের কয়েকটি সম্ভ্রান্ত হিন্দু দ্বিজেন্দ্রের বিবাহে আমাদের সহিত বরযাত্রী গিয়াছিলেন। কিন্তু, বিবাহের পূর্বে কৃষ্ণনগরের কোন প্রবল পক্ষ, যাঁহারা এ বিবাহে যোগ দিবেন তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করিবার চেষ্টা করিবেন, এই সংবাদ পাইয়া তাঁহারা সহসা চলিয়া গেলেন। যাহা হৌক, বিবাহ হইয়া গেলে আমরা ভ্রাতাগণ দ্বিজু ও নবোঢ়া বধূকে সঙ্গে করিয়া কৃষ্ণনগরে লইয়া আসিলাম; দ্বিজেন্দ্রের এই বিবাহে আমরা যোগ দেওয়া

২৪। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ১৬৯।

২৫। নব্যভারত : শ্রাবণ, ১৩২০।

সত্ত্বেও কেহ আমাদিগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন না। কিন্তু, প্রকাশ্য-ভাবে দ্বিজেন্দ্রের সহিত তখন কেহ চলিতে স্বীকৃত হইলেন না।[২৬]

এই সমস্ত ব্যাপারে দ্বিজেন্দ্রলাল বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। 'একঘরে' পুস্তিকায় (২রা জানুআরি, ১৮৮৯) তিনি প্রাচীনপন্থী হিন্দু সমাজের নেতৃবৃন্দকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন। 'একঘরে' একটি বিদ্রূপাত্মক গদ্য রচনা মাত্র। তরুণোচিত উচ্ছ্বাস-প্রাবল্য, আহত চিত্তের দহন-দীপ্তি ও বিদ্রূপাত্মক তির্যক ভঙ্গি এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। 'একঘরে' রচনাটিতে দ্বিজেন্দ্রলালের লেখনী ক্ষুব্ধ অভিমানে সমস্ত সংযমের বাঁধ অতিক্রম করেছে। হিন্দু সমাজকে আক্রমণ করতে গিয়ে তিনি বিলাত-ফেরতদের সঙ্গে একটি একাত্মতার আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছেন, তার সঙ্গে 'ব্যাধিগ্রস্ত' হিন্দু-সমাজকেও ব্যাধিমুক্তির কথা শুনিয়েছেন :

"আসুন, যে সব ব্যাধি জাতির বুকে বসিয়া অবাধে বুকের রক্তপান করিতেছে, যাহারা নির্ভয়ে উন্নতির, প্রেমের, সত্যের হৃদয়ে শেল বিঁধিতেছে, তাহাদিগকে একঘরে করি, পীড়নের হেতু করি। সে 'একঘরে'তে দেখিবেন দেশের মঙ্গল হইবে; জাতির জীবন হইবে। সে 'একঘরে'র অর্থ অধর্মের প্রতি সমাজের কেন্দ্রীভূত ঘৃণা ও ক্রোধ; সে 'একঘরে'র অর্থ অনর্থের উচ্ছেদ; জ্ঞানের, সত্যের, উল্লাসের নবরাজ্য। নহিলে যেখানে কেশবচন্দ্র সেন, মনোমোহন ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী একঘরে, সে একঘরেতে কেহ ভীত হইবে না, কারণ, তাহার অর্থ জাতির মান্য, দেশের ভক্তি। সে একঘরের অর্থ বিদ্যা, প্রতিভা, সত্য, ন্যায়, ধর্ম।[২৭]

বিলাত থেকে লিখিত পত্রাবলীতেও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রাগ্রসর সমাজদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রগতিশীল ব্রাহ্ম সম্প্রদায় সম্পর্কেও তিনি সপ্রশংস মন্তব্য করেছিলেন। নবশিক্ষার আলোকে দ্বিজেন্দ্রলালের মন কতখানি প্রগতিশীল ও সংস্কারমুক্ত হয়েছিল তার প্রমাণ তাঁর এই সময়ের পত্রগুচ্ছের মধ্যেই পাওয়া যায়।[২৮] বাংলাদেশের নবজাগরণের অরুণালোকে তরুণ

২৬। নব্যভারত : শ্রাবণ, ১৩২০।

২৭। একঘরে : দ্বিজেন্দ্র-গ্রন্থাবলী (তৃতীয় ভাগ, বসুমতী সং) পৃঃ ২৫৭।

২৮। 'উন্নতি-অনুবর্তিতাই ব্রাহ্ম-ধর্মের গৌরব। ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রথানুযায়ী নহে—স্বাধীন, চিন্তাবান। প্রত্যেকেই বুঝিবেন—সভ্যতা পাপ নহে, সুবিধানুসরণ ধর্মের পথে কণ্টক দেয় না।'
—বিলাত-প্রবাসী : দ্বিজেন্দ্র-গ্রন্থাবলী (বসুমতী) পৃঃ ২৮৩

দ্বিজেন্দ্রলালের মনের আকাশ রঞ্জিত হয়েছিল। কেশবচন্দ্র, মনোমোহন ঘোষ, লালমোহন ঘোষ, রমেশচন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ যুগ-নায়কদের নাম তিনি একাধিকবার শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। গ্যারিবল্ডি ও ম্যাটসিনির সংগ্রামশীল জীবনাদর্শ বাংলাদেশের অধিকাংশ তরুণের মতো তাঁকেও উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। নবযুগের মন্ত্রে দীক্ষিত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার পূজারী তরুণ দ্বিজেন্দ্রলাল যে আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দেশে ফিরেছিলেন, তা প্রতিকূল সমাজের নিষ্ঠুর আঘাতে বিবর্ণ হয়ে উঠল। 'একঘরে' পুস্তিকায় সেই সংঘাতটিকেই তিনি তীব্র শ্লেষ-বিদ্রূপে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। কুণ্ঠা ও দ্বিধার মেঘ অপসারিত হল,—দ্বিজেন্দ্রলাল খুঁজে পেলেন তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভাষা ও ভঙ্গি। পরবর্তীকালের প্রহসন, হাসির গান ও বিদ্রূপাত্মক কবিতার মধ্যে প্রধানত সামাজিক ব্যঙ্গের অম্ল-মধুর রূপটিই ফুটেছে। 'একঘরে'-র সাহিত্যিক মূল্য কিছু নেই, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসন ও বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনার ভূমিকা হিসেবে এর একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। 'একঘরে' পুস্তিকায় যে ধরনের মর্মান্তিক বিদ্রূপ আছে, পরবর্তীকালেও তার রেশ থামে নি—বিদ্রূপাত্মক কবিতা ও প্রহসনে সেই সুরই যেন ধ্বনিত হয়েছে।

॥ ৬ ॥

'আর্যগাথা' (দ্বিতীয় ভাগ) প্রকাশিত হওয়ার পরে 'কল্কি-অবতার' দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বপ্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। 'কল্কি অবতার'কে একখানি সামাজিক প্রহসন বলা যায়। সামাজিক চিত্রকে সম্পূর্ণভাবে ফোটানোর জন্য পাঁচটি শ্রেণীকে এখানে আনা হয়েছে—পণ্ডিত, গোঁড়া, নব্যহিন্দু, ব্রাহ্ম ও বিলাত-ফেরত। লেখক এই পাঁচ শ্রেণীর লোককেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন। 'একঘরে' পুস্তিকায় লেখকের যে তীব্র মর্মবেদনা প্রকাশিত হয়েছিল, 'কল্কি-অবতার' প্রহসনে তার অগ্নিজ্বালা নির্বাপিত হয় নি। 'একঘরে' প্রকাশিত হওয়ার পর হিন্দুসমাজ ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু 'কল্কি-অবতার' প্রহসন সম্পর্কে রক্ষণশীল সমাজের নেতারাও লেখকের

ভূয়সী প্রশংসা করেন।[২৯] 'কল্কি-অবতার' প্রহসন থেকে তৎকালীন সমাজের মোটামুটি সবগুলি টাইপেরই একটি ব্যঙ্গচিত্র পাওয়া যায়। প্রহসনটির অন্যতম 'বিলাত-ফেরতা' চরিত্র মিস্টার দাসের মুখ দিয়ে 'একঘরে' প্রহসনের লেখকই যেন কথা বলেছেন :

কিসের প্রায়শ্চিত্ত ! theft murder-ও করি নি
কারুর wife seduce করে নিয়ে আসি নি…

* * *

এ প্রায়শ্চিত্তর অর্থ যে কি পাইনে ক খুঁজে,
এ প্রায়শ্চিত্তর value বা কি উঠিনিও বুঝে
এ Society মানবে কে ? Priests-রা সব চোর
আর এ Society-ও আজ rotten to the core.

'ত্র্যহস্পর্শ' (১৯০০) প্রহসনে দুটি বালকের কৌতুককর কথোপকথনের মধ্যে তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক যুগের একটি টুকরো ছবি পাওয়া যায়। সুরেন বাঁড়ুজ্জে ও লালমোহন ঘোষের মধ্যে কে বড় বাগ্মী, তাই তাদের আলোচ্য বিষয়। 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রহসনে (১৯০২) বিলাতফেরতা নব্যহিন্দু ও শিক্ষিতা রমণীদেব নিয়ে পরিহাস করা হয়েছে। প্রহসনটির বাস্তব-ঘনিষ্ঠ ঘটনা ও পটভূমিকা সম্পর্কে নাট্যকার ভূমিকায় যে মন্তব্য করেছেন, তা উল্লেখযোগ্য : "আমি এই গ্রন্থে বিলাত-ফের্তা সম্প্রদায়ের নিকৃষ্ট শ্রেণীর একটি ছবি দিবাব চেষ্টা করিয়াছি। তাহা অতিরঞ্জিত নহে। এই ছবিব background-টি অতিরঞ্জিত বটে। কিন্তু মূলকেন্দ্রীয় ছবিটি ব্যক্তিগত না হইলেও প্রকৃত বলিয়া বিশ্বাস কবি।" দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর প্রহসনগুলিতে যেমন বক্ষণশীল চরিত্রকে আঘাত করেছেন, তেমনি বিলাত-ফেরতা সমাজের অতিরিক্ত সাহেবিয়ানাকেও ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি—'প্রায়শ্চিত্ত' প্রহসনের গঙ্গারাম চম্পটির চরিত্র তার উজ্জ্বলতম নিদর্শন। চম্পটির কথাবার্তা একটু অতিরঞ্জিত হলেও তাতে শিক্ষিত নব্যসম্প্রদায়েব অসঙ্গতি ও আতিশয্য

২৯। "একঘরে পাঠ করিয়া কবির হিন্দু সমাজের আত্মীয়েরাও অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু 'কল্কি-অবতার' পাঠ করিয়া রক্ষণশীল সমাজের নেতা বঙ্গবাসীও লিখিয়াছিলেন—"এরূপ পুস্তক বঙ্গভাষায় আর হয় নাই।"

—(দ্বিজেন্দ্রলাল : নবকৃষ্ণ ঘোষ, পৃঃ ৬৮)

ফুটে উঠেছে।[৩০] 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রহসনের গানগুলির মধ্যে সামাজিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের চূড়ান্ত পরিচয় আছে। "আমরা বিলাত-ফের্তা ক' ভাই", "নূতন কিছু করো একটা নূতন কিছু করো", "কটি নবকুলকামিনী", "চম্পটির দল আমরা সবে" প্রভৃতি গানের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ ও অসঙ্গতিগুলি উদ্ঘাটিত হয়েছে। একটা নূতন কিছু জোর করে করতে হবে, এই ভ্রান্ত নেশায় মত্ত হয়ে যারা জীবনের সমস্ত সঙ্গতি হারিয়ে ফেলেছে, নাট্যকার তাদের তীব্র কশাঘাত করেছেন।

'প্রায়শ্চিত্ত' প্রহসনে নাট্যকার নিজেকেও ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি। দ্বিজেন্দ্র-জীবনীকার তাঁর ছাত্রজীবনের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন : "কৃষ্ণনগরে যখন তিনি ইস্কুলের উপরের শ্রেণীতে পড়িতেন সেই সময়ে, তাঁহার সতীর্থ ও ছাত্র-সহচরগণের সহযোগে, তিনি একটি 'চাদর-নিবারণী সভা' স্থাপন করেন ; এবং এই দরিদ্র দেশে, অনাবশ্যকভাবে যাহাতে আর কেহ অর্থ-ব্যয় করিয়া চাদর ব্যবহার না করে তজ্জন্য সবান্ধব বিশেষ যত্নপর হন। এই বালকবৃন্দের সভায় দ্বিজেন্দ্রলাল সতেজে ও আগ্রহসহকারে প্রায়ই দেশের নানাবিধ দুর্গতি নির্দেশপূর্বক সুদীর্ঘ বক্তৃতাদি করিতেন, ফলে এইভাবে তাঁহার উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা ও যুক্তিপ্রভাবে, বালক-সম্প্রদায়ের ভিতর হইতে অচিরে চাদর ব্যবহার একরূপ উঠিয়া গেল।"[৩১] এই ঘটনার দীর্ঘকাল পরে 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রহসনের 'নূতন কিছু করো' কোরাস গানটিতে তিনি নিজের পূর্বতন আচার-আচরণকেও ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি :

ডাল ভাতের দফা, কর সবাই রফা,
কর শীগ্‌গির ধুতিচাদর-নিবারণী সভা,

লঘু পরিহাসের ভঙ্গিতে তিনি তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক ভাবাদর্শেরও একটি সরস ছবি এঁকেছেন :

কিম্বা সবাই ওঠো, টাউন হলে জোটো ;
হিন্দুধর্ম প্রচার করতে আমেরিকায় ছোটো ;

৩০। চম্পটি। এ জীবনে যত রকম চলানো যেতে পারে তা চলিইছি বাবা। Briefless barrister হওয়া, মেম বিয়ে করা, তাকে divorce করা ; পরে আবার আর এক Portionless widow বিয়ে করা—যত রকম হতে পারে। এখন একটা প্রায়শ্চিত্ত করলেই ষোল কলা পূর্ণ হয়। [প্রায়শ্চিত্ত : দ্বিতীয় অঙ্ক, ষষ্ঠ দৃশ্য]

৩১। দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৮০-৮১।

আমরা যেন নেহাইৎ খাটো হয়ে না যাই দেখো,
খুব খানিক চেঁচাও, কিম্বা খুব খানিক লেখো।

এ ছবি থেকে তখনকার কালের একটি পরিচয় পাওয়া যায়। নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ ও নানাবিধ সামাজিক আন্দোলনের দিনে প্রধান মিলনক্ষেত্র ছিল টাউন হল। তেজস্বিনী বক্তৃতা দেওয়া, পত্র-পত্রিকায় লেখা ও তর্ক-বিতর্ক করা সে যুগকে কর্ম-মুখর ও গতি-চঞ্চল করেছিল। উনিশ শতকের শেষদিকে স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা যাত্রা ও হিন্দুধর্ম প্রচার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। স্ত্রী-শিক্ষার ফলে নাটক-নভেল-পড়া রোমান্স-রোগগ্রস্তা নায়িকা-চরিত্রের অসঙ্গত আচার-আচরণের হাস্যকর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

সে যুগের স্বদেশপ্রেমিকতার মধ্যে একটি পরস্পর-বিরোধী দ্বন্দ্ব ছিল। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুশীলনের ফলে ইংরেজ-চরিত্রের প্রতি একটি অসাধারণ মোহ ছিল অথচ অন্যদিকে জাতীয়তাবোধও দেখা দিয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতাকামনার মধ্যে এই জাতীয় একটি স্ববিরোধ ছিল।[৩২] পরিহাস-তরল কণ্ঠে বললেও জাতীয় জীবনের এই স্ববিরোধ তীক্ষ্ণধী দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টি এড়ায় নি। তাই তাঁর 'বিলাত-ফের্তা ক'ভাই' গানে আছে :

'আমরা বিলাত-ফের্তা ক'টায়,
দেশে কংগ্রেস আদি ঘটাই ;
মোদের সাহেব যদিও দেবতা, তবুও
সাহেবগুলোই চটাই।

নব-হিন্দুধর্মবাদীদেরও তিনি ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি—"ব্যাখ্যা করছেন হিন্দুধর্ম হরি ঘোষ আর প্রাণধন দে।" প্রহসনের মধ্যে একটি সামাজিক

৩২। 'সেদিন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ বেধেছিল দাস-প্রথার বিরুদ্ধে। ম্যাটসিনি-গারিবালডির বাণীতে কীর্তিতে সে-যুগ ছিল গৌরবান্বিত, সেদিন তুর্কির সুলতানের অত্যাচারকে নিন্দিত করে মন্দ্রিত হয়েছিল গ্ল্যাডস্টোনের বজ্রস্বর। আমরা যেদিন ভারতের স্বাধীনতার প্রত্যাশা মনে মনে লালন করতে আরম্ভ করেছি। সেই প্রত্যাশার মধ্যে একদিকে যেমন ছিল ইংরেজের প্রতি বিরুদ্ধতা, আর-একদিকে ইংরেজ-চরিত্রের প্রতি অসাধারণ আস্থা।'
[কালান্তর পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৪০ : রবীন্দ্রনাথ]

দিক আছে, সামাজিক অসঙ্গতি ও ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিকে প্রহসন ও ব্যঙ্গাত্মক নকশা-নাটক-রচয়িতারা বিদ্রূপের শরাঘাতে জর্জরিত করেন। এইজন্য অ্যারিস্টোফিনিস থেকে আরম্ভ করে এ কালের সমাজ-বিদ্রূপমূলক নাটক-রচয়িতারা প্রকারান্তরে সমাজ-সমালোচনাই করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনগুলির মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আতিশয্য থাকলেও, সমসাময়িক সমাজ-জীবনের ছবি হিসেবে প্রহসনগুলির একটি বিশেষ মূল্য আছে।

॥ ৭

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনগুলির মূলভিত্তি তাঁর হাসির গান। প্রহসনগুলির মতো বিদ্রূপাত্মক কবিতা ও হাসির গানের মধ্যেও তৎকালীন সামাজিক জীবনের কিছু কিছু উপাদান পাওয়া যায়। 'আষাঢে' ব্যঙ্গকাব্যের (১৮৯৯) 'শ্রীহরি গোস্বামী' কবিতায় তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্মের উদ্ভট বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে :

হা বাঙ্গালি নব্য, হয়ে একটু সভ্য
বিজ্ঞানের ক খ গ পড়ি করে কতই গর্ব
ডুবছে-'খাবি খাচ্ছে সবে' সভ্যতা হিল্লোলে,
হায় ব্যাসের কর্ম, হায় মনুর মর্ম,
ডুবল কি এ কলিকালে সবই মুর্গীর ঝোলে ?
(এখন ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নাহি জানি,)
—যে মরে সে মরে, ব্রহ্মার বাপের বরে
বাঁচাতে পারে না একবার মরে গেলে প্রাণী,

'ভট্ট-পল্লীতে সভা' কবিতাটিতে 'তৈলাধার পাত্র কিনা পাত্রাধারই তৈল' সমস্যার প্রচলিত কাহিনীকে নিয়েই তিনি প্রাচীনপন্থীদের চুলচেরা কূটতর্কের হাস্যকর অসঙ্গতিকে দেখিয়েছেন। 'ডেপুটী-কাহিনী' কবিতাটিও কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার রসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 'রাজা নবকৃষ্ণ রায়ের সমস্যা' কবিতায় সমাজ-জীবনের বিভিন্ন টাইপ নিয়ে বিদ্রূপ করা হয়েছে। এর মধ্যে

সবচেয়ে উপভোগ্য তিনটি চিত্র—তৎকালীন সমাজ-জীবনের তিনটি পূর্ণতর ছবি

বল্লেন উঠে শ্রীমান নন্দলাল দত্ত—
—"মহারাজ এক সংবাদপত্রের স্বত্ব—
অধিকারী আমি, লিখে বিশুদ্ধ প্রবন্ধ ,
ইংরেজ ও বড়লোককে দিয়ে গালি মন্দ,
চলে যায় পেট , দিন যায় কেটে
সুখে, ধর্মের এবং স্বদেশ-হিতৈষিতার ভানে,
করি মেলা গোল, তাই আমায় অনেক লোকেই জানে।

ধর্ম ব্যাখ্যাতা জীবন সরকার বলেন

কবি ব্যাখ্যা ধর্ম, ভাগবতের মর্ম,
বেদ ও দর্শন, মনু ও স্মৃতি,—সংস্কৃতে না শিখিই
তন্ত্রাদি যোগ ব্রহ্মচর্য চালাই একখান মাসিকী ,
ইত্যাদি" বল্লেন সরকার "বিদ্যে নেইক দরকার
বলা দরকার 'ইংরেজ মূর্খ, হিন্দুরাই সব' ,
তাতে আমার মাসিক পত্র কাটে অসম্ভব ॥"

'কলিযজ্ঞ' কবিতায় স্বদেশপ্রেমের নামে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বক্তৃতা-সর্বস্বতাকে কবি তীব্র ভাষায় ব্যঙ্গ করেছেন :

এরূপ শুদ্ধ ইংরাজী এরূপ উপমা ছটা।
এরূপ শব্দবিন্যাস এরূপ দ্রুত বক্তৃতা ॥
সিসিরো, পিট, বর্কাদি কাছাকাছি ত নিশ্চয়।
একবাক্যে মহাহর্ষে বলিলা সব কাগজে ॥

রেজোল্যুশান ও বক্তৃতার অন্তঃসারশূন্যতাকে কবি কৌতুককর ভঙ্গিতে বলেছেন। এই প্রসঙ্গে কবিপুত্র দিলীপকুমার রায়ের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : "তখনো দেশ জাগে নি। সভাসমিতি তো একটা প্রহসন—খালি রেজুলেশন আর বক্তৃতা। এ হেন আন্দোলনের অসারতা যে কী হসনীয় তার ছবি এঁকেছেন তিনি তাঁর "আষাঢে"-র "কলিযজ্ঞ" কবিতায়—অনুষ্টুপ ছন্দে : দেশে আজ তবু খানিকটা সৃষ্টির চাঞ্চল্য এসেছে কিন্তু তখন ছিল শুধুই নিষ্কর্মা বক্তৃতা। কবি বুঝেছিলেন যে এ পথে মুক্তি

হতে পারে না। চাই সমাজের সংস্কার, আত্মশোধন, তাই তিনি দেশের অসারতাকে শুরু করলেন ব্যঙ্গ।"৩৩

'হাসির গান' (১৯০০) দ্বিজেন্দ্রলালের খ্যাততম কাব্যগ্রন্থ। 'হাসির গানের' গানই তাঁর প্রহসনগুলির প্রাণ। 'তা সে হবে কেন' গানে বক্তৃতা-সর্বস্ব দেশপ্রেমিক, অপদার্থ হিন্দুধর্ম-ব্যাখ্যাতা, প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল ও নারীমুক্তি-বিরোধীদের ব্যঙ্গ করেছেন। 'বদলে গেল মতটা' কবিতায় সে যুগের শিক্ষিত বাঙালীর ধর্মসম্পর্কীয় দোলাচলবৃত্তিকে তীব্র কশাঘাত করা হয়েছে—তৎকালীন বাঙালী-মানসের সুন্দর একটি ছবি পাওয়া যায়। খ্রীষ্টধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম, স্পেন্সার-মিল-পড়া যুক্তিবাদ, 'বসু-ঘোষে'র হিন্দুধর্ম ও সর্বশেষে Theosophy-র গর্ত—মত-পরিবর্তনের এই সূত্রগুলি উনিশ শতকের শেষদিকে বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের একটি জীবন্ত আলেখ্য। 'হিন্দু' কবিতায় সে যুগের নবহিন্দুবাদীদের কথাই বলা হয়েছে :

এখন ঘোষের নিকট বোসের নিকট
(হিন্দু) ধর্মশাস্ত্র শিখি গো।
আমি জীবনের সার করেছি আমার
(আহা) ফোঁটা, মালা আর টিকি গো।

'Theosophy-র গর্ত' সম্পর্কে একটি ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য : "এই সময় ডাক্তার ৺বিহারীলাল ভাদুড়ী ও তদীয় জামাতা ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে (যাঁর কন্যাকে দ্বিজেন্দ্রলাল বিবাহ করেন) নিয়ে শ্রীরামপুর-সাঁওরাগাছিতে খুব দলাদলির সূত্রপাত হয়। বিহারীবাবু বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়ে চিরজীবন স্বীয় সমাজে নির্যাতিত হয়ে আসছিলেন। এই সময়ে তিনি "থিওজফির গর্তে" পতিত হন, এবং বুড়া বয়সে প্রায়শ্চিত্ত করে প্রতাপবাবু ও দ্বিজুবাবুর সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক অস্বীকার করেন। এই সকল ব্যাপার দেখে ন্যায়নিষ্ঠ দ্বিজুবাবু ভয়ানক চটে ওঠেন।"৩৪ শশধর তর্কচূড়ামণি ও তাঁর শিষ্যসম্প্রদায়ের আতিশয্য-পন্থাও দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টি এড়ায় নি। 'চণ্ডীচরণ' কবিতায় তিনি লিখেছেন :

তবু সে ব্যাখ্যায় এদেশে পড়ে গেল টিড্‌টিকার ;
লিখতেন তিনি অতি চাঁছা গদ্যে ;

৩৩। উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল : দিলীপকুমার রায়, পৃঃ ১৩৬।

৩৪। দ্বিজেন্দ্র-জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরীর কাছে সুরেশ সমাজপতির লিখিত পত্রাংশ। [দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ২১০]

বোঝাতেন যে হার্বার্ট স্পেন্সার, ওয়েবেস্টার কি বিডভিকার,—
আছে সবই গীতার একটি অধ্যায়েরই মধ্যে,

'নন্দলাল' কবিতাতেও পোশাকী দেশপ্রেমিকতাকে তীব্র কশাঘাত করা হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের সামাজিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্যে তৎকালীন সমাজ-জীবনের গতি-প্রকৃতির সঙ্কেত নিহিত আছে।

দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যে তৎকালীন পাশ্চাত্ত্য দর্শন-বিজ্ঞানেরও প্রভাব পড়েছে। তিনি একাধিক কবিতায় হার্বার্ট স্পেন্সারের কথা উল্লেখ করেছেন। ডারউইনের 'Origin of Species' গ্রন্থ (১৮৫৯) প্রকাশের পরের বছর থেকেই হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁর দশখণ্ডে বিভক্ত 'Synthetic Philosophy' (১৮৬০-৯৬) গ্রন্থের সূত্রপাত করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক থেকেই বাংলা সাহিত্যের উপর স্পেন্সারের রচনার প্রভাব পড়েছিল। স্পেন্সারের 'অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়' (Unknown and Unknowable) তত্ত্ব তখনকার [illegible] নাস্তিকতাবাদ ও অজ্ঞেয়বাদের (Agnosticism) ভিত্তিমূলকে পরিপুষ্ট করেছিল। এই সংশয়বাদ পরবর্তীকালে নানাভাবে পল্লবিত হয়ে বাঙালীর মানস জীবনকে চঞ্চল করে তুলেছিল। তাই উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মান্দোলনগুলির পাশাপাশি একটি সংশয়বাদের ধারাও সক্রিয় ছিল। হাক্সলির 'Man's Place in Nature' গ্রন্থটিও কম প্রভাব বিস্তার করে নি। তখনকার কালের নাস্তিকতাবাদের গুরুস্থানীয় ছিলেন স্পেন্সার ও হাক্সলি। দ্বিজেন্দ্রলাল হাসির গান-এর 'বদলে গেল মতটা' কবিতায় কৌতুকের সঙ্গে বলেছেন:

নাস্তিকের এক দলের সঙ্গে মিশলাম গিয়ে বঙ্গে,
Hume ও Mill ও Herbert Spencer
পড়তে লাগলাম সঙ্গে।

দ্বিজেন্দ্রলাল কৌতুকচ্ছলে বললেও, বক্তব্যটি যে সে যুগের মর্মবাণী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দও এই যুগ-প্রভাব থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারেন নি।[৩৫]

৩৫। এই বিষয়ের বিস্তৃত পরিচয়ের জন্য অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন লিখিত 'রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা' (শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৬৫) প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

॥ ৮ ॥

স্ত্রী-বিয়োগের পর থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যজীবনের পট-পরিবর্তন হয়েছে। হাস্যপরিহাস-মুখর আনন্দোজ্জ্বল জীবনের উপর আকস্মিকভাবে মর্মান্তিক আঘাত এসে পড়েছে। শূন্যহৃদয়ের বেদনা তৎকালীন গানে ও কবিতায় অভিব্যক্ত হয়েছে। আকস্মিকভাবে দেশ-কালের একটি অমোঘ নির্দেশ দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক জীবনকে এক নূতন পথ-নির্দেশ করেছে। ব্যক্তিগত জীবনের মর্মান্তিক শোক এক বৃহত্তর জাতীয় জীবনের কলধ্বনির সঙ্গে তিনি মিশিয়ে দিয়েছিলেন। জাতীয় জীবনের এই প্রবল আলোড়নের মূলে আছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যজীবনের শেষ দশক এই আন্দোলনের উত্তাপে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। সুতরাং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের স্বরূপ-প্রকৃতি ও দ্বিজেন্দ্রলালের মনোজীবনের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করলেই তাঁর এই পর্বের নাটকগুলির মৌলিক অভিপ্রায় নির্ণয় করা সম্ভব।

তৎকালীন বঙ্গদেশের জনমতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি লর্ড কার্জন বঙ্গবিভাগের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। ১৯০৩-এর ডিসেম্বর মাসে 'ক্যালকাটা গেজেটে' এই প্রস্তাবটি প্রকাশিত হল। ১৯০৪ সাল থেকেই অসন্তোষের বিক্ষোভ বাংলাদেশের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল—এই সর্বনাশা পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সঙ্কল্প-কঠোর প্রতিরোধের শপথ ক্ষুব্ধ অভিমানে গর্জন করে উঠল। ১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই ভারতসচিব বঙ্গভঙ্গের ব্যবস্থাদি মঞ্জুর করলেন। ভারত সরকারের ইস্তাহার অনুসারে ঐ বছরেরই ১৬ই অক্টোবর (১৩১২, ৩০শে আশ্বিন) বঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা ঘোষিত হল। এই ব্যবস্থা অনুসারে বঙ্গদেশ দুজন গভর্নরের অধীনে দুটি পৃথক প্রদেশে ভাগ হল: রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম এই তিনটি বিভাগের সঙ্গে আসামকে যুক্ত করে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে একটি প্রদেশ গঠিত হল। প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান বিভাগের সঙ্গে বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যাকে যুক্ত করে স্বতন্ত্র আর একটি প্রদেশ গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হল।

জনমতের বিরুদ্ধে আমলাতান্ত্রিক সরকারের এই হৃদয়হীন ব্যবস্থাকে বাঙালীরা মেনে নেয় নি। এইখান থেকেই শুরু হল বাঙালীর জাতীয় জীবনের নূতন পরিচ্ছেদ। এরও দু-তিন বছর আগে থেকেই জাতীয় জীবনের

বিক্ষোভ ক্রমশই ধূমায়িত হচ্ছিল। ৩০শে আশ্বিন দিনটিকে স্মরণীয় করার জন্য রবীন্দ্রনাথ সেদিন রাখী-বন্ধনের প্রস্তাব করেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রস্তাব করেন অরন্ধনের। এই দিনটিকে চিরস্মরণীয় করার জন্য রবীন্দ্রনাথ "বাংলার মাটি বাংলার জল" গানটি রচনা করেছিলেন। ৩০শে আশ্বিন অপরাহ্নে "সারকুলার রোডের উপরিস্থিত ময়দানে" ফেডারেশন হলের প্রতিষ্ঠা হল। তারপর সেই জনতা পশুপতি বসুর বাড়ির দিকে অগ্রসর হল। অখণ্ড বাংলাদেশকে দ্বিধা-বিভক্ত করার সর্বনাশা প্রস্তাবের ফলে বাঙালী জীবনের মধ্যে এক অখণ্ড ঐক্যানুভূতি দেখা দিল। কার্জন-শাসিত বাংলাদেশের সেই মেঘ-দুর্যোগময় প্রহরে বাঙালার হৃদয়পদ্ম নানাদিক থেকে বিকশিত হয়ে উঠল। এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য স্মরণীয়:

Lord Curzon has divided our province ; he has sought to bring about the disintegration of our race, and to destroy the solidarity of our popular opinion. Has he succeeded in this novel endeavour ? He has built better than he know ; he has laid broad and deep the foundations of our national life ; he has stimulated those forces which contribute to the upbuilding of nations ; he has made us a nation ; and the most reactionary of the Indian Viceroys will go down to posterity as the Architect of the Indian national life.[৩১]

ঐ বছরের সাতই আগস্ট থেকে সক্রিয়ভাবে বিলাতী শিল্পজাতদ্রব্য বর্জন শুরু হল। স্বদেশী শিল্পের লুপ্ত গৌরবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যও সে যুগে নানাদিক থেকে চেষ্টা করা হয়েছিল। সরলাদেবী 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' নামে স্বদেশী শিল্পদ্রব্যের এক দোকান খুলেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'য় স্বদেশী দ্রব্য-সামগ্রীকে প্রচলিত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' কথকতার ঢঙে ও ব্রতকথার আদর্শে রচিত হলেও বাংলাদেশের সেইকালের জাতীয় সমস্যা ও মর্মবেদনাকে উদ্ঘাটিত করেছিল:

"১৩১২ সাল, আশ্বিন মাসের তিরিশে, সোমবার শুক্লপক্ষের তৃতীয়া, সেদিন

৩১। Speeches Surendranath Banerjee (1908) Vol vi ; Pp 397-398.

বড় দুর্দিন, সেইদিন রাজার হুকুমে বাঙলা দু-ভাগ হবে ; দু'ভাগ দেখে বাঙলায় লক্ষ্মী বাঙলা ছেড়ে যাবেন। পাঁচকোটি বাঙালী আছাড় খেয়ে ভূমে গড়াগড়ি দিয়ে ডাকতে লাগল—মা, তুমি বাংলার লক্ষ্মী, তুমি বাংলা ছেড়ে যেয়ো না, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর ;...মায়ের মন্দির হতে মা বলে উঠলেন—জয় হউক, জয় হউক ; ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকবেন ; বাংলার লক্ষ্মী বাংলায় থাকবেন ; তোমরা প্রতিজ্ঞা ভুলো না ; ঘরের থাকতে পরের নিয়ো না, পরের দুয়ারে ভিক্ষা চেয়ো না ; ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হয়ো না ; তোমাদের 'এক দেশ এক ভগবান, এক জাতি এক মনপ্রাণ হোক,' লক্ষ্মী তোমাদের অচলা হবেন।"[৩৭]

১৯০৫ সনের ১৩ই জুলাইয়ের "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় কৃষ্ণকুমার মিত্র "আন্দোলনের উপেক্ষা" ও "কর্তব্য নির্ধারণ" নামক দুটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিদেশী পণ্য-বর্জনের প্রস্তাব তোলেন। এই প্রস্তাব শুধু কলকাতায় নয়, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে গৃহীত হল। এই প্রস্তাবের মধ্যে বিদেশী জীবন বীমা কোম্পানি বর্জন করার নির্দেশও ছিল। বিলিতি পণ্য-বর্জন ব্যাপারে বাঙালী ছাত্ররাই হলেন অগ্রণী। বাংলা সরকারের প্রধান সেক্রেটারি কার্লাইল সাহেব এক সার্কুলারের সাহায্যে জানিয়ে দিলেন যে ছাত্র সম্প্রদায়ের পক্ষে এই আন্দোলন বা সভাসমিতিতে যোগদান করা অবৈধ। কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার আবদুর রসুলের সভাপতিত্বে কার্লাইল সার্কুলার সম্পর্কে আলোচনা হয়—ছাত্রদমন নীতির প্রতিকার ও জাতীয় শিক্ষা বিস্তারকল্পে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করার প্রস্তাব গৃহীত হয় (৭ই কার্তিক, ২৪শে অক্টোবর)। সভায় ব্যারিস্টার জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রমুখ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সেইদিনই লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের ভ্রাতা মেজর নরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহের সভাপতিত্বে যে সভা হয়, তাতে বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী চাকুরি পরিত্যাগ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর তিনদিন পরে (১০ই কার্তিক, ১৩১২) রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে পটলডাঙা মল্লিক-বাড়িতে যে সভা হয় তাতে তিনিও জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রয়োজনটিকে সুস্পষ্ট করে তোলেন। এই সভায় অ্যাটর্নী ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র, বিপিনচন্দ্র পাল, বরিশালের

৩৭। বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা : বঙ্গদর্শন, পৌষ ১৩১২।

মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, ডন সোসাইটির সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি জাতীয় শিক্ষালয়ের অনুকূলে বক্তৃতা দেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে 'ডন সোসাইটি' ছাত্র সমাজের মধ্যে দেশসেবার আদর্শ সংক্রামিত করেছিল। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা উদ্বোধনের ইতিহাসে 'ডন সোসাইটি' ও তার প্রাণপুরুষ আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। 'ডন সোসাইটি' ১৯০২-এর জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সমিতির স্থায়ী সভাপতি ছিলেন নগেন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি ছিলেন মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের অধ্যক্ষ ও "ইণ্ডিয়ান নেশান" পত্রের সম্পাদক। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন এর সাধারণ সম্পাদক। ভবানীপুরের ভাগবত চতুষ্পাঠী থেকে প্রকাশিত 'ডন পত্রিকা' ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ডন সোসাইটি'-র মুখপত্রে পরিণত হল—তখন এর নূতন নাম হল "দি ডন অ্যাণ্ড ডন সোসাইটিজ ম্যাগাজিন।" ১৯০৫ এর ৮ই নভেম্বর রংপুরে প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হল। ১৬ই নভেম্বর "বেঙ্গল ল্যাণ্ড-হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের" এক সভায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯০৬-এর ১১ই মার্চ 'ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব এডুকেশন' গঠিত হয়।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন আহূত হল। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিকে তখন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু মিছিল সভা-মণ্ডপে প্রবেশ করার পূর্বেই পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কেম্প সশস্ত্র পুলিশবাহিনী নিয়ে শোভাযাত্রা ভেঙে দিলেন—দলবদ্ধ স্বেচ্ছাসেবকের উপর বেপরোয়া লাঠিচালনা হল। এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে বর্ষীয়ান সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হলেন। বরিশালের এই নির্মম অত্যাচারের সংবাদ দাবানলের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ১৯০৫ এর বেনারস কংগ্রেসের ও ১৯০৬-এর কলকাতা কংগ্রেসের বক্তৃতা ও প্রস্তাবসমূহেও এই সমস্ত ঘটনার প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

সমসাময়িককালে মহারাষ্ট্রেও এক নবজাগরণ ঘটেছিল। পুনার চিৎপাবন ব্রাহ্মণরাই প্রধানত এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সার্বজনীন গণপতি উৎসবকে কেন্দ্র করে এক দেশপ্রেম ও ঐতিহ্য-প্রীতির উন্মাদনা প্রবল হয়ে উঠেছিল। বৈদেশিক শত্রুকে উৎখাত করতে গিয়ে তাঁরা শিবাজীর জীবনাদর্শের দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। শিবাজী মেলা ও

শিবাজী উৎসবকে কেন্দ্র করে বৈদেশিক শাসন-পাশ থেকে মুক্ত হওয়ার এক তীব্র আগ্রহ জেগে উঠেছিল। মহারাষ্ট্রের একচ্ছত্র নেতা লোকমান্য তিলক তাঁর 'কেশরী' পত্রিকার মাধ্যমে দেশের জনসাধারণকে উদ্‌বুদ্ধ করেন। ১৯০৬ সালের ৪ঠা জুন তিলক কলকাতায় শিবাজী-মেলার উদ্বোধন করেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে যে শিবাজী-উৎসব প্রবর্তিত হয়েছিল, তা ধীরে ধীরে বাংলাদেশেও প্রবর্তিত করার চেষ্টা করা হল। সখারাম গণেশ দেউস্করের 'শিবাজীর দীক্ষা' নামে একখানি পুস্তিকার ভূমিকা স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ 'শিবাজী-উৎসব' নাম কবিতা লিখেছিলেন (বঙ্গদর্শন ১৩১১, আশ্বিন।)[৩৮]

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে মতানৈক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সুরাট কংগ্রেস নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক, মারপিট ও জুতো-ছোড়াছুড়ির মধ্যে দিয়ে শেষ হয়। নরমপন্থীদের মধ্যে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ, ফিরোজ শাহ মেটা, গোখলে, রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি এবং চরমপন্থীদের মধ্যে ছিলেন তিলক, খাপার্দে, অরবিন্দ ঘোষ, লাজপত রায় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ। এই সময়ে 'নিউ ইণ্ডিয়া' কাগজে বিপিনচন্দ্র পাল, 'সন্ধ্যা'য় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় অরবিন্দ ঘোষ, নানা রাজনৈতিক প্রবন্ধে দেশের জনমত গঠনের চেষ্টা করেন। 'বন্দেমাতরম্' ও 'সন্ধ্যা'র বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ করা হয়। বিচারাধীন সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের ধূমায়িত বহ্নিও এই সময় শত শিখায় বহ্নিমান হয়ে উঠেছিল। ১৯০৮ সালে কিংসফোর্ড সাহেব হত্যার অপরাধে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হল, প্রফুল্ল চাকী করলেন আত্মহত্যা। ঐ বছরের জুন মাসে মানিকতলা বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হওয়ায় অরবিন্দ ঘোষ গ্রেপ্তার হলেন। ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে 'আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদের' পূর্ণতম অভিব্যক্তি ঘটেছিল। উনিশ শতকের শেষ দু দশক থেকে ব্রাহ্মসমাজ তার উদ্দীপনা ও প্রাণশক্তি হারাতে থাকে। নূতন নেতা সুরেন্দ্রনাথের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবোধ এক নূতন পথে প্রবাহিত হয়। এই কালের জাতীয় আন্দোলনের প্রতিনিধিস্থানীয় পুরুষেরা হলেন বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ, সতীশচন্দ্র,

৩৮। রবীন্দ্র-জীবনী (দ্বিতীয় খণ্ড) : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১১৪-১১৫

অশ্বিনীকুমার, ব্রহ্মবান্ধব প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ। রবীন্দ্রনাথও এই জাতীয়তার বাণীকেই বজ্রকণ্ঠে শুনিয়েছেন।

॥ ৯ ॥

বাংলা সাহিত্যের উপর স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব অনন্যসাধারণ। সক্রিয় প্রতিরোধ ও কর্মচঞ্চল জাতীয় জীবনের অভীপ্সা গানে, কবিতায়, নাটকে নানাভাবে রূপায়িত হয়েছে। বৈদেশিক উৎপীড়নে বাঙালী চিত্তের মুক্তি ঘটেছিল—আঘাতে ও বেদনায় হৃদয়ের অবরুদ্ধ আবেগ বিচিত্র ভাষায় কল্লোলিত হয়ে উঠেছে :

Some of the dramas of Dwijendralal Roy reflected the national spirit in a most imposing manner and there was hardly any important town or village in Bengal in which one or other of his works was not staged. When presented on the stage these dramas led to considerable popular excitement, so much so, that the Government thought it fit to suppress some of them. The national songs composed during the period by Dwijendralal Roy, Rabindranath Tagore, Sarala Debi Choudhuri, Mr. A. P. Sen and the Late Rajani Kanto Sen smote on the heart of the people as on a giant's harp, awakening out of it a storm and a tumult such as had never been known through the long centuries of her political serfdom [৩৯]

উদ্ধৃত মন্তব্যটি থেকে স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি তথা দ্বিজেন্দ্রলালের একটি উজ্জ্বল ভূমিকার পরিচয় পাওয়া যায়। শিখ, মারাঠা ও রাজপুত ইতিহাস বাঙালীর সম্মুখে এক বীরত্বমণ্ডিত গৌরবোজ্জ্বল কাহিনীকে উপস্থিত করেছিল। ১৯১০ সালে শরৎকুমার রায়ের

৩৯। Life and Times of C. R. Das—The Story of Bengal's Self-expression : Prithwis Chandra Roy, Pp. 41-42

'শিখগুরু ও শিখজাতি' পুস্তকের ভূমিকা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সখারাম গণেশ দেউস্করের রচিত গ্রন্থগুলি সে যুগের জাতীয়-ভাবোদ্দীপ্ত যুব-মানসে এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। শিবাজী উৎসবের মুখ্য ও গৌণ প্রেরণা মারাঠা ইতিহাসের দিকে বাঙালী গবেষকদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছিল। পরবর্তীকালে এ বিষয়ে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের ইংরেজি ও বাংলা রচনাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিবাজী উৎসবের দুটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে—প্রথমত, অতীত ইতিহাস ও জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অনুরক্তি; দ্বিতীয়ত, বীরপূজার উদ্দীপনা। এই বীরপূজার ও অতীত ইতিহাসের শ্রদ্ধাবিগলিত অনুসন্ধানের ভিতর দিয়ে বাঙালী তার জাতীয় গৌরবের বিস্মৃতপ্রায় কাহিনীকে খুঁজে পেয়েছে। বাঙালীর 'বার ভুঁইয়া' যাঁরা শুধু ঐতিহাসিকের গবেষণার মধ্যেই শেষ আশ্রয় খুজে পেয়েছিলেন, আজ তাঁরা রঙ্গমঞ্চের উজ্জ্বল প্রেক্ষাপটে ও অজস্র দর্শকের কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে জীবন্ত হয়ে উঠলেন। অক্ষয় মৈত্রেয়ের 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশিম', নিখিলনাথ রায়ের 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী', 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস', সত্যচরণ শাস্ত্রীর 'ছত্রপতি শিবাজী', টডের 'রাজস্থান' প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙালীর এই বীরপূজার উদ্দীপনাময় মুহূর্তে প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। বাংলার রঙ্গালয়ও এই পূজার মহোৎসবে মেতে উঠেছিল :

"খ্রীষ্ট অব্দ ১৯০৪-০৫। বাংলা জাগিয়াছে। কোনদিন এই অন্নগতপ্রাণ বাঙালীর বাহুতে যে বল ছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া বাঙালী তাহার নিদর্শন খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছে। · বাঙালীর পূর্বপুরুষ, তাহার পিতৃপিতামহ যে একদিন দোর্দণ্ডপ্রতাপ মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আপনার অপহৃত স্বাধীনতাকে শক্তিধর সম্রাটের হাত হইতে ছিনাইয়া আনিয়াছিল, শিক্ষিত বাঙালী যুবক কুস্তির আখড়ার মাটি মাখিতে মাখিতে এখন সেই কথাই আলোচনা করে, বাংলার বারো ভূঁইয়া যে, এই আমাদেরই মত বাঙালীর জাত ভাই, সেই কথা স্মরণ করিয়া বাঙালী যুবক তাহার পৈত্রিক বাঁশঝাড় হইতে বাঁশ কাটিয়া বাঙালীর বাহুবলের পরিচয় স্বরূপ লাঠি খেলায় মাতিয়া উঠে, পল্লীতে পল্লীতে সমিতি, পল্লীতে পল্লীতে সংঘবদ্ধ যুবকের দল।"[৪০]

গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' (১৩১২), 'মীরকাশিম' (১৩১৩), ও

৪০। রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর . অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১০৭।

'ছত্রপতি' (১৩১৪) এই আবহাওয়ার মধ্যেই প্রকাশিত ও অভিনীত হয়। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'প্রতাপাদিত্য' (১৩১০), 'পদ্মিনী' (১৩১৩), 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' (১৩১৩), 'চাঁদবিবি' (১৩১৪) 'নন্দকুমার' (১৩১৪), 'বাংলার মসনদ' (১৩১৭) প্রভৃতি জাতীয-ভাবোদ্দীপক ঐতিহাসিক নাটকগুলিও এই সময়েই রচিত হয়েছিল : অমৃতলাল বসু 'সাবাস বাঙালী'তে (১৩১২) ও 'নবজীবন' (১৩০৮), নক্শা-নাটিকায় স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থন করেছেন। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ' (১৯০৫-এর ৭ই অগস্ট প্রথম অভিনীত) নাটকেও একালের জাতীয় আবেগটিকে প্রকাশ করেন। জাতীয় জীবনের এই উদ্দীপনাময় মুহূর্তে শৌর্য-বীয, ত্যাগ, মহত্ত্ব, দেশপ্রেম, মনুষ্যত্ববোধ, ঔদাযনীতি প্রভৃতি ভাববৃত্তিকে নাটকের উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়ে তোলা হত। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত প্রভৃতি কবি তাদের সঙ্গীতের মাধ্যমে জাতীয় জীবনের এই অসাধারণ লগ্নটিকে মুখর করে তুলেছিলেন। সরলাদেবী শারদীয়া মহাষ্টমার দিনে বীরাষ্টমী ব্রত পালনের আদর্শ প্রচার করেছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রাক্কালের একখানি চিঠি থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের ভাবাবেগস্পন্দিত মনের পরিচয় পাওযা যায়

"আজ নবজীবনেব উন্মাদনায় আমরা আত্মহারা তন্ময হইযা গিয়াছি। বাঙালীর জীবনে আজ একি অমৃতের আস্বাদ। যাহা স্বপ্নের অগোচর, কল্পনাবও অতীত ছিল, আজ সেই বিচিত্র দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া জীবন আমার ধন্য সার্থক হইল, প্রাণ আমার স্নিগ্ধশীতল হইযা জুড়াইযা গেল!... কিন্তু এত আনন্দের ভিতরেও একটা কথা যখন আমার মনে হয়, তখন আমি ত শঙ্কায় উদ্বেগে কিছু ভীত ও চঞ্চল হই।...স্বাভাবিক মনেব আবেগে যদি আমাব মাকে 'মা' বলিয়াই পূজা না করি, যদি পবের দ্বারা আহত না হইলে আমরা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া মাকে মযাদা দিতে না চাই, যদি অকৃত্রিম ভক্তি ও ভালবাসার টানেই মার দৈন্য-ক্লেশ দূর করিতে না পাবি তবে ত ভয় হয—বুঝি বা আমাদের পূজা আন্তরিক নহে।"[৪১]

দ্বিজেন্দ্রলালের এই উক্তির মধ্যে যেমন একটি উচ্ছ্বসিত আবেগ ও ভাব-

---

৪১ কলকাতা থেকে লিখিত চিঠি (৭ই নভেম্বর, ১৯) দ্বিজেন্দ্রলাল দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৩৯১-৩৯২।

বিহ্বলতা আছে, তেমনি তিনি দেশপ্রেমের এই প্রবল জোয়ার সম্পর্কে একটু সংশয়ও প্রকাশ করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের মূলে ছিল বিদেশীর আঘাত। "পরের দ্বারা আহত" হওয়া যে মাতৃপূজার মূল, দ্বিজেন্দ্রলাল তার স্থায়িত্ব সম্পর্কে আশঙ্কাই প্রকাশ করেছেন। কার্জনের বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থাই যে আমাদের জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় জীবনের ভিত্তিভূমিকে সুদৃঢ় করেছে, এ কথা তখনকার কেউ কেউ স্পষ্টই বলেছেন।[৪২] কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল এই আন্দোলন সম্পর্কে যত সংশয়ই প্রকাশ করুন না কেন, দেশ-কালের সেই প্রবল কলধ্বনিতে তাঁরও ভাবতন্ময় চিত্ত আন্তরিকভাবে সাড়া দিয়েছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল তখন ৫নং সুকিয়া স্ট্রীটে ছিলেন। বিরাট এক শোভাযাত্রা চলেছিল। শোভাযাত্রা যখন তাঁর গৃহের কাছে এসেছে "তখন দ্বিজেন্দ্রলাল সেই ভাব-তরঙ্গে ভাসমান হইয়া, একেবারেই প্রকাশ্য রাজপথে নামিয়া আসিয়া স্বয়ং সে-গানে যোগদান করিলেন ; এবং ঊর্ধ্ববাহু হইয়া, মেঘ-মন্দ্রবৎ, মুহুর্মুহু 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে অকস্মাৎ অম্বরতলে ভাব-রোমাঞ্চ সঞ্চারিত করিয়া দিলেন।"[৪৩] দ্বিজেন্দ্র-জীবনীকার বলেছেন যে রাখীবন্ধনের দিন (৩০শে আশ্বিন, ১৩১২) দ্বিজেন্দ্রলাল পশুপতি বসুর গৃহপ্রাঙ্গণে সমবেত জনতার সঙ্গে যোগ দিয়ে স্বরচিত গান গেয়েছিলেন। সেইদিনই তিনি 'কুন্তলীনে'র হেমেন্দ্র বসুর অনুরোধে একটি গান লেখেন। গোলদীঘির একটি সভায় সেই গানটি গাওয়া হয়েছিল।[৪৪]

॥ ১০ ॥

(স্বদেশী আন্দোলনকে যাঁরা সাহিত্যে রূপ দিয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সেই বীরযুগের গৌরবোজ্জ্বল মুহূর্তে বাঙালীর প্রাণৈশ্বর্য যখন আবেগে উচ্ছ্বাসে ও উৎকণ্ঠায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে, দ্বিজেন্দ্রলাল তখন

৪২। "He has built better than he knew ; he has laid broad and deep the foundations of our national life ; he has stimulated those forces which contribute to the upbuilding of nations ;"—[Speeches : Surendranath Banerjee (1908) Vol vi ; Pp 397-8.

৪৩। দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৩৯৮।

। ঐ : ঐ পৃঃ ৩৯৯-৪০০।

তাদের শোনালেন বীরপূজার নূতন আদর্শ। ইতিহাসের কীর্তি-ভাস্বর অধ্যায়গুলির মধ্যে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার যে মৃত্যুহীন স্বাক্ষর বিদ্যমান, দ্বিজেন্দ্রলাল তাকেই ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে রূপায়িত করেছেন। 'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫), 'দুর্গাদাস' (১৯০৬), 'নূরজাহান' (১৯০৮), 'মেবার পতন' (১৯০৮), 'সাজাহান' (১৯০৯) প্রভৃতি রোমান্টিক ঐতিহাসিক নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশী আন্দোলনের যুগের ভাব-বিপ্লবকে মূর্ত করে তোলেন।[৪৫] বাংলা ঐতিহাসিক নাটক রচনার শ্রেষ্ঠ পর্ব বিংশ শতকের প্রথম দশক—জাতীয় জীবনের সেই গরিমাদীপ্ত প্রহরে দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের স্বদেশপ্রেম, ত্যাগব্রত, কর্তব্যবুদ্ধি, আত্মোৎসর্গের মহিমা প্রভৃতি জাতীয় জীবনে নূতন আশার সঞ্চার করেছিল। (জীবনের দুঃখ-বেদনার মর্মান্তিক আঘাতের মধ্যেও তিনি এগিয়ে চলার সঙ্গীত শুনিয়েছেন—মনুষ্যত্ববোধের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন। 'মেবার পতন' নাটকের বেদনা-ম্লান [illegible] পটভূমিকায় চারণীদের সঙ্গীত মনুষ্যত্ব ও আদর্শের গরিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে—চারণীদের সঙ্গীতের মধ্যে নাট্যকারের বলিষ্ঠ আশাবাদই ঝঙ্কৃত হয়েছে :

কিসের শোক করিস ভাই—আবার তোরা মানুষ হ'।
গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই—আবার তোরা মানুষ হ'॥
পরের 'পরে কেন এ রোষ,
নিজের যদি শত্রু হোস ?
তোদের এ যে নিজেরই দোষ—আবার তোরা মানুষ হ'॥)

ঐতিহাসিক নাটক রচনার উপাদানগুলি প্রধানত তিনি মধ্যযুগের মোগল-রাজপুত ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের মোগল-রাজপুত-সম্পর্কিত নাটক রচনার প্রধানতম উপাদান হল টডের রাজস্থানের ইতিহাস। 'তারাবাই' (১৯০৩) নাটকে সর্বপ্রথম রাজপুত বীরপূজার আদর্শ গৃহীত হয়েছিল। 'তারাবাই' নাটকে যার সূচনা, তাই পরবর্তীকালে প্রতাপসিংহ (১৯০৫), 'দুর্গাদাস' (১৯০৬) ও 'মেবার পতন'

৪৫। At such time of the greatest need, these dramas acted like a great inspiration and changed the servile mentality of the people." (Indian Stage, Vol iv) : H. N. Dasgupta.

(১৯০৮) নাটকের মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করেছিল। প্রতাপসিংহের বীরত্ব, দুর্গাদাসের শৌর্য ও মহত্ত্ব, মহবৎ খাঁর আদর্শ, বীরজায়া মহামায়ার তেজোদৃপ্ত ব্যক্তিত্ব নবভাবোদ্দীপ্ত বাংলার মানসলোকে গতি ও শক্তি সঞ্চারিত করেছিল। স্বদেশী-আন্দোলনের সময় ব্যক্তি দ্বিজেন্দ্রের আদর্শনিষ্ঠা ও চারিত্রিক বলিষ্ঠতার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর একটি পত্রাংশ থেকে :

"ক্রমাগত transfer (বদলি) আমাকে যথার্থই যেন অস্থির করে তুলেছে। এত বদলি করছে কেন জান? আমার বিশ্বাস স্বদেশী-আন্দোলনে যোগদান, আর ঐ প্রতাপসিংহ নাটকই তার মূল। কিন্তু কি বুদ্ধি! এমনি একটু হয়রান করলেই বুঝি আমি অমনি আমার সব মত ও বিশ্বাসকে বর্জন করব?"[৪৬]

স্বদেশী-আন্দোলনের উত্তেজনার পটভূমিতে দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলি রচিত হয়। তাঁর অন্যান্য নাটকের মতো ঐতিহাসিক নাটকেরও প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অপূর্ব সঙ্গীত-মন্ত্রে। প্রথম যুগের স্বদেশপ্রেমের কবিতায় ও গানে যে ভাব-সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, তারই পূর্ণতম পরিণতি এই যুগের স্বদেশপ্রেমের সঙ্গীতগুলি। 'আমার দেশ', 'আমার জন্মভূমি', 'ভারতবর্ষ', 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে' প্রভৃতি গানে দেশপ্রেমের উন্মাদনায় সেদিন বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠেছিল। এই গানগুলি তাঁর বিভিন্ন নাটকে সংযোজিত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল যখন গয়ায় ছিলেন সেই সময় আচার্য জগদীশচন্দ্র তাঁর অতিথি হয়েছিলেন। জগদীশচন্দ্রকে তিনি 'মেবার পাহাড়' গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন। সেই গান শুনে জগদীশচন্দ্র বলেন : "আপনার এ গানে আমরা কবিত্ব উপভোগ করিতে পারি, কিন্তু যদি আমি মেবারের লোক হতেম তাহলে আমার প্রাণ দিয়ে আগুন ছুটত। তাই আপনাকে অনুরোধ করি, আপনি এমন একটি গান লিখুন যাতে বাংলার বিষয় ও ঘটনা—বাঙ্গালীর বিষয় ও ঘটনা থাকে।" দ্বিজেন্দ্রলাল তখন তাঁর 'আমার দেশ' নামক সুবিখ্যাত মাতৃবন্দনাটি লেখেন।[৪৭] গয়ার তৎকালীন জজ ছিলেন সুপণ্ডিত ও সাহিত্যরসিক লোকেন্দ্রনাথ পালিত।

৪৬। দেবকুমার রায়চৌধুরীকে লিখিত : দ্বিজেন্দ্রলাল দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৪৬২-৪৬৩।

৪৭। দ্বিজেন্দ্রলাল : নবকৃষ্ণ ঘোষ, পৃঃ ২৩৫।

তাঁর সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য বিষয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক হত। এই গান শুনে তিনিও মুগ্ধ হয়েছিলেন।

অতীত গৌরবের ইতিহাস-চিত্রকে তিনি উদ্‌ঘাটিত করেছেন, দেশের বর্তমান দুরবস্থার কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এইটুকুই যথেষ্ট নয়, আশাবাদী কবির কণ্ঠ এক স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে :

> যদিও মা তোর দিব্য-আলোকে ঘেরে আছে আজ আঁধার ঘোর
> কেটে যাবে মেঘ নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর,
> আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য, মানুষ আমরা নহি ত মেষ।
> দেবি আমার! সাধনা আমার! স্বর্গ আমার! আমার দেশ!

তিনি তার 'ভারতবর্ষ' সঙ্গীতে মৃন্ময়ীকে যেন চিন্ময়ী করে তুলেছেন। দেশ শুধু একটি ভৌগোলিক পরিধি মাত্র নয়—সজীব মাতৃমূর্তি। দ্বিজেন্দ্রলালের গানে দেশমাতৃকার মূর্তিটি মানবীয় রসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে

> জননি! তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা, কত না হর্ষ,
> জগৎপালিনি! জগত্তারিণি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!

দ্বিজেন্দ্রলাল রাজপুত-গৌরবের অতীতের ছবি ফুটিয়েছেন। অনেক দেশপ্রেম-মূলক গানও রাজপুত নরনারীদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। আসলে তিনি রাজপুত জাতির অতীত গরিমার ভিতর দিয়ে নিজেদের কথাই বলেছেন। 'ধন-ধান্যে-পুষ্পে ভরা' গানটি 'শাজাহান' নাটকে চারণ বালকদের দ্বারা গীত হলেও এ যেন বাংলাদেশেরই বন্দনা।[৮৮] দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেমের গানগুলির পশ্চাৎপটে একটি যুগের উন্মাদনা আছে সত্য, কিন্তু এই গানগুলি দেশ ও কালের দাবি মিটিয়েও যে চিরন্তন ও সার্বজনীন ভাবরূপকে ফুটিয়েছে, এ কথা বোধ হয় আরও সত্য। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতগুলিতে

৮৮। "ধন-ধান্য-পুষ্পভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা"—ইহা একটি মহান সঙ্গীত। কবির এই সঙ্গীতে বিশ্বের ধ্যান আছে। ইহা কেবলমাত্র এই বঙ্গদেশকে লইয়া রচিত নয়। ইহা শ্রবণ করিয়া আমি কেবল মুগ্ধ হই না, তুমি মুগ্ধ হও না, আমি যদি আমার দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙালী না হইয়া জন্মগ্রহণ করিতাম, তাহা হইলেও আমার ভাবের সাগরে ঢেউ তুলিত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে দেশভক্তির যে ক্ষীরধারা জন্মলাভ করিয়াছে—দ্বিজেন্দ্রলালের "আমার দেশে" তাহা প্রবাহিত হইয়া পরিপুষ্ট করিয়াছে।" [বিপিনচন্দ্র পাল. অর্ঘ্য, শ্রাবণ, ১৩২০]

জাতি-গঠনের প্রচুর উপাদান আছে। স্পষ্টতায়, বলিষ্ঠতায়, পৌরুষে ও হৃদয়াবেগের তীব্র আলোড়নে তাঁর জাতীয় মহাসঙ্গীতগুলি শুধু তাঁর নিজের কালেই নয়, পরবর্তীকালেও সংগ্রামশীল জাতীয়-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করেছিল।) তাঁর অকৃত্রিম ভাবুকতা ও কাল-সচেতনতা তাঁকে শুধু আকাশ-প্রসারী স্বপ্নলোকে উধাও করে নিয়ে যায় নি, জাতীয় জীবনের অশ্রু-বেদনা আশা-আকাঙ্ক্ষাব বিচিত্র তরঙ্গধ্বনির মাঝখানে নিয়ে এসেছে। আপন কালের কণ্ঠে মন্ত্র দিতে গিয়ে তিনি সর্বদেশের সর্বকালের সারস্বত সাধনার কণ্ঠেই জয়মাল্য দিয়েছেন। আর দেশকে দিয়েছেন নূতন শক্তি, নূতন আশ্বাস। এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীব একটি মন্তব্য প্রণিধান-যোগ্য :

"তিনি স্বজাতিকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, যদি দেশের দৈন্য দূর করতে হয়, তাব জন্য আমাদের মনে ও চরিত্রে যোগ্য হতে হবে, সক্ষম হতে হবে, সবল হতে হবে। আমার বিশ্বাস, তাঁর দেশপ্রীতিব চরম বাণী এই যে 'আবার তোরা মানুষ হ'।"[৪২]

৪২। সবুজপত্র, আষাঢ়, ১৩২৮

দ্বিজেন্দ্র কাব্যপ্রবাহ

বাংলা কাব্যে দ্বিজেন্দ্রলাল একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। অথচ কবিতার ক্ষেত্রে যে তার রচনার পরিধি খুব বড এ কথাও বলা যায় না। "দি লিরিক্স অব দি ইণ্ড" নামক ইংরেজি কাব্যটি বাদ দিলে তাঁর রচিত কাব্য-গ্রন্থের সংখ্যা মাত্র সাতখানি। কিন্তু রচনা-পরিধি বা ভালো কবিতার সংখ্যার উপরেই শুধু দ্বিজেন্দ্রলালের কবিখ্যাতি নির্ভর করে না। বাংলা কাব্যের ভাষায়, ভঙ্গিতে তিনি এমন একটি সুর সংযোগ করেছেন, যা তাঁর কবি প্রতিভার নিজস্ব মৌলিকত্ব ও বলিষ্ঠতার পরিচয় দেয়। আর এক কারণে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিপ্রতিভা বাংলা কাব্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই পর্বের বাংলা সাহিত্যের অধিনায়ক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বয়সে দ্বিজেন্দ্রলালের চেয়ে দু বছরের বড ছিলেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের কবিখ্যাতি লাভ করার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের যশ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[১] ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মে দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু হয়। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ তার 'গীতাঞ্জলি' পর্ব শেষ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর ছ মাস পরেই রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পান। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ কবি-জীবনের প্রথমার্ধ কাল, দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন-পরিধি। উনিশ শতকের শেষ দু দশক থেকেই রবীন্দ্রনাথ কাব্যক্ষেত্রে নিজস্ব মূর্তি নিয়ে দেখা দিয়েছেন। বিহারীলাল, হেমচন্দ্র, অক্ষয় চৌধুরী প্রভৃতি কবির প্রভাব এর পূর্ববর্তী

১। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আর্যগাথা (প্রথম ভাগ) প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ, এই সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিকাহিনী (১৮৭৮), 'বনফুল' (১৮৭৯), 'ভগ্নহৃদয়' (১৮৮১), 'রুদ্রচণ্ড' (১৮৮১), 'বাল্মীকি-প্রতিভা' (১৮৮১), 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮১), 'কালমৃগয়া' (১৮৮২) প্রভৃতি কাব্য ও গীতিনাট্য রচিত হয়। এ ছাড়া 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১) ও 'বৌঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮২) প্রকাশিত হয়।

দশকেও ছিল। সুতরাং বাংলা কাব্যের ইতিহাসে উনিশ শতকের নবম দশক থেকেই রবীন্দ্রনাথের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে। এই কালের কবিদের মধ্যে অল্প-বিস্তর সকলেই রবীন্দ্রকাব্যের ভাবরস ও কাব্যরূপের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। রবীন্দ্রযুগের বাঙালী কবি হয়েও দ্বিজেন্দ্রলাল মানসিক স্বাতন্ত্র্যে ও কাব্য-কলাবিধির অনন্যতায় আর-এক জগতের অধিবাসী। দ্বিজেন্দ্রলালের কোনো কোনো রচনায় যে রবীন্দ্র-প্রভাব নেই এমন কথা বলা যায় না, কিন্তু এই দুই কবির দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই একটি মৌলিক পার্থক্য ছিল।

১৮৫০ থেকে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যে সমস্ত কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, বয়সের দিক থেকে তারা রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমসাময়িক হলেও তাঁদের কাব্যে রবীন্দ্র-কাব্যের প্রভাব একেবারে অলক্ষিত নয়।[২] অপেক্ষাকৃত বর্ষীয়ান কবিদের কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের উৎসাহদাতা, "সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক", কবি-সমালোচক প্রিয়নাথ সেনের বিবিধ মৌলিক ও অনুবাদ কবিতায় রবীন্দ্র-কাব্যের একটি সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা হয়। কবি হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৬-১৮৯৭) যদিও হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের যুগের কৃত্রিম ক্লাসিক কাব্যধারার কবি ছিলেন, তথাপি তার কোনও কোনও কবিতায় রবীন্দ্র-কাব্যানুরাগী আত্মমুগ্ধ রোমান্টিক ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে তাঁর 'চিন্তা' কাব্যটির কথা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়।[৩] মানকুমারী বসু রবীন্দ্রনাথের চেয়ে চার বছরের বড় ছিলেন। কৃত্রিম ক্লাসিক যুগের কাব্যাদর্শ তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি—তবুও তাঁর 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' (১৮৯৩) ও 'কনকাঞ্জলি'-র (১৮৯৬) কোন কোন কবিতায় রবীন্দ্র-কাব্যের গীতিধর্ম ও আত্মগত ভাবানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে।

২। প্রিয়নাথ সেন (১৮৫৩-১৯১৬), গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮), দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৫-১৯২০), গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৭-১৯৩২), বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৬-১৯৩২), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০), অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯) প্রভৃতি কবি।

৩। "চিন্তার কোন কোন কবিতার গীতি উচ্ছ্বাস আরও অকৃত্রিমভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ক্বচিৎ এই সকল কবিতায় যেন রবীন্দ্রনাথের কৈশোর রচনার ধ্বনি পাওয়া যায়।"

—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) : সুকুমার সেন, পৃঃ ৪৪৮।

বিহারীলাল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা কাব্যের মানসলোক এক আপাতবিরোধী ভাবের দ্বন্দ্বে আন্দোলিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে যথার্থ ক্লাসিক্যাল যুগ গড়ে উঠতে পারে নি। তবু একমাত্র মধুসূদনের কাব্যেই ক্লাসিক কবি-ভাবনার সমুন্নতি লক্ষ্য করা যায়। তাই আমাদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ বাঙালী জীবনের মধ্যে তিনি একটি উদাত্ত-গম্ভীর সুর-সংযোগ করেছিলেন। কিন্তু মধুসূদনের কাব্যসাধনায় যথার্থ উত্তর-সাধক কেউ ছিলেন না। মধুসূদনের কবি-কল্পনার সমুন্নতি হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্রের পক্ষে অনুকরণ করা সম্ভব ছিল না। কারণ বাংলা কাব্যে ক্লাসিক আদর্শের নিতান্ত শৈশব লগ্নেই রোমান্টিক ভাবাদর্শের প্রবল-প্রবাহ তার ভিত্তিমূলকে পর্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত করেছে। এমন কি মধুসূদনের কবি-মানসের মধ্যেই ক্লাসিক আদর্শের সঙ্গে একটি রোমান্টিক ভাবনা জড়িত ছিল। হেম-নবীনের কাব্যে এই দুই কোটির মানস-প্রবণতা এক কৃত্রিম ক্লাসিক ভাবাদর্শের সৃষ্টি করেছিল। ইংরেজি ও ফরাসি কাব্যের সঙ্গে তুলনা করলে বলতে হয় যে, বাংলা কাব্যে প্রকৃতপক্ষে কোনও ক্লাসিকাল যুগ গড়ে ওঠে নি। মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের গীতি-কবিতা এমন কি আখ্যায়িকা-কাব্যের মধ্যেও ব্যক্তিমানসের গীতিস্পন্দী লীলা-লহরী অলক্ষ্যগোচর নয়। বিহারীলাল সেই আত্মগত ভাবনার ধ্যানলীলাকেই নতুন আর এক মন্ত্রে আরতি করেছেন।

তথাপি ক্লাসিক-রোমান্টিক কাব্যানুভূতির এক মিশ্র-মানস রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী বাংলা কাব্যের মানস-পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছে। 'মহিলা' কাব্যের কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-৭৮), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬), অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫০-৯৮), ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬১-১৮৯৮), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৬-১৯৩২) প্রভৃতি রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক বর্ষীয়ান, বর্ষীয়সী কবিদের মধ্যে কৃত্রিম ক্লাসিক কাব্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। হেম-নবীনের আদর্শে গাথা-কাব্য ও আখ্যায়িকা-কাব্য রচিত হলেও তাঁদের কাব্যে রোমান্টিক গীতিধর্মিতার প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। বাংলা কাব্যের কৃত্রিম ক্লাসিক মানসিকতা ও কাব্যরীতি যে ধীরে ধীরে রোমান্টিক গীতিকবিতার দিকে অবশ্যম্ভাবী পরিণতির পথে চলেছিল, তার ইতিহাস এই যুগের বাংলা কবিতার গতি-প্রকৃতির মধ্যে সুচিহ্নিত হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম দিকের কবিতায় অক্ষয়চন্দ্রের কবিতার দ্বারা প্রভাবিত

হয়েছেন।[৪] স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম দিকের গাথা-কবিতায় কৃত্রিম ক্লাসিক পর্বের যুগোচিত নির্দেশ সুস্পষ্ট, কিন্তু অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের কবিতায় ও গানে রবীন্দ্র-প্রভাবিত গীতিধর্মিতা ও সূক্ষ্ম সংবেদনশীল ভাবানুভূতির প্রাধান্য লক্ষণীয়। কৃত্রিম ক্লাসিক কাব্য-সংস্কার ও আত্মমুগ্ধ রোমান্টিক গীতিপ্রবণতা—এই দুয়ের বিচিত্র আকর্ষণে এই যুগের বাংলা কাব্যের ভিত্তিমূল গড়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের বর্ষীয়ান সমসাময়িকদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেনই (১৮৫৫-১৯২০) বোধ হয় সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সচেতনভাবে প্রভাবিত হন। দেবেন্দ্রনাথ রূপোল্লাসের কবি—তাঁর কবিতা এক অধীর উচ্ছ্বসিত রূপকাতরতার স্পর্শে বর্ণময় হয়ে উঠেছে।[৫] দেবেন্দ্রনাথের কাব্যকলাবিধিতে মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের প্রভাব পরিস্ফুট—'অপূর্ব বীরাঙ্গনা' ও 'অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের নামকরণ ও ভাবাদর্শ মধুসূদনের কাব্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এ সম্পর্কে কবি-সমালোচক মোহিতলালের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

"বাংলা পয়ারের মধ্যে যে উদার ও বৃহত্তর সঙ্গীত সুপ্ত ছিল, যাহার আকস্মিক ও অদ্ভুত উদ্বোধনে মেঘনাদবধ-কাব্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, বঙ্গ-ভারতীর সেই সপ্তস্বরা হইতে দেবেন্দ্রনাথ ইহাকে লাভ করিয়াছিলেন। এখানে তিনি বিশেষভাবে মাইকেলের দ্বারা প্রভাবান্বিত। মাইকেলের অনুপ্রাসের ভঙ্গিও তাঁহার কাব্যে প্রচুর আছে ('নতজানু সাগশিরে অতনু, কুহকা')। তাঁহার মুখেই মেঘনাদবধ আবৃত্তি শুনিয়া আমি বাংলা অমিত্রাক্ষরের মাধুরী প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলাম। তাঁহার কাব্য-সাধনায়, মাইকেল ও হেমচন্দ্র দুই কবির প্রভাব স্পষ্ট লক্ষিত হয়। 'অপূর্ব বীরাঙ্গনা'র উৎসর্গ-কবিতায় তিনি মহাকবি মাইকেলকে ভক্তি-গদগদভাবে 'গুরু-নমস্কার'

৪। "অক্ষয়চন্দ্রের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, নবীনচন্দ্র সেন, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আখ্যায়িকা-কাব্য ও গাথা কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।"

—বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) সুকুমার সেন, পৃঃ ৪৪০।

৫। চিরদিন চিরদিন রূপের পূজারী আমি—
রূপের পূজারী!
সারাসন্ধ্যা সারানিশি রূপ বৃন্দাবনে বসি
হিন্দোলায় দোলে নারী আনন্দে নেহারি। (অশোক গুচ্ছ)

করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের কাব্য-প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার কোথায় সগোত্রতা ছিল বলা কঠিন—বোধ হয়, হেমচন্দ্রের ভাষা ও ভাবের সাবল্য এবং কাব্যের নিরঙ্কুশ গতি-প্রাবল্য তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল।"[৬]

কৃত্রিম ক্লাসিক যুগের কাব্যরীতির প্রতি দেবেন্দ্রনাথের একটি গভীর শ্রদ্ধা সত্ত্বেও রবীন্দ্র-যুগের সেই উষালগ্নে কবি-কনিষ্ঠের কাব্যপ্রভাবও তাঁর মানসলোককে বর্ণ-রঞ্জিত করে তুলেছিল। দেবেন্দ্রনাথের সনেটে মধুসূদনের সনেটের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল'-এর প্রভাবই বেশি পড়ছে। রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের সনেট পাঠ করে বিমুগ্ধ কবি দেবেন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল

পাঠ করি, সাধ যায়, আলিঙ্গিয়া রঙ্গে
প্রিয়ারে, বাসন্তী নিশি জাগি সকৌতুকে।

রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'সোনার তরী' কাব্যখানি 'কবি-ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ সেনের কর-কমলে' সমর্পণ করে পরস্পরের প্রীতি-বন্ধনকে দৃঢ়তর করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় রূপ-পিপাসা ও বিমুগ্ধ সৌন্দর্য-তৃষ্ণার সঙ্গে বাঙালী গার্হস্থ্য-জীবনের প্রীতিমুগ্ধ রসাস্বাদন একত্র সঙ্গে জড়িত ছিল। বাগবৈদগ্ধ্য, ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক ইংরেজি বাংলা শব্দ মিশ্রিত বাক্যাংশ তার কিছু কিছু কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। লিরিসিজম ও আত্মবিভোরতার সঙ্গে একটি সচেতন সামাজিক মনেরও পরিচয় পাওয়া যায়।[৭]

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী'র (১৮৫৭-১৯২২) চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'অশ্রুকণা' সম্পাদনা করেন অক্ষয়কুমার বড়াল। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের 'পরিশিষ্টে' অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর একটি কবিতাও প্রকাশিত হয়। গিরীন্দ্রমোহিনী স্বর্ণকুমারী দেবীর বান্ধবী ছিলেন। এই তিনটি প্রসঙ্গ থেকেই গিরীন্দ্রমোহিনীর কবি-মানসের স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব। অক্ষয় চৌধুরী-প্রভাবিত গাথা-কাব্য ও পূর্ববর্তী কাব্যধারার কৃত্রিম ক্লাসিক সংস্কার তার কবিতার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। অন্যদিকে রবীন্দ্র-কাব্যের কিছু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবও

৬। দেবেন্দ্রনাথ সেন আধুনিক বাংলা-সাহিত্য, পৃঃ . ।

৭। 'অপূর্ব নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের কোন কোন কবিতা দ্রষ্টব্য।

ছিল।[৮] প্রত্যক্ষ সংসারের ছোট ছোট কথা ও তাঁর নানামুখী অভিজ্ঞতা, মেয়েলি মনের মৃদু অথচ অন্তরঙ্গ অনুভব, পুরাতন কবিপ্রসিদ্ধিগুলির দিকে আকর্ষণ তাঁর কবিতার কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ। সহজ স্বভাবোক্তির কবিতাগুলি অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি নিজের জীবনের সুখ-দুঃখের কথা খুব সরল ও সহজ করে বলেছেন, তার সঙ্গে যুগোচিত একটি সামাজিক মনও তাঁর ছিল। এই যুগের আরও দুজন মহিলা-কবি মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩) ও কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) যুগ-জীবনের আপাত-বিরোধী ভাবধারায় আন্দোলিত হয়েছেন। অভিমন্যুবধ বৃত্তান্ত নিয়ে মানকুমারীর 'বীর-কুমার বধ' কাব্য (১৩১০) অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত হয়েছিল। সুতরাং মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের যুগ-মানস তাঁর মনোজীবনের উপর এক দীর্ঘ-বিস্তৃত ছায়া ফেলেছে। দেশপ্রেমমূলক, পৌরাণিক ঘটনার ব্যাখ্যামূলক, প্রকৃতিবিষয়ক ও গার্হস্থ্য-জীবনাশ্রয়ী কবিতায় এই যুগের বৈশিষ্ট্য ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। 'কাব্য-কুসুমাঞ্জলি' ও 'কনকাঞ্জলি' কাব্যদ্বয়ে রবীন্দ্রানুসারী আত্মগত ভাবনার সুর আছে। মানকুমারী বসুর চেয়েও কামিনী রায়ের কাব্যে এই যুগের যুগ্ম-ভাবধারার পরিচয় আরও বেশি পরিস্ফুট হয়েছে। তার প্রথম কাব্য 'আলো ও ছায়া'র (১৮৮৯) ভূমিকা লেখেন কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কামিনী রায়ের কাব্যের ভূমিকাটি যে শুধু হেমচন্দ্রের, তাই নয়, হেমচন্দ্রের কাব্য সংস্কারকে তিনি কোনো দিনই ভালোভাবে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, অথচ রবীন্দ্র-প্রবর্তিত নূতন কাব্যধারাকেও তিনি বর্জন করতে পারেন নি। আপাত-দৃষ্টিতে এ প্রভাবকে একই সঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণমেরুর যুগপৎ আকর্ষণ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এই পর্বের বাংলা কাব্যের ইতিহাসের এই ছিল সাধারণ লক্ষণ। কৃত্রিম ক্লাসিক কাব্যের বিচিত্র ইন্দ্রধনুর রং ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছিল, অথচ সর্ববন্ধনমুক্ত রোমান্টিক কল্পনার অভিসার তখনও কুণ্ঠিত,

---

৮। "গিরীন্দ্রমোহিনীর শ্বশুরালয়ে সাবিত্রী লাইব্রেরীকে কেন্দ্র করিয়া যে সাহিত্য গোষ্ঠী জমিয়া উঠিয়াছিল তাহার একজন প্রধান সভ্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই সূত্রে অনুমান করা যায় যে রবীন্দ্র কাব্যের পরোক্ষ প্রভাব ছাড়াও হয়ত গিরীন্দ্রমোহিনীর কোন কোন কবিতা রবীন্দ্রনাথের হাতে সংস্কার লাভ করিয়াছিল (অশ্রুকণার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।"—বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড) সুকুমার সেন, পৃঃ ৫৩২।

অর্ধব্যক্ত ও দ্বিধাগ্রস্ত। বিহারীলালের পরবর্তী কাল থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী ও রবীন্দ্র-সাময়িক কবিরা এই ভাব-সন্ধিলগ্নের মানস-সন্ততি।

॥ ২ ॥

আলোচ্য পর্বে ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের (১৮৫৫-১৯১৮) নামও উল্লেখযোগ্য। এই যুগের অন্যান্য কবির সঙ্গে একটি বিষয়ে তাঁর মিল আছে —সেটি হল গার্হস্থ্য-জীবনাশ্রয়ী দাম্পত্য-প্রেম। দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের মতো গোবিন্দ দাসও মর্ত্যের গৃহিণীকেই মিলনের আনন্দে ও বিরহের বেদনায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের সঙ্গে গোবিন্দ দাসের দুটি বিষয়ে পার্থক্য ছিল—প্রথমত, তাঁর প্রেমের স্বরূপ ছিল স্বতন্ত্র, দ্বিতীয়ত, তাঁর প্রকাশরীতিও ছিল স্বতন্ত্র। নারীপ্রেমের মধ্যে একটি সম্ভোগ-তীব্রতা ও দেহ-সর্বস্বতা আত্মপ্রকাশ করেছে—"আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।"—প্রেম ও যৌবনস্বপ্নের কবিতা ছাড়া জাতীয়তা-বোধ, পারিবারিক জীবন, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, ঈশ্বর-বিষয়ক—নানা শ্রেণীর কবিতা তিনি রচনা করেছিলেন। গোবিন্দ দাসের কবিতায় আন্তরিক অনুভূতি ও সহজ কবিত্বশক্তির অভাব ছিল না। কিন্তু তিনি কবিতা রচনায় যত্নকৃত কলাকৌশল সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। তাঁর ভাষা ও বাগ্‌ভঙ্গিতে তাই ঋজুতা ও বলিষ্ঠতা ছিল, কিন্তু তার কোনো সুমার্জিত শিল্পরূপ ছিল না। গোবিন্দদাসের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের কোনো প্রভাব পড়ে নি। প্রাচীন বাংলার মঙ্গলকাব্যের কবিদের সঙ্গে কোথায় যেন তাঁর মানসিকতার একটি মিল আছে। ঈশ্বর গুপ্ত ও কবিওয়ালাদের সহজ বাগ্‌বৈদগ্ধ্যও কখনো কখনো তাঁর কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় যেমন দুই বিপরীত সভ্যতার সংঘর্ষের ফলে তীব্র বিজাতীয় বিদ্বেষ ব্যঙ্গকবিতার আকারে প্রকাশিত হয়েছিল, গোবিন্দদাসের কবিতায়ও সেই পদ্ধতিই অনুসৃত হয়েছে —কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর ব্যঙ্গের তীব্রতা যেমন জ্বালাময়, তেমনি এর প্রকাশের মধ্যে আছে এক নির্মম কঠিন শববৎ ঋজুতা! কৃত্রিম ক্লাসিক ধারার সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের যুগাদর্শ ও মঙ্গলকাব্যের কবিদের মতো স্বগ্রাম, পত্নী-পুত্র-কন্যা-পরিবৃত সংসার, আত্মীয়পরিজন, সামাজিক উৎপীড়ন প্রভৃতি লৌকিক ও ঘর-গৃহস্থালির চেতনা তাঁর কাব্যে পরিস্ফুট!

অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯) এ যুগের আর একজন শক্তিশালী কবি। অক্ষয়কুমার ছিলেন বিহারীলালের কবি-শিষ্য। বিহারীলালের প্রত্যক্ষ প্রভাবের মধ্যেই অক্ষয়কুমারের ভাবজীবন পরিবর্ধিত হয়েছিল। অক্ষয়কুমারের প্রথম তিনখানি কাব্যগ্রন্থ—'প্রদীপ' (১৮৮৪), 'কনকাঞ্জলি' (১৮৮৫) ও 'ভুল' (১৮৮৭) বিহারীলালের জীবিতকালেই রচিত হয়। বিহারীলালের মৃত্যুর পর তাঁর এই প্রতিভাবান কবি-শিষ্য তাঁকে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছিলেন, তাতে শুধু বিহারীলালের কবিমানসই উদ্‌ঘাটিত হয় নি, বড়াল কবির অন্তর্জগৎও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে :

> বুঝায়েছ তুমি—তব তুচ্ছ যশ।
> কবিতা চিন্ময়ী, চির সুধা-রস,
> নারী কত মহীয়সী।
> পূত ভাবোল্লাসে মুগ্ধ দিক-দশ
> ভাষা কিবা গরীয়সী।

অক্ষয়কুমার বিহারীলালের কাব্যমন্ত্রটিরই অনুসরণ করে কাব্যজগতে পদক্ষেপ করেন। বিহারীলালের কাব্যে ভাবসাধনাই সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, অনেক ক্ষেত্রে এর কাব্যরূপ দুর্বল ও শিথিলবন্ধ। এক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার তাঁর কাব্যগুরুকে অতিক্রম করেছেন। প্রথম থেকেই তাঁর কাব্যরীতির একটি সংযত-সংহত-সুপরিমার্জিত রূপ ছিল। এক অপূর্ব স্বপ্নালস্য তাঁর কবিজীবনের প্রথমার্ধকে লাবণ্যমণ্ডিত করে তুলেছে। এই যুগে তাঁর কাব্যের একটি 'বাস্তবে-স্বপনে দ্বন্দ্ব' পরিস্ফুট হয়েছে। এই দ্বন্দ্ব-মথিত বেদনাকেই তাঁর রোমান্টিক কবি-ভাবনা জয়যুক্ত করে তুলেছে—কারণ প্রেমের পরিতৃপ্তি নয়, প্রেমের অধীর আকাঙ্ক্ষা ও পিপাসাই তাঁর কাব্যে বড় হয়ে উঠেছে। অক্ষয়কুমার তাঁর 'ভুল' কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন। 'উপহার' কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধন করে কবি তাঁর ভাব-জগতের এক অপূর্ব-সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন। অক্ষয়কুমারের চতুর্থ কাব্য 'শঙ্খ' (১৯১০) থেকেই তাঁর কবি-জীবনের একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। স্ত্রী-বিয়োগ-বেদনার সঙ্গে পারিবারিক ও গার্হস্থ্যজীবনের ছবিও এই কাব্যটিতে ফুটে উঠেছে। অক্ষয়কুমারের শেষ কাব্য 'এষা'র (১৯১২) ভূমিকা

১। 'কনকাঞ্জলি'র উৎসর্গ কবিতা।

হিসেবে বিপিনচন্দ্র পাল এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে কাব্যটির উচ্চতর তত্ত্বমূল্য নির্দেশ করার চেষ্টা করেছিলেন। মোহিতলালও 'এষা'র একটি উচ্চতর সাহিত্যিক মূল্য নির্দেশ করেছেন।[১০] কিন্তু 'এষা' কাব্যে সাধারণ একজন বাঙালী গৃহস্থ-বধূর মৃত্যুকাহিনী তার চিরপরিচিত ঘর-গৃহস্থালির পরিবেশের মধ্যে দেখানো হয়েছে। 'এষা' কাব্যে যেন কবিত্বের চেয়ে তত্ত্বদৃষ্টি বড় হয়ে উঠেছে।[১১] দেবেন্দ্রনাথের ভাষায় আছে বর্ণের উল্লাস ও অতি-ভাষণের অপচয়, কিন্তু অক্ষয়কুমারের ভাষায় আছে মর্মর মসৃণ সৌকুমার্য। অক্ষয়কুমারের কল্পনাশক্তি খুব বড় নয়, দেশ-কাল-অতিক্রমকারী অশরীরী সৌন্দর্যানুভূতির অগ্রগতি গৃহিণী-পুত্র-কন্যা-পরিবৃত পরিচিত সংসারের লৌকিক সীমায় রুদ্ধ হয়েছে। তথাপি সমকালীন কবিদের মধ্যে অক্ষয়কুমারের সাধনাতে সে যুগের ভাব সাধনার পূর্ণতর অভিব্যক্তি ঘটেছে। বাংলা কাব্যের রোমান্টিক স্বপ্ন-বাসনা পূর্ব-দিগন্তে যে বিচিত্র ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করেছিল, অক্ষয়কুমারের কবিমন সেই পুলকিত রসাবেশের বিনম্র-প্রহরে তাতে সাড়া দিয়েছিল। অক্ষয়কুমারের কবি-প্রতিভা বাংলা কাব্যে রোমান্টিক অভীপ্সাকে সুনিশ্চিত করে তুলেছে।

সাহিত্যের মধ্যে প্রবহমান ধারাবাহিকতা থাকে। এইজন্য যে কোনো সাহিত্যিকের মনোজীবন আলোচনার পক্ষে পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাদের সংযোগসূত্র আবিষ্কার করা সমালোচকদের অবশ্য কর্তব্য। রবীন্দ্র-শাসিত বাংলা কাব্যের ইতিহাসের সঙ্গেও পূর্ববর্তী সাহিত্যের একটি সংযোগসূত্র আছে। এই পর্বের কবিদের মধ্যে রবীন্দ্র-কাব্যের সংস্কারই ছিল প্রবলতম শক্তি, কিন্তু সব কবিই যে একই ভাবে এবং একই পরিমাণে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, এ কথা বলা যায় না। এমনকি রবীন্দ্র-মানসের প্রতিকূল উপাদানও কারো কারো মনে সক্রিয় ছিল। রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী উনিশ-

১০। অক্ষয়কুমার বড়াল আধুনিক বাংলা-সাহিত্য, পৃঃ ১৭৭-১৮৮।

১১। "...তাঁহার শোকক্লিষ্ট হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি হিসাবে সুন্দর হইলেও কবিত্ব হিসাবে এই কাব্যখানিকে তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা বলা যায় না, কারণ এই রচনায় অক্ষয়কুমারের কাব্যের চেয়ে কবি অক্ষয়কুমার বড়। Browning-এর ভাষা কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া প্রয়োগ করিলে বলা যায় যে, he has gained the man's sorrow, but lost the artist's joy."—অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতা. নানানিবন্ধ সুশীলকুমার দে, পৃঃ ২৮৪।

শতকীয় বাংলা কাব্যের মধ্য থেকেই তাঁরা সচেতনভাবে বা অজ্ঞাতসারে সেই উপাদান সংগ্রহ করেছেন। রবীন্দ্রানুসারী রোমান্টিক কবি ভাবনা যেমন আত্মতন্ময় তেমনি সূক্ষ্ম-সংবেদনশীল কল্পনায় ও প্রগাঢ় অনুভূতিতে ভাব-গভীর। কলাবিধি ও শিল্পোৎকর্ষের ললিত-মধুর সুষমা এই কাব্যের গীতি-উৎসকে নিঃসংশয়িত করে তুলেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমবয়স্ক অথবা কিছু বর্ষীয়ান কবিদের কাব্যে অল্প-বিস্তর দ্বিধা-সংশয়ও লক্ষ্য করা যায়।

ঊনিশ শতকের বাংলা কাব্যে যে নবযুগ সঞ্চারিত হয়েছে, তার মূলে ছিল প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংঘাত। এই সংঘাতের ফল দ্বিমুখী। এই ভাব-জীবনের মন্থনলীলায় যেমন একদিকে রোমান্সের উৎসমুখ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে এই বিপরীত সংঘাতের ফলে হাস্যরস ও বিদ্রূপাত্মক সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের মোহ-মদিরা যেমন রুদ্ধকক্ষ বাঙালী জীবনের পরিধিকে প্রসারিত করেছে, তেমনি এই অপরিচিত ও প্রবল-প্রতিপক্ষের আকস্মিক আবির্ভাবকে সে বিদ্রূপাত্মক সাহিত্যের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক কবিতার অন্তরালে এই জাতীয় মনোভাবই সক্রিয় ছিল। 'নববাবু বিলাস', 'আলালের ঘরের দুলাল', ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' প্রভৃতি গ্রন্থগুলিও এই নবজাগ্রত নাগরিক হাস্যরসের উদাহরণ। নূতনের প্রতি এক অন্ধ আকর্ষণে বাঙালী সমাজের ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়েছিল, অন্যদিকে বিদেশী শাসনের নানা অসঙ্গতিও উৎকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। তার ফলে কোনো কোনো সাহিত্যিক রোমান্সের দুর্নিরীক্ষ্য স্বপ্নলোকে যাত্রা না করে দৈনন্দিন জীবনকেই কৌতুক-বিদ্রূপের বাগ্‌-বৈদগ্ধ্যে উজ্জ্বল করে তুলেছেন।

আপাতদৃষ্টিতে রোমান্টিক মনোভাবের সঙ্গে বিদ্রূপাত্মক সাহিত্যের একটি অহি-নকুল সম্বন্ধ আছে মনে হয়, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক সাহিত্যের পাশে সামাজিক নকশা ও বিদ্রূপাত্মক সাহিত্যের ধারাটিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে—এই দুটি আপাত-বিরোধী স্রোতোরেখা একই উৎস থেকে উৎসারিত হয়েছে। আখ্যায়িকা-কাব্য রচয়িতারাও এই বিদ্রূপাত্মক সাহিত্যকে আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন। তাই 'বৃত্রসংহারে'র মতো গুরুগম্ভীর কাব্যের রচয়িতা হেমচন্দ্রও লঘুকৌতুক ও সামাজিক বিদ্রূপের কবিতা

লিখেছিলেন। হালকা ছন্দে ও কথ্যভাষায় লেখা হেমচন্দ্রের এই শ্রেণীর কবিতা একটি স্বতন্ত্র রসমূল্যের অধিকারী। গুরুগম্ভীর বিষয় ও রচনারীতির ব্যঙ্গ-অনুকৃতি বা প্যারডিও এই পর্বে রচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে জগদ্বন্ধু ভদ্রের "ছুচ্ছুন্দরী বধ কাব্যে'র (১২৭৫) নাম উল্লেখযোগ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের অসঙ্গতির রন্ধ্রপথ থেকে প্রচুর পরিমাণে হাস্যরসের ধারা উৎসারিত হয়েছে। এই পর্বের কুশলী হাস্যরসিক ছিলেন 'পঞ্চানন্দ' ছদ্ম-নামধারী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আপন কালের প্রতিটি অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতিকে তীক্ষ্ণরূপে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। নারীপ্রগতি ও সমাজসংস্কারের মধ্যে যে সামাজিক ভাবসাম্যের অভাব ঘটেছিল, কেশবচন্দ্রের ধর্মমতের মধ্যে যে ভাবালুতা ও আতিশয্য ছিল, বৈদেশিক শাসনে বিচারের নামে যে প্রহসনের সৃষ্টি হয়েছিল, দেশপ্রেমের নামে যে শূন্যগর্ভ ফাঁকা বুলি প্রাধান্য লাভ করেছিল, ইংরেজি সভ্যতার ব্যর্থ অনুকরণের ফলে বিশেষ একটি শ্রেণীর মধ্যে যে উৎকট অসামঞ্জস্য ফুটে উঠেছিল—ইন্দ্রনাথ তাঁর অব্যর্থলক্ষ্য বিদ্রূপ-শরাঘাতে তাকে জর্জরিত করে তুলেছিলেন। রাজনৈতিক জীবনের দ্বিমুখী অসঙ্গতিকেই তিনি নির্মমভাবে বিদ্রূপ করেছেন। একদিকে বৈদেশিক শাসনের ত্রুটি-বিচ্যুতি, অন্যদিকে দেশপ্রেমের নামে "শূন্যগর্ভ ভাব-বিলাস" ইন্দ্রনাথের "ভারত-উদ্ধার কাব্য" ও "ভলেন্টিয়ারী কাব্যে"র বিষয়বস্তু। এই দুটি কাব্য সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

"গুরুগম্ভীর ভাষার সঙ্গে লঘুভাবের বৈপরীত্য-মূলক সমাবেশ অনিবার্য হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছে। এ যেন মাইকেলের ছন্দের বায়ুব্যস্ফীতির মধ্যে উপহাসের সূচ ফুটাইয়া উহাকে চুপসাইয়া দেওয়া। এই অনুকরণের মধ্যে হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভাবন ও বিষয় ও রীতির মধ্যে সামঞ্জস্য-কৌশলের সঙ্গে সময় সময় উচ্চাঙ্গের কবি-কল্পনার সংমিশ্রণ বিসদৃশতার চরম সীমা স্পর্শ করিয়াছে।"[১২]

রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৮৬১-১৯০৭) ছিলেন ইন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য। ইন্দ্রনাথের কাছ থেকেই

১২। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্ল পাল সম্পাদিত 'সমালোচনা সাহিত্য', পৃঃ ৩১-১১।

তিনি বিদ্রূপাত্মক সাহিত্যরচনার প্রেরণা লাভ করেন।[১৩] দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশে' তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। ছদ্মনাম নিয়ে তিনি 'অবতার' প্রহসনে (১৮৮১) কেশবচন্দ্রকে কটাক্ষ করেছিলেন। প্রহসনটিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'কিঞ্চিৎ জলযোগে'র (১৮৭২) প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়, কিন্তু ইন্দ্রনাথের রচনার প্রভাব ছিল তার চেয়েও বেশি। এরও আগে তিনি 'সভ্যতাসোপান' (১৮৭৮) প্রহসন ও 'বঙ্গীয় সমালোচক' (১৮৮০) নামক ব্যঙ্গকাব্য রচনা করে বিদ্রূপাত্মক সাহিত্য রচয়িতা হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমলের' কয়েকটি কবিতা নিয়ে তিনি 'মিঠেকড়া' (১৮৮৮) নামে এক প্যারডি-কাব্য রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এর কোনো উত্তর দেন নি, শুধু 'নিন্দুকের প্রতি' কবিতাটি রচনা করেছিলেন। কালীপ্রসন্নের 'মিঠেকড়া' সম্পর্কে আর একটি প্রসঙ্গও এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন কাব্যবিশারদের এই ব্যঙ্গকাব্যের বিদ্রূপাত্মক জবাব দিয়েছিলেন ১২৯৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যার 'সাহিত্য' পত্রিকায়। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের এই পর্বে একই সময়ে রবীন্দ্র-বরণ ও রবীন্দ্র-বিরোধের ধারা পাশাপাশি চলেছিল।

কাব্যরীতি ও সাহিত্যাদর্শ সম্পর্কিত রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র বিরোধের অনেক আগেই রবীন্দ্র-কাব্যাদর্শের বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ ছিল। রবীন্দ্র-কাব্যের বিরুদ্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের অস্পষ্টতার অভিযোগ আনার বহু পূর্বে এই জাতীয় অভিযোগ-বাণী ধ্বনিত হয়। 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের বিরুদ্ধেও অস্পষ্টতার অভিযোগ করা হয়েছিল। বিরুদ্ধবাদীরা মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের 'ফুল্লরার বারমাস্যা'র উদাহরণ উদ্ধৃত করে সার্থক কাব্যের নমুনা দিয়েছিলেন। এই সম্পর্কে রবীন্দ্র-জীবনীকার বলেছেন :

"কড়ি ও কোমল প্রকাশিত হইবার পর যে-সব সমালোচনা হয়, কবি তাহার জবাব দেন পরোক্ষভাবে। বিশুদ্ধ রস ও রীতির মাপকাঠিতে তিনি সাহিত্যকে বিচার করিতে চেষ্টা করিলেন, ধর্মনীতি বা প্রাচীনরীতির দিক দিয়া নহে। কবি 'কাব্যে স্পষ্ট ও অস্পষ্ট' শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখিলেন যে সাধারণত দেখা যায় একদল লোক স্পষ্ট কবিতা না পাইলে কবির কবিত্ব

১৩। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্যসাধকচরিতমালা (ষষ্ঠ খণ্ড) পৃঃ ৭২।

স্বীকার করেন না। স্পষ্টকাব্যের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক এবং সমালোচক কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলকাব্য হইতে নিম্নপংক্তিদ্বয় দুঃখবর্ণনার চরমপ্রকাশ জ্ঞানে উদ্ধৃত করিয়া রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ কাব্যের অস্পষ্টবাদীদের সম্মুখে কাব্যসৌন্দর্যের আদর্শ স্থাপন করিলেন।

দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান॥

এই পংক্তিদ্বয় সম্বন্ধে উক্ত লেখক বলিলেন, 'সার্থক কবিত্ব, সার্থক কল্পনা, সার্থক প্রতিভা।' রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টকাব্যবাদীর এই উচ্ছ্বাস উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন—কোনো দুঃখ অতিশয় স্পষ্ট হইলেই কবিতা হয় না। তাহা হইলে 'তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে' ইত্যাদিও কবিতা হইত।"[১৪]

রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যে স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট' প্রকাশিত হয় ১২৯৩ সনের চৈত্র মাসের 'ভারতী'তে। সুতরাং রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র মতানৈক্যের বহু পূর্বেই রবীন্দ্র-বরণ ও রবীন্দ্র-বিরোধের ভিতর দিয়ে তৎকালীন বাংলা কাব্যের পটভূমিকা রচিত হয়েছিল। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের কবিখ্যাতির বিকাশ-পর্বে একদল সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল—দুজনের প্রভাবকেই আত্মসাৎ করার চেষ্টা করেছেন। বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০), প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৮), চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৭০-১৯২৫), প্রমথনাথ রায়চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪৯) প্রমুখ কবিদের কাব্যে ও অপেক্ষাকৃত পরবর্তীদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮১-১৯২২), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯ জন্ম) প্রমুখ কবিদের রচনায় বাংলা কাব্যের এই দ্বিমুখী মেজাজের প্রভাব আছে। (এঁদের সম্পর্কে 'দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব' অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।) রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সূক্ষ্ম গীতিধর্মিতার মসৃণ-পেলব সৌকুমার্য, ব্যঞ্জনার আলো-ছায়া লীলা, ভাষা ও ছন্দের ইন্দ্রজাল দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যে অনুপস্থিত। ভাষার স্পষ্টতা ও বলিষ্ঠতা, বাকচাতুর্য, হাস্য-পরিহাসের সাবলীল ও অকুণ্ঠ প্রকাশ, মহৎ ও তুচ্ছের অনায়াস সংমিশ্রণ—দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যে এমন একটি নূতন আস্বাদন সঞ্চারিত করেছিল, যা একসময় রবীন্দ্রনাথেরও বিস্ময়-মুগ্ধ সানন্দ অভিনন্দন লাভ করেছিল।

১৪। রবীন্দ্রজীবনী (১ম খণ্ড): প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১৮৫-৮৬।

বাংলা কাব্যের এই দ্বিমুখী মেজাজের কথা মনে রেখে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যবিচারের প্রয়োজন।

॥ ৩ ॥

দ্বিজেন্দ্রলালের কবিজীবনকে মোটামুটি তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। কবি-মানস ও কবিজীবনের বিচিত্র বিবর্তনের দিক থেকে এই জাতীয় বিভাগের একটি প্রয়োজনীয়তা আছে। এই তিনটি পর্ববিভাগ শুধু কালগত কয়েকটি ছেদচিহ্ন নির্দেশ করার জন্যই করা হয় নি, কবির মানস-বিকাশের তিনটি স্তরকেও নির্দেশ করা হয়েছে। 'আর্যগাথা' (প্রথম ভাগ) ও ইংরেজি কাব্য 'The Lyrics of Ind.' নিয়ে কবি-জীবনের 'উদ্ভবপর্ব'। এই পর্বে বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে কবির পরিচয় ঘটে নি—কবির ভাবনাগুলি অস্পষ্ট নীহারিকার মতো এখনো ভাবালুতার শূন্যমার্গে ভ্রাম্যমাণ। (কবিজীবনের দ্বিতীয় স্তরের নাম দেওয়া হল 'সমৃদ্ধিপর্ব'। 'আর্যগাথা' (দ্বিতীয় ভাগ), 'আষাঢ়ে', 'হাসির গান' ও 'মন্দ্র' এই পর্বের অন্তর্গত। কবি-মানসের বৈশিষ্ট্য ও অভিপ্রায় এই পর্বে পরিস্ফুট হয়েছে। শুধু তাই নয়, দ্বিজেন্দ্র-মানসের দ্বিমুখী অভিব্যক্তি —রোমান্টিক গীতিধর্ম ও ব্যঙ্গবিদ্রূপ-নৈপুণ্য এই পর্বে যুগ্মভাবরেণী রচনা করেছে। 'মন্দ্র' কাব্যে তার সর্বোত্তম প্রকাশ। দ্বিজেন্দ্র-কবিমানসের স্বরূপলক্ষণটি এই পর্বে বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ব্যক্তিজীবনের দিক থেকেও এই অংশটির একটি বিশেষত্ব আছে। প্রেমময়ী পত্নীর সাহচর্যে, পুত্র-কন্যা-স্বজন-পরিবৃত গৃহজীবনের আস্বাদনে ও বন্ধু-বান্ধবদের উচ্ছ্বসিত প্রীতিরসে জীবনের এই অধ্যায় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। গীতিসুষমার ও হাস্য-পরিহাসের বেগদৃপ্ত তরঙ্গলীলায় কবিজীবনের এই অংশই সবচেয়ে পরিপূর্ণ ও সম্ভাবনাময়। 'মন্দ্র' কাব্য প্রকাশের প্রায় এক বছর পরে দ্বিজেন্দ্রলালের স্ত্রীবিয়োগ হয়। দ্বিজেন্দ্র-কাব্যের তৃতীয় স্তরকে 'পরিণতি-পর্ব' বলা যায়। 'আলেখ্য' ও 'ত্রিবেণী' কাব্যদ্বয় এই পর্বের অন্তর্গত। এই দুটি কাব্যকেই 'স্ত্রীবিয়োগের কাব্য' হিসাবে অভিহিত করা যায়। দাম্পত্যপ্রেম ও বাৎসল্যরসের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতা এই দুটি কাব্যগ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। স্ত্রীবিয়োগের আকস্মিক আঘাতে কবি যেন

খানিকটা স্থির ও গভীর হয়েছেন। কবিজীবনের ও কাব্যকলার মধ্যে কোনো নূতন সূত্র সংযুক্ত না হলেও এই পর্বের কবিতাগুলির মধ্যে জীবনপরিণতির একটি সুর ও খানিকটা প্রৌঢ় উপলব্ধির স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিচরিতের এই তৃতীয় পর্বটি প্রধানত নাটক রচনার যুগ। কিন্তু এই দুটি কাব্যের মধ্যে তাঁর মানসলোকের যে ছবি ফুটেছে তার মূল্য কম নয়। ঐতিহাসিক নাটকের ঘটনার ঘনঘটা ও বহু মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার অন্তরালে কবি দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তি-মানসের অভিব্যক্তি অনেকখানি চাপা পড়েছে, কিন্তু এই পর্বের দুটি কাব্যে কবির ব্যক্তিহৃদয়ের শূন্যতা ও বিদীর্ণ বেদনা নিঃসংশয়িত হয়ে উঠেছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আর্যগাথা' (প্রথম ভাগ) ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ সম্পর্কে কবি নিজেই বলেছেন: "১২ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে আমি গান রচনা করিতাম। ১২ হইতে ১৭ বৎসর বয়সে রচিত আমার গীতগুলি ক্রমে 'আর্যগাথা' নামক গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়। তখন কবিতাও লিখিতাম। কিন্তু তখন কোনো কবিতা প্রকাশিত হয় নাই। কেবল "লেওঘরে সন্ধ্যা" নামক মৎপ্রণীত একটি কবিতা "নব্যভারত"এ প্রকাশিত হয়।"[১৫] গ্রন্থটি যে বছর প্রকাশিত হয় সেইবারই তিনি বি এ পরীক্ষা দিলেন। কবিতাগুলিকে কবির বাল্য ও কৈশোরের রচনা বলা যায়—নিতান্ত অল্পবয়স থেকেই তার কাব্যপ্রতিভা ও সাঙ্গীতিক প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল।

'আর্যগাথা'র ভূমিকায় কবি কাব্য সম্পর্কে দুটি মূল্যবান নির্দেশ দিয়েছেন। প্রথমত, 'আর্যগাথা' গান, কবিতা নয়—"আর্যগাথা'র ভিন্ন ভিন্ন গীতে, মধ্যে মধ্যে বিরোধীভাব থাকিতে পারে। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, 'আর্যগাথা' কাব্য নহে। ইহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ের মনের সমুদ্ভূত ভাবরাজি ভাষায় সংগ্রহ।" "আর্যগাথা" সঙ্গীত, কিন্তু কবিতা হিসাবেও এর রসাস্বাদনে বিশেষ কোনো বিঘ্ন ঘটে না। দ্বিতীয়ত, ভূমিকাতে কবি কাব্যের বিষয় নির্দেশ করেছেন:

"যাঁহারা একমাত্র মনুষ্যপ্রেম-গীতকেই গীত মনে করেন, 'আর্যগাথা' তাঁহাদিগের জন্য রচিত হয় নাই, এবং তাঁহাদিগের আদর প্রত্যাশা করে

১৫। নাট্যমন্দির শ্রাবণ, ১৩১৭।

না। যদি কেহ প্রকৃতির অপার্থিব সৌন্দর্যে ও লাবণ্যে কখন কখন বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন, যদি কেহ প্রকৃতিকে দেখিতে দেখিতে কখন কখন প্রকৃতি-রচয়িতার অনন্ত মহিমায় স্তব্ধ হইয়া থাকেন, যদি কেহ শোক-জরা-সঙ্কুল জগতে দুঃখাবসন্ন হইয়া কখন কখন নীরবে অশ্রুবারি বিসর্জন করেন, যদি কাহার অধঃপতিতা হতভাগিনী দুঃখিনী মাতৃভূমির নিমিত্ত নেত্রপ্রান্ত কখন সিক্ত হইয়া থাকে, 'আর্যগাথা' তাহারই আদর চাহে। আদর পায়, আবার নূতন গীত শুনাইবে। না পায়, যথার্থই হতাশ হইবে।"

এই ভূমিকাটি থেকে 'আর্যগাথা'র গান ও কবিতাগুলির বিষয়ানুসারী বিভাগ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই গ্রন্থের রচনাগুলিকে বিষয়ানুসারে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়—(১) প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতা ("প্রকৃতি-পূজা)", (২) ঈশ্বর-বিষয়ক কবিতা ('ঈশ্বর-স্তুতি"), (৩) বেদনানুভূতির কবিতা ("বিষাদোচ্ছ্বাস") ও (৪) দেশপ্রেমমূলক কবিতা ("আর্যবীণা)। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম কাব্যে জীবন সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতা নেই, থাকাও সম্ভব ছিল না—এ যেন একটি অস্পষ্ট নীহারিকার জগৎ। তাই 'নক্ষত্র', 'আকাশ', 'জ্যোস্নাস্নাত গগনে মেঘখণ্ড', 'মেঘ', 'কাননকুসুম' প্রভৃতি নিয়ে আপন মনের একটি কাব্যজগৎ গড়ে তুলেছেন। কবি তখনও মানবজগতের মধ্যে প্রবেশ করেন নি। প্রকৃতির কবিতা হিসাবেও এদের কোনো স্বতন্ত্র রূপ নেই—একটি অস্পষ্ট ছায়া-গোধূলির রাজ্য—কবির অপরিস্ফুট মানস ও ছায়াময় অস্তিত্বের স্বপ্নসহচর মাত্র। 'আর্যগাথা"র "প্রকৃতিপূজা অংশে বিহারীলালের প্রভাব আছে। 'প্রকৃতি-স্তোত্র' কবিতায় কবি বলেছেন

> ঊর্দ্ধে চন্দ্র রবিতারা নীল নভস্থলে, (দেখি
> বিপুলা বসুধা পৃথ্বী পড়ি পদতলে,
> সিন্ধু গম্ভীর সুন্দর, ব্যাপি যুগযুগান্তর
> রহে প্রতি ঊর্মি ঘায় করি কেন উগিরণ।

বিহারীলাল বলেছেন

> পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম,
> তুচ্ছ তারা সূর্য সোম
> নক্ষত্র, নখাগ্রে যেন গণিবারে পারে,

সম্মুখে সাগরাম্বরা
ছড়িয়ে রয়েছে ধরা,
কটাক্ষে কখন যেন দেখিছে তাহারে।

(সারদামঙ্গল, চতুর্থ সর্গ)

'প্রকৃতি-পূজা' অংশের কোনো কোনো কবিতায় বিহারীলালের কাব্যের প্রতিধ্বনি থাকলেও বিহারীলালের কবিতার মগ্নময়তা ও ধ্যান-নিবিষ্টতা এখানে নেই। বিহারীলাল আত্মমুগ্ধ, নিজের নিভৃত ভাবসাধনায় তিনি 'যোগমগ্ন'। দ্বিজেন্দ্রলালের কিশোর বয়সের প্রকৃতি-কবিতায় নিঃসন্দেহে একটি সৌন্দর্যমুগ্ধ মনের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু মন আবিষ্ট নয়, বিহারীলালের মতো আত্মবিহ্বল নয়। এ বৈশিষ্ট্য শুধু কবিমানসের অপরিণতি-প্রসূত নয়, দ্বিজেন্দ্রলালের মানস-প্রকৃতিরও নির্দেশক। এই সম্পর্কে আর একটি প্রসঙ্গও স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের কৈশোর রচনাবলীর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তিনি কাহিনী-কাব্য দিয়ে কবিজীবন শুরু করেন। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' বাদ দিলে 'শৈশবসঙ্গীত'ই তাঁর সর্বপ্রথম গীতি কবিতার সঙ্কলন। 'শৈশবসঙ্গীত' কাব্যগ্রন্থটি 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২) ও 'প্রভাতসঙ্গীত'-এর পরে (১৮৮৪) প্রকাশিত হলেও কবিতাগুলি 'ভারতী' পত্রিকায় ১২৮৫ থেকে ১২৮৭-এর মধ্যে প্রকাশিত হয়। কবি এই গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন : "এই গ্রন্থে আমার তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের কবিতাগুলি প্রকাশ করিলাম, সুতরাং ইহাকে ঠিক শৈশবসঙ্গীত বলা যায় কিনা সন্দেহ।" 'শৈশবসঙ্গীতে'ও কবির জীবনের অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু আর একটি মহাসম্পদ বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে—সে হল এই কাব্যের অনেকগুলি কবিতার অসাধারণ গীতিসম্পদ। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল—এই দুই কবির একই বয়সের কাব্য নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় যে রবীন্দ্র-প্রতিভায় লিরিসিজম্ অনেক সূক্ষ্ম ও স্বপ্রকাশ। এই গীতিসম্পদ সমকালীন কাব্যে একমাত্র বিহারীলালের ও মধুসূদনের কোনো কোনো কাব্যাংশে লক্ষ্য করা যায়।

'আর্যগাথা'র 'প্রকৃতি-পূজা' অংশের কয়েকটি কবিতায় প্রকৃতিকে অবলম্বন করে কবি-হৃদয়ের বিচিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষার মৃদু আন্দোলন স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। 'নীহার' কবিতায় কবি বলেছেন :

নীহার কি স্বর্গবাসী, ফেলে এই অশ্রুরাশি,
তারাও কি কাঁদে শোকে হইয়ে বিহ্বল ;
সদা মানব-রোদন, শুনি কিম্বা তারাগণ,
নর-দুঃখে সমদুখী ফেলে অশ্রুজল।

তার পরক্ষণেই বলেছেন :

কিম্বা তপ্তা রবিকরে, ধবার স্নানের তরে
আনেন রজনীদেবী বারি সুশীতল ;
কিম্বা বিভু প্রেমরাশি, তবল হইয়ে আসি
সুপ্ত ধরাতল মাঝে করে ঢল ঢল।

'আর্যগাথা' কাব্যে যে বিষাদোচ্ছ্বাস ফুটেছে, তাই যেন নীহার-বিন্দুর অশ্রুজলে রূপায়িত হয়েছে। নীহারবিন্দু কখনো কবির কাছে মানব-দুঃখে দুঃখী তারকার অশ্রুজল, কখনো বা তপ্ত-পৃথিবীর স্নানের সুশীতল বারি, আবার কখনো বা 'বিভু-প্রেমরাশি'। প্রকৃতির স্বর্ণসূত্রে কবি মানব লোক ও দেব-লোককে গেঁথে তুলতে চেয়েছেন। "ঈশ্বর-স্তুতি"-র কবিতাগুলির মূলেও এই প্রেরণাই কাজ করেছে। "তটিনী" কবিতাতেও এই "ত্রিদিব-সৌন্দর্যের" আভাস ফুটে উঠেছে :

অমরা হইতে আসি, আনি স্বর্গসুধারাশি,
দুখী মহী-দুখ কিগো ঘুচাইতে চাও রে।

কবির অন্তরের বেদনাময় ভাবনা ও বিষণ্ণতা প্রকৃতির দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে। কবিচিত্তের বিষণ্ণতা ও ভাব-লহরীকেই প্রকৃতির কবিতাগুলির মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ব্যক্তিচিত্তের বেদনার রসেই 'হ্রদ' কবিতাটি জন্মলাভ করেছে :

দিবানিশি কেন হ্রদ! কাঁদ দুখভরে।
একাকী বিরলে তুমি কাঁদ কার তরে।

প্রকৃতির প্রতি সুগভীর আকর্ষণ কবিচিত্তের ভাব-ভূমিকে স্নেহ-প্রীতি-বেদনা ও ঐক্যানুভূতির বিচিত্র বর্ণে অভিষিক্ত করেছে। তাই প্রকৃতির স্নেহরসমুগ্ধ কবি কিশোর বলেছেন : "প্রকৃতি জননী যার, কিসের অভাব তার।" প্রকৃতিকে কবি বাৎসল্যময়ী জননীর সঙ্গেই তুলনা করেছেন। সন্তান ও জননীর স্নেহ-সুকোমল সম্পর্কটিই প্রকৃতির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ

করেছে। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক রচনায় কিশোর কবি অনেক সময় যা বলেছেন, তার মধ্যে সুলভ ভাবাতিরেকের স্পর্শ আছে। 'কাঁদিবে কি স্নেহময়ি' কবিতায় কিশোর কবি ভাবছেন, যেন তাঁর মৃত্যুর পর—

সান্ধ্য সমীরণোচ্ছ্বাসে
ফেলিবে মা দীর্ঘশ্বাসে,
ঝরিবে অমূল্য অশ্রু নিশীথ নীহার
কাঁদিবে কাঁদিবে দেবি জননী আমার।

"বিষাদোচ্ছ্বাস" অংশটিতে "প্রকৃতি-পূজা"-র বিষণ্ণতাই আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই অংশটিতে পূর্বস্মৃতির পর্যালোচনার সঙ্গে হৃদয়ের বিষণ্ণ অনুভবকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'নিশীথে গান শুনিয়া' কবিতায় কবি বলেছেন :

নিশীথে ললিত স্বরে কে গায় রে গান।
মাতিল হৃদয় করি গীত-সুধা পান।
গায় কি তারকা সবে, মিলিত করুণ রবে
ভাসায়ে সঙ্গীতস্রোতে নর-নারী প্রাণ।
স্বর্গচ্যুতা দেবী আসি, বিষাদে বিজনে বসি,
ঢালেন কি দুখপূর্ণ সুমধুর তান।

'আর্যগাথা' (প্রথম ভাগ) কাব্যের ভাবানুভূতি যত অস্পষ্টই হোক না কেন, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম কাব্যে কবিচরিত্রের মূল রাগিণী ধ্বনিত হয়েছে। এই অপরিণত কাব্যের মধ্যেই রোমান্টিক কবিচেতনার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। প্রকৃতিকে মানবের সুখ-দুঃখের প্রতি সহানুভূতিশীল, বিচিত্র ভাব-লীলার উদ্দীপক ও মাতৃমূর্তি হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু উচ্চতর রোমান্টিক প্রকৃতিগাথায় যে কল্পনা-প্রসারতা ও রূপ-বৈচিত্র্য বর্তমান দ্বিজেন্দ্রলালের কিশোর বয়সের কবিতায় তা অনুপস্থিত। তা ছাড়া তথাকথিত নৈতিক দৃষ্টি যেন কবির সহজ কল্পনাশক্তিকে আচ্ছন্ন করেছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতি কবিতায় একজাতীয় আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধি আছে—কিন্তু তা উচ্চতর আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক গভীরতারই সৃষ্টি করেছে। "ঈশ্বরস্তোত্র" জাতীয় কবিতাগুচ্ছে কোনো আধ্যাত্মিক গভীরতা নেই, সুলভ নীতিকবিতায় পরিণত হয়েছে। এই অংশটিই কাব্যের দুর্বলতম অংশ।

তথাপি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থে রোমান্টিক কল্প-স্বপ্নেরই অস্পষ্ট ও অপরিণত আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। কবির প্রকৃতি-পূজার সঙ্গে মিলেছে এক ছায়াচ্ছন্ন বিষণ্ণতা। বিষণ্ণতা রোমান্টিক কবিদের চিন্তা-চেতনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। রোমান্টিক কবিদের কাব্যের উন্মেষলগ্নে একটি সুলভ ভাবালুতা ও ভাবাতিশয্য থাকে—কবিজীবনের এই অংশে মূর্তিরচনার কোনো প্রচেষ্টা নেই। কায়াহীন অশরীরী ভাবনার স্ফুট-অস্ফুট বাষ্পরাশি মনের দিগন্তে যদৃচ্ছ বিচরণ করে। রোমান্টিক কবিদের মনের এই বিশেষ অবস্থাটিকে কার্লাইল উপহাস করে বলেছিলেন 'Werterism'। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' পযন্ত রবীন্দ্রকাব্যের প্রাথমিক পর্বটিকেও বাস্তব অভিজ্ঞতাহীন ভাবাতিরেকের পর্ব বলা যায়। 'বনফুল', 'কবিকাহিনী', 'ভগ্নহৃদয়', 'শৈশবসঙ্গীত', 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' প্রভৃতি কাব্যকে এক হিসেবে হৃদয়োচ্ছ্বাসপূর্ণ ভগ্নহৃদয়ের কাব্য বলা যায়। 'ভগ্নহৃদয়' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

"ভগ্নহৃদয় যখন লিখিতে আরম্ভ করেছিলাম তখন আমার বয়স আঠারো। বাল্যও নয় যৌবনও নয়। বয়সটা এমন একটা সন্ধিস্থলে—যেখান থেকে সত্যের আলো স্পষ্ট পাবার সুবিধা নেই।...আমরা সকলে মিলেই একটা বস্তুহীন ভিত্তিহীন কল্পনালোকে বাস করতেম। সেই কল্পনালোকের খুব তীব্র সুখদুঃখও স্বপ্নের সুখদুঃখের মতো। অর্থাৎ, তার পরিমাণ ওজন করবার কোনো সত্য পদার্থ ছিল না, কেবল নিজের মনটাই ছিল ;—তাই আপন মনে তিলে তাল হয়ে উঠত।"[১৬]

দ্বিজেন্দ্রলালের এই শ্রেণীর কবিতাগুলি প্রকৃতপক্ষে 'ভগ্নহৃদয়ের' কবিতা। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকারও তাঁর এই কালের "নির্জনতা-প্রীতি ও বিষাদের" কথা উল্লেখ করেছেন। রামতনু লাহিড়ী একদিন তাঁকে বলেছিলেন : "এই অল্প বয়সে তোমার হৃদয়ে এমন কি বিষাদ বা দুঃখ থাকিতে পারে যাহাতে তোমার প্রায় প্রত্যেক গানেরই সুরে এমন বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়ে ?"[১৭]

১৬। জীবনস্মৃতি : পৃঃ ১১২।

১৭। দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৫১।

॥ ৪ ॥

"আর্যগাথা"র সর্বশেষ অংশ "আর্যবীণা"। পূর্ববর্তী তিনটি বিভাগের সঙ্গে এই অংশটির একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। এই অংশের সাঁইত্রিশটি গানে দেশপ্রেমের উদ্বোধন করা হয়েছে। পরবর্তীকালে জাতীয়-ভাবোদ্দীপক ঐতিহাসিক নাটকে ও দেশপ্রেমমূলক বিখ্যাত সঙ্গীতগুলিতে তিনি যে আদর্শবাদের কথা বলেছেন, এই গানগুলি তারই প্রাথমিক পদক্ষেপ। প্রেমের মৃদু সঙ্গীত তিনি চান না, কারণ, অধঃপতিত ও পরপদানত দেশের কবির পক্ষে প্রেমসঙ্গীত নিতান্ত অসঙ্গত—তাই মধুর মুরলীধ্বনির চেয়ে গগনভেদী তুরী আজ কবির কাছে প্রার্থনীয় হয়ে উঠেছে :

রেখে দেও রেখে দেও প্রেমগীতি স্বরে রে।
কেন ও কুহক আর ভারত ভিতরে রে।
যাও চলি পরভৃত, চাই না ও মৃদুগীত,
গাও রে পাপিয়া তবে ভাসায়ে অম্বরে রে।
শুনিয়া মুরলী-গান, জাগিবে না আর্যপ্রাণ,
ঢালিবে সে স্বপ্ন তার শ্রবণ-কুহরে রে।
উঠ তবে পার যদি, রে তুরী গগনভেদী,
উঠ কাঁপি দূরাকাশে লহরে লহরে রে।

এই একটি কবিতা থেকেই "আর্যবীণা" অংশের কবিতাগুচ্ছের অভিপ্রায় উপলব্ধি করা যায়।

যে বীরপূজার আদর্শ ঐতিহাসিক নাটকে ও স্বদেশপ্রেমের গানে স্বদেশী আন্দোলনের জাতীয় উন্মাদনাকে রূপায়িত করেছিল, সেই সুর "আর্যবীণা"-র সঙ্গীতের মধ্যে সর্বপ্রথম লক্ষ্য করা যায়। ভারতের অতীত সংস্কৃতি ও গৌরবগাথা তিনি শুনিয়েছেন। "শঙ্কর-গৌতম-কথা, প্রতাপের বীরগাথা" তাঁর কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছে। 'প্রতাপসিংহ' ও 'গুরুগোবিন্দ' সম্পর্কে স্বতন্ত্র কবিতাও আছে। দেশের বর্তমান দুরবস্থার সঙ্গে অতীতের গৌরবদীপ্ত যুগের তুলনামূলক আলোচনা করে কবিহৃদয় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। জাতিভেদ ভুলে ঐক্যমন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে কবি "আর্য-বংশ-গরিমা" পুনরুদ্ধারের জন্য ভারতবাসীকে আহ্বান করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের

এই পর্বের দেশপ্রেমমূলক গানের মধ্যেও ভাবাতিশয্য আছে। দেশপ্রেমও তখন কবির কাছে একটি অপরিণত ও উচ্ছ্বসিত বাসনার মতো। এই কবিতাগুলিতে উনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশপ্রেমের কবিতার প্রভাব আছে। হেমচন্দ্রের কবিতার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। হেমচন্দ্রের কবিতার ভাবকেই তিনি শুধু অনুসরণ করেন নি, তাঁর কাব্যরূপ ও ছন্দকেও তিনি অনেক ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছেন। 'আর্যগাথা' যে বছর প্রকাশিত হয়, সেই বছরে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) প্রকাশিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল যখন এই কবিতাগুলি রচনা করেন তখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। জাতীয়তাবোধ তখন ছিল একটি নবজাগ্রত উন্মাদনার মতো। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে স্বদেশী আন্দোলন গড়ে উঠল, তখন দেশসেবার একটি বিশিষ্ট কর্মপদ্ধতিও দেখা দিয়েছে। দেশসেবার আদর্শকে তখন নানাভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে। কিন্তু উনিশ-শতকীয় স্বদেশপ্রেম ছিল একটি অশরীরী ধ্যানবস্তুর মতো। তাই পরবর্তীকালের স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে যখন প্রত্যক্ষ কর্মরূপ গড়ে তোলার প্রয়োজন হল, তখনই ধরা পড়ল অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি, অনেক ভুল-ভ্রান্তি। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের এই যুগের দেশপ্রেমের গানে ব্রিটন-মহিমাও কীর্তন করা হয়েছে : "মিলিয়া গাও রে বৃটন মহিমা।" হেমচন্দ্রের 'ভারত ভিক্ষা' কবিতা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। হেমচন্দ্রও প্রিন্স অব্ ওয়েলস বন্দনায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। সুতরাং উনিশ-শতকীয় জাতীয়তাবোধের মধ্যে একজাতীয় স্ব-বিরোধ ছিল। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও স্বদেশী যুগের কবিতা ও গানের রূপ স্বতন্ত্র, বোধও স্বতন্ত্র। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী যুগের গানের আস্বাদন স্বতন্ত্র—কোনো বিরোধী ভাবের সংশয়দোলায় তার ঋজুতা নষ্ট হয় নি—ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মতোই তা প্রকাশিত হয়েছে। কারণ সেগুলি 'নব জাতীয়তা বোধে'র যুগে রচিত। এই প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পালের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

Patriotism is assuming a new shape and meaning among us to day. There was patriotism of a kind among the educated classes thirty or forty years back. It was, however, inspite of its sincerity and exuberance, such as have left a permanent

impression upon the mind and character of the older generations of our political and social leaders,—something positively more outlandish than indigenous, and decidedly more sentimental than real.···Our old **admiration** for Europe has thus been largely supplanted now by an ardent **love** for our own country. This new love is not, as of old, a vague sentiment and a fairy fancy, such as possess our hearts when we are under the spell of a great poem or novel, but something real and true, not merely a subjective attitude but something that yearns for an objective expression and realisation, through acts and symbols, as always happens with all real and true love.[১৮]

বিপিনচন্দ্রের এই বিশ্লেষণী আলোচনার আলোকে দ্বিজেন্দ্রলালের আর্যগাথার স্বদেশপ্রেমের গানের সঙ্গে স্বদেশীযুগের গানের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থেই পাশাপাশি দুটি মনের অস্পষ্ট ছায়া আছে। একটি হল তার অন্তর্মুখী গীতিধর্মী কবিচিত্ত, আর একটি হল তার সামাজিক মন—যে মন দেশের অধঃপতনের কথা ভেবে বেদনাতুর হয়, যে মন জাতীয় জীবনের জড়ত্বকে পাঞ্চজন্যধ্বনিতে উদ্বোধিত করতে চায়। অবশ্য প্রথম কাব্যে, অনুভবের চেয়ে ভাবাতিরেকের প্রাবল্য অনেক বেশী। বিহারীলাল ও হেমচন্দ্র দুজনার প্রভাবই পাশাপাশি চলেছে, সমুদ্রসম্পর্কিত কবিতায় বায়রনেরও প্রভাব আছে, 'আর্যবীণা' অংশে মূরের 'আইরিশ মেলোডিজ'-এর দু-একটি কবিতারও প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল এখনো যেন তার প্রতিভার স্বক্ষেত্র খুঁজে পান নি। 'আর্যগাথা' (১ম ভাগ) কবি-কিশোরের মানসলোকের সংবেদনাকে প্রকাশ করেছে। প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ ও রোমান্টিক বিষাদের সঙ্গে জাতীয়তার আদর্শ তার প্রথম কাব্যেই লক্ষ্য করা যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক জীবন তথা কাব্যজীবন এই দুইয়ের টানা-পোড়েনে রচিত হয়েছে। 'আর্যগাথা'

১৮। The New Patriotism (8th April, 1905) Swadeshi and Swaraj, Pp. 17-19 · B. C. Pal.

পূর্ণশক্তির কাব্য নয়, কাব্য-কৌতূহল মাত্র—কিন্তু কিশোরকালের কৌতূহলবশে কবি তাঁর চরিত-মঞ্চের যতটুকু যবনিকা উন্মোচন করেছেন, সেই আংশিক উদ্‌ঘাটনের মধ্যেই দ্বিজেন্দ্র-মানসের যে অস্পষ্ট রেখাটুকু ফুটেছে, তাই এ কাব্যের শ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি। তার বেশী এ কাব্য আর কিছু দাবি করে না।

'আর্যগাথা' (প্রথম ভাগ) ও 'আর্যগাথা' (দ্বিতীয় ভাগ)—দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম ও দ্বিতীয় কাব্যের মধ্যে ব্যবধান প্রায় এগারো বছর। কিন্তু এই দুটি কাব্যের মাঝখানে দ্বিজেন্দ্রলাল 'The Lyrics of Ind' নামক একখানি ইংরেজি কাব্য প্রকাশ করেন (সেপ্টেম্বর ১৮৮৬)। এই কাব্যটি বিলাত-প্রবাসকালে লণ্ডন থেকেই ছাপা হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের পরে আর কোনো ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন নি। এই ইংরেজি কাব্যগ্রন্থটিতে দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-প্রতিভার বিশেষ লক্ষণ ফুটেছে এ কথা বলা যায় না, তাছাড়া গ্রন্থটি বাংলায় লেখা হয়নি। কিন্তু এডুইন আর্নল্ডকে উৎসর্গীকৃত এই গ্রন্থটি দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যধারা বিচারের পক্ষে দুটি কারণে বিশেষ প্রয়োজনীয়। 'আর্যগাথা' প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে শুধু কালগত নয়, ভাবগত ব্যবধানও অনেকখানি। শিল্প পরিণতি ও মানস-পরিণতি দুদিক থেকেই অনেকখানি ফাঁক চোখে পড়ে 'দি লিরিকস্ অব ইণ্ড' কাব্যগ্রন্থটি এই দুটি বাংলা কাব্যের মধ্যে যেন সেতু রচনা করেছে। 'আর্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগকে প্রেম ও যৌবন-স্বপ্নের কাব্য বলা যায়। প্রথম ভাগের ভূমিকায় কবি প্রেম-কবিতা সম্পর্কে বিরূপ ধারণাই প্রকাশ করেছেন—প্রকৃতি ও দেশপ্রেমই সেখানে মুখ্যস্থান অধিকার করেছিল। 'দি লিরিকস অব ইণ্ড' কাব্যটি যেন এই দুটি বাংলা কাব্যের সংযোগসূত্র। প্রকৃতি ও দেশপ্রেম ছাড়া এ কাব্যে সৌন্দর্য ও যৌবনস্বপ্নের রোমান্টিক অনুভূতিও প্রকাশিত হয়েছে। এই ইংরেজি কাব্যটি তাই 'আর্যগাথা' প্রথম ভাগের পরিণতি ও দ্বিতীয় ভাগের ভূমিকা। কবি এতদিন মনগড়া নক্ষত্র-মেঘলোক-তরুলতার জগতেই তার কল্প-বাসর রচনা করেছিলেন —আজ যৌবন উন্মেষের সঙ্গে মানব জগতের প্রতি কৌতূহল জেগেছে—যৌবন-স্বপ্নের লীলাময়ী অপ্সরী তাকে হাত ধরে প্রেম-সৌন্দর্যময় বিচিত্র মানব-লোকের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তরুণ কবি বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠেছেন :

On, on, ye with your tuneful revelry,
Invisible ministers ! let me feel
The throb, the wild pulsation, th' agony
Of love, and in that madness let me die.

—Hymn to the Spirit of Love—

সৌন্দর্য ও যৌবনস্বপ্নের আনন্দোচ্ছ্বাসে বিষাদের কুয়াশাও আর নেই—জীবনের পানপাত্র আজ কানায় কানায় পূর্ণ। 'আর্যগাথা' প্রথম ভাগের অস্বস্থ বিষাদমগ্ন অনুভূতি প্রেম ও সৌন্দর্যের আলোকধারার স্পর্শে জীবনরসে পূর্ণ হয়ে উঠেছে—জীবনের সেই সূর্যকরোজ্জ্বল স্বর্ণাভ মুহূর্ত প্রকৃতির ভিতর দিয়েও স্পন্দিত হয়ে উঠেছে :

Its lovely smile glows in its depth,
In the soft sunlight's quivering glances,
Its murmurs are its songs of joy,
Its curling waves, its rapturous dances.

—The River of Joy—

এই কাব্যটিতে প্রকৃতিপ্রীতি ও দেশপ্রেম সম্পর্কিত কবিতায় যেমন পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থেরই সুরের পরিণত রূপ শোনা যায়, তেমনি প্রেম ও সৌন্দর্যানুভূতির কবিতায় একটি নূতন সুরেরও উদ্বোধন ঘটেছে। এই দ্বিতীয়োক্ত সুরটি 'আর্য-গাথা' দ্বিতীয় ভাগের পূর্বাভাস। সুতরাং এই কাব্যটি যেমন পূর্ববর্তী কাব্যের অপরিণত সুরকে পূর্ণতর করেছে, তেমনি পরবর্তী কাব্যের প্রেম-সৌন্দর্যময় আত্মমুগ্ধ যৌবনস্বপ্নেরও পাদপীঠিকা রচনা করেছে। প্রবাসী কবি মাঝে মাঝে দেশের কথা ও মায়ের বিষাদাচ্ছন্ন মূর্তির কথাও ভাবতেন—'The Stream' নামক কবিতায় একটি নদীর আত্মকাহিনীর মাধ্যমে প্রবাসী কবি যেন নিজেরই অতীত স্মৃতির পর্যালোচনা করেছেন। 'আর্যগাথা' প্রথম ভাগের প্রকৃতি-কবিতাগুলি মাতৃস্নেহ-রসে সঞ্জীবিত, কিন্তু ইংরেজি কাব্যগ্রন্থে প্রকৃতির ভিতর দিয়ে কবি তাঁর অধীর ও ব্যাকুল যৌবন-স্বপ্নকেই রূপ দিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকাররা বিলাত-প্রবাসকালে বিদেশিনীর প্রেমের কথা উল্লেখ করেছেন : "বিলাতে অবস্থানকালে একটি ইংরাজবালিকার প্রণয়জালে পড়িয়া দ্বিজেন্দ্রের তাহাকে বিবাহ করিবার প্রলোভন হইয়াছিল। ভাগ্যক্রমে

সেই বিপদে পড়িবার পূর্বেই তিনি আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।"[১৯] দেবকুমার রায়চৌধুরী এই ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন।[২০] এই সময়ের ইংরেজি কবিতার মধ্যে সেই অভিজ্ঞতার ছায়াপাত ঘটাও কিছু বিচিত্র নয়।

ইংরেজি কাব্যখানির আর একটি মূল্য আছে। ইংরেজি সাহিত্য, বিশেষত রোমান্টিক যুগের কবিতা, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিজীবনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তৃত করেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের কিশোর বয়সের কবিতায়ও ইংরেজি রোমান্টিক কাব্যের কিছু কিছু প্রভাব আছে—কিন্তু তখনও সে প্রভাব তেমন গূঢ় ও অন্তর্মুখী হতে পারে নি। কিন্তু ইংরেজি কাব্যখানিতে বায়রন ও শেলীর প্রভাব সংশয়হীন। বায়রনের কাব্যের প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস, প্রগল্ভ হৃদয়াবেগ ও জ্বালাময় বর্ণদীপ্ত প্রকাশ তরুণ দ্বিজেন্দ্রলালকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ইংরেজি রোমান্টিক কবিদের মধ্যে বায়রনের প্রভাবই দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু "দি লিরিকস অব ইণ্ড" কবিতায় তিনি বায়রনের চেয়েও শেলীর ভাবানুভূতির দ্বারা অনেক বেশী প্রভাবিত হয়েছেন —অবশ্য পরবর্তীকালে তাঁর উপর বায়রনের কাব্যরীতির প্রভাবই অধিকতর পরিস্ফুট। এ সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের একটি মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

"বাল্যাবধি কবিতা ও নাটক পাঠে আমার অত্যন্ত আসক্তি ছিল। এত অধিক ছিল যে বিদ্যাভ্যাসকালে বায়রনের Manfred ও Child Harold এর দুই canto এবং মেঘদূত উত্তর চরিতের কাব্যাংশ আমি মুখস্থ করিয়াছিলাম। বিলাতে গিয়া ক্রমাগত Shelley পড়িতাম এবং তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া ক্রমাগত Wordsworth ও Shakespeare বার বার পড়িতাম।...বিলাতে গিয়া ইংরাজিতে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করি এবং সেই কবিতাগুলি একত্রিত করিয়া এড্‌উইন আর্নল্ডকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি চাহি এবং তৎসঙ্গে কবিতাগুলির পাণ্ডুলিপি পাঠাই। তিনি কবিতা প্রকাশ সম্বন্ধে আমাকে উৎসাহিত করিয়া পত্র লেখেন ও সে কবিতাগুলি তাঁহাকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি সাগ্রহে দান করেন। তখন সেই কবিতাগুলিকে Lyrics of Ind আখ্যা দিয়া প্রকাশ করি।"[২১]

১৯। দ্বিজেন্দ্রলাল : নবকৃষ্ণ ঘোষ, পৃঃ ৪০।

২০। দ্বিজেন্দ্রলাল : পৃঃ ১৯০-১৯১।

২১। নাট্যমন্দির শ্রাবণ, ১৩১৭।

রঙ্গলাল-মধুসূদনের সময় থেকেই বাংলা সাহিত্যে সার্থক ও সচেতন ভাবে ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব সঞ্চারিত হয়। মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের মধ্যে বিশ্বসাহিত্যের কলধ্বনি জাগিয়ে তুলে তাকে ভাব-প্রকাশের উদার ক্ষেত্রে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কবিশক্তি খুব বড় ছিল না, তবুও তাঁরা বাংলা কাব্যকে ইউরোপীয় ভাবাদর্শ ও চিন্তা-চেতনার দ্বারা ঐশ্বর্যময়ী করে তুলতে চেয়েছিলেন। এই যুগের উপন্যাসে ও নাটকে ইউরোপীয় সাহিত্যের ভাব-জগতের পণ্য আহরণ করার উদ্যোগ ও আয়োজন চলেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের সম্মুখেও পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদের আদর্শ ছিল। তাই তিনি এই কাব্যে শ্বেতদ্বীপের কাব্য-সরস্বতীর সঙ্গে 'শ্বেতভূজা' ভারতীর একটি মিলন-সূত্র রচনা করতে চেয়েছিলেন। 'দি লিরিক্স অব ইণ্ড'-এর ভূমিকায় তিনি বলেছেন: "My principal object in the composition of the following verses has been to harmonise English and Indian poetries as they ought to be" যদিও কবির এই "self imposed mission" একটি কাব্যেই নিবদ্ধ, তবুও তিনি এ কাজে ব্যর্থ হন নি। কারণ পরবর্তীকালে ইংরেজি সাহিত্য ও বিলাতি গানের সুর তাঁর ভাব-জীবনকে সমৃদ্ধই করেছিল। এ বিষয়ে মোহিতলালের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

"মধুসূদন যেমন বিজাতির সাহিত্যিক আদর্শ নিজের আত্মায় আত্মসাৎ করিয়া বাংলা কাব্যকে নবকলেবর দান করিয়াছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলালও আর এক ক্ষেত্রে, সেই ধরনের প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন—বিলাতি গীতি-সুর নিজপ্রাণে গ্রহণ করিয়া তাহাকে বাংলা ছন্দে ও বাংলা সঙ্গীতে রূপ দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুরের সেই অভিনবত্বই বাংলাভাষায় তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান।"[২২]

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যপ্রবাহের উদ্ভবপর্বে রোমান্টিক কবিদৃষ্টি ও অকৃত্রিম গীতি-উচ্ছ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। 'আর্যগাথা' প্রথম ভাগের 'বিষাদোচ্ছ্বাসে'র মধ্যে যে ভাবাতিরেক আছে, তাতে কবিমানসের ভাবী পথরেখা সুস্পষ্ট হয় নি—তা একটি অব্যক্ত ও অনতিস্ফুট কাব্য-কাকলির প্রকাশ মাত্র। ভাবপ্রকাশের ব্যাকুলতা জেগেছে, কিন্তু অভিজ্ঞতা নেই—কবি-বিহঙ্গের কাছে আকাশ-বিহারের কলা-কৌশল এখনও অনায়ত্ত। মধুসূদন,

২২। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সাহিত্য বিতান, পৃঃ ৯১ মোহিতলাল মজুমদার।

হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, অক্ষয় চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল প্রভৃতি কবির প্রথম দিকের কাব্যেও এই ভগ্নহৃদয়ের আর্ত হাহাকার আছে।[২৩] দ্বিজেন্দ্রলালের ইংরেজি কাব্যে এই সুর অনেকটা কেটে গিয়েছে—ছায়ার চেয়ে এখানে আলো বেশী। প্রেম ও যৌবনস্বপ্নের মানসসঙ্গিনী কবিকে এক নূতন রসের তীর্থে নিয়ে এসেছে—যেখানে মুক্তপক্ষ কল্পনা-বিহঙ্গের অবাধ বিচরণ, যেখানে পঞ্চেন্দ্রিয়ের আরতি-প্রদীপে যৌবনস্বপ্নের বিহ্বল-বন্দনা।

॥ ৫ ॥

দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'আর্যগাথা' (দ্বিতীয় ভাগ) ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'আর্যগাথা' প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে দশ বছরেরও বেশি ব্যবধান। এই দশ বছরের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের মনোজীবনের গভীর পরিবর্তন ঘটেছে। 'আর্যগাথা' (দ্বিতীয় ভাগ) কবির 'সমৃদ্ধিপর্বের' প্রথম কাব্য। 'দি লিরিকস অব ইণ্ড' কাব্যে এই পর্বেরই একটি স্বল্প-সঙ্কেত আভাস ফুটে উঠেছিল—কিন্তু আভাসের বেশী আর কিছুই নয়। 'আর্যগাথা' প্রথম ভাগের সঙ্গেও এর দূরত্ব কম নয়। কবিও এ সম্পর্কে সচেতন :

"দশ বৎসরে আমার জীবনে যুগান্তর হইয়াছে—কাহার না হয়? আজ আমি আর সে পাঠাধ্যায়ী, অনূঢ়, জগতের দূরস্থ-পরিদর্শক বিস্মিত বালক নই।—

'আজ যেন রে প্রাণের মতন কাহারে বেসেছি ভাল ;
উঠেছে আজ নূতন বাতাস, ফুটেছে আজ নূতন আলো।'

মলয়ানিলস্পৃক্ত, প্রেমোদ্ভাসিত আমার হৃদয়কুঞ্জে তাই এই কৃতজ্ঞ অস্ফুট কুহুধ্বনি।"

'আর্যগাথা' প্রথম ভাগে বেদনার চেয়ে বিলাস ছিল বেশী, সাধের চেয়ে সাধ্য ছিল অনেক কম। তখন কবি ছিলেন অনভিজ্ঞ, জগতের 'দূরস্থ-পরিদর্শক' মাত্র। কিন্তু দশ বছর পরে কবি ত্রিশ বছরের যুবক, বিবাহিত।

২৩। "All of them, in their early compositions, were dominated by a morbid melancholy, an unreality, a kind of wertherism which was altogether a new current in our poetry." [Western Influence on 19th Century Bengali Poetry : H. N. Dasgupta. Pp XXXVII]

জীবনের মধ্যে অভিজ্ঞতার বর্ণ সঞ্চারিত হয়েছে। কবি প্রকৃতির জগৎ থেকে মানব-লোকে প্রবেশ করেছেন। জগৎটা এখন শুধু একটি ছায়া মাত্র নয়—নব বসন্তের রক্তরাগে অনুরঞ্জিত। 'আর্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগের কবিতাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য এর স্বতঃস্ফূর্ত ও অকৃত্রিম গীতিধর্মিতা। দ্বিজেন্দ্র-কবিমানসে একটি রোমান্টিক সৌন্দর্যানুভূতি ছিল, কিন্তু বিবাহ-পরবর্তী জীবনে সেই সৌন্দর্য প্রেমের নিবিড় উচ্ছ্বাসে ভরে উঠেছে। উৎসর্গ কবিতায় কবি এই সত্যটিকে স্পষ্ট করে বলেছেন :

ছিলে বা তখন
পাপিয়ার স্বরবৎ মধুর প্রবল,
ছিলে বা তখন
প্রাতঃস্বর্ণমেঘবৎ প্রগাঢ় উজ্জ্বল;
ছিলে নক্ষত্রের সম অর্ধ রজনীর—
শান্ত, দিব্য, স্থির,—
কিন্তু দূরস্থায়ী।
তখন সৌন্দর্যে এসেছিলে, 'প্রেমে' আস নাই।

'আর্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগের মূল উৎস নারীপ্রেম—কবিপত্নী সুরবালা দেবীই এই কাব্যের সৌন্দর্য ও প্রেমানুভূতির কেন্দ্রস্বরূপিণী। প্রেমের সূক্ষ্ম ভাবানুভূতির স্পন্দনগুলি যেমন সূক্ষ্ম, তেমনি সুরময়। জীবনে এই আনন্দ-চঞ্চল উচ্ছ্বসিত মুহূর্তে যেন কোনো বাধা নেই—যুগল হৃদয়ের বিগলিত প্রেমাকাঙ্ক্ষা সমুদ্র ও নীল আকাশের বিস্তৃতির মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দিতে চায় :

মোদের প্রেমের পথে পাহাড় বন নাই,
হৃদয়ে হৃদয়ে মিলি সাগরে আয় লো ধাই,
হৃদয়ে হৃদয়ে মিলি মিশিব লো নীলিমায়,
আয় আয় আয় লো যমুনে আয়।

'আর্যগাথা'র কয়েকটি কবিতায় লিরিসিজমের চূড়ান্ত পরিচয় আছে। এক তন্দ্রাতুর সুখালস্যময় অনুভব কবিতা ও গানগুলির উপরে এক সূক্ষ্ম সুরের আবরণ সৃষ্টি করেছে। কবির স্বপ্নবিহ্বল মনের এমন অকুণ্ঠ ও আত্মতন্ময় অভিব্যক্তি তাঁর পরবর্তীকালের কাব্যেও খুব সুলভ নয়।

একমাত্র 'আলেখ্য' ও 'ত্রিবেণী'—কবিজীবনের 'পরিণতি-পর্বে'র দুটি কাব্যের কয়েকটি কবিতা ছাড়া সুরধর্মের এমন অন্তরঙ্গ প্রকাশ কবির আর কোনো কাব্যে নেই। সুখাবেশমধুর তন্দ্রাতুর এক-একটি খণ্ডচিত্র সুরের আলপনায় বিচিত্রিত :

ঘুমায় সুরভি ফুলে, নিকুঞ্জে ঘুমায় গান,
ঘুমায় জগৎপাশে চাঁদের অলস প্রাণ ;—
আয় লো স্বপনখানি
যামিনী বহিয়ে যায় ;—
অধরে মধুর হাসি
আয়—আয়—আয়।

বিশ্বপ্রকৃতিও প্রেমের রসে সঞ্জীবিত হয়েছে।—প্রকৃতির প্রসাধন-বৈচিত্র্যে কবি তাঁর প্রেয়সীকে নূতন আভরণে সাজিয়ে তুলেছেন। কবিমনের অধীর উৎকণ্ঠা ও রূপরচনার সাগ্রহ বাসনা কয়েকটি কবিতায় বর্ণের ইন্দ্রজাল বিস্তার করেছে। মানবীর প্রসাধন রচনায় প্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্য কবির সৌন্দর্যমুগ্ধ মানসলোকে এক মধুর স্বপ্নসাধ রচনা করেছে :

মেখলা দিব ভানুলেখা আনি নবঘনস্নেহে সিনায়ে,
দিব রে বসন সান্ধ্য মেঘে রঞ্জিত রবির ঘুমটি বিনায়ে ;
চরণের তলে দিব অলক্তক
কবির গীত ভকতিরাশি,
দিব ও অধরে অধররাগ
কিশোর প্রেম স্বপন হাসি।

কবির প্রেম-পরিতৃপ্ত জীবনে "মধুর দাসত্ব যার, লীলাময় কারাগার ; শৃঙ্খল নূপুর হয়ে বাজে।" কবি নিজের প্রেমের মধ্যে নিখিলের প্রেমসঙ্গীত শুনেছেন। প্রকৃতির ললিত-মধুর সৌন্দর্যে কবি জন্ম-জন্মান্তরের সুখস্মৃতিপূর্ণ স্বপ্নছবি দেখেছেন—'হৃদয়-রাণী' ছাড়া বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্যও যেন পরিপূর্ণ নয়। ব্যক্তিজীবনের প্রেমানুভূতি এক চিরন্তন প্রেমপ্রবাহের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়—যমুনাতীর, পর্বতমালা, চন্দ্রকরোজ্জ্বল ঢেউয়ের নৃত্য কবিকে যুগযুগান্তের যুগ্মহৃদয়রাগের লীলা মনে করিয়ে দেয় :

এই সে যমুনাতীর, ওই সে পাহাড়মালা,
সেই সে চাঁদের আলো ঢেউ সনে করে খেলা।
মনে কি পড়ে গো, মোরা হৃদয়ে হৃদয়লীন,
হেরিয়াছি এই শোভা কত রাতি কত দিন,—

'আর্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগের যে সমস্ত কবিতা একটি মধুর স্বপ্নাবেশ ও তন্দ্রাতুর অনুভূতিকে প্রকাশ করেছে, লিরিক হিসাবে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই অনুভূতি দ্বিজেন্দ্র-কবিমানসের একটি বিশেষ অবস্থা মাত্র। এই বিহ্বলতা তাঁর মনে তেমন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থেই তার প্রমাণ আছে। রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতায় কবিমনের এই অবস্থাটি অনেক বেশী দীর্ঘ। সম্ভবত তার কারণ দুটি - প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ ও বড়াল কবির কাব্যে প্রেমের নৈর্ব্যক্তিক রূপরহস্যই বড় হয়ে উঠেছে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যে ব্যক্তি-মানবীর উপস্থিতি ও সান্নিধ্যানুভূতি স্পষ্ট। প্রত্যক্ষ ও চিরন্তনের মাঝখানে যত সূক্ষ্মই হোক না কেন, একটি ব্যবধান আছে। কবির প্রেমস্বপ্নের কেন্দ্রে মানবী,—যিনি—

মর্মরে সংগীতময় বর্ণে, কবিতার
স্বপ্নে ভর দিয়া।—
এসেছে ঢাকিয়া
মাংসের শরীরে আজি সোদ্বেগ তোমার
জীবন্ত—হৃদয়।

এই রক্তমাংসের মানবী ও বাসনালক্ষ্মী—দুজনকেই কবি একই হৃদয়াবেগের দ্বারা আরতি করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সব সময় যেন 'সক মোটা' দুটি তার এক হয়ে ওঠে নি। রক্তমাংসের মানবী সত্তা যখন জ্যোতির্ময়ী সৌন্দর্যলক্ষ্মীতে পরিণত হয়েছে, তখনই কবিমনের লিরিক-প্রবণতার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু যেখানে গৃহিণী সুরবালার মানবী সত্তাই কবিদৃষ্টিতে বড় হয়ে উঠেছে, সেখানে কাব্যসৌন্দর্য খণ্ডিত হয়েছে—লিরিকের মৃদু-মূর্চ্ছনাও অন্তর্হিত হয়েছে। এই জাতীয় কবিতায় সূক্ষ্ম ও কোমল মনের লঘুস্পর্শ সংবেদন নেই —এগুলি যেন নিতান্ত বাস্তবঘেঁষা কথা ও স্থূল হাতের রচনা। যেমন—

গরিমা আমার, গৃহিণী আমার, আমার কুটিরবাণী
প্রণয়ের খনি, প্রীতির নিঝর, আশার প্রতিমাখানি;

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, এই কবিতাংশটিতে পরবর্তীকালের দুটি বিখ্যাত উদ্দীপক সঙ্গীতের রূপ ফুটে উঠেছে ("দেবি আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ" ও "আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমাব হৃদয়রাণী")। কবিতাটি আসলে গৃহিণীবন্দনাব। সরব প্রবল ও উচ্চকণ্ঠ কবির পেশীবহুল কবিতা অনেক সময় তাঁব হৃদয়ের সূক্ষ্ম ভাবানুভূতির স্বচ্ছন্দ আন্দোলনগুলিকে আচ্ছন্ন করেছে।

'আর্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগের আলোচনায় ববীন্দ্রনাথ কবিতা ও গানের মৌলিক পার্থক্য নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।[২৪] কবিতায় কথা সবটুকু না হলেও অনেকখানি, কিন্তু গানে সুবই প্রধান। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "সুর খুলিয়া লইলে অনেক সময়ে গানের কথা শ্রীহীন এবং অর্থশূন্য হইয়া পড়ে এবং সেইরূপ হওয়া উচিত। কারণ, সংগীতের দ্বারা যখন আমরা ভাব ব্যক্ত করিতে চাহি তখন কথাকে উপলক্ষ্য মাত্র করাই আবশ্যক, কথাব দ্বারাই যদি সকল কথা বলা হইয়া যায় তবে সংগীত সেখানে খর্ব হইয়া পড়ে।" হিন্দুস্থানী গানেব সঙ্গে বাংলা গানের তুলনামূলক আলোচনা করে কবি বলেছেন:

"হিন্দুস্থানে বিশুদ্ধ সংগীত প্রাবল্য লাভ করিয়াছে কিন্তু বঙ্গদেশে কাব্য ও সঙ্গীতের সম্মিলন ঘটিয়াছে। গানের যে একটি স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য, একটি স্বাধীন পরিণতি তাহা এদেশে স্থান পায় নাই। কাব্যকে অন্তরেব মধ্যে ভালো করিয়া ধ্বনিত করিয়া তুলিবার জন্যই এদেশে সংগীতেব অবতারণা হইয়াছিল।"

দ্বিজেন্দ্রলালের 'আর্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগ আলোচনাপ্রসঙ্গে কাব্য-সঙ্গীত বা কথা-সঙ্গীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন বাংলাব গীতিকাবদের সম্পর্কে তা সাধারণভাবে প্রযোজ্য। ববীন্দ্রনাথের এই সমালোচনাটির মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলিকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। এখানে কবি গান ও কবিতার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে গীতিধর্মিতাব তারতম্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে এমন কতকগুলি রচনা আছে যা সুরসংযোগে গীত হলেও তা প্রকৃতপক্ষে গান নয়। আবার এমন কতকগুলি কবিতা আছে যা সুরসংযোগের অপেক্ষা রাখে না—সুর না থাকলেও তাকে অনায়াসে গান বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের এই আলোচনা থেকে কাব্যটির

২৪। সাধনা. ১৩০১, অগ্রহায়ণ।

গীতিধর্মিতা সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া যায়। কিন্তু আর্যগাথার কতকগুলি কবিতায় যে গীতিরসের পূর্ণ আস্বাদন সম্ভব নয়, এ কথাও কবি বলেছেন। কিন্তু কেন ?

এর প্রধান কারণ হল দ্বিজেন্দ্রলালের বিশিষ্ট কাব্যরীতি ও ভাষা। যে সমস্ত কবিতায় প্রচলিত ছন্দবিধি ও মসৃণ সুকুমার বাণীভঙ্গিকে কবিতার ভাষায় পরিণত করা হয়েছে, সেখানে গীতিধর্মের ললিত লীলাস্পন্দন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠার পথে কোনো বাধা ঘটে নি—সেখানে অল্প-বিস্তর সঙ্কেত-ব্যঞ্জনাও আছে। কিন্তু যেখানে কবিতার মধ্যে গদ্যাত্মক কাব্যরীতি, সংলাপাত্মক ভঙ্গি ও যুক্তির ভাষা এসে পড়েছে সেখানে কবিতার স্বচ্ছন্দ লিরিক প্রবাহ উপলবন্ধুর কাব্যভূমিতে নানাভাবে প্রতিহত হয়ে একটি তীক্ষ্ণাগ্র তির্যকরূপ লাভ করেছে। কবির প্রেম ও সৌন্দর্যানুভূতি গদ্য-বাহনে আরোহী হয়ে তার লিরিসিজমই শুধু হারিয়ে ফেলে নি, যৌবনস্বপ্নের সংরাগকেও অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছে :

আহা—
যদি কোনো মন্ত্রবলে সুন্দর ধরণী
হইত আবদ্ধ এক স্বরে ,
যদি অপ্সরার সংমিলিত গীতধ্বনি
হত সত্য , নৈশ নীলাম্বরে
প্রত্যেক নক্ষত্র যদি প্রাণোন্মাদী সুর
হইত , অথবা যদি হেম
সন্ধ্যাকাশ অকস্মাৎ একটি দিগন্তব্যাপী ঝঙ্কার হইত ,
হইত আশ্চর্য তাহা।
কিন্তু হইত না অধমধুর সংগীত ও
যেমতি মধুর
স্বপ্নময়, কুহুময় 'প্রেম'।

'আর্যগাথা' দ্বিজেন্দ্রলালের পরিণত শক্তির কাব্য নয়, এমন কি বিশিষ্ট শক্তির কাব্যও নয়। কিন্তু এই কাব্যটি দ্বিজেন্দ্রলালের কবিমানসের দ্বিমুখী অভিব্যক্তির যে সঙ্কেতচিহ্ন এঁকে গিয়েছে, ভাবীকালের পূর্ণ কবিশক্তির কাব্যগুলি সেই পথনির্দেশকেই প্রায় চূড়ান্তভাবে স্বীকার করেছে। 'আর্যগাথা'

মূলত স্বতোৎসারিত কাব্য হলেও কখনো কখনো গদ্যের যুক্তিপ্রধান ভাষা ও বাক্যবিন্যাস দ্বিজেন্দ্রলালের কবিশক্তিকে আর এক পথে নিয়ন্ত্রিত করেছে। কিন্তু অন্য প্রসঙ্গ বাদ দিলে বিশুদ্ধ লিরিক হিসেবে আর্যগাথার কতকগুলি কবিতার কাব্যমূল্য অনস্বীকার্য। দ্বিজেন্দ্রলালের এই যুগের কোনো কোনো কবিতার বিরুদ্ধে অগভীরতার অভিযোগও করা যায়। কিন্তু 'আর্যগাথা'য় এমন কয়েকটি কবিতা আছে, যা শুধু যৌবন-বেদনার বহিরাশ্রয়ী লীলারূপ নয়, —হৃদয়ের নিগূঢ় অন্তস্তলকেও তা আলোড়িত করে, প্রেমের চিরন্তন রহস্যকেও উচ্চকিত করে তোলে :

তোমার হৃদয়খানি আমায় এ হৃদয়ে আনি
রাখি না কেনই যত কাছে,
যুগল হৃদয়মাঝে কি যেন বিরহ বাজে,
কি যেন অভাবই রহিয়াছে।
এ ক্ষুদ্র পরাণ ভরি' যেন পরিমাপ করি'
দিয়া প্রেম পূরে নাক সাধ এ ;
যত ভালবাসি তাই, আরও বাসিতে চাই—
অপূর্ণ বাসনা পড়ি কাঁদে।

এই কবিতাটিতে কবি ব্যক্তিহৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাকে এক অসীম ও শাশ্বত প্রেমের ব্যঞ্জনার সঙ্গে মিশিয়ে বিশ্বব্যাপক করে তুলেছেন :

সে দিন এ প্রাণ দুটি, অসীম রাজত্বে উঠি
যাবে মিশি যুগ যুগ বাহি ;
জগতের কথা সব এ স্বপ্নবৎ বোধ হবে
জগৎ বিস্ময়ে রবে চাহি।

দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যে এই কবিতাটি দুর্লভ-দোসর !

॥ ৬ ॥

'আর্যগাথা' (দ্বিতীয় ভাগ) কাব্যটির মধ্যে দুটি ভাগ আছে। কবি প্রথম ভাগের নাম দিয়েছেন 'কুহু'। এই অংশে তাঁর মৌলিক কবিতাগুলি সঙ্কলিত হয়েছে। দ্বিতীয়াংশটির নাম 'পিউ'। এই অংশে কবি কয়েকটি "অতি প্রসিদ্ধ ইংরাজি স্কচ ও আইরিশ সংগীতের অনুবাদ" করেছেন। বিলাত-

প্রবাসকালে দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতি গানের চর্চা করেছেন। বিলাত-প্রবাসকালে তিনি যে বিলাতি গান—ইংরেজি, স্কচ ও আইরিশ গানের প্রতি কতদূর আকৃষ্ট হন, তা তাঁর এই সময়ের কয়েকটি পত্রাংশের মধ্যে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত-প্রবাসকালে বিদেশী সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রতি এক তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছেন। ইংরেজি কাব্য-নাটক পড়ে শ্বেতদ্বীপের কলা-লক্ষ্মীর যে মূর্তি তাঁর মানসলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, তাকেই তিনি সে দেশের কবি-নাট্যকারদের স্মৃতিরঞ্জিত বিভিন্ন সাহিত্য-তীর্থের মধ্যে অনুসন্ধান করেছেন। স্বাধীনচেতা স্কটল্যাণ্ডবাসীদের জীবনাচরণ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি যেখানে সপ্রশংস মন্তব্য করেছেন, সেখানে স্কচ গানের কথাও বলেছেন :

"স্কটল্যাণ্ডবাসী ইংলণ্ডবাসীকে ঘৃণা না করুক, অন্তত তাহার সহিত হরিহরাত্মা নয়। স্কট কবি নিজের পাহাড়ময় দেশেরই গরিমা গান করেন "The land of lakes, the land of lakes," "Auld Long Syne" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ গান ইংলণ্ডের মহিমা কীর্তন নহে। ইহারা—স্কচ জাতিরা অত্যন্ত স্বদেশপ্রেমী।...স্কচজাতি স্বাধীনচেতা, উন্নতচরিত্র, বীরজাতি; স্কটল্যাণ্ড বীরের জননী। তাহাদের দেশও ব্রুস, ওয়ালেসের প্রসূতি। তাহাদেরও বিস্তৃত সাহিত্য আছে; তাহাদের স্কট, বার্নস ও কার্লাইল আছে।...স্কটল্যাণ্ডও যদি ইংরাজ-প্রপীড়িত না হইত, তাহা হইলে এত স্বদেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস উঠিত না। স্কচ জাতির দেশপ্রেমিকতা গভীর অপরিমেয়। প্রতি গানেই তাহার স্ফুলিঙ্গ বিদ্যমান"।[২৫]

এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ডের সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তাও প্রণিধানযোগ্য :

আইরিষদিগের প্রতি ইংরাজের ভূতপূর্ব অবিচারের কথা ইতিহাসজ্ঞ কাহারও অবিদিত নাই। তাহারা সে সব ভুলিতে পারে নাই।...তাহাদিগের গৌরব ভূতকালের কথা নয়। আয়র্লণ্ড ডিউক অব ওয়েলিংটন, বার্ক ও মূরের জননী। তাহাদের বাহুবল আছে, বুদ্ধি আছে। তাহারা ইংরাজের মতই সভ্য। কেন তাহারা ইংরাজ রাজত্বের অবিচার নীরবে সহিবে?"[২৬]

২৫। বিলাতের পত্র : ৫ই মার্চ, ১৮৮৫ সালে লিখিত পত্র।
২৬। ঐ : ৫ই বৈশাখ, ১২৯২-এর চিঠি।

দ্বিজেন্দ্রলালের এই দুটি পত্রাংশ তাঁর অনুবাদ-সঙ্গীতগুলি প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মর্তব্য। প্রবাসী কবি স্কচ ও আইরিশদের মতো দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তা ছাড়া স্কট, বার্নস, মূর প্রমুখ কবির সঙ্গীতগুলির গীতিধর্মিতা কবিচিত্তকে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছিল। অনুবাদ-গীতিগুলির অধিকাংশই বিখ্যাত সঙ্গীত। তখনকার দিনে বাংলাদেশেও বিলাতি গানের একটি আবহাওয়া ছিল। ইউরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে যেমন সাহিত্য প্রভাবিত হয়েছিল, তেমনি সঙ্গীতের ইতিহাসেও এই সময় কতকগুলি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। বিলাতি সঙ্গীতের চর্চা নানাভাবে প্রসারতা লাভ করেছিল। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গীতিসূত্রসার' (১৮৮৫) গ্রন্থে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।[২৭] জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেও বিলাতি সঙ্গীতের চর্চা শুরু হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী' নাটকের দুটি গানের 'সুর ছিল বিলেতি।' সেকালের এই বিলাতি গানের আবহাওয়া সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন : "রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় হবার চার-পাঁচ মাস পরে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং অভিজ্ঞার বড়দিদি শ্রীমতী প্রতিভাদেবীর সঙ্গে দাদার বিবাহ হয়।...তিনি পিয়ানো বাজাতেন ওস্তাদী বিলেতি বাজনা। বেঠোভেনের 'Funeral March' ও 'Moonlight Sonata' আমি অন্তত হাজার বার শুনেছি। তাই থেকে আমার বিলেতি গান-বাজনার উপর যে অশ্রদ্ধা ছিল, তা কমে যায়।"[২৮] এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গও স্মরণীয়। প্রথমবার বিলাতে থেকে ফিরে এসে তিনি মূরের আইরিশ মেলোডিজের গান এবং অন্যান্য বিলাতি গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন। এই দেশী ও বিলাতি সুরের বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষাই তাঁর 'বাল্মীকিপ্রতিভার' জন্মলগ্নে। দ্বিজেন্দ্রলালের বিদেশী সঙ্গীত অনুবাদের মূলে তাঁর একটি ব্যক্তিগত 'ভালোলাগা'র দিক আছে, কিন্তু এই যুগে আমাদের দেশে বিলাতি গানেরও যে চর্চা ও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

তখনকার কালে বিলাতি গানের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল কবি টমাস মূরের 'আইরিশ মেলডিজ' (১৮০৭)। উনিশ শতকের বাঙালী কবি ও বিলাতি সঙ্গীতরসিকদের উপর মূরের এই গ্রন্থটির প্রভাব ছিল অসাধারণ।

২৭। রবীন্দ্র-সংগীত : শান্তিদেব ঘোষ, পৃঃ ১২৩।
২৮। পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ১২৭-১২৮।

দ্বিজেন্দ্রলালের অনুবাদ-সঙ্গীতগুলির মধ্যে মূরের কবিতাও আছে। রবীন্দ্র-স্মৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী তখনকার বিলাতি সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা ও 'আইরিশ মেলোডিজ' প্রসঙ্গে বলেছেন. " সে বয়সে অবশ্য এর সম্পূর্ণ রসগ্রহণ করার ক্ষমতা আমার ছিল না, কিন্তু এটুকু মনে আছে যে "Won't you tell me, Molly darling," "Darling, you are growing old," "Good-bye sweet heart, good-bye" প্রভৃতি তখনকার জনপ্রিয় গানগুলি তিনি গাইতেন। আইরিশ কবি টমাস মূরের Irish Melodies তখন খুব লোকপ্রিয় হয়েছিল। তার মধ্যে "The last Rose of Summer" নামে একটি গান আমি ফিরতিবেলায় জাহাজের কাপ্তেনকে গেয়ে শুনিয়েছিলুম, একটু একটু মনে পড়ে। পরবর্তী জীবনে আমি অবশ্য রবিকাকার অনেক বিলিতী গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজিয়েছি, সে-সব এখনও সেদিনের মূক সাক্ষীস্বরূপ আমার গানের বাঁধানো বইয়ে পড়ে আছে, যথা— "In the gloaming," "Then you'll remember me," "Good night, good night beloved," সুইনবার্নের "If etc। এ ছাড়া বেন্ জনসনের বিখ্যাত গান "Drink me only with thine eyes" ভেঙে লিখেছিলেন "কতবার ভেবেছি"।[২৯]

'আর্যগাথা' প্রথম ভাগের কয়েকটি দেশপ্রেমমূলক কবিতায় মূরের প্রভাব আছে। বিলাত-প্রবাসকালে তিনি মূরের সঙ্গীতগুলির সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। মূরের "My Harp" কবিতাটির আদর্শে দ্বিজেন্দ্রলাল 'সাধের বীণা' গানটি রচনা করেন।[৩০] 'Rule Britannia' নামক বিখ্যাত ইংরেজি সঙ্গীতের আদর্শে "যখন নীলিমা জলধি হৃদয়ে, উঠিল বৃটন ঈশ্বর আদেশে" রচিত হয়। পরিণত বয়সে এই গানটিকেই আদর্শ করে তিনি বিখ্যাত "ভারতবর্ষ" গানটি রচনা করেছিলেন। 'আর্যগাথা'র অনুবাদ-কবিতাগুলির কাব্যমূল্য ও সঙ্গীতমূল্য দুই-ই দ্বিজেন্দ্রলালের বিশিষ্ট শক্তির পরিচয় বহন করে। অনুবাদকার্যে দুটি বিষয়ের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। মূলের সঙ্গে

২৯। রবীন্দ্রস্মৃতি ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৪।

৩০। "দ্বিজেন্দ্র Moore-এর Irish Melodies পাঠ করিতে ভালবাসিতেন এবং সেই কবিতাগুলির মধ্যে 'My Harp' কবিতাটি দ্বিজেন্দ্রের বিশেষ প্রিয় ছিল—তিনি সেই কবিতাটি বন্ধু-বান্ধবদের পাঠ করিয়া শুনাইতেন। সম্ভবতঃ সেই কবিতাটিকে আদর্শ করিয়া দ্বিজেন্দ্র 'সাধের বীণা' গীতটি রচনা করেন।"—দ্বিজেন্দ্রলাল নবকৃষ্ণ ঘোষ, পৃঃ ২৩৪।

যতদূর সম্ভব সঙ্গতি রক্ষা করতে হবে, কিন্তু দেখতে হবে, যে ভাষায় অনূদিত হচ্ছে তার রসরূপটি যেন ফুটে ওঠে। ফিটজিরাল্ডের ওমর খৈয়ামের অনুবাদ বিশ্ববিশ্রুত। এর কারণ হল এই যে কবি তাঁর অনুবাদ-কবিতায় শুধু কথার বা বাক্যের ভাষান্তর সাধনই করেন নি, তিনি তার সঙ্গে ইংরেজি কাব্যের নিজস্ব প্রকৃতি মিশিয়ে দিয়েছেন। তার চেয়েও বড় কথা হল, তিনি মূলের সঙ্গে যোগ রেখেই 'আপন মনের মাধুরী' ছড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে ফিটজিরাল্ডের এই অসাধারণ অনুবাদ-গ্রন্থটি অনুবাদ হয়েও 'নূতন সৃষ্টি'তে পরিণত হয়েছে। তাই তার মৌলিক কবিতাগুলি কালের শাসনে হারিয়ে গিয়েছে, কিন্তু অনুবাদ-কাব্যটি আজও নিজস্ব মহিমায় সমুজ্জল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে অনুবাদকার্যের নানা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য নানা সাহিত্যের গদ্য, কবিতা ও নাটকের অনুবাদ শুরু হয়েছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ মধ্যযুগেও হয়েছে—রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও বিবিধ পুরাণের যে অনুবাদ হয়েছে তার প্রাচুর্য ও বিস্তৃতি কম নয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর অনুবাদ-সাহিত্য-রচয়িতাদের দৃষ্টি শুধু সংস্কৃত সাহিত্যের উপরেই নিবদ্ধ রইল না, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের বিচিত্র সৃষ্টির দিকেও তাঁদের দৃষ্টি প্রসারিত হল। এ বিষয়ে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কতকগুলি খণ্ডকবিতা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য—আর বিভিন্ন কাব্যাংশে মধুসূদনের অনুবাদ তো অনুবাদ নয়, নিজস্ব সৃষ্টি। অনুবাদকার্যে সে যুগে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদ-সাহিত্যের প্রসার যেমন বিপুল, তেমনি এর অনন্যসাধারণ বৈচিত্র্য। তা ছাড়া সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে তিনি একেবারে মূল থেকেই অনুবাদ করেছেন। প্রিয়নাথ সেনও বিদেশী কবিতার কিছু অনুবাদ করেছিলেন। ১৩০৭ সনের 'সাহিত্য' পত্রিকায় তিনি পারসিক কবিতার বৈশিষ্ট্য ও কাব্যরীতি অনুযায়ী ওমর খৈয়ামের অনুবাদ শুরু করেছিলেন। অক্ষয়কুমার বড়ালেরও কতকগুলি অনুবাদ-কবিতা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ভিক্টর হ্যুগো, শেলী, ব্রাউনিং প্রমুখের কতকগুলি গীতি-কবিতার তিনি অনুবাদ করেন। তাঁর 'পান্থ' কবিতাটি[১১] "ওমারের অনুবাদ ও অনুসরণ।"

১১। সাহিত্য : বৈশাখ, ১৩১৮।

অনুবাদকর্মের মূলে তিনটি কারণ সক্রিয় থাকতে পারে। প্রথমত, অনুবাদের ভিতর দিয়ে বিদেশী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ভাবকে নিজের ভাষায় সঞ্চারিত করে তাকে সমৃদ্ধ করে তোলা হয়। দ্বিতীয়ত, অনুবাদের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞান-পরিশীলিত মন অনেকটা তৃপ্তিলাভ করে। এই প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ-কবিতাগুলির কথা বলা যায়। সত্যেন্দ্রনাথের তীব্র জ্ঞানানুশীলনস্পৃহা, অধ্যয়ননিষ্ঠা ও গবেষকবৃত্তি তাঁর অনেকগুলি অনুবাদ কবিতা রচনার প্রেরণামূলে। বিদেশী কবিতার ছন্দসম্পদ ও কাব্যরূপ পর্যন্তও তিনি কখনো কখনো নিজের ভাষায় আত্মসাৎ করার চেষ্টা করেছেন। তৃতীয়ত, অনেক সময় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও অনুবাদ করা হয়। অবশ্য এ জাতীয় অনুবাদের সব সময় সাহিত্যিক মূল্য থাকে না। অনুবাদক দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথমোক্ত কারণেই অনুবাদকর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

বিদেশী কবিতার অনুবাদেও দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার গীতিধর্মিতা পরিস্ফুট হয়েছে। কাহিনীমূলক গাথা কবিতা, প্রেম ও লৌকিক জীবনের আনন্দ-বেদনা-সমন্বিত কবিতা, দেশপ্রেমের কবিতা ইত্যাদি বিচিত্রবিষয়াশ্রিত রচনা এখানে স্থান পেয়েছে। 'Auld Robin Gray' স্কটল্যাণ্ডের একটি বিখ্যাত গ্রাম্যগাথা। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই গ্রাম্যগাথার আঞ্চলিক ও স্থানিক চিত্রগুলিকে (local colour) সম্পূর্ণ ভাবে মুছে ফেলে তাঁকে বাংলা দেশের গ্রাম-জীবনের সহজ ও মর্মস্পর্শী একটি কাহিনীতে পরিণত করেছেন। হেম, নবীন ও রামী—দুজন গ্রাম্য তরুণ ও একজন গ্রাম্য তরুণীর কাহিনীকে নিয়ে কবি প্রেমজীবনের এক ত্রিভুজ রচনা করেছেন। স্কটল্যাণ্ডের বিশ্রুত কাহিনীটির আদর্শে কবি বাংলা দেশেরই একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী ফুটিয়ে তুলেছেন। হেমের সঙ্গে রামীর বিয়ে ঠিক। কিন্তু টাকার দরকার—তাই "টাকাকড়ির জন্য হেম গেল দেশান্তর।" এমন সময় রামীদের দুর্ভাগ্য ঘটল—গোরু চুরি গেল, মায়ের অসুখ হল—তাতে "বাবার কাজ বন্ধ হল, তাঁত বোনা মার।" পরিবারের এই দুঃসময়ে প্রৌঢ় নবীনই তাদের সংসার চালাত। কর্তব্যের খাতিরে নবীনকেই রামীর বিয়ে করতে হল, কিন্তু "পরাণ আমার রইল হেমের, নবীন হ'ল স্বামী।" বিয়ের অল্পদিন পরেই হেম ফিরে এসে রামীকে বিয়ে করতে চেয়েছে। রামীর মনে শুরু হল তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব। একদিকে সমাজ ও নীতির শাসন, অন্যদিকে ব্যক্তিহৃদয়ের তীব্র প্রেমাকাঙ্ক্ষা

—এই দুই বিপরীত প্রবাহের অন্তর্দ্বন্দ্বে সরলা কৃষককন্যার জীবনে যে মর্মান্তিক চিত্তদাহের সৃষ্টি হয়েছে, দ্বিজেন্দ্রলাল তাকে অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে রূপ দিয়েছেন। স্কটল্যাণ্ডের কৃষক তরুণীর মর্মব্যথাকে দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গবালার মর্মবেদনায় পরিণত করে এক চিরন্তন নারীহৃদয়ের সার্বজনীন আর্তধ্বনিকে মর্মরিত করে তুলেছেন :

যখন মেষরা তাদের পীঁড়ে গোয়ালেতে গাই
শ্রান্ত জগৎ ঘুমিয়ে যখন জেগে ত কেউ নাই,
তখন আমার চক্ষে ঝরে প্রাণের বারিধার,
আর পাশেতে ঘুমিয়ে থাকে সোয়ামী আমার।

অনুবাদ হয়েও কবিতাটি নূতন সৃষ্টিই হয়ে উঠেছে।

'We 're a Noddin'-ও আর একটি বিখ্যাত স্কচ গান। এই কবিতার অনুবাদে দ্বিজেন্দ্রলাল কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মূল কবিতার শব্দার্থ অনুবাদ করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, মূল রসটি বাঙালী মনেও গভীরভাবে সঞ্চারিত করার জন্য তিনি মৌখিক বুলি ও ভাবপ্রকাশক ধ্বন্যাত্মক শব্দকেও ব্যবহার করেছেন। হেম ফিরে এসেছে—এই খুশিকে কবি অতি সহজে অন্যের মনে সঞ্চারিত করেছেন :

কবে এ—এ সে গিয়েছিল পরাণ ছিল ভার,
বিদায় দিনু কেঁদে, ডেকে দেখব কি তায় আর।
এখন বড়ই খুসী খুসখুস খুসী
এখন বড়ই খুসী আছি মোরা ভাই।

'My heart's in the highland' গানটি শৈলবন্ধুর ও অগণিত হ্রদ-শোভিত আয়র্ল্যাণ্ডের আর একটি জনপ্রিয় সঙ্গীত। স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিষয়ক এই কবিতাটি দ্বিজেন্দ্র-কবিমানসের অত্যন্ত অনুকূল। পরবর্তী কালে দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রেমের কোনো কোনো গানে এই সঙ্গীতটির ভাবরস থাকা খুব বিচিত্র নয়। 'Caller Herring' কবিতাতেও কবি স্কটল্যাণ্ডের মৎস্যবিক্রেতাদের সুরটিকে বাংলাদেশের মৎস্যজীবীদের কণ্ঠেই ফুটিয়ে তুলেছেন :

কে, কিনবে তাজা পোনা মাছ এ,
তারা খেতে ভাল, হজমি আছে ;

কিনবে তাজা পোনা মাছ এ,
টাটকা ঝিলে ধরা।

বলা বাহুল্য, স্কটল্যাণ্ডের হেরিং মাছ বাংলাদেশের 'তাজা পোনা মাছে' পরিণত হয়েছে।

'Won't you buy my pretty flowers' গানটিকে মোটামুটি ভাবে একটি স্বচ্ছন্দ অনুবাদ বলা যায়। 'Some Folk' গানটির উল্লাসরস ছন্দের লঘুলীলায় ও চলতি ভাষার দ্রুতসঞ্চারী গতিতে সুন্দর ফুটে উঠেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল টম মূরের 'Go where glory waits thee' গানের অনুবাদ করেছেন। মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে অনুবাদকারীর কৃতিত্ব কতখানি, তা বোঝা যাবে। 'আইরিশ মেলোডিজ'-এ আছে :

When at eve thou rovest
By the star thou lovest,
Oh ! then remember me.
Think, then home returning,
Bright we've seen it burning,
Oh ! thus remember me.

দ্বিজেন্দ্রলাল অনুবাদ করেছেন :

যখন দেখবে, মধুর সাঁঝে,
সে তারাটি আকাশ মাঝে,
আমায় একবার মনে কোরো ;
আসতে মোরা বাড়ী ফিরে
দেখতেম সে তারাটিরে ;
আমায় একবার মনে কোরো।

'Erin oh Erin' গানটিতে মূর আয়র্ল্যাণ্ডের চারণ কবির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন—মাতৃভূমিকে প্রেয়সী কল্পনা করে আশাবাদী কবি জাগরণের মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। বলা বাহুল্য এ গানটিও দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-কল্পনার পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল হয়ে উঠেছিল। এই গানটির দ্বিতীয় স্তবকে আছে :

And though slavery's cloud o'er thy morning hath hung,
The full moon of freedom shall beam round thee yet.

মূরের গানের এই অংশটি পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলালের একটি সুবিখ্যাত গানে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের অনুবাদ কবিতাগুলির মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই এ কথা বলা যায় না। 'Under the green wood tree'-র মতো সুবিখ্যাত গানটির অনুবাদে অনেকখানি ভাবগত আড়ষ্টতা আছে—গানটির অন্তর্নিহিত লিরিসিজমও তাই ফুটে উঠতে পারে নি। স্কটের বিখ্যাত গান 'Auld Lang Syne'-এর অনুবাদ করেছেন বাংলা হরফে, কিন্তু হিন্দী ছড়া কবিতার ঢঙে। 'Home, Sweet home'-ও খুব রসোত্তীর্ণ অনুবাদ নয়, আড়ষ্টতা আছে। 'Rule Britania'-ও খুব ভালো অনূদিত হয় নি—প্রকাশরীতিতেও গদ্যাত্মক রীতি যেন প্রবল হয়ে উঠেছে। সম্ভবত, এই অনুবাদটি কবিরও খুব মনঃপূত হয় নি—তাই তিনি পরবর্তীকালে এই ছন্দে 'ভারতবর্ষ' গানটি লিখেছিলেন। কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও বিদেশী গানের অনুবাদে তিনি সার্থক হয়েছেন। এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এই সব গানকে আর কোনো কবি এমন সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ এক সময় অক্ষয় চৌধুরীর কাছে মূরের 'আইরিশ মেলডিজ'-এর কবিতাগুলির "মুগ্ধ আবৃত্তি" শুনেছিলেন। সেই থেকে তাঁর সেই গানগুলি সুরে শোনার ইচ্ছা হয়। বিলাতে গিয়ে তিনি সেই আশা পূর্ণ করেছিলেন।[৩২] তিনি এর কয়েকটি সঙ্গীত অনুবাদও করেছিলেন।[৩৩]

বিদেশী সঙ্গীতের অনুবাদের মধ্যে অনুবাদক দ্বিজেন্দ্রলালকে পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলালকে। তিনি অর্থব্যয় করে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত শিখেছিলেন, ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গেও তার গভীর পরিচয় ঘটেছিল। তাই তিনি অতি সহজেই সুরের ভিতর দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমের সমন্বয় করেছিলেন।

॥ ৭ ॥

'আর্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগে সৌন্দর্যের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও প্রেমের মাধুর্য স্বতঃস্ফূর্ত গীতি-উচ্ছ্বাসে প্রকাশিত হয়েছে। এই কাব্যটি প্রকাশ করার চার বছর আগে 'একঘরে' নামক বিদ্রূপাত্মক নকশা (১৮৮৯) প্রকাশিত হয়েছিল।

৩২। জীবনস্মৃতি. পৃঃ ১১২

৩৩। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, মাঘ, ১২৮৪ ও কার্তিক, ১২৮৬।

'আর্যগাথা' গ্রন্থাকারে চার বছর পরে প্রকাশিত হলেও এর কিছু কিছু কবিতা 'একঘরে' প্রকাশের আগেই লেখা হয়েছিল। সুগভীর পত্নীপ্রেম ও দাম্পত্য জীবনের সুখতৃপ্ত আস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সামাজিক নির্যাতনও ভোগ করতে হয়েছে। বিলাত-ফেরত হয়ে আসা ও বিবাহ-ব্যাপার এই দুটিই ছিল তাঁর সামাজিক নির্যাতনের কারণ। 'আর্যগাথা'র কবিতাগুলিতে যখন কবিজীবনের রোমান্টিক প্রেমস্বপ্ন গাঢ় হয়ে এসেছে, তখনই তিনি পাশাপাশি 'একঘরে' নকশায় বিদ্রূপের নির্মম হাতিয়ার হাতে নিয়েছেন। এইখান থেকেই দ্বিজেন্দ্রলালের কবিচরিতে একটি জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে অন্তর্মুখী কবিচিত্ত, আর একদিকে বহির্মুখী সামাজিক মন। অন্তর্মুখী কবিমনের সৃষ্টি 'আর্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগ, পারিপার্শ্বিক-সচেতন বহির্মুখী সামাজিক মনের সৃষ্টি পরবর্তী কাব্য 'আষাঢ়ে' (১৮৯৯)। এইখান থেকে দ্বিজেন্দ্র-কাব্য-প্রবাহের সমৃদ্ধি-পর্বের দ্বিতীয় স্তর শুরু হল। 'আষাঢ়ে' ও 'হাসির গানের' ফলশ্রুতি অনেকটা এক। সমৃদ্ধি-পর্বের সর্বশেষ স্তর 'মন্দ্র' কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে।

'আষাঢ়ে' দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বপ্রথম ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক কাব্য হলেও একে আকস্মিক বলা যায় না। দ্বিজেন্দ্রলালের লিরিকের অন্তরালে যে শৈলবন্ধুর কঙ্করময় একটি অংশ ছিল, 'আর্যগাথায়' মাঝে মাঝে তার উগ্র প্রকাশ ঘটেছে—সেখানে গান নেই, আছে সংলাপাত্মক গদ্য, আছে যুক্তি-তর্কের ভাষা। 'একঘরে'-র গদ্যরীতিই যেন গীতিরসে অভিষিক্ত হয়ে সেখানে দেখা দিয়েছে, কিন্তু তবুও তার বলিষ্ঠ ঋজু যুক্তিপন্থী মেজাজ অপসারিত হয় নি—তাই সেখানে লিরিকের লতা-নমনীয় আবেদন মাঝে মাঝে শব্দ-পেশল গদ্যাত্মক ভঙ্গির দ্বারা ব্যাহত হয়েছে। এ সম্পর্কে আর একটি প্রসঙ্গও উল্লেখযোগ্য। 'আষাঢ়ে' প্রকাশের আগে 'হাসির গান'-এর কয়েকটি গানও লেখা হয়েছিল। সেই গানগুলি অবলম্বন করে 'আষাঢ়ে' প্রকাশের আগেই তিনি দুখানি প্রহসন লিখেছিলেন—'কল্কি অবতার' (১৮৯৫) ও 'বিরহ' (১৮৯৭)। সুতরাং দ্বিজেন্দ্রলালের মন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই ছিল। 'একঘরে' নকশায় তিনি যে বিদ্রূপের গাণ্ডীবে টঙ্কার দিয়েছিলেন, তার তীব্র উচ্চনাদ তাঁর কবিজীবনের আর একটি অধ্যায়কে সচকিত করে তুলেছে।

'আষাঢ়ে' কাব্যগ্রন্থটিতে কয়েকটি হাসির গল্প সঙ্কলিত হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরস এখানে পার্বত্য নদীর মতোই খরস্রোতা। গল্পগুলির প্রত্যেকটিতে এক-একটি প্রবল 'হাস্যজনক অসঙ্গতি' আছে—সেই অসঙ্গতিই হাস্যরসকে জমিয়ে তুলেছে। রচনার মধ্যে এমন একটি স্বতঃস্ফূর্ত ভাব আছে, যা অনায়াসেই গল্পগুলিকে গতি-মুখর করে তুলেছে। এই অনায়াস-স্বচ্ছন্দ গতির উপরে কবির "সুনিপুণ হাস্য ও সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপের" বৈদ্যুতিক দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয়েছে। প্রত্যেক কবিতার মধ্যেই একটি সরব ও প্রাণখোলা হাসি আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসি সরব, প্রবল, স্পষ্টোজ্জ্বল ও প্রাণখোলা। 'আষাঢ়ের' গল্পগুলি শুধু বুদ্ধিকেই নাড়া দেয় না, মনকেও মাতিয়ে তোলে। সমানরসরসিকদের আড্ডায় দ্বিজেন্দ্রলাল যেন তাঁর গল্পগুলি বলেছেন—স্ফূর্তির প্রবাহে ও মজাদার গল্পগুলির অভ্রান্ত আবেদনে সর্বশ্রেণীর শ্রোতাই যেন আমোদ অনুভব করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের লীলা ছিল, তা যেমন তাঁর কাব্যে-নাটকে তেমনি 'আষাঢ়ে' ও 'হাসির গানের' মতো হাস্যরসের কবিতায় আত্মপ্রকাশ করেছে। যে প্রবলতা ও স্পষ্টতা কবিতা ও নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের নিজস্ব স্টাইলকে সুনিশ্চিত করে তুলেছে, সেই গুণই তাঁর হাস্য-রসাত্মক কবিতাগুলির মধ্যে তির্যক ভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করেছে।

'আষাঢ়ে'র গল্পগুলি একজাতীয় নয়—এদের মধ্যেও বিভিন্ন পর্যায় আছে। 'কেরাণী' কবিতায় কবি চাকুরিজীবনের বিড়ম্বনা ও রুক্ষ বাস্তবের ছবি এঁকেছেন। জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই যেন সঙ্গতি নেই—ছন্দ নেই। এই ছন্দহীন রোমান্স-বর্জিত জীবনের প্রতিটি অসঙ্গতি দ্বিজেন্দ্রলালের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই অসঙ্গতির কোনো কোনো অংশ সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়, আর কতকগুলি কবির অভিনব আবিষ্কার—দ্বিতীয় শ্রেণীর অসঙ্গতিগুলিই কবিতাটিকে উপভোগ্য করে তুলেছে। সহজ অসঙ্গতিগুলিতে তৃপ্ত না হয়ে কবি নূতন অসঙ্গতি আবিষ্কার করেছেন—অ্যান্টিক্লাইম্যাক্সের লক্ষ্যভেদী অগ্নিবাণকে যতদূর সম্ভব তীক্ষ্ণচূড় করেছেন :

হুঁকো টেনে কোসে',
ভাঙ্গা চ্যারে বোসে',
দিস্তেখানেক কাগজেতে কলম ঘোষে' ঘোষে',
মাথায় বেরোল ঘাম ;—এবং ঠোঁটে লাগলো কালি,
গোঁফও গেল ঝুলে, খেয়ে মুনিবদত্ত গালি।

ভাঙা চেয়ারে বসে হুঁকো খাওয়া, দিস্তেখানেক কাগজে কলম ঘষা, মাথায় ঘাম বেরোনো ও ঠোঁটে কালি লাগা—এমন কিছু অসঙ্গত ব্যাপার নয়, বলার কৌশলে যতটুকু রসিকতা সৃষ্ট হয়েছে! কিন্তু শেষ চরণের 'গোঁফও গেল ঝুলে'—যেমন উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেয়, তেমনি তীব্র অসঙ্গতির সৃষ্টি করে—উল্লেখমাত্রেই শ্রোতা সশব্দ হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। ব্যঙ্গাত্মক অতিরঞ্জিত ছবি আঁকায়ও দ্বিজেন্দ্রলাল অনায়াস-সাবলীলতার পরিচয় দিয়েছেন :

চল্লিশ বছর থেকেই
চুলও গেল পেকে,
মাংসও গেল ঝুলে, সুঠাম শরীর গেল বেঁকে,
দাঁতও হল জীর্ণ, এবং ভুঁড়ি গেল থেমে,
চিবুক গেল উঠে,—এবং নাকও গেল নেমে।

স্বাভাবিক ব[illegible]েই একটু অতিরঞ্জিত করেছেন মাত্র—এত সাধারণ উপাদান থেকে কবি একটি প্রথম শ্রেণীর ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন।

'অদল বদল' কবিতাটি আগাগোড়া কৌতুকরসের। কবিতাটির হাস্যরস চারিত্রিক অসঙ্গতি থেকে উদ্ভূত হয় নি—ঘটনা-সংস্থানের কৌশল ও ঘটনা-বিন্যাসের কৌতুককর অসঙ্গতি থেকেই এখানকার হাস্যরস সৃষ্ট হয়েছে। স্ত্রী বদলের ব্যাপারটির মধ্যে হয়তো কিঞ্চিৎ আকস্মিকতা আছে, কিন্তু ছোট আদালতের বৃদ্ধ হাকিমটির কৌতুককর ঘটনা যুক্ত হয়ে তাকে উপভোগ্য করে তোলা হয়েছে। এখানে সূত্র তিনটি—স্ত্রী বদল, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা ও আদালতের কৌতুকোজ্জ্বল চিত্র। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রহসনটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র হাস্যরসের প্রকৃতি নির্দেশ করেছেন—তিনি 'Mistake' ও 'Folly'-কে 'ব্যঙ্গের যোগ্য' বলেছেন, কিন্তু 'Error'-কে বলেছেন ব্যঙ্গের অযোগ্য।[৩৪] কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল এই অংশটিকে একটু অস্পষ্ট রেখেছেন—গোপীর ব্যাপারটি অজ্ঞানতা-প্রসূত কি স্বেচ্ছাকৃত, সেখানে একটু প্যাঁচ রেখেছেন :

এখন না হয় গোপীনাথের কপালের জোর,
নয়ত সে কুচরিত্র অথবা চোর,

৩৪। বঙ্গদর্শন, চৈত্র, ১২৭৯।

কিম্বা অন্ধকারে নিজেই স্ত্রীই অনুমানি,
নিল গোপী চেলিপরা জজের স্ত্রীকেই টানি।

কিন্তু শুধু এইটুকুর উপরে হাস্যরস দাঁড়াতে পারত না, তাই তিনি বৃদ্ধ জজ সাহেবের নাস্তানাবুদ হওয়ার ছবি ও আদালতের উকিলদের জেরার কৌতুকদীপ্ত ছবি দিয়ে গল্পটিকে রসোত্তীর্ণ করেছেন। 'Mistake' বা 'Eroor' যাই হোক না কেন সেটি বড় কথা নয়, আসল কথা হল বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা গ্রহণের বিড়ম্বনা। সুতরাং কৌতুকরসের স্নিগ্ধতা পরিশেষে সামাজিক ব্যঙ্গের অম্লরসে পরিণত হয়েছে। 'হরিনাথের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা' গল্পটিতে নব-বিবাহিত হরিনাথের শ্বশুরবাড়ি যাত্রার কৌতুককর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাস পড়ে হরিনাথের মনে যে রোমান্স রসের উদ্রেক হয়েছিল, তাকে এক আকস্মিক রূঢ় আঘাতে চূর্ণ করা হয়েছে। দাড়ির কাহিনীটি যুক্ত করে কবি গল্পটিকে সরস করে তুলেছেন। রোমান্স জগতের রঙে ও রসে যে সমস্ত অবাস্তব ভাবালুতার সৃষ্টি হয়েছিল, বাস্তবের নির্মম অট্টহাস্যে তা মিলিয়ে গিয়েছে। তথাকথিত অবাস্তব ভাবালুতার বিরুদ্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন খড়্গহস্ত। অবাস্তব রোমান্সের সঙ্গে বাস্তবের তীব্র অসঙ্গতি-প্রসূত ব্যঙ্গ দ্বিজেন্দ্রলালের অনেক রচনার প্রাণ। 'রাজা নবকৃষ্ণ রায়ের সমস্যা' কবিতাটির মূল রসকেন্দ্রটি দ্বিধাগ্রস্ত ও কিঞ্চিৎ শিথিল। নবকৃষ্ণ রায়ের চরিত্রটি উদ্ভট—তাঁর খেয়ালও ততোধিক উদ্ভট, রবীন্দ্রনাথের 'হিং টিং ছট' কবিতার হবুচন্দ্র রাজার উদ্ভট স্বপ্নদর্শন ও বিচিত্র খেয়ালের কথা মনে করিয়ে দেয়। ধনী-নন্দন নবকৃষ্ণের সময় কাটে না। কিন্তু গল্পটির প্রথমাংশের সঙ্গে দ্বিতীয়াংশের কোনো গভীর সংযোগ নেই। নবকৃষ্ণের সমস্যার সঙ্গে সাহিত্যিক পূর্ণচন্দ্র, সম্পাদক নন্দদুলাল, হিন্দুধর্ম-সংরক্ষক জীবন সরকার, আড্ডাবাজ ও তাস-পাশা খেলার ওস্তাদ মহেন্দ্র ঘোষ, আফিংখোর ও গল্পবাজ কৃষ্ণকমল, বেশ্যাসক্ত ও মদ্যপায়ী রতিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি চরিত্রের কোনো সাক্ষাৎ যোগ নেই। বিচ্ছিন্ন ব্যঙ্গচিত্র হিসেবে প্রত্যেকটির মূল্য আছে, কিন্তু সমস্ত চরিত্র মিলে ব্যঙ্গগল্পের একটি সংহতি গড়ে ওঠে নি। অথচ প্রত্যেকটি চিত্রের অন্তরালে সমাজের এক-একটি শ্রেণীকেই বিদ্রূপ করা হয়েছে। 'কর্ণবিমর্দন কাহিনী' দ্বিজেন্দ্রলালের একটি অপূর্ব সৃষ্টি। কবিতাটির ছন্দের সঙ্গে বিষয়ের অসঙ্গতি হাস্যরসটিকে ফুটিয়ে তুলেছে। ছন্দ পজ্ঝটিকা কিন্তু

বিষয়টি কর্ণবিমর্দনের, আর ভাষায় তৎসম ও চলতি শব্দের অবাধ মিশ্রণ ঘটেছে। এই সমস্ত বিরোধের ফলে কৌতুকহাস্যের নির্মল ধারা স্বতোৎসারিত হয়েছে।

'আষাঢে' কাব্যটির মধ্যে বিশুদ্ধ কৌতুকরস ছাড়াও, সামাজিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও আছে। ব্যক্তিগত জীবনের সামাজিক উৎপীড়নের তিক্ততা দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিজীবন ও শিল্পীজীবনকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করেছে। 'শ্রীহরি গোস্বামী', 'বাঙ্গালী-মহিমা,' 'ভট্টপল্লীতে সভা,' 'নসীরাম পালের বক্তৃতা', 'কলিযজ্ঞ', 'শুকদেব' প্রভৃতি কবিতার মূলরস স্যাটায়ার। 'শ্রীহরি-গোস্বামী' কবিতা তৎকালীন সামাজিক জীবনের অসঙ্গতিকেই লক্ষ্য করে লেখা। নব্যহিন্দুধর্মবাদীদের প্রচার ও আচারের যে বিরোধ তাই তিনি কবিতাটিতে প্রকাশ করেছেন। দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যে এই জাতীয় চরিত্র ও কাহিনী বিরল নয়। 'ভট্টপল্লীতে সভা' কবিতাটির সঙ্গে 'কল্কি অবতার' (১৮৯৫) প্রহসনের একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে। কবিতাটির প্রথমাংশে ভট্টপল্লীর পণ্ডিতদের "তৈলাধার পাত্র, কি পাত্রাধার তৈল" নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণের কৌতুকচিত্র আঁকা হয়েছে, দ্বিতীয় প্রস্তাবে দেবসভার ব্যঙ্গাত্মক পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কবিতাটি প্রসঙ্গে 'কল্কি-অবতার' প্রহসনের ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলালের একটি উক্তি স্মরণীয়: "স্থানে স্থানে দেবদেবী লইয়া একটু আধটু রহস্য আছে। তাহা ব্যঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে নহে। গ্রন্থখানির প্রধান উদ্দেশ্য, সমাজ বিভ্রাট। তাহা দেখাইতে গেলেই দেব-দেবী বিষয়ক একটু আধটু কথার অবতারণা করা আবশ্যক। কারণ হিন্দুসমাজ ধর্মের সহিত এত দৃঢ় সংশ্লিষ্ট যে একের কথা বলিতে গেলে অন্যের কথা অনিবার্য রূপে আসিয়া পড়ে।" অনুষ্টুপ ছন্দে লেখা 'কলিযজ্ঞ' কবিতাটি রেজল্যুশন বিষয়ে দক্ষ ও বক্তৃতা সর্বস্ব বাঙালী জাতির তথাকথিত রাজনৈতিক চেতনাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। অনুষ্টুপ ছন্দে আদিকবি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেছিলেন—সেই খ্যাতকীর্তি ক্লাসিক ছন্দে দ্বিজেন্দ্রলাল অতি তুচ্ছ একটি বিষয়কে রূপ দেওয়ার ফলে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। ছন্দ 'সাব্লাইম' কিন্তু বিষয়টি 'রিডিক্যুলাস'। 'নসীরাম পালের' বক্তৃতায় স্ত্রীশিক্ষা ও নারীপ্রগতি বিরোধী রক্ষণশীলদের তীব্রভাবে বিদ্রূপ করেছেন। 'ডেপুটি-কাহিনী' ও 'বাঙ্গালী-মহিমা' কবিতাতেও বিদ্রূপ আছে, কিন্তু বিদ্রূপের চেয়ে সেখানে কৌতুকই বড় হয়ে উঠেছে।

'আষাঢ়ে' রচনা সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল একটি ইংরেজি ব্যঙ্গকাব্যের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন: "বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাঙ্গালা ভাষায় হাস্যরসাত্মক কবিতার অভাব পূরণ করিবার অভিপ্রায়ে 'Ingoldsby Legends'-এর অনুকরণে কতকগুলি হাস্যরসাত্মক বাঙ্গালা কবিতা লিখিয়া 'আষাঢ়ে' নামে প্রকাশ করি।"[৩৫] রেভারেণ্ড রিচার্ড হ্যারিস বারহাম (১৭৮৮-১৮৪৫) রচিত 'ইনগোল্ডসবি লিজেণ্ডস' উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে (১৮৪০) ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক কবিতার মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। টমাস ইনগোল্ডসবি ছদ্মনাম নিয়ে তিনি তাঁর এই কাব্যটি রচনা করেছিলেন। কিন্তু 'আষাঢ়ের' সঙ্গে ইংরেজি কাব্যটির খুব বেশী আত্মিক সম্পর্ক নেই। কারণ কতকগুলি মধ্যযুগীয় গল্প, সংস্কার, ভৌতিক ব্যাপার, ধর্মসম্পর্কিত বিধি-ব্যবস্থা, অসংস্কৃত লোকসঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়কে ইনগোল্ডসবি লঘুতরল ভঙ্গিতে পরিবেশন করেছেন। এক 'ভট্টপল্লীর সভা' ছাড়া অন্য কোনো কবিতায় কোনো প্রাচীন প্রচলিত কাহিনীর ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণ নেই। বারহামের মতো তাঁর কোনো 'Grotesque miracles'এর প্রতি আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু দুটি বিষয়ে ইনগোল্ডসবির সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের মিল ছিল। ইনগোল্ডসবিও অসঙ্গতি দূর করতেই চেয়েছিলেন—তবে অন্যভাবে—"Whose only concern at the end of his life was that his purpose should be recognised for what it was—an honest endeavour to combat error and imposture in an age of scientific doubt and unrest."[৩৬] ইনগোল্ডসবি প্রচলিত প্রসিদ্ধ গাথা ও কাহিনীকে নিয়ে লঘু ভঙ্গিতে তাকে নূতন করে বলেছেন—'বেবস ইন দি উড', 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস' প্রভৃতি রচনা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তা ছাড়া, ইনগোল্ডসবির moral-এর অনুসরণে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর কোনো কোনো কবিতার শেষে মর্মার্থ যোগ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের কাল-সচেতন মন প্রধানত তাঁর দেশ-কালকে অবলম্বন করেই হাস্যরস সৃষ্টি করেছে। কিন্তু ইনগোল্ডসবির গল্প বলার

৩৫। নাট্যমন্দির: শ্রাবণ, ১৩১৭।

৩৬। The Ingoldsby Legends. Edited by John Tanfield and Guy Boas Introduction, Page X.

বিশেষ ধরনের ভঙ্গি এবং ছন্দ ও ভাষার বৈশিষ্ট্য দ্বিজেন্দ্রলালকে প্রভাবিত করেছিল। বিদেশী কাব্যের প্রভাব সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলালের মৌলিকত্ব এই কাব্যে অক্ষুন্ন আছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'আষাঢ়ে' কাব্য প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যের এক সমালোচনা লেখেন।[৩৭] এই প্রবন্ধে তিনি ছন্দ সম্পর্কেই বেশী আলোচনা করেছেন—ভাষার শৈথিল্য সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের কৈফিয়তকে তিনি মেনে নিয়েছেন, কিন্তু ছন্দ-শৈথিল্য সম্পর্কে তিনি অভিযোগ করেছেন : …"ছন্দের শৈথিল্য হাস্যরসের নিবিড়তা নষ্ট করে। কারণ হাস্যরসের প্রধান দুইটি উপাদান, অবাধ দ্রুতবেগ ও অভাবনীয়তা। যদি পড়িতে গিয়া ছন্দের বাধা পাইয়া যতিস্থাপন সম্বন্ধে দুই তিনবার দুই-তিন রকম পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয় তবে সেই চেষ্টার মধ্যে হাস্যের তীক্ষ্ণতা আপন ধার নষ্ট করিয়া ফেলে।…"আষাঢ়ে"র অনেকগুলি কবিতা ছন্দের উচ্ছৃঙ্খলতাবশত আবৃত্তির পক্ষে সুগম হয় নাই বলিয়া অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে।" নিয়মিত ছন্দের কবিতাগুলিই রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু তবুও কবি "ছন্দ ও মিলের উপর গ্রন্থকারের আশ্চর্য দখলে"র কথা স্বীকার করেছেন : "উত্তপ্ত লৌহচক্রে হাতুড়ি পড়িতে থাকিলে যেমন স্ফুলিঙ্গবৃষ্টি হইতে থাকে তাহার ছন্দের প্রত্যেক ঝোঁকের মুখে তেমনি করিয়া মিল বর্ষণ হইয়াছে। সেই মিলগুলি বন্দুকের ক্যাপের মতো আকস্মিক হাস্যোদ্দীপনায় পরিপূর্ণ। ছন্দের কঠিনতাও যে কবিকে দমাইতে পারে না তাহারও অনেক উদাহরণ আছে।"

দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার টেকনিক সর্বত্র সমানভাবে সার্থক না হলেও তার শোষণশক্তি অসাধারণ—গুরুগম্ভীর তৎসম শব্দ থেকে চলতি ভাষা, আঞ্চলিক ভাষা এমন কি 'স্ল্যাং' পর্যন্ত কবি ব্যবহার করেছেন। তা ছাড়া ইংরেজি, হিন্দী, আরবি-ফারসি, সংস্কৃত—নানাজাতীয় শব্দের বিচিত্র মিশ্রণে তিনি এই কাহিনীগুলি রচনা করেছেন, ছন্দের ছাঁচের মধ্যে ঢেলে সবগুলিকে মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়েও তিনি ইনগোল্ডসবিরই অনুসরণ করেছেন। বারহামের কাহিনী সম্পর্কে বলা হয়েছে : "With Barham the fantastic rhyming is part of his facile versification. True,

৩৭। ভারতী : অগ্রহায়ণ, ১৩০৫।

he generally used a loose metre, designed for portmanteau purposes : but even so, his verse has an Ostrich stomach. Legal jargon, current slang, quotations in four or five languages, and untractable proper names, all drop into his scurrying pace. Occasionally he solves the problem by splitting a word at the end of the line."[৩৮] এর অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যই 'আষাঢ়ে' কাব্যটিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'আষাঢ়ে' কাব্যের রস-বৈচিত্র্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথই চরম কথা বলে দিয়েছেন : "তাহা ছাড়া সাময়িক পত্রে মধ্যে মধ্যে "আষাঢ়ে" রচয়িতার এমন সকল কবিতা বাহির হইয়াছে যাহাতে হাস্য এবং অশ্রুরেখা, কৌতুক এবং কল্পনা, উপরিতলের ফেনপুঞ্জ এবং নিম্নতলের গভীরতা একত্র প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাই তাঁহার কবিত্বের যথার্থ পরিচয়। তিনি যে কেবল বাঙালিকে হাসাইবার জন্য আসেন নাই সেই সঙ্গে তাহাদিগকে যে ভাবাইবেন এবং মাতাইবেন এমন আশ্বাস দিয়াছেন।" রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য শুধু রসজ্ঞের বিচারই নয়—এর ভিতর দিয়ে দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার স্বরূপ-ধর্ম সম্পর্কেও তিনি মূল্যবান নির্দেশ দিয়েছেন।

॥ ৮ ॥

'হাসির গানের' অনেকগুলি গান 'আষাঢ়ে' প্রকাশের অনেক আগেই রচিত হয়েছিল। সেই গানগুলিকে মূলত ভিত্তি করে দ্বিজেন্দ্রলাল 'কল্কি-অবতার' ও 'বিরহ' নামে দুটি প্রহসন রচনা করেন। পরবর্তী প্রহসনগুলির মূলও এই 'হাসির গান'। কিন্তু হাসির গানের সঙ্কলনটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'আষাঢ়ে'র এক বছর পরে (১৯০০)। এক হিসেবে 'হাসির গান' সমগ্র দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যের কেন্দ্রীয় উপাদান—কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালকে একই সূত্রে সংযুক্ত করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসাত্মক কবিতা ও গান হিসাবে এর একটি সর্বজনস্বীকৃত স্থান আছে—কিন্তু প্রহসন ও নাটকের দিক থেকেও এই অসাধারণ সৃষ্টির মূল্য কম নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনগুলির আসল প্রাণ

৩৮। The Ingoldsby Legends : Edited John Tanfield and Guy Boas : Introduction, Pp XIII-XIV.

এই হাসির গান। এই গানগুলি বাদ দিলে প্রহসনগুলির মূল আবেদন নষ্ট হয়ে যায়। 'হাসির গান'-এর জনপ্রিয়তা ও গ্রন্থাকারে প্রকাশ সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন: "বিবাহান্তে অনেকগুলি প্রেমের গান রচনা করিয়া আর্যগাথা দ্বিতীয় ভাগ নাম দিয়া ছাপাই এবং কতকগুলি হাসির গানও রচনা করি। এই হাসির গানগুলি অবিলম্বে অনেকের প্রিয় হয় এবং কার্যোপলক্ষে কোন নগরে যাইলেই ঐ সকল গান আমার স্বয়ং গাহিয়া শুনাইতে হইত। সেগুলি একত্রে গ্রন্থাকারে বহুদিন পরে প্রকাশিত হয়।"[৩]

দ্বিজেন্দ্রলালের সমৃদ্ধি-পর্বের রোমান্টিক গীতিধর্মী সুর যেমন 'আর্যগাথা'য় প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি 'আষাঢ়ে' ও 'হাসির গানে' হাস্যরসাত্মক ধারাটি পূর্ণায়ত হয়ে উঠেছে। এক দিক থেকে বিচার করতে গেলে 'আষাঢ়ে' ও 'হাসির গান'কে একই মানসিকতার সৃষ্টি বলতে হবে। 'আষাঢ়ে' কাব্যগ্রন্থের সুরটি 'হাসির গানে' আরও পরিণত ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, 'আষাঢ়ে' কাব্যের প্রকাশরীতিগত ও ভাবগত দুর্বলতাও এই সঙ্কলনটিতে আর নেই। 'আষাঢ়ে' বিদ্রূপ-কৌতুকের প্রথম জলোচ্ছ্বাস—প্রথম বর্ষার আকস্মিক যৌবন-সঞ্চারের একটি প্রগলভ ও দুর্বিনীত আবেগ, তাই অসম পদক্ষেপের স্খলনচিহ্নও সেখানে অনুপস্থিত নয়। 'হাসির গান' কবির বিভিন্ন বয়সের সঙ্গীত-সঙ্কলন—বিষয়-বৈচিত্র্যে ও রস-বৈচিত্র্যে রচয়িতার অনন্যসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় বহন করে। 'হাসির গান'-এর কোনো কোনো রচনায় যৌবনের উচ্ছলতার সঙ্গে প্রৌঢ়ত্বের স্থিরদৃষ্টির সমন্বয় ঘটেছে। তাই 'হাসির গান' হাসির গান হয়েও যেন আরও কিছু—হাসি ও অশ্রু যেন এক-এক সময় সম্পূর্ণ এক হয়ে যায়। স্বতঃস্ফূর্ততা ও উদ্ভাবনী শক্তির সঙ্গে জীবনের এক-একটি সত্য যেন গতিশীলতার তরঙ্গচূড়ায় মণিখণ্ডের মতো জ্বলে ওঠে। তাই 'হাসির গান' পরিণত বর্ষার পরিপূর্ণ রূপ—আবেগ, চাঞ্চল্য ও শফরীনৃত্য এখানেও আছে, কিন্তু কবির জীবন-পরিণতির বর্ণে তার রূপ একটু স্বতন্ত্র।

কিন্তু 'হাসির গানে'র প্রথম দিকের রচনার সঙ্গে পূর্ববর্তী কাব্য 'আষাঢ়ে'র একটি নিকট সম্পর্ক আছে। সম্ভবত ইনগোল্ডসবির গল্পগুলি তখনও তাঁর মনে নানাভাবে আন্দোলিত হচ্ছিল। 'হাসির গান'-এর পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রসঙ্গগুলি রচনার টেকনিক ইনগোল্ডসবি কাহিনীগুলির মতো। এই সমস্ত

৩৯। নাট্যমন্দির: শ্রাবণ, ১৩১৭।

কাহিনীতে স্বেচ্ছাকৃত কালানৌচিত্য (Anachronism) দোষ ঘটিয়ে উদ্ভট ঘটনা ও চরিত্রের সৃষ্টি করা হয়েছে।[৪০] বারহাম সাহেব পুরাবিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। যে যুগ অবলম্বন করে তিনি উদ্ভট ঘটনাসংস্থান ও হাস্যরস সৃষ্টি করতেন, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনা সম্পর্কে তাঁর অত্যন্ত সুস্পষ্ট ধারণা ছিল —তাই তিনি অনায়াসে একজন দ্বাদশ শতাব্দীর কাউন্টের সঙ্গে ষোড়শ শতকের একজন জাদুকরের সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিতে পেরেছেন; শুধু তাই নয়, কালগত অসঙ্গতিকে আরও বাড়িয়ে তোলার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর এক অভিজাত ভোজসভাকে তার সঙ্গে সুকৌশলে যোগ করে দিয়েছেন!

'তানসান্-বিক্রমাদিত্য-সংবাদ', 'রাম-বনবাস', 'দুর্বাসা', 'কালোরূপ', 'কৃষ্ণ-রাধিকা-সংবাদ' প্রভৃতি গানে দ্বিজেন্দ্রলাল বারহামের মতোই সুকৌশলে কালগত অসঙ্গতি সৃষ্টি করেছেন। 'তানসান্-বিক্রমাদিত্য' গানটির প্রতি চরণে কালের অসঙ্গতি। ইতিহাস সম্পর্কে যাঁর স্বল্পতম জ্ঞানও আছে, তিনিই পড়তে পড়তে হাস্যকর অসঙ্গতির সঙ্গে বহুবার ধাক্কা খাবেন—এই উদ্ভট পদ্ধতিই কবিতাটির হাস্যরস সৃষ্টির মূলে। রাজা বিক্রমাদিত্য, তানসেন দুজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে এক সঙ্গে ভেট করিয়ে দিয়েই তিনি শান্ত হন নি—'কলকাতা', 'রেলের গাড়ী', 'হুগলি ব্রিজ', 'পিয়ানো', 'ওয়াটারপ্রুফ', —প্রভৃতি হাল-আমলের জিনিসগুলিকে টেনে এনেছেন। অনেকগুলি আপাত-অসংলগ্ন প্রসঙ্গ ভেদ করে একটি সত্য আবিষ্কার করা যায়—"আজও রোজ রোজ অনেক ওস্তাদ করেন তাঁহার শ্রাদ্ধ।"—এখানে কটাক্ষ থাকাও বিচিত্র নয়! পুরাণের সিদ্ধরসকেও লঘুরসের সাহায্যে কৌতুককর করে তোলা হয়েছে। 'রাম-বনবাস' কবিতায় রামায়ণের তুঙ্গশীর্ষ-মহিমা থেকে কবি তাঁর বক্তব্যকে বর্তমানকালের লৌকিক ভূমিতে নামিয়ে এনেছেন—অ্যান্টিক্লাইম্যাক্সের দ্রুতসঞ্চারা গতি যে কৌতুকাবহ অসঙ্গতির সৃষ্টি করেছে, তাই কবিতার রসকেন্দ্র :

> যদি নিতান্ত যাইবি বনে, সঙ্গে নে সীতা লক্ষ্মণে,
> ভালো এক জোড় পাশা, আর ঐ (ওরে) ভাল দু জোড় তাস।
> ও কি হেরি সর্বনাশ।

৪০। "Barham, for the most part ignoring the pun, had two favourite devices, anachronism and the outrageous rhyme."—Ingoldsby Legends : Introduction, Page XIII.

ওরে আমি যদি তুই হইতাম, পোর্টমাণ্টর ভিতরে নিতাম
বঙ্কিমের ঐ খানকতক (ওরে) ভালো উপন্যাস।

'দুর্বাসা' কবিতায় গুরু বিষয়কে লঘু করতে গিয়ে পৌরাণিক দুর্বাসার দুর্গতি ঘটিয়েছেন। 'কৃষ্ণ-রাধিকা সংবাদ' কবিতা সংলাপাত্মক। রাধাকৃষ্ণের "হ্লাদিনী শক্তি" বা "অখিলরসামৃত" মূর্তি এখানে একেবারেই নেই—তার বদলে একালের তরুণ-তরুণীর মান-অভিমানের লৌকিক ছবি ফুটেছে। কবিতাটিতে যে কৌতুকরস সৃষ্ট হয়েছে তা শেষ দিকে সশব্দ উচ্চহাস্যে ফেটে পড়েছে :

কৃষ্ণ বলে "এমন বর্ণ দেখি নি ত কভু"
আর—রাধা বলে "হাঁ আজ সাবান মাখি নি ত তবু—
নইলে আরও শাদা"।

কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের 'নব্য বঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ' (মানসী)-এর প্রভাব আছে বলে মনে হয়। বৈষ্ণব কবিরা "কালিয়া" রূপের ভাবসমৃদ্ধ ব্যাখ্যা প্রকাশ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'কালোরূপ' কবিতায় কোনো রোমান্স নেই—উৎকট-মধুর লঘু-গুরু, সম্ভব-অসম্ভব, আপাত-বিপরীত রসগুলিকে একই সঙ্গে মিশিয়ে তিনি একই পাত্রে পরিবেশন করেন। কালো রঙের লিস্ট অ্যাণ্টিক্লাইম্যাক্সের সর্বশেষ ধাপে যখন এসে পৌঁছল তখন বৈষ্ণবীয় রোমান্সের নেশা আর নেই, কারণ তখন 'গদাধরের পিসি কালো' পর্যন্ত উপমার নিম্নমুখী ধারা নেমে এসেছে।

সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের অসঙ্গতিকে তিনি বিদ্রূপের তীব্র কশাঘাত করেছেন। 'Reformed Hindoos,' 'বিলাতফের্তা,' 'চম্পটির দল,' 'নতুন কিছু করো,' 'নবকুলকামিনী,' 'বদলে গেল মতটা,' 'নন্দলাল' প্রভৃতি কবিতায় ও গানে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রকৃতপক্ষে তার সমকালীন দেশকালের ত্রুটি-বিচ্যুতিকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল বাস্তববিমুখ পলায়নবাদী কবি ছিলেন না, যে সামাজিক পরিবেশে তিনি বাস করেছেন, তাকে তিনি মোহমুক্তভাবে বিচারকের দৃষ্টিতেই দেখেছিলেন। তিনি যে বলিষ্ঠতা ও উন্নত জীবনাদর্শের পক্ষপাতী ছিলেন, তার ব্যতিক্রম যেখানেই দেখেছেন সেখানেই তার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অব্যর্থ শরজাল বর্ষিত হয়েছে। এই শ্রেণীর হাস্যরসে তাই নিছক কৌতুকরসই প্রাধান্য লাভ

করে নি, একটি মর্মভেদী অন্তর্জ্বালাও ফুটে উঠেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের সামাজিক বিদ্রূপ 'হাসির গান'-এর একটি প্রধান অংশ। এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক একজন সাহিত্যিকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

"যখন দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত হইতে এদেশে ফিরিয়া আসেন তখন বাঙ্গালায় ভাবস্থবিরতা ঘটিয়াছিল। তখন কেবল বচনের আস্ফালন ছিল, নব্যহিন্দু কেবল আর্যামির আস্ফালন করিতেছিলেন, উন্নতিশীল শিক্ষিত সম্প্রদায় সমাজ-সংস্কারের দোহাই দিয়া কেবল স্বেচ্ছাচারের আস্ফালন করিতেছিলেন, এবং রাজনৈতিক সম্প্রদায় কংগ্রেসের বিশালতায় আগ্রীব নিমজ্জিত হইয়া কেবল একতার আস্ফালন করিতেছিলেন। "ন্যাকামি"-র প্রভাব চারিদিকে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতের Humour বা ব্যঙ্গের এ দেশে আমদানি করিয়া, দেশীয় শ্লেষের মাদকতা উহাতে মিশাইয়া বিলাতী ঢঙের সুরে হাসির গানের প্রচার করিলেন। • দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান বাঙ্গালী সমাজে একটা ভাববিপ্লব ঘটাইয়াছিল।"[৪১]

বিলাত-ফেরত সমাজের অসঙ্গতির ছবিগুলি কবি ইংরেজি-বাংলার খিচুড়ি ভাষার সৃষ্টি করে সুন্দরভাবে ফুটিয়েছেন। সামাজিক 'উলট-পুরাণ' সম্পর্কে চমৎকার একটি মন্তব্য—"বিলেত-ফের্তা টানছে হুক্কা, সিগারেট খাচ্ছে ভশ্চার্যি।" একটি উপমার বিদ্যুচ্চমকে বৃদ্ধ ভণ্ড ধর্মধ্বজীদের মনের গোপন অন্তঃপুর আলোকিত হয়েছে—"ভবনদীর পারে গিয়ে বিড়াল বসেছেন আহ্নিকে।" 'নবকুলকামিনী'দের আচরণগত অসঙ্গতিও দ্বিজেন্দ্রলালের সন্ধানী দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে। 'ভীরুতাটি আধ্যাত্মিক, আর কুঁড়েমিটা ধর্ম'—এই মন্ত্র যারা জীবনের সার করেছে, সেই নির্বীর্যতাকে তিনি পরিহাস করেছেন। ধর্মধ্বজীদের যখন তিনি ব্যঙ্গ করে বলেন--"আর মুরগী খাই না, কেন না পাই না, হয় যদি বিনা খরচেই"—তখন স্পষ্টবাদী কবির এই বাস্তব আবিষ্কারটিতে হাস্যবেগ সংবরণ করা কঠিন হয়ে ওঠে। শৌখীন ও বাকসর্বস্ব দেশসেবক, ধর্মধ্বজী ভণ্ড, ফাঁকিবাজ, ধাপ্পাবাজ, উৎকট ভাবপ্রবণতা—প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থী, নারী ও পুরুষ সকলেরই মুখোস তিনি খুলে দিয়েছেন। আত্মম্ভরি কবি (কবি), অলস কর্মহীন অপদার্থ ('কি করি'), ধর্মের মুখোস পরা প্রতারক (গীতা) প্রভৃতি সম্প্রদায় তাঁর বিদ্রূপের পাত্র

৪১। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য, আষাঢ়, ১৩২০।

হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের এই শ্রেণীর কবিতাগুলি মোলিয়েরের নাটক ও প্রহসনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[৮২]

দ্বিজেন্দ্রলাল প্যারডি রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। গভীর ভাবের অনেক বিখ্যাত গান ও কবিতা অবলম্বন করে তিনি প্যারডি রচনা করেন। 'হাসির গান'-এর 'এস এস বঁধু এস' কবিতাটি একটি বিখ্যাত বৈষ্ণব কবিতার ('এস এস বঁধু এস, আধ আঁচরে বস') ব্যঙ্গ-অনুকৃতি। 'আমরা ও তোমরা' ও 'তোমরা ও আমরা' কবিতা দুটি রবীন্দ্রনাথের 'তোমরা ও আমরা' (সোনার তরী) কবিতার সার্থক প্যারডি।

কতকগুলি হাসির গান প্রেম ও নরনারীর রোমান্সকে কটাক্ষ করে লেখা হয়েছে। প্রেমজীবন সম্পর্কে প্রচলিত রোমান্টিক ধারণা ও মাত্রাতিরিক্ত ভাবপ্রবণতাকে নিয়ে তিনি রঙ্গ ও ব্যঙ্গ দুই-ই করেছেন। প্রেমের তথাকথিত রঙীন আবরণ ভেদ করে তিনি এর গদ্যাত্মক ও বাস্তব অসঙ্গতিগুলিকেই দেখিয়েছেন। প্রথম বিয়ের পর যাকে উর্বশীর মতো মনে হয়েছিল, ধীরে ধীরে মোহপাশ ছিন্ন হওয়ার পর প্রেমিক রোমান্সের স্বপ্নলোক থেকে স্বর্গ-ভ্রষ্ট হল:

দেখলাম পরে প্রিয়ার সঙ্গে হলে আরো পরিচয়,
উর্বশীর ন্যায় মোটেই প্রিয়ার উড়ে যাবার গতিক নয়;
বরং শেষে মাথার রতন লেপ্টে রইলেন আঠার মতন,
বিফল চেষ্টা বিফল যতন, স্বর্গ হতে হল পতন—
বলেছিলাম যাহারে।
ভাবলাম বাহা বাহা রে।

—প্রণয়ের ইতিহাস

বিরহ-বিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যেও বাস্তব অসঙ্গতিগুলিই আবিষ্কৃত হয়েছে। বিরহকে নিয়ে যে সমস্ত কবিপ্রসিদ্ধি আছে, তাকে নিয়েও তিনি পরিহাস করেছেন:

৮২। "......he understood that the true subject of Comedy was to be found in the actual facts of human society—in the affectation of fools, the absurdities of cranks, the stupidities of dupes, the audacities of impostors, the humours and the follies of family life."—Landmarks in French Literature: Lytton Strachey, Page 58.

বিরহেতে দিনদিন ওজনেতে বেশী হই ;—
এতদিনে বুঝলেম প্রিয়ে (আমি) তোমা বই আর কারো নই।
—বিরহ-যাপন

বসন্তকালের পটভূমিকায় নর-নারীর বিরহ-মিলনের রোমান্সকে আরও ঘনীভূত করে তোলা হয়। প্রাচীনকালের এই কাব্যসংস্কারকে দ্বিজেন্দ্রলাল আঘাত করেছেন—বসন্তের আবেশময় বর্ণদীপ্ত রূপমূর্তি এখানে অনুপস্থিত। বিরহিণীরা বিরহানল প্রশমিত করার জন্য পদ্মপত্রে শয়ন করেন না, তার বদলে তারা বলে—"কাঁচা আঁব দুটো পেড়ে আন্ সখি গুড় দিয়ে রাঁধ অম্বল" এবং "পড়িগে অর্ধমুদিত নয়নে গোলেবকাওলি গ্রন্থ।" দ্বিজেন্দ্রলালের বর্ষাও রোমান্টিক বর্ষা নয়, তিনি বর্ষার কদমাক্ত জোলো রূপের বাস্তব রূপ এঁকেছেন। কালিদাস, বৈষ্ণব কবি ও রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে বর্ষা সম্পর্কে যে রোমান্সের সৃষ্টি হয়েছে—তার আড়ালের বাস্তবরূপ দেখিয়ে দিয়ে আমাদের ভাব-প্রবণ মনকে তিনি সচকিত করে তুলেছেন। যে কল্পনাপ্রবণতা ও ভাববিলাস জাতীয় জীবনকে মেরুদণ্ডহীন করে তোলে তাকে তিনি কোনও দিন প্রশ্রয় দেন নি।

কিন্তু নির্মম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের মূল সুর নয়। কারণ দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে সহানুভূতিপ্রবণ সমবেদনায় করুণ একটি আবেগময় কবিচিত্ত ছিল। তাই তাঁর হাসি ভল্‌তেয়ারের হাসির মতো কটাক্ষে ভ্রূভঙ্গিতে-শ্লেষে-চাপা বিদ্রূপে অব্যর্থলক্ষ্য সূচ্যগ্র শরনিক্ষেপ করে অন্তরাত্মাকে কাঁপিয়ে তোলে না, শ-সুলভ মার্জিত শ্লেষাত্মক বুদ্ধিদীপ্ত বাক্‌চাতুর্যও তাঁর নেই। তাঁর হাস্যরস সব সময়ে সূক্ষ্ম কলা-কৌশলের উপরেও নির্ভর করে না—তার হাসি স্পষ্ট, উজ্জ্বল ও সশব্দ। জীবনের সত্য, নিষ্ঠুরতম করুণতম সত্য, তাঁর হাসির মধ্য দিয়ে যখন উদ্ভাসিত হয়, তখন তারই আলোকে আমাদের মুখচ্ছবির বিবর্ণতা ধরা পড়ে, তখন হাসতে গিয়ে নিজের হাসির শব্দে আমাদের অন্তরাত্মা কেঁদে ওঠে। 'বদলে গেল মতটা' কবিতায় নিঃসন্দেহে বাঙালী চরিত্রের মুহূর্মুহু মত পরিবর্তনের একটি কৌতুকোজ্জ্বল ছবি ফুটেছিল, কিন্তু কবিতার শেষ স্তবকে যখন কবি বলেন : "মিশিয়েও এনেছি প্রায় 'এনি' ও বেদান্ত, এমন সময় হয়ে গেল ভবলীলা সাঙ্গ!"—তখন যেন হাসি হঠাৎ থেমে যায়। কারণ এ তো বিদ্রূপ নয়,

বিষাদ-করুণ মুখশ্রীর ভাবনায় আরো বেশী অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে। 'ঘুমন্ত শিশু', 'পুত্রকন্যার বিবাদ' ও 'নূতন মাতা'—এই তিনটি কবিতা স্ত্রী-বিয়োগের কিছুকাল আগের লেখা। কিন্তু এই তিনটি কবিতার সঙ্গেও 'মন্দ্রে'র বাৎসল্যরসের কবিতার প্রভেদ আছে। 'মন্দ্রে'র বাৎসল্যরসের কবিতায় স্নেহসিক্ত পিতৃহৃদয়ের সঙ্গে জগৎ ও জীবনের ভাবনা জড়িত—পৃথিবীর ভালো-মন্দের কথাও তিনি ভেবেছেন। 'আলেখ্যে'র কবিতাগুলিতে বাৎসল্যরস স্বতোৎসারিত হয়ে উঠেছে—সেখানে অন্য কোন ভাবনা নেই।

শুধু বাৎসল্যরসের বিশুদ্ধিই নয়, লিরিসিজমও যেন এখানে আবার স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে। 'মন্দ্র' কাব্যের গীতিধর্ম কোনো কোনো কবিতায় দ্বিধাগ্রস্ত। 'নূতন মাতা' কবিতাটি একটি সহজ-সুন্দর ছবি—গার্হস্থ্যজীবনকেই কবি এখানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছেন। স্ত্রী মেয়ে কোলে নিয়ে আছেন—চাঁদের আলো তাঁদের উপর ছড়িয়ে পড়েছে—কবির সম্মুখে এক অপার্থিব সৌন্দর্য-জগৎ উদ্ঘাটিত করেছে :

> চাঁদের কিরণ এসে, মেয়ের মায়ের কেশে,
> কোমল মুখে, দেহে, পড়েছে সে ছেয়ে।
> চাঁদের কিরণ এসে ঢলে পড়েছে সে
> মেয়ের কচি মুখে, মেয়ের কচি বুকে।

কবি যেন দাম্পত্যপ্রেম ও বাৎসল্যরসের মধ্যে লিরিসিজমের সোনার কাঠি আবার খুঁজে পেয়েছেন। 'পুত্রকন্যার বিবাদ' কবিতা কবির পারিবারিক জীবনের একটি সাধারণ ঘটনামাত্র—কিন্তু কন্যা যখন স্বেচ্ছায় তার দাদাকে পিঁড়ি ছেড়ে দিতে চেয়েছে, তখন কবি এই সামান্য ঘটনার মধ্যে নারী-পুরুষের একটি পার্থক্য উপলব্ধি করেছেন—'পুরুষ স্বার্থমগ্ন কিন্তু নারীর প্রেমের মূলে আছে স্বার্থত্যাগ'। সংশয়াতুর কবি যেন একটি নূতন সত্য পেয়েছেন :

> মনে হল—শুধু স্বার্থ নহে,
> স্বার্থত্যাগও আছে এ সংসারে
> পৃথিবীটা যত খারাপ ভাবি,
> তত খারাপ না হতেও পারে।

'বিপত্নীক' (১), 'বিপত্নীক' (২), 'মাতৃহারা', 'হতভাগ্য'—কবিতা স্ত্রী-

বিয়োগের পরে লেখা। পত্নীবিয়োগের নিদারুণ আঘাত সদাহাস্যময় রহস্যপ্রিয় কবিকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছিল। গভীর মর্মবেদনায় কবি আর্তনাদ করে উঠেছেন :

অমনি আমার কুঁড়ের সঙ্গে, সোণার স্বপ্ন আমার
হয়ে গেল ছাই ;
গেছে, গেছে, সবই গেছে উড়ে পুড়ে গেছে,
চিহ্ন মাত্র নাই।

—বিপত্নীক

মাতৃহারা সন্তান দুটির ম্লান মুখের দিকে চেয়ে কবির পত্নীবিয়োগের বেদনা দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে। অবোধ শিশুসন্তান দুটির মুখের দিকে চেয়ে কবির আর্তকণ্ঠ জীবনের নিষ্ঠুর সত্যটিকেই ফুটিয়ে তুলেছে :

না না, তুইই সইতে পারিস্, আমিই সইতে পারি নাক ;
কি জিনিস যে হারিয়েছিস্, বুঝিস্ না ক তুই।
এখন রে তোর কাছে,
তুল্যমূল্য স্বর্ণ লোষ্ট্র, দুই।
তাহার উপর, শিশুর হাড়ে ভেঙে গেলে জোড়া লাগে,
আমাদের আর লাগে না ক জোড়া ;

—মাতৃহারা

'হতভাগ্য' কবিতায় মাতৃহারা পুত্রকন্যার মুখের দিকে চেয়ে কবির বেদনা উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। 'আর্যগাথা'র বাৎসল্যরসের কবিতা স্বচ্ছ, সুন্দর কৌতুকোচ্ছল রসানুভূতিতে প্রসন্ন 'মন্দ্র' কাব্যের বাৎসল্যরসের কবিতাগুলি একটু মিশ্র প্রকৃতির—সন্তান-বাৎসল্য এখন শুধু একটি সহজ-সুন্দর রসানুভূতি মাত্র নয়, কবির চিন্তাক্লিষ্ট ও সংশয়াচ্ছন্ন মন নির্মল বাৎসল্যের আকাশে একটি কালো ছায়া ফেলেছে।—জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কবির বিশেষ কতকগুলি চিন্তা বাৎসল্যরসের কবিতাগুলিকেও যেন খানিকটা জটিল করে তুলেছে। কিন্তু স্ত্রীবিয়োগের পরে বেদনার অশ্রুজলের ভিতর দিয়ে বাৎসল্যের সহজ সুরটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরিপূর্ণ পারিবারিক জীবনের ও দাম্পত্য-প্রীতিরসে 'আর্যগাথা'র বাৎসল্যরসের কবিতাগুলি কবির পরিতৃপ্ত জীবনের ছবি, কিন্তু 'আলেখ্য' কাব্যে পত্নীবিয়োগ-বিধুর কবির জীবনে শিশু দুটিই

একমাত্র অবলম্বন। তাই পত্নী-বিয়োগ-বেদনার ব্যথার রসই এই শ্রেণীর কবিতাগুলির প্রাণ। 'বিপত্নীক' (২) কবিতাটিতে কবি তাঁর ষোলো বছরের বিবাহিত' জীবন পর্যালোচনা করেছেন। তিনি তাঁর পত্নীর মানবীসত্তা বিস্মৃত না হয়েও এক শাশ্বত প্রেমের পটভূমিকায় তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন :

কভু ভাবি, বিশ্বে প্রথম তোমায় যেদিন দেখেছিলাম
প্রথম দেখা সে কি।
কিম্বা পূর্বে আমাদিগের জন্মান্তরে হয়েছিল
কোথাও দেখা-দেখি।

বিহারীলাল থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালের গীতি-কবিদের কাব্যে গৃহনিষ্ঠ বাঙালী জীবনের ছবি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মাত্রাভেদ ও প্রকারভেদ সত্ত্বেও দাম্পত্যপ্রেম ও গার্হস্থ্য-জীবনরস এই যুগের কবিদের কাব্যের এক প্রধান সুর। দেবেন্দ্রনাথ সেন দাম্পত্য প্রেমকেই পঞ্চেন্দ্রিয়ের আলোক-শিখায় রঞ্জিত করেছেন, বাঙালীর বাস্তব গৃহ-সংসার ও পত্নীপ্রেমকেই এক আবেগ-মুগ্ধ সৌন্দর্যরসে অভিষিক্ত করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছেন :

গায়ের এ কূলে কূলে, প্রাণের অশ্বত্থ-মূলে
যতদিন বহিবে জাহ্নবী—
খোকারে লইয়া বুকে
প্রিয়ারে আলিঙ্গি সুখে,
বুক পুরি' রঞ্জিব এ ছবি—
ক্ষুদ্র আমি বাঙ্গালার কবি।[৫০]

দেবেন্দ্রনাথ দাম্পত্যপ্রেমকেই এক উচ্চতর সৌন্দর্যলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রেমের হাব-ভাব, কটাক্ষ-চাতুরী, লীলা-বিলাস, বিচিত্র প্রসাধনকলা—সমস্ত কিছু তাঁর কবিতায় এক গাঢ় বর্ণে বিলসিত হয়ে উঠেছে। ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতায় পারিবারিক ও দাম্পত্য-জীবনের বাস্তবনিষ্ঠ ছবি আছে—শুধু তাই নয়, তাঁর কবিতায় স্বগ্রামের খুঁটিনাটি ছবিগুলিও স্পষ্ট। গোবিন্দচন্দ্র দাসের দাম্পত্যপ্রেমের কবিতাগুলিতে কোনো উর্ধ্বলোকের স্বপ্ন নেই। বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবন ও

৫০। আমি কে? অশোকগুচ্ছ।

স্ত্রী-পুত্র-কন্যাপরিবৃত সংসারের মধ্যেই গোবিন্দ দাসের প্রেম-কবিতা মূলত আবদ্ধ। গোবিন্দ দাসের দাম্পত্যপ্রেমের কবিতায় আবেগের তীব্রতা ও আন্তরিকতা আছে, কিন্তু সেখানে অনেক সময় দেহানুগত্য বড় হয়ে উঠেছে। দেবেন্দ্রনাথের কাব্যপটভূমি গোবিন্দচন্দ্রের কাব্যপটভূমির চেয়ে প্রশস্ততর। দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় পত্নীপ্রেমের মাধ্যমেই নিখিল সৌন্দর্য আস্বাদনের যে সূত্র আছে, গোবিন্দচন্দ্রের কবিতায় তা খুব স্পষ্ট নয়।

গৃহজীবন ও দাম্পত্যরসকে অতিক্রম করে এ যুগের কবিরা শাশ্বত সৌন্দর্য আস্বাদন করতে পারেন নি। গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রথমা পত্নী সারদাসুন্দরীর মৃত্যুর পর 'কুঙ্কুম' (১২৯৮) কাব্য রচনা করেছিলেন। এই শোক-কাব্যটিতে কবিহৃদয়ের গভীর অন্তর্বেদনার স্পর্শ আছে। অতীত স্মৃতির পর্যালোচনায়, মাতৃহারা সন্তানদের বেদনায়, ব্যক্তিগত জীবনের দারিদ্র্য ও নির্যাতন-কাহিনী বর্ণনায় গোবিন্দচন্দ্রের শোকগাথা সহজ অনাড়ম্বর শোকার্তিকেই প্রকাশ করেছে। গোবিন্দচন্দ্রের শোক-কবিতাগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ—সেখানে কবিত্ব বা ব্যঞ্জনার স্থান নেই, কোনো বৃহত্তর আদর্শ বা দার্শনিক ভাবনায় তিনি সান্ত্বনা লাভ করার চেষ্টা করেন নি। পরবর্তী কালে অক্ষয়কুমার বড়ালের 'এষা' কাব্য (১৩১৯) শোক-কাব্য হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিল। স্ত্রী-বিয়োগের এই কাব্যটিতে বড়াল-কবি গার্হস্থ্য জীবনের অতি তুচ্ছ প্রসঙ্গের বর্ণনা দ্বারা শোকের গভীরতা প্রকাশ করেছেন। কবির অশান্ত আত্মজিজ্ঞাসা জীবনমৃত্যুর রহস্য সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করেছে। মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের বৃহত্তর ব্যঞ্জনার মধ্যে কবি আশ্বাসবাণী খুঁজে পেয়েছেন। মানবী গৃহলক্ষ্মীই যেন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে 'বিশ্বরমা'য় পরিণত হয়েছেন :

হে মরণ, ধন্য তুমি ! না বুঝে তোমায়
বৃথা নিন্দা করে লোকে
জগতে—তুমি ত শোকে
অমর করিছ প্রেমোদেব-মহিমায় !
আজি মোর প্রিয়তমা
তব করে বিশ্বরমা—
ভাসিছে ইন্দিরা-সমা সৃষ্টি-নীলিমায়।[৫১]

৫১। সান্ত্বনা, ৩নং. এষা

দ্বিজেন্দ্রলালের দাম্পত্যরস ও স্ত্রী-বিয়োগের কবিতাগুলির সঙ্গে সমসাময়িক কবিদের কাব্যের তুলনা করলে কয়েকটি পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। দেবেন্দ্রনাথ, গোবিন্দচন্দ্র, অক্ষয়কুমার প্রমুখ কবির কাব্যে দাম্পত্যরসটিই প্রধান—দাম্পত্যরসটিকে কেন্দ্র করেই তাঁদের প্রেমস্বপ্ন বিকশিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য সম্পর্কে ঠিক এ কথা বলা যায় না—দাম্পত্য জীবনের গণ্ডীর বাইরেও প্রেমের যে আর একটি মুক্ততর ও বিচিত্রতর রূপ ছিল তার প্রতিও তিনি আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। দাম্পত্য-জীবনাশ্রয়ী প্রেম ও প্রেমের বিশ্বব্যাপক চিরন্তন সত্তা—দুই-ই প্রায় একই সঙ্গে তাঁর কবিজীবনে সত্য হয়ে উঠেছিল। স্ত্রী-বিয়োগের ফলে কবি-পত্নী এখন প্রত্যক্ষের অতীত,—প্রত্যহের সীমাও অন্তর্হিত—বেদনা ও স্মৃতির অর্ঘ্যধূপে কবিপ্রিয়া এক জ্যোতির্ময়ী নারী-লক্ষ্মীতে পরিণত হয়েছেন। এখানে মর্ত্যের গৃহিণী ও সৌন্দর্যলক্ষ্মী—এই দুয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। গোবিন্দচন্দ্রের পত্নী-বিয়োগের কাব্যে কোনো তত্ত্বকথা নেই,—দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জীবনে পত্নীকে হারানোর পর কবি শুধু বলতে পেরেছেন :

জননী ভগিনী, জায়া
সকলের দয়া মায়া
প্রেম-তিলোত্তমা ছিল সারদা আমার।

* * *

অনল দিয়াছি সেই আননে তাহার,
কৃতঘ্ন আমার চেয়ে আছে কি হে আর?[৫২]

কিন্তু অক্ষয়কুমারের পত্নীবিয়োগের কাব্যে গৃহ-পরিজনের খুঁটিনাটি বর্ণনা আছে, শোকের সান্ত্বনা হিসাবে তিনি তত্ত্বকথার অবতারণা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের পত্নীবিয়োগের কাব্যে মর্মভেদী শোক প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু কোনো তত্ত্বদৃষ্টি তাঁর কবিসত্তাটিকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। বরং স্ত্রী-বিয়োগের কিছুকাল আগে তিনি জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কিছু সংশয়াচ্ছন্ন হয়েছিলেন, স্ত্রী-বিয়োগের পরবর্তী কালে যেন সেই মেঘ অনেকখানি কেটে গিয়েছে।

৫২। সারদাসুন্দরী : কুসুম।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্ত্রী-বিয়োগের কাব্য সম্পর্কে আর একটি প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়বে। তাঁর পত্নীবিয়োগের প্রায় তিন বছর আগে রবীন্দ্রনাথের পত্নীবিয়োগ হয় (৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৭)। 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থে কবির স্ত্রী-বিয়োগের সাতাশটি কবিতা সঙ্কলিত হয়েছে। কিন্তু এই শোককাব্যে কোনো প্রবল হৃদয়াবেগ বা উচ্ছ্বাস নেই—এক শান্ত, সংযত বেদনার অনুদ্বেলিত রূপ 'স্মরণ' কাব্যে ফুটে উঠেছে। সংসারের গৃহিণী মৃত্যুর ভিতর দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছেন :

যতকাল কাছে ছিলে বল কি উপায়ে
আপনারে রেখেছিলে এমন লুকায়ে ?

* * *

আজি যবে চলি গেলে খুলিয়া দুয়ার
পরিপূর্ণ রূপখানি দেখালে তোমার।[৫৩]

পরবর্তী কালে 'শিশু' কাব্যগ্রন্থে খোকা আর তার মায়ের সম্পর্কের ভিতর দিয়ে দাম্পত্যরস ও বাৎসল্যরস এক যুগ্মবেণীতে পরিণত হয়েছে। 'স্মরণ' কাব্যের শোকাশ্রু তুষার-স্তম্ভিত, 'শিশু' কাব্যে সেই তুষার বিগলিত হয়েছে বাৎসল্যরসের অশ্রুতপ্ত ধারায়। কবি একখানি চিঠিতে বলেছেন : "...খোকা এবং খোকার মার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ মধুর সম্বন্ধ সেইটে আমার গৃহস্মৃতির শেষ মাধুরী...মাতৃশয্যার সিংহাসনে খোকাই [শমীন্দ্র] তখন চক্রবর্তী সম্রাট ছিল। সেইজন্য লিখতে গেলেই খোকা এবং খোকার মার ভাবটুকুই সূর্যাস্তের পরবর্তী মেঘের মতো নানা রঙে রঙিয়ে ওঠে—সেই অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত কিরণ এবং বর্ণ আকর্ষণ করে আমার অশ্রুবাষ্প এই রকম খেলা খেলবে—তাকে নিবারণ করতে পারিনে।"[৫৪] রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর কবিতায়ও আপন গৃহ-সংসারকে অতিক্রম করে একটি নৈর্ব্যক্তিক রহস্য-ব্যঞ্জনাই বড় হয়ে উঠেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় এত সূক্ষ্ম গীতিধর্মিতা ও সৌকুমার্য নেই, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের ব্যথা-বেদনা ও বাৎসল্যরসের গভীর অনুভব সেখানে অনেক বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, অথচ গোবিন্দচন্দ্র ও অক্ষয়কুমারের মতো পত্নী-পুত্রকন্যা ও গৃহ-পরিজনের এত

৫৩। পরিচয় : স্মরণ।

৫৪। বিশ্বভারতী পত্রিকা : কার্তিক, ১৩৩৯।

পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা নেই। দ্বিজেন্দ্রলালের পথ রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের মধ্যপথ।

'আলেখ্য' কাব্যে পূর্ববর্তী কাব্যগুলির সুরও অনুপস্থিত নয়। 'আষাঢে', 'হাসির গান' ও 'মন্দ্রে'র বিদ্রূপাত্মক মনোভঙ্গি এখানেও আছে, কিন্তু পূর্ববর্তী কাব্যগুলির তুলনায় এর তীব্রতা অনেক কম। 'নেতা' ও 'ভক্ত' কবিতায় যথাক্রমে বক্তৃতাসর্বস্ব আত্মপরায়ণ রাজনৈতিক নেতা ও শৌখীন ভোগসর্বস্ব ভক্তকে কবি ব্যঙ্গ করেছেন। এই জাতীয় কবিতা দ্বিজেন্দ্রকাব্যের পূর্বতন সুরের পুনরাবৃত্তি মাত্র। কিন্তু এখন ব্যঙ্গ করতে গিয়ে নিজেও আঘাত পান হঠাৎ যেন গম্ভীর হয়ে ওঠেন :

ব্যঙ্গ-কবি আমি ?—ব্যঙ্গ কবি শুধু ?
নিন্দা করি শুধু সকলে ?
কভু না। আসলে ভক্তি কবি আমি,
ঘৃণা করি শুদ্ধ—নকলে।

—ভক্ত

'সিরাজদ্দৌলা,' 'রাখাল বালক', 'রাজা'—কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলালের সামাজিক মনই বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। একটি গণতান্ত্রিক চেতনাও অনুপস্থিত নয়। তার মতে সিরাজদ্দৌলার পতনের জন্য ইংরেজ-পরাশি বা মীরজাফরের দায়িত্ব নিতান্ত বহিরাশ্রয়ী, তাঁর পতনের আসল কারণ হল নৈতিক—"অতিদম্ভী অনাচারীর পেতেই হবে সাজা।" 'রাজা' কবিতায়, কবি চাষী, তাঁতী প্রভৃতি সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের পক্ষ অবলম্বন করে বলেছেন

ওরে ও ভাই চাষী। ওরে ও ভাই তাঁতি।
পড়িস না ক ভয়ে, জানিস এ সব ফাঁকি,
তোদের অন্নে পুষ্ট, তোদের বস্ত্র গায়ে,
কর্বে তোদের উপর রক্তবর্ণ-আঁখি ?

সভ্যতা আমাদের গ্রামজীবনের সরল ও সহজ ভাব শোষণ করে নিচ্ছে—কবি সেই বেদনাকে প্রকাশ করেছেন তাঁর 'রাখাল বালক' কবিতায়। চাষীদের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও আধুনিক সভ্যতার কুটিল মূর্তি এই কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে।

'মন্দ্র' কাব্যের বিতর্কমূলক ও সংলাপাত্মক কাব্যভঙ্গি ও শ্লেষ-চতুর বাগ-বৈদগ্ধ্য 'আলেখ্যে'রও কোনো কোনো কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। 'মণ্ডপ' কবিতাটি আগাগোড়াই সংলাপাত্মক রীতিতে লেখা—শ্লেষ-বিদ্রূপ, যুক্তি-তর্ক—দ্বিজেন্দ্রকাব্যের সবগুলি বাহনই এখানে আছে। 'বিবাহযাত্রী' কবিতাটিতে বর ও বরযাত্রীর খুঁটিনাটি বর্ণনা করেছেন—কবিতাটির মধ্যে শ্লেষ ও সংশয় যেন কবিদৃষ্টিকে বিবর্ণ করে তুলেছে। বর ও বরযাত্রীদের দেখে তাঁর জীবনের বিষাদময় পঞ্চমাঙ্কের কথাই মনে পড়েছে। বলা বাহুল্য, পত্নী-বিয়োগের মর্মান্তিক স্মৃতিই তাঁর দৃষ্টিকে তিযক করেছে :

ভাবছিলেন না "পরিশেষে, পঞ্চমাঙ্কে পড়লে এসে,
পিছন থেকে লৌহ হস্ত একটির এসে ধর্বে টুঁটি ;

* * *

এ রহস্য হবে ভেদ ; ঘুচে যাবে সকল খেদ ,
প্রেমের পরিপূর্ণ মাত্রায় পড়বে পূর্ণ পরিচ্ছেদ।"

ব্যক্তিগত জীবনের এত বড় আঘাতের পর সংশয়বাদী হয়ে ওঠা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রজীবনে এই 'সিনিক' মনোবৃত্তি একটি সাময়িক ব্যাপার মাত্র, এ কথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। প্রেমবঞ্চিতা নর্তকীকে তিনি সহানুভূতি দেখিয়েছেন (নর্তকী), নিজের পত্নীহীন জীবন দিয়ে বিধবার মর্মবেদনা উপলব্ধি করেছেন (বিধবা)। কিন্তু ঈশ্বরকেও ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি :

খোসামদের মন্দির খুলে,
মিথ্যার কৃষ্ণ নিশান তুলে,
উচ্চৈঃস্বরে, "দয়াল।" বলে ডাকি।

'আলেখ্য' কাব্যের 'সত্যযুগ' কবিতাটি দ্বিজেন্দ্রলালের মনোজীবনের বিবর্তনের দিক থেকে একটি মূল্যবান স্বীকৃতি। পত্নীবিয়োগবিধুর কবি বিশ্ববিধান সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত সংশয়বাদীই হয়ে উঠেছিলেন। শোকের আঘাত যেন ক্ষণকালের জন্য কবির বিচারবুদ্ধিকে বিমূঢ় করে দিয়েছিল। কোনো আধ্যাত্মিকতা বা পারমার্থিক বিশ্বাসের ভিতর দিয়ে তিনি এর সমাধান খুঁজে পান নি। আশাবাদী মানব-বিশ্বাসী কবি ক্রমবিবর্তনবাদের সূত্র ধরে এক জ্যোতির্ময় 'মহাভবিষ্যতে'র স্বপ্ন দেখেছেন। কবির বাষ্পাচ্ছন্ন

চোখের ভিতর থেকে চিন্তা ও মননশীলতার দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয়েছে। কবির ধীশক্তি ও বুদ্ধিমার্জিত বিশ্লেষণী চিত্ত জীবনের চরম পরীক্ষার মুহূর্তেও চিন্তা-চেতনার ঋজুতা ও বহ্নিদীপ্তি হারায় নি। তাই কবি অপার্থিব ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের ভিতর দিয়ে নয়, মানবের বলিষ্ঠ ও অপ্রতিহত অগ্রগতির দিক থেকেই 'সত্যযুগ' দেখেছেন। এ 'সত্যযুগ' পৌরাণিক যুগের নয়, বৈজ্ঞানিক যুগের :

> দূরত্ব অতীত হবে ; জটিল যাহা সহজ হবে ; দুঃখ হবে দূর ;
> পরার্থেই ইচ্ছা হবে ; ইচ্ছা হবে ফলবতী ! কার্য সুমধুর ;
> আলোকে সঙ্গীতে পূর্ণ, আনন্দে উল্লাসে মুগ্ধ, বিজ্ঞানে মহৎ,
> স্বার্থত্যাগে স্বর্গীয়, সে গগনে গগনে ব্যাপ্ত—মহাভবিষ্যৎ।

দ্বিজেন্দ্রলাল এখানে নিজেকেই খুঁজে পেয়েছেন—সংশয়ান্ধকারের ভিতর দিয়ে নয়, পারমার্থিক উপলব্ধির ভিতর দিয়েও নয়, মানবিক অগ্রগতির মহিমোজ্জল ভা... তব বলিষ্ঠ ভাবনার ভিতর দিয়ে। দ্বিজেন্দ্র-মানস চরম আঘাতের দিনেও তার আত্মপ্রত্যয় ও স্বাতন্ত্র্য হারায় নি।

॥ ১১ ॥

'ত্রিবেণী' (১৯১২) দ্বিজেন্দ্রলালের শেষ কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থ প্রকাশের প্রায় আট মাস পরে দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু হয়। 'আলেখ্য' কাব্যের মধ্যে যে ম্লান-বেদনার ছায়া আছে, 'ত্রিবেণী'-তে সে ছায়া অনেকখানি অপসারিত হয়েছে। কিন্তু ছায়া সরে গেলেও কবিজীবনের সেই মধ্যাহ্নদীপ্তি আর নেই। তীব্র দাবদাহ ও মধ্যাহ্নদীপ্তির পর যেন এক প্রশান্ত অপরাহ্নের আবির্ভাব। উচ্ছ্বাস ও হৃদয়াবেগের প্রাবল্য এক করুণ-সুন্দর রসাবেশে ভরে উঠেছে। কবিচিত্তও অন্তর্মুখী হয়েছে, আত্মনিষ্ঠ গীতিধর্মিতা আবার নিঃসংশয়িত হয়ে উঠেছে। 'ত্রিবেণী' কাব্যে লঘুচিত্ত পরিহাস ও শ্লেষ-বিদ্রূপের ভ্রূভঙ্গি নেই বললেই হয়। কাব্যটির সুর প্রশান্ত-গভীরই নয়, গম্ভীরও বটে। 'ত্রিবেণী' কাব্যের 'সমুদ্র' কবিতার সঙ্গে 'মন্দ্র' কাব্যের 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটির তুলনা করলেই কবিজীবনের সুরপরিবর্তন ব্যাপারটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। 'মন্দ্র' কাব্যে সমুদ্রকে অবলম্বন করে লঘু-গুরু ভাবনার নৃত্য-চঞ্চল ক্রীড়াশীলতা

প্রকাশিত হয়েছে—সমুদ্রের উদাত্ত-গম্ভীর মহিমার সঙ্গে লঘু-কৌতুক, সরস রহস্যালাপ ও সংলাপাত্মক ব্যঙ্গভঙ্গিকে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু 'ত্রিবেণী'র কবিতাটিতে অসমতল চিন্তার বন্ধুরতা নেই। স্ত্রী-বিয়োগের পরে সাত বছর অতিবাহিত হয়েছে—এই সাত বছরের শোকঝঞ্ঝায় কবিচিত্তও পরিবর্তিত। নিজের জীবনের অশ্রুগম্ভীর ভাবনাগুলি সমুদ্রের মধ্যে রূপায়িত হয়েছে :

—সেই সে সাক্ষাৎ হতে আজি হে সমুদ্র !
সপ্তবর্ষ কেটে গেছে, আমার এ ক্ষুদ্র
পরমায়ু। ছিলাম সেদিন শ্লেষস্মিত,
উচ্চকণ্ঠ, ধর্মে অবিশ্বাসী, গর্বস্ফীত,
উচ্ছৃঙ্খল। আজি হইয়াছি চিন্তা-নত,
জীবনের গূঢ়তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু নিয়ত।
গান গাই নিম্নতর ঠাটে, কম্প্র, ধীর,
ম্লান, ব্যথাপ্লুত, অশ্রুগদ্গদ, গম্ভীর।

'ত্রিবেণী' এই 'নিম্নতর ঠাটের' 'ম্লান, ব্যথাপ্লুত' সঙ্গীত। 'মন্দ্র' কাব্যের 'অজ্ঞেয়বাদী' দ্বিজেন্দ্রলাল 'আলেখ্য' কাব্যে অনেকখানি সংশয়মুক্ত হয়েছেন, কিন্তু তার মাধ্যম ছিল বুদ্ধি। 'ত্রিবেণী' কাব্যে বুদ্ধির হিরণ্ময় আবরণটিও যেন অনেকখানি সরে এসেছে—যবনিকার অন্তরালে এক মহান অস্তিত্ব কবির বিশ্বাসী দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়েছে। যেটুকু প্রত্যক্ষ ও পরিদৃশ্যমান তারও গভীরে আর এক 'মহালোক' আছে, 'কোটি কোটি মহাদীপ্ত উদ্ভাসিত রবি, শুদ্ধমাত্র যার ছায়া, যার প্রতিচ্ছবি।'

'ত্রিবেণী' কাব্যের কয়েকটি কবিতা পত্নীপ্রেমের স্মৃতিবেদনায় অনুরঞ্জিত হয়ে উঠেছে। 'সোণার স্বপ্ন', 'স্মৃতি', 'আহ্বান', 'ফিরিয়ে দাও'—প্রভৃতি কবিতা ও গান এই শ্রেণীর অন্তর্গত। গীতিকবিতা হিসাবে এই শ্রেণীর কবিতাগুলিই সঙ্কলনটির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অতিকথনের অপচয় নেই, একাধিক চিন্তার জটিলতা নেই, গদ্যের উপলখণ্ডে গীতিপ্রবাহ ব্যথিতগতি নয়। পত্নী-বিয়োগের প্রাথমিক শোকোচ্ছ্বাস আর নেই, সময়ের ব্যবধান এক বেদনামধুর স্মৃতিরসের সৃষ্টি করেছে। 'আলেখ্য' কাব্য যখন রচিত হয়, তখন স্ত্রী-বিয়োগের বেদনা স্পষ্টতর ও নির্মম। শোকের ঝড় কবিজীবনকে

উদ্বেল করে তুলেছিল। কিন্তু দীর্ঘকালের ব্যবধানে 'ত্রিবেণী'র কবিতাগুলিতে সেই স্পষ্টতা ও প্রত্যক্ষতা আর নেই। এক ভাব-স্থির প্রশান্ত-করুণ স্মৃতি-সমুদ্রের করুণ মর্মরধ্বনি শোনা যায়, শুধু তটসীমায় অশ্রুর লবণাক্ত রেখাটুকু সেদিনের উদ্বেলিত হৃদয়ের স্মৃতিচিহ্ন রেখে গিয়েছে। 'আলেখ্য' কাব্যের কবিপত্নীর মানবী-মূর্তি অস্পষ্ট নয়—তিনি গৃহিণী, জায়া ও জননী। মৃত্যু প্রত্যক্ষের যবনিকা উন্মোচন করলেও তখনও কবির স্মৃতিচারণা এক নৈর্ব্যক্তিক ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। কিন্তু 'ত্রিবেণী' কাব্যের দীর্ঘ কাল-ব্যবধান স্মৃতি-বিস্মৃতির আলো-ছায়া এক ভাবলোকের তাজমহল রচনা করেছে। 'আলেখ্য' শোকোচ্ছ্বাসের কাব্য, 'ত্রিবেণী' স্মৃতিবেদনার কাব্য। 'ত্রিবেণী' কাব্যে কবিপ্রিয়া আর গৃহ-পরিজন-পুত্র-কন্যার সংসার-সীমার আবদ্ধা নন—তিনি স্মৃতির তীর্থে নৈর্ব্যক্তিক ভাব-রহস্যে অধিষ্ঠিতা।

তাই কবির একমাত্র কামনা, তার হারিয়ে-যাওয়া 'সোনার স্বপ্ন'। যদি যুগের ঘুমে সেই ..টি আর একবার আসে :

এখন বহি সন্ধ্যার গভীর গানে,
বীণার স্বরে, কবির তানে
চেয়ে নিরবধি—
সেই স্বপ্ন আমার—যুগের ঘমে একবার আসে যদি।

—সোনার স্বপ্ন

কবি সেই স্মৃতিটুকু বুকে নিয়েই সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করেছেন—প্রিয়ার স্মৃতিও বিশ্বব্যাপক হয়ে উঠেছে—"জন্মান্তরের যেন একটি গাথা জীবন আমার ব্যাপে।" প্রকৃতির বিস্তৃতির সঙ্গে মিশে কবিপ্রিয়া আজ অনন্যসাধারণ রূপমূর্তি লাভ করেছেন

এসো কুসুমের মত শোভায়, জ্যোৎস্নার মত ভেসে,
কল্পনার মত সেজে,
এসো আকাশের মত ঘিরে, প্রভাতের মত হেসে,
দুঃখের মত বেজে, —এসো

'আহ্বান' কবিতাটিতে পত্নীস্মৃতির সঙ্গে নিজের অনাগত মৃত্যু-ভাবনা জড়িত হয়েছে। এই ম্লান সুরের মধ্যে প্রেমই এনেছে এক বিশ্বাসমুগ্ধ নির্ভরতা :

আঁধার যদি—তুমি শুধু হেসো
আঁধার হবে আলো ;
তুমি আমায় আগিয়ে নিতে এসো
তুমি বেসো ভালো।

'ত্রিবেণী'র কয়েকটি কবিতায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের স্বরও আছে, কিন্তু পূর্বতন ব্যঙ্গ-কবিতাগুলির মতো এখানে তেমন তীব্রতা নেই। এ সম্পর্কে কবি নিজেই ভূমিকায় বলেছেন : "গুটিকতক কবিতা ব্যঙ্গচ্ছলে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু কোন পাঠক-সম্প্রদায়ের কাছে সেগুলি উচ্চ ধরণের কবিতা বলিয়া আদৃত হইয়াছিল বলিয়া সেগুলিও এই সংগ্রহে সন্নিবেশিত হইল।" এই সময়ে 'কাব্যে অস্পষ্টতা' নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের মতভেদের সূত্রপাত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন স্পষ্টকাব্যের পক্ষপাতী এবং অস্পষ্ট কাব্যের বিরোধী। অস্পষ্ট কাব্যের উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি ব্যঙ্গচ্ছলে "রূপকত্রয়" ও "এস্রাজ" কবিতা দুটি রচনা করেন।[৫৫] 'রূপকত্রয়' কবিতায় কবিমনের বিচ্ছিন্ন তিনটি ভাবনা তিনটি চিত্রপ্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। প্রত্যেক তিনটির মধ্যে কোনো মিল নেই—কিন্তু কবিমনের বিচ্ছিন্ন ভাবনাগুলির একটি মাধুর্য আছে। 'এস্রাজ' কবিতাতেও একটি ভাবগভীর গূঢ় ব্যঞ্জনা আছে। এস্রাজের সকরুণ ধ্বনির মধ্যে এক অতৃপ্ত পিপাসা বেজে উঠেছে। সর্বশেষে এস্রাজবাদিনীর দীর্ঘ-নিশ্বাসের মধ্য দিয়ে কবিতাটি শেষ হয়েছে। কবিতাটির শেষাংশে অব্যক্ত রহস্য-ব্যঞ্জনার এক অপরূপ আকৃতি জেগে উঠেছে :

কোন বিদেশিনী—
তাহার প্রাণের কোন নিগূঢ় কাহিনী,
মর্মকথা তবু নাহি বুঝাইতে পারে ;
উঠি কম্প্র মূর্ছনায়—নামে শতধারে,
শতধা বিদীর্ণ তার নিষ্ফল প্রয়াস ;
ঢাকে মুখ শেষে নারী ফেলি দীর্ঘশ্বাস।

সংবেদনশীল মনের লাবণ্যময় স্পন্দনে, গীতিধর্মিতায় ও সঙ্কেত-ব্যঞ্জনায় অপূর্ব হয়ে উঠেছে। সুতরাং কবিতা দুটির রচনার ইতিহাস যাই হোক না

৫৫। দ্বিজেন্দ্রলাল. নবকৃষ্ণ ঘোষ, পৃঃ ২৫৭।

কেন, ভাবে ভাষায় কবি তাঁর উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে নূতন সৃষ্টিই করেছেন। 'এস্রাজের' মতো একটি নিটোল গীতিকবিতা দ্বিজেন্দ্রলাল খুব বেশী রচনা করেন নি।

'রমণীর সুখ' ও 'সুন্দরী কে?'—কবিতা দুটির প্রারম্ভে একটু লঘু কৌতুকের সুর আছে। কবিতা দুটিতে দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'অশোকগুচ্ছে'র কোনো কোনো কবিতার প্রভাব থাকাও বিচিত্র নয়। নারীসৌন্দর্য নিয়ে লঘু সুরে লীলা-কৌতুক প্রকাশ ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন অদ্বিতীয় শিল্পী। 'রমণীর সুখ' কবিতার শেষে তিনি বলেছেন :

পৃথিবীর সুখ প্রায় অর্দ্ধেক ত কল্পনায়—
অপরার্ধ মাত্র তার বাস্তবিক সুখ।

'সুন্দরী কে?' কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলালের সৌন্দর্যদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সৌন্দর্য-চেতনার সঙ্গে একটি কল্যাণের আদর্শ জড়িত ছিল :

হাস্যে আমার সখীসমা, ক্রোধে মূর্তিমতী ক্ষমা
রোগে দুঃখে চিন্তাজ্বরে—হরে সর্বশোক ;
দৈন্যে আমার উপকারী, পাপে আমার পাপহারী,
তাকে অসুন্দরী বলে কে সে আহাম্মক ;

'ত্রিবেণী' কাব্যগ্রন্থে কতকগুলি 'মাত্রিক দশপদী' কবিতা সঙ্কলিত হয়েছে। তিনি সনেট না লিখে কেন যে দশপদী লিখেছেন, তার কৈফিয়ত আছে কাব্যগ্রন্থটির ভূমিকায় : "ক্ষুদ্র কবিতা লেখায় যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমার মনে হয় যে, চতুর্দশপদীর চেয়ে দশপদী ঐরূপ কবিতা রচনার পক্ষে সমধিক উপযোগী।" দ্বিজেন্দ্রলালের দীর্ঘ কবিতায় মাঝে মাঝে শৈথিল্য দেখা যায়, এই 'দশপদী' কবিতাগুলিতে তা অনুপস্থিত—স্বল্পপরিসর কবিতাগুলির মধ্যে কথা-বিস্তারের অবকাশও নেই। ব্যক্তিগত ভাবনার মৃদু আন্দোলনে কোনো কোনো কবিতার ভাবগভীরতাও লক্ষণীয়। দশপদীগুলিকে বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক থেকে মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করা যায় : (ক) আত্মগত ভাবনা, (খ) প্রকৃতি, (গ) প্রেম ও সৌন্দর্যানুভূতি ও (ঘ) জগৎ ও জীবন-সম্পর্কিত বিভিন্ন মন্তব্য। বর্ণনার ঐশ্বর্যে ও চিত্রসৌন্দর্যের রমণীয়তায় 'ঊষা' কবিতাটি উল্লেখযোগ্য :

উষা যখন নেমে আসে শুভ্রবাসে, ভিজা এলোচুলে,
নতনেত্রে, স্মিতমুখে অলক্তক রক্তিম চরণে,
চাঁপার মত আঙুল দিয়ে অন্ধকারের দরোজাটি খুলে,
জাগে বিশ্ব বিরঞ্জিত মুঞ্জরিত নবীন জাগরণে,

বসন্তে ও বর্ষায় বিরহের পার্থক্যটি একটি মিতাক্ষর মন্তব্যে সুন্দর হয়ে উঠেছে ·

বসন্তে বিরহ—শুদ্ধ প্রণয়ীরই—নহে সে দুঃসহ,
বর্ষায় বিরহ বড় বাজে বক্ষে —সে বিশ্ববিরহ।

'প্রেম' ও 'কোকিল' কবিতা দুটিতে বাঙ্গের তির্যক দৃষ্টিই প্রাধান্য লাভ করেছে। 'উর্বশী' স্বর্গীয় সৌন্দর্য, কামনার মোহনিদ্রায় তার মত্য প্রেমিককে আচ্ছন্ন করে সে রূপপক্ষ প্রসারিত করে 'সন্ধ্যারাগরঞ্জিত' অম্বরে মিলিয়ে যায়। অপ্সরা-প্রেমমুগ্ধ মর্ত্যমানবের ট্র্যাজেডিকে কবি ব্যঞ্জনার সূক্ষ্মতায় চিরন্তন করে তুলেছেন

আমি যবে মগ্ন মোহঘুমে,
তোমায় বক্ষে রেখে প্রিয়ে,—তুমি (কবি বিদলিত কামে
প্রেমসম) সন্ধ্যাবক্ষে রূপপক্ষ প্রসারিত করে
উড়ে গেলে, মিশে গেলে সন্ধ্যারাগরঞ্জিত অম্বরে।

'রূপসী' ও 'সুন্দরী' কবিতা দুটির ভাবানুষঙ্গও দ্বিজেন্দ্র-মানসের অনুকূল। বহিরাশ্রয়ী সৌন্দর্যের ক্ষয়িষ্ণুতার সঙ্গে হৃদয়ের চিরন্তন সৌন্দর্যের তুলনা করে শেষোক্তটিকে কবি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'চুম্বন' ও 'প্রথম চুম্বন' কবিতা দুটিতে ব্রাউনিং-এর কবিতার ছায়া আছে। দেবেন্দ্রনাথ সেনের এই শ্রেণীর কবিতায় হৃদয়াবেগ ও উচ্ছলতা আছে, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় আছে ভাষার ও ভাবের সংহতি। দেবেন্দ্রনাথের রূপমুগ্ধ চিত্ত কল্পনার ক্রীড়াশীলতায় ও দুর্জয় হৃদয়াবেগে প্রমত্ত ·

দাও দাও একটি চুম্বন—
মিলনের উপকূলে সাগরসঙ্গমে
দুর্জয় বানের মুখে ভাসাইয়া দিব সুখে
দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন।[৫৬]

৫৬। দাও দাও একটি চুম্বন অশোকগুচ্ছ।

দ্বিজেন্দ্রলাল সেই অসহ্য আনন্দের বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাবাবেগহীন গদ্যাত্মক ভঙ্গিতে :

> বাষ্প হ'য়ে উড়ে যায় সে অবিলম্বে। আনন্দ না সহে
> গুরুভার। ছিঁড়ে যায় সেই তানপুরার উচ্চে বাঁধা তার
> বেজে উঠে তীক্ষ্ণ আর্তনাদে।

'প্রবাসে' ও দশপদীর শেষ দিকের কয়েকটি কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের চরম স্বীকারোক্তিই প্রকাশিত হয়েছে। তার শেষদিকের কবিতায় ভাব-গভীরতা আছে, কিন্তু বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্যের মধ্যে তিনি তাঁর বৈশিষ্ট্য ও চিন্তার দার্ঢ্য হারিয়ে ফেলেন নি। কবির কাছে অনুতাপও মূল্যহীন —"অনুতাপ ত শিশুর রোদন"—ধর্মের ভিতর দিয়ে নয়, কর্মময় জীবন ও পরহিতব্রতেই একমাত্র পাপক্ষয় সম্ভব (অনুতাপ)। মোক্ষবাদীদের কবি বলেছেন —"মানব জীবন নহে শুদ্ধ আলো কিন্তু নহে শুদ্ধ ছায়া" (মোক্ষ) মানুষের সুখ দুঃখে বিধানের কোনো পরিবর্তন ঘটে না—"তোমার সুখ কি তোমার দুঃখ এ ব্রহ্মাণ্ডে বাধে এতটুক।" (মানুষ),—প্রভৃতি উক্তির মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের মূল কবিধর্মটি দ্বিধাগ্রস্ত হয় নি। দুঃখ-আঘাতে জর্জরিত হয়ে, জীবনের অন্তিমলগ্নেও বুদ্ধিবাদী মানবপ্রেমিক কবি তাঁর ব্যক্তিত্ব-ভাস্বর প্রচল-প্রতিষ্ঠ আসন থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হন নি। দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে স্বর্গ কোনো অলৌকিক বস্তু নয়—মানুষ নিজেই তার পরহিতব্রত ও মহৎ জীবনাদর্শ দ্বারা স্বর্গ রচনা করে

> চাও স্বর্গ ?—স্বর্গ। সেত মানুষেরই নিজের হাতে গড়া,
> ধর্ম—পরহিতব্রতের মহাতন্ত্র—নহে মন্ত্র পড়া। (ধর্ম)

স্বর্গ 'আকাশে কি পরপারে নয়'—

> স্বর্গ সে স্বকীয় ধর্মকর্ম করা, স্বর্গ মহাযোগ,
> স্বর্গ পরহিতব্রত, স্বর্গ পরহেতু দুঃখভোগ। (স্বর্গ)

জীবনীকাররা বলেছেন 'প্রবাসে' দ্বিজেন্দ্রলালের শেষ কবিতা। কিন্তু এ তথ্যটির কথা বাদ দিলেও 'প্রবাসে' কবিতা দ্বিজেন্দ্রলালের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। কবিতাটি কবির মনোজীবনের এক বিচিত্র চলচ্ছবি—মনের মধ্যে যে ভাবনার তরঙ্গ ওঠানামা করে, কবি তারই এক অন্তরঙ্গ পরিচয় দিয়েছেন। বাল্য-কৈশোরের প্রকৃতিপ্রীতি ও খেলাধূলা, কৃষ্ণনগরের রাজবাড়িতে

দুর্গোৎসবের আনন্দ, বিলাত প্রবাস, বিবাহিত জীবনের যৌবনস্বপ্ন ও হাসির গানের আত্মবিহ্বল দিনগুলি, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি —কবির মনে পড়েছে। অতীত স্মৃতির পর্যালোচনার পর কবি তাঁর জগৎ ও জীবনসম্পর্কিত রহস্য-জিজ্ঞাসার কথা বলেছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান-পরিশীলিত বুদ্ধিমার্জিত মননশীলতা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর নবজাগরণের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। হৃদয়বৃত্তির বিচিত্রমুখী সম্প্রসারণের সঙ্গে বুদ্ধিমার্জিত জ্ঞানানুশীলনও এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য। দ্বিজেন্দ্রলালের মনোজীবন বিশ্লেষণ করলে বাঙালী চিত্তের দ্বিমুখী সম্প্রসারণেরই পরিচয় পাওয়া যায়। জগৎ ও জীবনের যে অর্থ উদ্‌ঘাটনের তৃষ্ণা জেগেছিল, তাকেই দ্বিজেন্দ্রলাল জীবন-সায়াহ্নে চিন্তা করেছেন

আবার ছুটি চিন্তারাজ্যে, প্রাণের তৃষ্ণায় করি ধ্যান—
জগতের এক নূতন তথ্য, নূতন অর্থ, নূতন জ্ঞান।

কবি জীবনের উপরিতলের হাস্য-পরিহাস নিয়ে থাকতে চান না—জীবনের গহনে অবতরণ করাই তার একমাত্র কামনা। মানবিক মহত্ত্বকে তিনি এক সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছেন। পুরাণ ও ইতিহাসের দুঃখবরণের কাহিনীগুলি কবিকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছে। মানবমহত্ত্ব, দুঃখবরণ ও আত্মত্যাগ কবিকে নূতন স্বর্গরচনার প্রত্যাশায় উদ্‌বুদ্ধ করে তুলেছে। দুঃখবরণ ও দুঃসহ বেদনার ভিতর দিয়ে যাঁরা অন্ধকার রাত্রি অতিক্রম করেছেন, তাঁদের উপর কবির প্রগাঢ় বিশ্বাস ও সহানুভূতি

হাস্য শুধু আমার সখা? অশ্রু আমার কেহই নয়?
হাস্য করে অর্ধজীবন করেছি ত অপচয়।
চলে যারে সুখের রাজ্য, দুঃখের রাজ্য নেমে আয়!
গলা ধরে কাঁদতে শিখি গভীর সহবেদনায়,

* * *

পরের দুঃখে কাঁদতে শেখা—তাহাই শুধু পরম নয়।
মহৎ দেখে কাঁদতে জানা—তবেই কাঁদা ধন্য হয়।

মানবমহত্ত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধের সঙ্গে মৃত্যুরুক্ষ বিশ্বরহস্য-জিজ্ঞাসা যুক্ত হয়ে কবিকণ্ঠকে ভাবগভীর করে তুলেছে—হয়তো নিজের আসন্ন মৃত্যুর কালো ছায়াও চকিতে দেখা দিয়েছিল। মানবের প্রতি গভীর বিশ্বাসী

ও মানব জয়যাত্রার কবি-দর্শক দ্বিজেন্দ্রলাল দুঃখবাদী হতে পারেন না। তাঁর মানবতন্ত্রী দৃষ্টি আত্মপ্রত্যয় ও বিচারবুদ্ধি দিয়েই মানুষের মধ্যে দেবতার সম্ভাবনা আবিষ্কার করেছে—স্বর্গ থেকে কোনো বিশ্বাসের ছবি আনতে চায় নি। শেষ কবিতায় কবি যেন তাঁর আত্মকাহিনীই রচনা করেছেন—কবি-চরিতের মর্মবাণী চিন্তায়-কল্পনায় ও মানবীয় সমবেদনায় মহিমোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

॥ ১২ ॥

কবি হিসাবে বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান কোথায়, এ প্রশ্ন মনে জেগে ওঠা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সমসাময়িককালে, বিশেষত দ্বিজেন্দ্রজীবনের শেষ দশ বছরে নাট্যকার হিসাবেই তাঁর পরিচয় মুখ্য হয়ে উঠেছিল—কারণ নাটকগুলির মধ্যে সমকালীন রাজনৈতিক উত্তাপ সঞ্চারিত হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসও কারো কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কবিচরিতের কোনো কোনো বৈশিষ্ট্য তাঁর সমকালে আলোচিত হলেও প্রধানত তাঁর গৌণ সৃষ্টি হিসাবেই সেগুলি দেখা হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিচেতনার সম্যক মূল্য নির্ধারিত হয় নি। এর মূলে বাঙালীর কাব্য-সংস্কারই প্রধানত দায়ী। দ্বিজেন্দ্রলালের কাল একই সঙ্গে রবীন্দ্র-বরণ ও রবীন্দ্র-বিরোধের কাল। কেউ কেউ আবার এই দুই বিপরীত আকর্ষণে আন্দোলিত হয়েছেন—বাংলা কাব্যের দুই বিরোধী শিবিরে একই সঙ্গে সাড়া না দিয়ে পারেন নি। তৎকালে দ্বিজেন্দ্রলালের নেতৃত্বে একটি রবীন্দ্র-বিরোধী সাহিত্যিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পরেও রবীন্দ্রনাথ আরো আটাশ বছর জীবিত ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পরে রবীন্দ্র-সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যে পরিণত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি অংশ এই অসাধারণ রূপস্রষ্টার রসদৃষ্টিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যের এই উত্তর-রবীন্দ্র পর্বটি প্রধানত রবীন্দ্র-বরণের পর্ব। দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রবর্তিত কাব্যরীতি ও কলাবিধির সম্যক অনুশীলনের অভাবে বাংলা সাহিত্যের এই প্রতিভাবান কবির কবিকীর্তি আজ এক বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু কবিমানসের স্বাতন্ত্র্যে ও কাব্যরীতির অভিনবত্বে দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা কাব্যের ইতিহাসে এক স্মরণীয় চিহ্ন রেখে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ, ভাষার সৌকুমার্য, লাবণ্যমণ্ডিত পদবিন্যাস, সঙ্কেত-ব্যঞ্জনার নিগূঢ় অর্থব্যক্তি পরবর্তীকালের বাংলা কাব্যের পথ-নির্দেশ করেছে। রবীন্দ্রকবিজীবনের সমৃদ্ধ জয়যাত্রার পাশে আর একটি মন, আর একটি কাব্যরীতিও সেদিন ব্যক্তিত্বভাস্বর ও পৌরুষদীপ্ত হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেও দ্বিজেন্দ্রলালের এই পৌরুষমণ্ডিত স্বাতন্ত্র্যের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন। শেষজীবনের কবিতায় তিনি অনেকখানি গভীরাশ্রয়ী হয়েছিলেন, কিন্তু আত্মতন্ময় বিশুদ্ধ হৃদয়চর্চার কৈবল্য কোনোদিনই তাঁর কবিচরিত্রের মূলমন্ত্র হতে পারে নি। প্রেম-সৌন্দর্যমুগ্ধ কবিমন যাতে পুষ্পপেলব গীতগন্ধভরা বিচিত্র-সুন্দর কাব্যমালঞ্চে ঘুমিয়ে না পড়ে এ জন্য সদাজাগ্রত বুদ্ধির একটি সতর্ক-শাসনও পাশাপাশি জেগে ছিল। তিনি পরিদৃশ্যমান বস্তুজগতের ঊর্ধ্বে কোনো অপার্থিব অধ্যাত্মজগতের কল্পনা করেন নি—বাস্তব পৃথিবীকেই তিনি স্বর্গীয় করে তুলতে চেয়েছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশ থেকেই বাংলা কাব্যের ইতিহাসে দুটি ধারা পাশাপাশি চলেছিল—মহাকাব্য ও আখ্যায়িকা-কাব্য এবং গীতিকাব্য। প্রথম ধারায় যুগ-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাই কবি-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে জড়িত হয়ে নবজাগ্রত জাতীয়-জীবনকে রূপ দিয়েছিল। দ্বিতীয় ধারাটি আত্মনিষ্ঠ লিরিক কবিতার ধারা—বিহারীলালের নির্জন ও নিঃসঙ্গ মানসে যার স্বপ্নবিলাস ও ধ্যানতন্ময়তা। কিন্তু লিরিকের আর এক মূর্তিও এই যুগের কাব্যে উদ্ভাসিত হয়েছিল। মধুসূদনের গীতিকবিতা ও গীতিধর্মিতা তার উজ্জ্বল প্রমাণ। প্রকৃতপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ মহাকাব্য রচনার পক্ষে ঠিক অনুকূল ছিল না। অনেক সময় অতি সামান্য বিষয়কে দীর্ঘ বর্ণনার দ্বারা ফেনস্ফীত করে তোলা হয়েছে। একমাত্র মধুসূদনই বিষয়ের আপেক্ষিক শীর্ণতাকেও এক উজ্জ্বল-দীপ্ত ক্লাসিক মহিমায় সমুন্নত করেছেন। মধুসূদনের চতুর্দশপদী-গীতিকবিতা, বিহারীলালের সারদামঙ্গল'ও গীতিকাব্য। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কম নেই এবং সে পার্থক্য শুধু কাব্যরীতিগত নয়, কবিমানসগতও। বিহারীলালের শান্ত মৃদু ভাবতন্ময়তা গীতিকবিতার এক নূতন রসাদর্শের প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু মধুসূদনের গীতিকবিতাতেও

তাঁর ক্লাসিক ভাবাদর্শ ব্যাহত হয় নি। মধুসূদনের লিরিক ধ্রুপদী রীতির। স্পষ্টতা, ঋজুতা, সমুন্নতি, সরলতা ও সবলতা তাঁর গীতিকবিতাতেও লক্ষ্য করা যায়। মহাকাব্যের ক্লাসিক সমুন্নতি সনেটের নির্ধারিত আয়তনের মধ্যেও তার বৈশিষ্ট্য হারায় নি। বস্তুকে গৌণ করে বিশুদ্ধ ভাবসাধনাই সেখানে জয়যুক্ত হয় নি। ক্লাসিক ও রোমান্টিক সাধনার যথার্থ সমন্বয় ঘটেছে মধুসূদনের প্রতিভায়—মহাকাব্যের মতো গীতিকাব্যও এই মনেরই রচনা।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'উদ্ভব-পর্বে'র কাব্যে বিহারীলালের প্রভাব যা আছে, তা নিতান্তই গৌণ, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের প্রভাব তাঁর প্রথম কাব্যে অনেক বেশী স্পষ্ট। জাতীয়গৌরববোধ ও স্বদেশপ্রীতির প্রেরণার মূলে আছেন এই যুগের দুজন কবি। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কাব্যেও হেমচন্দ্রের সামান্য কিছু প্রভাব আছে। কিন্তু সে প্রভাবের রূপটি স্বতন্ত্র। হেমচন্দ্রের মহাকাব্য বা জাতীয়ভাবোদ্দীপক কবিতার দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন নি। কয়েকটি গীতিকবিতা যেগুলি হেমচন্দ্রের অপেক্ষাকৃত আত্মনিষ্ঠ মনের সৃষ্টি ও সূক্ষ্মতর হাতের রচনা এবং 'দশমহাবিদ্যা'র কোনো কোনো অংশের প্রভাবও আছে।[৫৭] অবশ্য হিন্দুমেলার যুগে লেখা দু-একটি স্বদেশপ্রীতির কবিতায় হেমচন্দ্রের প্রভাব আছে। রবীন্দ্রনাথের 'শৈশবসঙ্গীত' কাব্যে হেমচন্দ্র যেমন আছেন, তেমনি বিহারীলালও আছেন—শুধু তাই নয়, বিহারীলালের দিকেই কবির আকর্ষণটি প্রবলতর।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, দ্বিজেন্দ্রলালের মনে লিরিসিজম ও স্যাটায়ার একটি যুগ্মবেণী রচনা করেছিল। লিরিক ও স্যাটায়ারের বিপরীত আকর্ষণ 'দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য-পরিণামকে কোন্ পথে নিয়ন্ত্রিত করেছে, এইটিই সম্ভবত তাঁর কাব্যজীবনের ফলশ্রুতি সম্পর্কে সবচেয়ে বড় জিজ্ঞাসা। আধুনিক বাংলা কাব্যে কোনো পূর্ণাঙ্গ ক্লাসিক্যাল যুগ সৃষ্টি হয় নি। তবে যে একটি অর্ধ-ক্লাসিক যুগ সৃষ্ট হয়েছিল, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে ক্রমশ রোমান্টিকতার উদার-মুক্ত আলো প্রসারিত হচ্ছিল। বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিকতার চূড়ান্ত সিদ্ধি রবীন্দ্রনাথের ভাব-সাধনায়। বিহারীলাল থেকে রবীন্দ্র-পূর্ববতী বাংলা কাব্য সেই পথেই অগ্রসর হয়েছে।

৫৭। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন এ সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা করেছেন (রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা : বিশ্বভারতী পত্রিকা. বৈশাখ, ১৩৫০)।

ক্লাসিক ও রোমান্টিক ভাবাদর্শের মিশ্র-মানস থেকে ক্রমাগত বিশুদ্ধ রোমান্টিকতার দিকেই বাংলা কাব্যের জয়যাত্রা।

দ্বিজেন্দ্রলাল মনোধর্মের দিক থেকে 'বিশুদ্ধ রোমান্টিক' কবি নন, যদিও শ্রেণীবিভাগের দিক থেকে তাঁকে 'রোমান্টিক' আখ্যা দেওয়া অসঙ্গত নয়। দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার মূলসঙ্কেত ও অভিপ্রায়টির কথা বহু আগে রবীন্দ্রনাথই বলে দিয়েছেন। 'আষাঢ়ে' কাব্যের সমালোচনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "বায়রনের ডন জুয়ানে কবি অবলীলাক্রমে যথেচ্ছ কৌতুকের অবতারণা করিয়াছিলেন। কিন্তু নির্দোষ ছন্দের সুকঠিন নিয়মের মধ্যেই সেই অনায়াস অবলীলাভঙ্গি পাঠককে এইরূপ পদে পদে বিস্মিত করিয়া তোলে।" রবীন্দ্রনাথ এখানে শুধু বায়রনের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে ও দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যের ছন্দের সঙ্গে ডন জুয়ানের ছন্দের একটি সাধারণ তুলনা করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। কিন্তু বায়রনের কবিচেতনা ও কাব্যরীতি দ্বিজেন্দ্রলালের কবিজীবনের উপর একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক যুগের কবিদের মধ্যে সমকালীন দেশ-কাল ও মনুষ্য-সমাজ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী কৌতূহলী ছিলেন বায়রন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা শেলীর মতো তাঁর কবিতায় কোনো সুনিবিড় আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা ছিল না। ভাব-স্থির অবস্থার চেয়ে একটি অস্থির-চঞ্চল মনোবৃত্তিই তাঁর ব্যক্তিজীবন ও কবি-জীবনের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভাষার ইন্দ্রজাল ও আবেগের তপ্ততার সঙ্গে এক বিদ্রূপাত্মক মনোভঙ্গি তাঁর কাব্যে প্রাধান্যলাভ করেছিল। মহতের সঙ্গে তুচ্ছ, গভীরের সঙ্গে অগভীর, করুণের সঙ্গে হাস্য—প্রভৃতি আপাতবিরোধী ভাববৃত্তিগুলি তাঁর কাব্যে দ্রুতবেগে ওঠা-নামা করেছে। তাঁর কাব্যে যে ভাবগভীরতা ছিল না এমন নয়, কিন্তু তা বেশীক্ষণ স্থির হয়ে থাকতে পারে নি, বিনা ভূমিকায় আকস্মিকভাবে ভাবের গৌরীশঙ্কর শিখরদেশ থেকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অতি তুচ্ছ লৌকিক ভূমিতে নেমে এসেছে। সূক্ষ্ম গীতিরসের সঙ্গে ব্যঙ্গের অতর্কিত বিদ্যুৎশিখা বায়রনের কাব্যে এক অভিনব আস্বাদন সঞ্চারিত করেছে। ব্যঙ্গকৌতুক ও সমাজ-সমালোচনার ভিতর দিয়ে তিনি সমকালীন সমাজ-জীবনের ছবি এঁকেছেন। ফরাসী-বিপ্লবোত্তর ও নেপোলিয়ানের যুগের রণক্লান্ত ইউরোপের বিকৃত ও বিবর্ণ মূর্তি বায়রনের মনোজীবনের উপর একটি সুচিরস্থায়ী ছায়াপাত করেছে—প্রথম

থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি যুগ-জীবনের এই উত্তাপ বহন করে এসেছেন। শেলীর অপার্থিব দিব্যানুভূতি ও কল্পস্বপ্নের সঙ্গে তাঁর এইখানেই প্রভেদ।[৫৮]

বায়রনের মতো দ্বিজেন্দ্রলালেরও অন্তর্মুখী গীতপ্রবণতার সঙ্গে বহির্মুখী সামাজিকবৃত্তির একটি মিলন ঘটেছিল। লিরিসিজম ও স্যাটায়ারের বিচিত্র সংমিশ্রণে ইংরেজ কবি ও বাঙালী কবি—দুজনেরই মনোজীবনে ভাবাবেগ-প্রবণতা ও বুদ্ধিবৃত্তধারার বিরুদ্ধপ্রবাহ তাঁদের কাব্যে কাব্যরীতির বৈচিত্র্য ঘটিয়েছে। বায়রনের কাব্যে বর্ণময় বর্ণনা ও হৃদয়াবেগের প্লাবনের সঙ্গে গদ্যাত্মক ও সংলাপাত্মক রীতি অনুপস্থিত নয়। গীতিকাব্যের অন্তর্গূঢ়, ধ্যানমৌন, আত্মবিভোর রূপ বায়রন বা দ্বিজেন্দ্রলাল দুজনার কারো কাব্যেই তেমন অন্তরঙ্গ হতে পারে নি—কারণ তাঁদের তির্যক বিচার-বুদ্ধিই তাতে বাধা দিয়েছে। লিরিসিজম তাঁদের কাব্যে আর একরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তাঁদের কাব্যে গতি ও গীতি দুই-ই ছিল—কিন্তু তার প্রকাশ স্পষ্টোজ্জ্বল। আকাশচারণার চেয়ে মর্ত্যের মৃত্তিকার প্রতি কৌতূহলই ছিল প্রবলতর।

বায়রনকে তাই তথাকথিত 'প্রেরণাবাদী রোমান্টিক'দের সঙ্গে তুলনা করে অনেকেই পুরোপুরি রোমান্টিক বলতে চান না। বায়রনের কবিমানসের সঙ্গে পোপের একটি আত্মিক সংযোগ আছে। রোমান্টিক যুগে বাস করেও তিনি পোপের কাব্যরীতি ও মনোধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাই তরুণ বয়সে English Bards and Scotch Reviewers কবিতায় তিনি প্রধানত পোপের 'ডানসিয়ার্ড' কাব্য থেকেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক কাব্যরচনার Mock-Heroic ভঙ্গিটি আয়ত্ত করেছিলেন। এই সময় বায়রন অষ্টাদশ শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্ত কাব্যধারার পক্ষ নিয়ে রোমান্টিক কবিদের আতিশয্যকেও তীব্র কশাঘাত করতে ছাড়েন নি।[৫৯] রোমান্টিক মনোভাবের প্রতি এই

৫৮। "Shelley, though he underwent times of deep depression and suffered much at the hands of a hostile government, was of too ethereal a temper to be cowed by the spirit of the time, or to abandon his faith in man's perfectiblity, imported to him by Godwin ; but Byron with his feet of clay, and with a mind which for good and evil, was profoundly responsive to the prevailing currents of contemporary thought, remained, from first to last, the child of his age." The Cambridge History of English Literature (1943) : Vol XII, Part I, Page 39

৫৯। "Byron adopts the role of a defender of Eighteenth Century intelligence and propriety against romantic extravagance."
—The Romantic Poets : Graham Hough, Page 100.

বিরোধিতা সত্ত্বেও বায়রনকে রোমান্টিক কবিগোষ্ঠীরই অন্তর্ভূত করা হয়, কিন্তু 'এপিক স্যাটায়ার' কাব্যরীতির বাস্তবপ্রবণতা ও আঙ্গিকের স্পষ্টতায় বায়রন রোমান্টিক হয়েও এক অর্ধ-ক্লাসিক ভাবের পোষকতাও করেছেন।

বায়রনের কবিশক্তি ও কবিমানসের সঙ্গে বহু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বাংলা কাব্যে রোমান্টিক ভাবাদর্শের প্লাবনের যুগে দ্বিজেন্দ্রলাল যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা বায়রনের কাব্যাচরণের কথাই স্মরিয়ে দেয়। উনবিংশ শতাব্দীব গদ্যসাহিত্যে চিন্তাকর্ষিত ভাবাবেগনির্মুক্ত একটি ক্লাসিক্যাল গদ্যরীতিও গড়ে উঠেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের চিন্তা-চেতনা, ব্যঞ্জনাহীন সুস্পষ্ট প্রকাশরীতি ও কল্পনা-বর্ণবর্জিত বস্তুগ্রাহ্য কাব্যজগৎ ক্রমবিলীয়মান ক্লাসিক ধারার প্রতিশ্রুতিকে বহন করেছে। অথচ বাংলা কাব্যের শ্যামায়িত অরণ্যবীথিকায দূর স্বপ্নলোকেব মর্মরধ্বনি জেগে উঠেছে। দ্বিজেন্দ্রলালেব কানে সে 'দক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্জরণ' এসে পৌছোয় নি এ কথা বললে ভুল হবে। কিন্তু সেই বোমান্টিক মন্ত্রগুঞ্জবণকে তিনি দূর স্বপ্নলোকে উধাও না করে, তার আতিশয্য ও অতিচাবী ভাবময়তাকে বিচার-বুদ্ধি ও বিতর্কের ঋজু-বলিষ্ঠ বন্ধনেব দ্বারা সংহত করে মর্ত্যলোকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তাই দ্বিজেন্দ্রলাল শেলী বা রবীন্দ্রনাথের মতো বিশুদ্ধ রোমান্টিক নন। দেবেন্দ্রনাথেব মতো চম্পকের গন্ধমদ জগতে তিনি মুগ্ধ প্রহর যাপন কবেন না, বডাল কবির মতো স্বপ্নালস্যে বিভোর হন না, রবীন্দ্রনাথের মতো 'মেঘচুম্বিত অস্তগিরিব সাগরপারে' তিান দূরাভিসারী কল্পলোকে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' করেন না। বাংলা কাব্যের রোমান্টিক ভাববৃত্তিকে তিনি আর এক মন্ত্রে শোধন করে তুলতে চেয়েছিলেন। বায়রন এ বিষয়ে তাঁর অনিবার্য পথিকৃৎ হয়েছিলেন। এই মনোধর্মই তাঁকে রবীন্দ্র-বিরোধী করে তুলেছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল ববীন্দ্রনাথ নন—তাঁব কবিশক্তির একটি নির্ধারিত সীমা আছে,—কিন্তু সেই স্বল্পপরিসর সীমার মধ্যে তাঁর কাব্য ব্যক্তিত্বভাস্বর ও নিজস্ব স্টাইলে স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের জয়যাত্রার সেই উৎসবমুখর যুগে তাঁরই সমসাময়িক একজন কবির পক্ষে এ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা নিতান্ত তুচ্ছ কবিশক্তির পরিচায়ক নয়।

কাব্যরীতি ও কলাবিধি

বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু ভাবের দিক থেকেই নূতন সুর সংযোজিত করেন নি, কাব্যরীতি ও কলাবিধির দিক থেকেও তিনি অভিনবত্ব সঞ্চাবিত করেছেন। ছন্দ, ভাষা, অলঙ্করণ ও প্রকাশরীতি প্রভৃতি দিকেও তিনি নানা রূপ-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেও এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। 'আষাঢ়ে', 'আলেখ্য' ও 'ত্রিবেণী' গ্রন্থত্রয়ের ভূমিকায় তিনি তাঁর কাব্যরীতি, ছন্দ ও ভাষা সম্পর্কে মূল্যবান নির্দেশ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও 'আষাঢ়ে' ও 'মন্দ্র' আলোচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যরীতির অভিনবত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। 'আর্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ গান ও কবিতার পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে ছন্দের কথা তুলেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার কাব্যরীতি ও প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা হয়।[১] পরবর্তী কালে ছন্দঃশাস্ত্রের আলোচনা করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দ-প্রকৃতি সম্পর্কে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা করেন বিখ্যাত ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন। তারপরে সজনীকান্ত দাস, দিলীপকুমার রায়, মোহিতলাল মজুমদার, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ছান্দসিকেরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে আলোচনা করেছেন। একালের একজন মনস্বী সমালোচকও তাঁর সাম্প্রতিক একটি প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যরীতির অভিনবত্ব সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন :

"বাংলা কাব্যে দ্বিজেন্দ্রলালের দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি যে কেবল অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা নয়, একটি নূতন কাব্যরীতির প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন।...তিনি গদ্যকে গদ্যের ব্যবহারিক

১। এ সম্পর্কে সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (ভারতী, আষাঢ়, ১৩২০), পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্য, আষাঢ়, ১৩২০). অমরেন্দ্রনাথ রায় (অর্চনা, আষাঢ়. ১৩২০), প্রমথ চৌধুরী (সবুজপত্র, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২ ও আষাঢ়, ১৩২৩), সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (বাঙ্গালী, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩) প্রমুখ সাহিত্যিকদের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ক্ষেত্রে টানিয়া নামাইযাছেন, পদ্যের এই ব্যবহার আমাদের সাহিত্যে নূতন, সে নূতন অভাবিত বেশে দেখা দিয়া চমক লাগাইয়া দিয়াছে, এ যেন রাজরানী দ্রৌপদীর রাজদাসী সৈরিন্ধ্রীবেশ ধারণ। আর কোনো কারণে না হইলেও (অন্য কারণও আছে) শুধু এই অভিনব কাব্যরীতির জন্যই তিনি বাংলা কাব্যে স্থায়িত্ব লাভ করিবেন।"[২]

দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় পূর্বাপর একটি আঙ্গিক-সচেতনতার ভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর কবিমানসের সঙ্গে এই আঙ্গিক-সচেতনতার একটি নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিপ্রতিভায় অন্তর্গূঢ় ধ্যানশীলতা অপেক্ষাকৃত কম, তিনি সতর্ক, সজাগ ও বিচারশীল। কাব্যকে অতিলালিত্যের সংস্কার থেকে তিনি মুক্ত করতে চেয়েছিলেন—স্পষ্টতা, প্রত্যক্ষতা, বলিষ্ঠতা ও ওজোগুণের প্রতি ছিল তাঁর অসাধারণ অনুরাগ। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যরীতি ও কলাবিধি সম্পর্কে এই কয়েকটি প্রসঙ্গ মনে রাখা প্রয়োজন। তাঁর এই কাব্যরীতির স্বাতন্ত্র্য কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়, অথবা প্রচলিত কলাকৌশল থেকে মুক্ত হওয়ার একটি 'ভঙ্গি' বা 'কৌশল' মাত্র নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যরীতি তাঁর কবিমানস ও কবিধর্মের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ছন্দ, ভাষা, অলঙ্কার, রূপকল্পনা (image)—বহিরঙ্গের সমস্ত উপকরণগুলি তাঁর কাব্যের আত্মার সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। এক্ষেত্রে কাব্যের আত্মার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য তার বহিরঙ্গকেও রচনা করেছে, এর জন্য কবিকে কোনো পৃথক যত্নের আশ্রয় নিতে হয় নি। এ সম্পর্কে কবি নিজেই তাঁর 'কবি' কবিতায় (আলেখ্য) যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য

> কাব্য নয় ক ছন্দোবন্ধ,
> মিষ্ট শব্দের কথার হার,
> কাব্যে কবির হৃদয় নাই যার,
> তাহার কাব্য শব্দসার।

বাংলা ছন্দের ইতিহাসে দ্বিজেন্দ্রলালের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। বাংলা ভাষা ও বাংলা ছন্দের শক্তিমত্তা সম্পর্কে তিনি প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন। ভাষার সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি গভীর অন্তর্দৃষ্টি ব্যতীত প্রচলিত

২। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল : প্রমথনাথ বিশী : রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ই মাঘ, ১৩৬৪।

ছন্দবিধির মধ্যে নূতনত্ব আনা সম্ভব নয়। ভারতচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, প্রমুখ কবিরা অসাধারণ শব্দশিল্পীও ছিলেন। এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিশক্তিও কম নয়।—তিনি বাংলা ভাষা ও বাংলা ছন্দের মূলপ্রকৃতি, ছন্দ ও ভাষার রহস্য উপলব্ধি করেছিলেন। 'আর্যগাথা'' প্রথম ভাগের অধিকাংশ কবিতায় অক্ষরবৃত্ত ছন্দ[৩] ব্যবহৃত হয়েছে। চতুর্দশমাত্রিক পঙ্‌ক্তি ছাড়াও ষোড়শমাত্রিক পঙ্‌ক্তিও ব্যবহৃত হয়েছে :

যাওরে কল্লোলি সদা ঘননীল পারাবার!

আনন্দে অশ্রান্ত তুমি হে অতল হে অপার!—সাগর—যাওরে কল্লোল

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থে দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দও আছে। 'আর্যগাথা' প্রথম ভাগ কবির কিশোর বয়সের রচনা, ছন্দ প্রসঙ্গেও তিনি প্রধানত পূর্ববর্তী কবিদের অনুসরণ করেছেন। কিন্তু দু-একটি জায়গায় কবি একটু নূতনত্ব দেখিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ 'বন-প্রবাহিনী নদী' কবিতাটির কথা বলা যায়। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে বিশ্লিষ্ট করে দুমাত্রায় পরিণত করা বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ দান। তাঁর আগে যুগ্মধ্বনিকে দ্বিমাত্রিক ধরা হত না। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পদ্ধতিতে আমাদের কান এমন অভ্যস্ত ছিল যে, রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী সেই সংস্কারের বশবর্তী হয়েই যুগ্মধ্বনিকেও একমাত্রা ধরা হয়েছে। কারণ তাঁরা অক্ষর সংখ্যা গণনা করেই কাব্য রচনা করতেন। রবীন্দ্রনাথ যুগ্মধ্বনিকে বিশ্লিষ্ট করে 'বাংলা ছন্দকে তরঙ্গায়িত করে' তুললেন।[৪] 'আর্যগাথা' প্রথম ভাগের মধ্যে মাত্রাবৃত্তের যৌগিক ধ্বনিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী কবিদের মতোই একমাত্রা ধরা হয়েছে। কিন্তু সম্ভবতঃ যুগ্মধ্বনি সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের মনেও একটি দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল। 'বন-প্রবাহিনী নদী' পঞ্চমাত্রিক পর্বে ও চতুষ্পর্বিক পঙ্‌ক্তিতে

৩। বর্তমান আলোচনায় 'অক্ষরবৃত্ত', 'মাত্রাবৃত্ত' ও 'স্বরবৃত্ত'—এই তিনটি বহু-প্রচলিত পারিভাষিক শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে।

৪। "...রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেলেন, বাংলায় কার্যত দীর্ঘস্বর নেই বটে, কিন্তু আশ্রিতান্তধ্বনি বা যুগ্মধ্বনি (closed syllable) আছে ; আর এই যুগ্মধ্বনিকে ছন্দের প্রয়োজনে অনায়াসে বিশ্লিষ্ট বা সম্প্রসারিত ক'রে দীর্ঘতা দান করা যায়। এ-ভাবে দীর্ঘস্বরের অভাব সত্ত্বেও যুগ্মধ্বনির সাহায্যে বাংলা ছন্দকে তরঙ্গায়িত করে তোলা সম্ভব হল।"

—ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ : প্রবোধচন্দ্র সেন, পৃঃ ৭

লেখা। কোমলতায় ও পেলবতায় ছন্দটির মধ্যে নদীর প্রশান্ত-প্রবাহ যেন ফুটে উঠেছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এখানে যুগ্মধ্বনিকে বিশ্লিষ্ট করার দিকে একটি প্রবণতা লক্ষণীয় :

বিজন বনে | বাহিয়া তুমি | তুষ রে বন | বাসী
বিতর সবে | বিমল তব | সলিল সুধা | রাশি।
যাওরে পুর | বাহিনী-নদী- | সখী সন্নি | ধানে
শুনাতে তায় | বিজন বন | বাসী সুখ | গানে।

তৃতীয় পঙ্‌ক্তির শেষে 'সন্নিধানে' শব্দটি লক্ষণীয়। এখানে ছন্দের মূল কাঠামো অনুযায়ী 'সন্নিধানে'-র যুক্তাক্ষরটিকে বিশ্লিষ্ট করে পাঁচমাত্রাই ধরতে হয়।

পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর অনেকগুলি কবিতায় ও গানে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের পরিণত রূপগুলিকে ফুটিয়েছেন। 'আর্যগাথা' প্রথম ভাগের যুগ্মধ্বনি সম্পর্কিত দ্বিধার ভাব আর নেই। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যেমন মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবহমানতা আনেন, তেমনি মাত্রাবৃত্ত ছন্দেও প্রবহমানতার সূচনা দেখা যায় দ্বিজেন্দ্রলালের 'মন্দ্র' কাব্যের 'নববধূ' কবিতায়। কবিতাটি পঞ্চমাত্রিক চতুষ্পর্বিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের। কিন্তু কবি সুকৌশলে ছন্দটির মধ্যে একটি প্রবহমানতা এনেছেন। যথা :

আমার ভারি | দায়টি! আমি | সইতে নারি | তবে
লোকের এই | গঞ্জনাটি ; | তা যা হবার | হবে
আমি তো হেথা | টিঁকিতে নাহি | পারিব, যথা | তথা
চলিয়া যাই | খরচ দাও | —এ বেশ সোজা | কথা।

প্রথম ও তৃতীয় পঙ্‌ক্তির শেষের অংশ দুটিতে প্রবহমানতার রূপ সুস্পষ্ট। প্রবহমানতার দ্বারা কবি ভাবকে আরো মুক্ত করেছেন। কাব্যাংশটির সংলাপাত্মক রূপ এই প্রবহমানতার জন্য আরো বেশী ফুটে উঠেছে।—প্রবহমানতার ফলেই কবিতাটির ভাব স্বচ্ছন্দ ও দীর্ঘায়ত হয়ে উঠেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের মাত্রাবৃত্ত ছন্দ সম্পর্কে আর একটি প্রসঙ্গও উল্লেখযোগ্য। মাত্রাবৃত্তের মেজাজটি প্রধানত শান্ত ও ধীর। কিন্তু এ ছন্দের স্বভাবশান্ত রূপটির মধ্যেও যে ওজোগুণের দীপ্তি ও বলিষ্ঠতা কেমন করে ফুটিয়ে তোলা যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল তা দেখিয়েছেন। একাধিক যুগ্মধ্বনির গাম্ভীর্যে একটি সামুদ্রিক কল্লোলধ্বনি তিনি এই ভাষার মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন :

সেদিন তোমার | প্রভায় ধরার | প্রভাত হইল | গভীর রাত্রি
বন্দিল সবে | জয় মা জননী | জগত্তারিণি ! | জগদ্ধাত্রি !

উদ্ধৃত কাব্যাংশটি ষণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে—কিন্তু কবি এই ছন্দের মধ্যে একটি আবেগ ও প্রবলতা সঞ্চারিত করেছেন। সপ্তমাত্রিক মাত্রাবৃত্তছন্দ খুব বেশী নেই। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সিংহল বিজয়' নাটকে সপ্তমাত্রিক মাত্রাবৃত্তের সুষ্ঠু প্রযোগ লক্ষ্য করা যায় ·

যাও হে সুখ পাও | যেখানে সেই ঠাঁই
আমার-এ দুখ আমি | দিতেতো পারি নাই।

—৪র্থ অঙ্ক, ২য দৃশ্য।

॥ ২ ॥

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর কাব-জীবনেব সমৃদ্ধিপর্ব থেকে ছন্দকৌশল সম্পর্কে খুব বেশী সচেতন হয়েছেন। প্রচলিত বিধি অতিক্রম করে ছন্দেব ক্ষেত্রে যে তিনি অভিনবত্ব আনতে চেয়েছেন তাব প্রমাণ পাওযা যায 'আষাঢে' কাব্য প্রকাশের চার বছর আগে প্রকাশিত 'কল্কি অবতাব' প্রহসনটিব প্রস্তাবনায। এখানে লেখকেব বক্তব্য ও বক্তব্যের রীতি দুই-ই লক্ষণীয় :

গদ্য কি পদ্যয আগে বেশ চৌদ্দয
চেনা যেত , কি প্রকারে হোল আবাব অদ্য এ ?
বেল্লিকামি, বেয়াদবি, বেআক্কেলি সহ্য এ ,
'এখন পদ্যের মাত্রাবোধ কি কানের উপব বিশ্বাস ?'
হযত বলতে পাবেন কেউ বা ফেলে দীর্ঘনিঃশ্বাস।
এর উত্তর "ছন্দ স্থানে স্থানে মন্দ
হোতে পারে, কিন্তু পডতে স্বাভাবিক নিঃসন্দো ,
থাকলেই বা একটুখানি বেল্লিকামির গন্ধ।

লেখক আরো জানিয়েছেন :

তবে গদ্য থেকে দেখবেন পড়ে একে,
এটা অনেক ফারাক অর্থাৎ শুনতে একটু মিষ্ট ,
যেখানে তা হয়নি সে আমার দুরদৃষ্ট।"

এই ছন্দটির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেই 'আষাঢ়ে' কাব্যের কোনো কোনো কবিতার বাক্‌রীতি ও ছন্দোবৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যাবে। কবিতার ভাষাকে তিনি গদ্যের এলাকায় নিয়ে এলেন। কবিতার স্বর্গবিহারের পক্ষচ্ছেদ ঘটল, দৈনন্দিন জীবনের গদ্যাত্মক রুক্ষ কঠিন মৃত্তিকায় কবিতার নূতন রীতি প্রবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিল। সহজ কাব্যরীতি ও সংলাপাত্মক ভঙ্গি দিয়ে নিরাভরণ সরলতা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হল। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, উদ্ধৃত কাব্যাংশটি একটি অতি সাধারণ অনলঙ্কৃত গদ্যাত্মক রীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্ত্যানুপ্রাস আছে বটে, কিন্তু পঙ্‌ক্তিগুলি সমান নয়। চলতি শব্দের রূপ নিয়ে এসে লৌকিক ছন্দের মেজাজটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু কবি শেষদিকে যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, তা থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেন নি। কবিতার মধ্যে গদ্যের মেজাজ সঞ্চারিত করতে গিয়ে তাঁর কতকগুলি ত্রুটি ঘটেছে, এ কথাও সত্য। কারণ এ পথে কবির উদ্যম নবীন, তাই অসমতল ভূখণ্ডে প্রাথমিক পদক্ষেপের ফলে কতকগুলি অনিশ্চয়তার সম্মুখে তাঁর উপস্থিত হতে হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে ছন্দের বৈচিত্র্যসাধনে দ্বিজেন্দ্রলাল অধিকতর সচেতনতা ও শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন।

'আষাঢ়ে' কাব্যে দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দ-প্রতিভা সর্বপ্রথম সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়। স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও লঘুরসের সংস্কৃত ছন্দ রচনায় তিনি মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা ছন্দের তিনটি রীতির মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগেই সবচেয়ে বেশী মৌলিকতার সৃষ্টি করেছেন। স্বরবৃত্ত ছন্দ ছড়ায়, গাথায়, বাউলের গানে, রামপ্রসাদের পদে নানাভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে—এ ছন্দ সেকালে খুব কৌলীন্য না পেলেও লোক-জীবনের সঙ্গে এর একটি গভীর সম্পর্ক ছিল। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, করুণানিধান, সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল প্রমুখ কবির হাতে এর নানা রূপবৈচিত্র্য আত্মপ্রকাশ করে। এই ছন্দের সম্ভাবনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য :

"এই প্রাকৃত বাংলা মেয়েদের ছড়ায়, বাউলের গান, রামপ্রসাদের পদে আপন স্বভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সাধুসভায় তার সমাদর হয়নি বলে সে মুখ ফুটে নিজের সব কথা বলতে পারে নি এবং তার শক্তি যে কত তার

সম্পূর্ণ পরিচয়ও হল না। · আমরা একটা কথা ভুলে যাই প্রাকৃত-বাংলার লক্ষ্মীর পেটরায় সংস্কৃত, পারসি, ইংরেজি প্রভৃতি নানাভাষা থেকেই শব্দ-সঞ্চয় হচ্ছে, সেইজন্যে শব্দের দৈন্য প্রাকৃত-বাংলার স্বভাবগত বলে মনে করা উচিত নয়। প্রয়োজন হলেই আমরা প্রাকৃতভাণ্ডারে সংস্কৃত শব্দের আমদানি করতে পারবো। · · আবার ফার্সি কথাও তার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা একসারে বসিয়ে দিতে পারি। · প্রাকৃত ভাষার এই ঔদার্য গদ্যে পদ্যে আমাদের সাহিত্যের একটি পরম সম্পদ, এই কথা মনে রাখতে হবে।"[৫]

দ্বিজেন্দ্রলাল স্বরবৃত্ত ছন্দের এই সম্ভাবনা ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ইংরেজি বাংলা লঘু-গুরু শব্দের বিচিত্র মিশ্রণে 'আষাঢে'র অধিকাংশ কবিতার ছন্দ রচিত হয়েছে। লঘু-ললিত চপলতার বদলে ইডিয়ম প্রধান জোরালো গদ্যাত্মক ভঙ্গির ভিতর দিয়ে প্রচলিত ছন্দ-বিধি লঙ্ঘন করে এক নূতন ধরনের ছন্দ তিনি সৃষ্টি করেছেন

এই অতি | গম্ভীর সভা | , সবাই ধ্যানে | মগ্ন
ছুরি এবং | ফর্কে, ধারাল সব | তর্কে
কঠিন এবং | কোমল প্রশ্ন | করেছেন বসে | ভগ্ন ,
সবার হৃদয় | ভক্তিপূর্ণ | সবার বাক্য | স্তব্ধ,
ধুম্বক ধিনিক | টঙাস ভিন্ন | নাই ক কোনই | শব্দ ,

—শ্রীহরি গোস্বামী

এখানে স্বরবৃত্ত ছন্দকেই তিনি একটি সংলাপাত্মক রূপ দিয়েছেন , প্রচলিত স্বরবৃত্ত ছন্দের মধ্যে নূতনত্ব এনেছেন।

• 'আষাঢে' কাব্যে দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দ-প্রতিভা নানা নূতন দিকের অনুসন্ধান করেছে। তিনি অক্ষরবৃত্ত ছন্দকেও একটি নূতন রূপ দিয়েছেন, 'বাঙালী-মহিমা' কবিতায় কবি বলেছেন

খোল ইতিহাস ,—সতর তুরস্ক
প্রবেশিল যবে গৌড়েতে,
লক্ষ্মণ সেন ত দিলেন চম্পট
কচুবনে এক দৌড়েতে।

৫। ছন্দ : রবীন্দ্র-রচনাবলী (একবিংশতি খণ্ড) পৃঃ ৩২৪।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দকেই কবি এখানে সংলাপাত্মক করে তুলেছেন। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সাহায্যে লঘুরস ফুটিয়ে তুলে ও সংলাপাত্মক মেজাজ সঞ্চারিত করে দ্বিজেন্দ্রলাল এই ছন্দের মধ্যে নূতন রস এনেছেন। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের দ্বারা যে লঘু-চপল পরিহাস ও ব্যঙ্গ-কৌতুক প্রকাশ করা কত সহজে সম্ভব, দ্বিজেন্দ্রলাল তা দেখিয়েছেন।

'আষাঢ়ে' কাব্যগ্রন্থের দুটি কবিতা দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দ-সম্পর্কিত কলা-কুশলতার পরিচয় দেয়। ব্যঙ্গচ্ছলে লেখা দুটি কবিতা 'কলিযজ্ঞ' ও 'কর্ণ-বিমর্দন কাহিনী' যথাক্রমে অনুষ্টুপ্ ও পজ্ঝটিকা ছন্দে রচিত হয়েছে। বিদ্রূপাত্মক লঘু বিষয়কে গুরু-গম্ভীর ছন্দে রূপ দেওয়ার ফলে হাস্যরস স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু লঘু বিষয়কে সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত ছন্দে রূপায়িত করার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের অসাধারণ কবিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অনুষ্টুপ্ সংস্কৃত কাব্যের একটি বহুল ব্যবহৃত ছন্দ। মহর্ষি-বাল্মীকি 'রামায়ণ' মহাকাব্যে এই ছন্দটিকে একটি ক্লাসিক মর্যাদা দিয়েছেন। পরবর্তীকালে ভাস, কালিদাস প্রমুখ কবির হাতে এই ছন্দ বৈচিত্র্য লাভ করেছে। অনুষ্টুপের সূত্র হল :

পঞ্চমং লঘু সর্বত্র সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ।
গুরু ষষ্ঠঞ্চ জানীয়াৎ শেষেষ্বনিয়মো মতঃ॥

অর্থাৎ প্রতি পঙ্‌ক্তিতে পঞ্চম অক্ষর লঘু ও ষষ্ঠ অক্ষর গুরু, দ্বিতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তির সপ্তম অক্ষর লঘু হবে, অন্য অক্ষর সম্পর্কে কোনো বিধিনিষেধ নেই। অনুষ্টুপ্ ছন্দের বহুল প্রচলনের একটি কারণ ছিল। চৌষট্টিটি অক্ষরের মধ্যে মাত্র দশটি অক্ষর সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ আছে সুতরাং কবিদের পক্ষেও এই ছন্দ অবলম্বন করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়েছিল। অনুষ্টুপ ছন্দের লঘু-গুরু বৈচিত্র্যকে দ্বিজেন্দ্রলাল অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রূপ দিয়েছেন :

বারিষ্টার উকীলাদি | মহাযজ্ঞ সমাধিলা।
ভারতে ভারি অদ্ভুত | আশ্চর্য মহতী সভা॥
আসিলা সে মহাযজ্ঞে | মহারাষ্ট্রীয় পশ্চিমে।
মান্দ্রাজী উড়িয়া শীক | বঙালী চ দলে দলে॥

এই ছন্দের প্রয়োগে দ্বিজেন্দ্রলাল যে সর্বত্র সার্থক হয়েছেন, এ কথা বলা যায়

না। অনুষ্টুপ ছন্দের বিধি অনুসারে 'মান্দ্রাজী উড়িয়া শীক'-এর 'শী' অক্ষরটির লঘু হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল ঠিক উলটো করেছেন।

পজ্ঝটিকা ছন্দে লেখা 'কর্ণবিমর্দন কাহিনী' দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দোনৈপুণ্যের আর একটি উদাহরণ। এই চন্দে ষোলো মাত্রার পঙ্ক্তির মধ্যে চারিটি সুস্পষ্ট বিভাগ থাকে। এই ছন্দের সঙ্গে বাংলা ছন্দের একটি মূলগত সংযোগ আছে। পজ্ঝটিকা ছন্দেরই একটি রূপভেদ চর্যার পাদাকুলক ছন্দ। এই বিবর্তন থেকে পয়ারের উৎপত্তি হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙালীর এই প্রিয় ছন্দটিকেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সম্পূর্ণ নূতন ও অপরীক্ষিত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'কর্ণবিমর্দনে'র মতো তুচ্ছ ব্যাপারকে এই ছন্দে রূপ দিয়ে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন :

জানো | নাকি ক | দাচন | মূ ঢ়,
কর্ণ বি | মর্দন | মর্ম কি | গূ ঢ়?
কর্ণ দি | বার কি | কারণ | অন্য,
যদি না | তা আ | কর্ষণ | জন্য?

এই কবিতাটির একটি অংশে দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দোনৈপুণ্য ও কবিত্বশক্তি চূড়ান্ত সিদ্ধিলাভ করেছে :

ও ঘুষি | পড়িলে | গণ্ডে | জোরে,
একে | বারে | মাথা | ঘোরে।

শেষ পঙ্ক্তিতে প্রত্যেকটি অক্ষরকে দ্বিমাত্রিক ধরা হয়েছে। এর ফলে ঘুঁষির প্রতিক্রিয়াটি একেবারে চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে। প্রচণ্ড ঘুঁষির আঘাতে 'মাথা ঘোরা'র রূপটি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। ছন্দের এই বিশেষ ভঙ্গিটি হাস্য-রসিক কবির রসসৃষ্টিকে সার্থক করে তুলেছে।

বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে এমন কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য আছে যে বাংলা ছন্দে সংস্কৃত ছন্দের মতো হ্রস্ব-দীর্ঘ ধ্বনি সমাবেশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের দেশের কয়েকজন কুশলী কবি হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের বিচিত্র সমবায়ে তাঁদের কাব্যে নূতন তরঙ্গ এনেছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে এই শ্রেণীর ছন্দে কবিতা রচিত হয়েছে। সংস্কৃত ছন্দে হ্রস্বদীর্ঘভেদে যথাক্রমে এক, দুই মাত্রা ধরা হত। কিন্তু বাংলায় প্রতিটি অক্ষরের মূল্য একমাত্রা। বাংলায় যে

কয়েকজন কবি দীর্ঘস্বরের দ্বৈমাত্রিক প্রয়োগ করেছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এ সম্পর্কে একজন ছান্দসিকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

"বাংলায় কোন মৌলিক স্বর দীর্ঘ উচ্চারিত হয় না। তজ্জন্য বাংলায় যে সংস্কৃত, হিন্দী, মরাঠী ইত্যাদি ছন্দের অনুরূপ ছন্দঃস্পন্দন সৃষ্টি করা যায় না। তাহা স্বয়ং সত্যেন্দ্রনাথও স্বীকার ক'রেছেন।··· তবে ভারতচন্দ্র, হেমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কবিতায় যেরূপভাবে সুকৌশলে মৌলিক দীর্ঘস্বরের সমাবেশ করিযাছেন, সেইভাবে দীর্ঘস্বর-বহুল ছন্দের সৃষ্টি হইতে পারে। পর্ব ও পর্বাঙ্গের স্বাভাবিক বিভাগ বজায় রাখিতে হইবে; কোন পর্বাঙ্গের একাধিক দীর্ঘস্বব থাকিবে না, কিংবা কোনো পর্বে উপর্যুপরি দুইটিব বেশী দার্ঘস্বর থাকিবে না, পর্বাঙ্গের অন্যান্য অক্ষরগুলি লঘু হইবে।[৬]

ভাবতচন্দ্রের হাতে এই জাতীয় ছন্দ সুকর্ষিত ও পরিমার্জিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে এ ছন্দের খুব বেশী চর্চা হয় নি। ভুবনমোহন বায়চৌধুবী ও বলদেব পালিত প্রমুখ কবি সংস্কৃত ছন্দ অনুযায়ী বাংলা ছন্দে লঘু-গুরু মাত্রাভেদ প্রবর্তন করার চেষ্টা করেন। এ সম্পর্কে ভুবনমোহন 'পাণ্ডবচবিত কাব্যে'র (১৮৭৭) ভূমিকায় যা লিখেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য. "আদৌ সংস্কৃত ছন্দঃসকল সাধুভাষায় ব্যবহারের উপযোগিতা প্রদর্শন, দ্বিতীযতঃ হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ বৈযম্যে সংস্কৃতভাষার সহিত তদ্গর্ভজাতা প্রাকৃতভাষার ভেদভাব নিরাকরণে পুনর্মিলন সম্পাদন।" বলদেব পালিত সংস্কৃতছন্দে কাব্য রচনা করে সার্থকতা লাভ করতে পারেন নি—তিনি তাঁর 'কর্ণাজ্জুন' কাব্যের ভূমিকায় এ কথা স্বীকাব করেছেন।"[৭] পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'-তে এই হ্রস্ব-দীর্ঘ মাত্রায় কবিতা বচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের 'দেশ দেশ নন্দিত কার', 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী', 'জনগণ-মন-অধিনায়ক' প্রভৃতি গানে হ্রস্ব-দীর্ঘ মাত্রা প্রয়োগের সার্থক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদারও

৬। বাংলা ছন্দের মূলসূত্র : অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২১৮।

৭। "স্বরবর্ণের লঘুত্ব বা গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিবা পাঠ করিবার প্রথা না থাকাতে, ঐ সকল ছন্দ সর্বসাধারণের নিকট সমাদৃত হয় না। আমার "ভর্তৃহরি কাব্য"ই তাঁহার দৃষ্টান্তস্থল। সেই কারণবশতঃ আমি ঐ প্রকার রচনায় আর প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইলাম না।"

এই শ্রেণীর কবিতা রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলালও তাঁর কতক-গুলি গানে হ্রস্ব-দীর্ঘ মাত্রাভেদের সাহায্যে তরঙ্গের সৃষ্টি করেছেন :

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে

শ্যামবিটপীঘন তটবিপ্লাবিনি ধূসর তরঙ্গ ভঙ্গে।

দ্বিজেন্দ্রলাল এই ছন্দের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। এই ছন্দ সঙ্গীতের পক্ষেও অনুকূল—তাই রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলালের মতো গীতিকারদের পক্ষে এ ছন্দ প্রিয় হয়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক ছিল।[৮]

॥ ৩ ॥

'মন্দ্র' কাব্যে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রতিভার বিশিষ্টতার পরিচয় আছে। ছন্দ, ভাষা ও প্রকাশরীতির ক্ষেত্রেও তিনি এই কাব্যে নূতনত্ব দেখিয়েছেন। 'আষাঢ়ে' কাব্যে ও 'হাসির গানে'র কতকগুলি গানে তিনি ছন্দ সম্পর্কে বিশিষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন সত্য, কিন্তু ব্যঙ্গ-কৌতুকের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই তার পরীক্ষা হয়েছে। এই জাতীয় কবিতায় ও গানে ছন্দের বৈচিত্র্য ও শব্দ-সংস্থানের বৈচিত্র্য হাস্যরস ফুটিয়ে তোলার সহায়ক হয়। কিন্তু 'মন্দ্র' কাব্যে দ্বিজেন্দ্র-লাল সম্পূর্ণ নূতন ক্ষেত্রে তাঁর অভিনব কাব্যরীতির প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। অপেক্ষাকৃত গুরু বিষয়ের গভীরাশ্রয়ী ভাবসম্পদকেও তিনি তাঁর নূতন ছন্দবিধির সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'মন্দ্র' কাব্যের অধিকাংশ কবিতাই অক্ষরবৃত্ত ছন্দে লেখা, কিন্তু মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতাতেও তিনিও কয়েকটি অভিনব কৌশল দেখিয়েছেন।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কবিতাগুলির মধ্যে চতুর্দশ ও অষ্টাদশ মাত্রার পঙ্‌ক্তি আছে। উভয়ক্ষেত্রেই ছন্দকে প্রবহমান করার দিকে একটি ঝোঁক দেখা

৮। "সে যাই হোক লঘুগুরু ছন্দের গুরুস্বর অনেক গানের চরণেই নীড় বাঁধতে পারল আরো এই জন্য যে গুরুস্বরের দরাজ আওয়াজ গানের সুরে বড় ভালো বসে। তাই রবীন্দ্রনাথের... বহু গানের চরণে গুরুরের স্ব প্রয়োগ দেখা যায়—দ্বিজেন্দ্রলালের গানের বেলায়ও ঐ এক কথা।" ছান্দসিকী : দিলীপকুমার রায়, পৃঃ ১৮৬।

যায়। অক্ষরবৃত্ত ছন্দই বাংলার সবচেয়ে কুলীন ছন্দ—এই ছন্দের মধ্যেই সবচেয়ে বেশী ধ্রুপদী গাম্ভীর্য সঞ্চারিত করা যায়। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল এই ছন্দে লঘু-গুরু, মহৎ ও তুচ্ছ সব কিছুকেই রূপ দিয়েছেন। লঘুধর্মী সংলাপাত্মক ভঙ্গিকেও এই ছন্দে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে :

—না না এ ভাষাটা কিছু বেশী গ্রাম্য হয়ে গেল ঐ হে !
কিন্তু গ্রাম্য কথাগুলো মাঝে মাঝে ভারি লাগ্‌সৈ হে !

চরণ দুটি অষ্টাদশমাত্রিক অক্ষরবৃত্ত ছন্দের। অষ্টাদশ মাত্রার ছন্দে ভাবকে তরঙ্গিত করে তোলার একটি প্রশস্ততর অবকাশ পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল এই ছন্দে সমুদ্রের সঙ্গে নানাপ্রকার রঙ্গ-রসিকতা করেছেন। এখানে আর একটি বিষয়ও লক্ষণীয়। সচরাচর শব্দের শেষের যুগ্মধ্বনির সম্প্রসারণই ঘটে, কিন্তু এখানে 'ঐ' ও 'সৈ' সম্প্রসারিত হওয়া দূরে থাকুক, সঙ্কুচিতই হয়েছে।

'তাজমহল' কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল স্তবক রচনায় ও মিলক্রমের মধ্যে বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। দশ পঙ্‌ক্তির এক-একটি স্তবক—দুটি চতুষ্পদীর শেষে, দুই পঙ্‌ক্তির একটি শ্লোক। এই দশ পঙ্‌ক্তির স্তবকটির মিলক্রম হল : (ক-খ-ক-খ, গ-ঘ-গ-ঘ, ঙ-ঙ)। এই ছন্দের আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথম নটি চরণ চোদ্দ মাত্রার, কিন্তু সর্বশেষ চরণটি অষ্টাদশ মাত্রার। শেষ চরণটি অষ্টাদশমাত্রিক হওয়ার জন্য সমগ্র স্তবকটির ধ্বনিসম্পদ্‌ যেন সেখানে কল্লোলিত হয়ে উঠেছে। ইংরেজি Spenserian Stanza-তে আটটি Iambic Pentametre চরণের শেষে একটি Alexandrine যুক্ত হয়ে স্তবকের সমস্ত ভাব ও ধ্বনিকে কল্লোলিত করে তোলে। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার দশপদী স্তবকের অষ্টাদশমাত্রিক শেষ পঙ্‌ক্তিটি থাকার জন্য কবিতাটির মধ্যে যেমন ভাবের মুক্তি ঘটেছে, তেমনি স্তবকটির সমস্ত ধ্বনি ঐ একটি পঙ্‌ক্তিতে ছড়িয়ে পড়েছে—চতুর্দশ মাত্রার সংহতি যেন শেষ পঙ্‌ক্তিতে এসে নিজেকে খানিকটা তরল করে ঢেলে দিয়েছে :

সুন্দর অতুল হর্ম্য ! হে প্রস্তরীভূত
প্রেমাশ্রু ! হে বিয়োগের পাষাণ-প্রতিমা !
মর্মরে রচিত দীর্ঘনিঃশ্বাস !—আপ্লুত
অনন্ত আক্ষেপে, শুভ্র হে মৌন মহিমা !

—এত শুভ্র, এত সৌম্য, এত স্তব্ধ, স্থির,
এত নিষ্কলঙ্ক, এত করুণ সুন্দর,
তুমি হে কবর!—আজি তুমি সম্রাজ্ঞীর
স্মৃতি সঞ্জীবিত কর এ বিশ্ব ভিতর ;
কিন্তু যবে ধূলিলীন হইবে তুমিও,
কে রাখিবে তব স্মৃতি? হে সমাধি! চিরস্মরণীয়।

'বাইরণের উদ্দেশ্যে' কবিতাটির পঙ্ক্তিগুলি দীর্ঘতম—বাইশ মাত্রার পঙ্ক্তি। কিন্তু এই ছন্দের মধ্যে প্রবহমানতা আছে—প্রয়োজন হলে পরবর্তী পঙ্ক্তিতে তিনি ভাবকে টেনে নিয়ে গিয়েছেন, যতিকে ভাবেরই অনুগামী করেছেন :

ছিল তব নিন্দাবাদী। | কহিয়াছে তারা তুমি | নিরীশ্বর, আর
মানববিদ্বেষী গাঢ় | দুর্নীতিকলুষপ্লুত | চরিত্র তোমার।
মানি সব। কিন্তু সেই | নিন্দাবাদী, সম অব | স্থায় কয়জন
হইতে পারিত সাধু? | কয়জন পেয়েছিল | ও উন্নত মন,
ও অপরিমেয় তেজ? | কয়জন পারিত বা | অপরের তরে
স্বীয় অর্থ, অবসর, | স্বাস্থ্য, পরে নিজ প্রাণ | দিতে অকাতরে
দিয়াছিলে, কবিবর! | পতিত গ্রীসের জন্য | যেইরূপ তুমি?
—কয়জন পূজা করে | হেন গাঢ় ভক্তিভরে | নিজ জন্মভূমি?

প্রকৃতপক্ষে কবিতাটির এক-একটি পঙ্ক্তি ত্রিপদী (৮+৮+৬)। কিন্তু কবি ছন্দের মধ্যে একটি স্বচ্ছন্দ প্রবাহ রেখেছেন। 'রাধার প্রতি কৃষ্ণ' কবিতার পঙ্ক্তিগুলি সমান নয়— অসমপদের ভিতর দিয়ে কবি বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

'মন্দ্র' কাব্যের অক্ষরবৃত্ত ছন্দে লেখা কবিতাগুলির মধ্যে উদ্বোধন' কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবিতাটিকে অমিল মুক্তক ছন্দের কবিতা বলা যায়। সমপঙ্ক্তিক প্রবহমান পয়ারের চেয়ে মুক্তক ছন্দে অনেক বেশী স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্য আনা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যাকে 'ভাবের ছন্দ' বলেছেন, একে তা বলাও সম্ভব নয়। কারণ মুক্তকছন্দ আর যাই হোক গদ্য নয়, কবিতার বন্ধনকে তার স্বীকার করে চলতে হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের মুক্তকছন্দ খুব বেশী সার্থক হতে পারে নি—মাঝে মাঝে গদ্যের উপলখণ্ড ছন্দের প্রবহমানতাকে বাধা দিয়েছে। শুধু গদ্যাত্মকই নয়, পদবিন্যাসের মধ্যেও কৃত্রিমতার সুর

আছে। কবিতাটির শেষাংশে সেই ত্রুটি সবচেয়ে বেশী প্রকাশিত হয়েছে। এই সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও এই কবিতাটিতে দ্বিজেন্দ্রলাল মুক্তক ছন্দেরই একটি প্রাথমিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

'মন্দ্র' কাব্যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দেরও বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সম্ভাবনাকেও তিনি বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। 'নববধূ' কবিতায় মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে তার ধরাবাঁধা রীতি থেকে অনেকখানি মুক্ত করা হয়েছে। প্রবহমানতা যে শুধু অক্ষরবৃত্ত ছন্দেরই যে একচেটিয়া অধিকার নয়, এ কথা তিনি এই কবিতায় প্রমাণ করেছেন।

'মন্দ্র' কাব্যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ নিয়েও কবি নূতন পরীক্ষা করেছেন। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যে তিনি একটি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পৌরুষ ও বলিষ্ঠতা সঞ্চারিত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ 'হিমালয়দর্শন' কবিতাটিকে গ্রহণ করা যায়। সাধারণতঃ এ ছন্দের এক-একটি পঙ্‌ক্তি একুশ মাত্রার—(৬+৬+৬+৩) অর্থাৎ ষণ্মাত্রিক চতুষ্পর্বিক ছন্দ। যুক্তাক্ষরবাহুল্যে ও দীর্ঘচরণবিন্যাসে এই ছন্দটির একটি বৈশিষ্ট্য আছে। একুশ মাত্রার পঙ্‌ক্তি ব্যবহার করে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পরিধিকে কবি ছড়িয়ে দিয়েছেন। ছন্দের প্রকৃতি যাতে সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয়, ভাব যাতে যতির বন্ধনে বন্দিনী না হয়, এজন্য তিনি এই ছন্দকে যতদূর সম্ভব প্রবহমান করেছেন .

কে তুমি সহস্র | যোজন জুড়িয়া | ব্রহ্মদেশ হ'তে | তাতার,
অক্ষয় হিরক | মুকুটের মত | ভারতলক্ষ্মীর | মাথার,
জ্বলিছ প্রদীপ্ত, | পাইয়া ঊষার | চরণ কনক | পরশ
তুষারমণ্ডিত | চূড়ায় ? | হিমাদ্রি ? | ব্যাপি কত লক্ষ | বরষ
আছ এইরূপ | নিশ্চল, নিস্তব্ধ, | ভেদিয়া নির্মল | গগন
উত্তুঙ্গ শিখরে, | গিরিবর ? আছ, | কোন মহাধ্যানে | মগন,·

এখানে কবিতা এক দীর্ঘ প্রবহমান ধারার মতো চলেছে—যেন বেগবতী নদীর এক বেগ-প্রচণ্ড অখণ্ডধারা। যুক্তাক্ষরের ধ্বনি-গাম্ভীর্য এই প্রবাহের মধ্যে একটি সুগম্ভীর কল্লোল সৃষ্টি করেছে।

॥ ৪ ॥

বাংলা ছন্দে দ্বিজেন্দ্রলালের দান সবচেয়ে বেশী সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর শেষ দুটি কাব্যগ্রন্থে—'আলেখ্য' ও 'ত্রিবেণী'তে। 'আলেখ্য' কাব্যের ভূমিকায় ছন্দ-সচেতন কবি উদাহরণসহ তাঁর নূতন ছন্দের পরিচয় দিয়েছেন :—"এ কবিতা-গুলির ছন্দ মাত্রিক (Syllabic) ; 'অক্ষর' হিসাবে ছন্দ নয়। দাশরথি রায়ের সময় কি তাহার পূর্ব হ'তে এ ছন্দ বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। ভারতচন্দ্র ও তাঁর পরবর্তী কবিগণ প্রায়ই এ ছন্দ বর্জন করে 'অক্ষর হিসাবে' ছন্দ প্রবর্তিত করেন। আমি সেই পুরাণো মাত্রিক ছন্দেই এ কবিতাগুলি রচনা ক'রেছি। তফাৎ এই যে, আমি ছন্দকে সম্পূর্ণভাবে মাত্রার ও তালের অধীন কর্ত্তে চেষ্টা করেছি।"—তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে তিনি 'আলেখ্য' থেকেই কয়েকটি উদাহরণ তুলেছেন। এর পরে তিনি তাঁর এই নব-প্রবর্তিত ছন্দ সম্পর্কে যা বলছেন তা আরো উল্লেখযোগ্য; "এ ছন্দ যে প্রচলিত ছন্দের চেয়ে অধিক স্বাভাবিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। "কোমল তরল জল" কেহ "কো-ম-ল-ত-র-ল-জ-ল" পড়ে না, "কোমল্ তরল্ জল্" পড়ে। এ ছন্দেও শেষোক্ত রূপ উচ্চারণ (অর্থাৎ শব্দের যেরূপ উচ্চারণ কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ উচ্চারণ) কর্ত্তে হবে। অন্যরূপ উচ্চারণ কর্লে ছন্দ মাত্রিক হবে না ও যতি ভঙ্গ হবে।" দ্বিজেন্দ্রলালের এই মন্তব্য থেকেই বেশ উপলব্ধি করা যায় যে, তিনি ছন্দকে "যেরূপ উচ্চারণ কথাবার্তায ব্যবহৃত হয়" তাতে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন অর্থাৎ প্রকারান্তরে ভাষাকে কৃত্রিমতামুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

'আলেখ্য' কাব্যে তিনি ঠিক প্রচলিত স্বরবৃত্ত ছন্দ রচনা করতে চান নি। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, তিনি অক্ষরবৃত্ত ছন্দকেই syllabic রূপে পরিণত করে স্বরবৃত্তসুলভ ঝোঁক আনতে চেয়েছিলেন। তাই প্রচলিত স্বরবৃত্ত ছন্দের আদর্শ রক্ষিত হয় নি, কারণ 'স্বরবৃত্ত ছন্দের যতিস্থাপন ও পর্ব সমাবেশ-বিধি রক্ষিত হয় নি।' এই জাতীয় ছন্দের মধ্যে স্বরবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের একটি বিচিত্র সমন্বয় ঘটেছে। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের দীর্ঘবিন্যস্ত শৈথিল্যও যেমন এখানে নেই, তেমনি নেই স্বরবৃত্ত ছন্দের নৃত্য-চটুল পদক্ষেপ। ছন্দের সর্বত্র একটি ঘন-সংহত পৌরুষ-দীপ্তি ফুটে উঠেছে। যতদূর সম্ভব কবি এই ছন্দকে তথাকথিত কাব্যসংস্কার বর্জন করে সহজ করার চেষ্টা করেছেন :

সে যদি তোর | থাক্‌ত, খানিক | আবদার কর্‌তিস | শোবার আগে |
দাবি কর্‌তিস | চুমা ;
টেনে নিত | বুকের মাঝে | গাইত সে সু- | মৃদুস্বরে
"ঘুমা যাদু | ঘুমা।"

তথাকথিত স্বরবৃত্ত ছন্দের আদর্শ এখানে রক্ষিত হয় নি—ছন্দের মধ্যে একটি পুরুষ-কঠিন ভাব আছে। 'হতভাগ্য' কবিতার প্রথমেই আছে :

একখানি তার তরী ছিল বিজন শূন্য ঘাটে বাঁধা ;—
একদিন হঠাৎ ডুবে গেল ঝড়ে

* * * *

বহে শীতের প্রখর বাতাস উড়িয়ে তাদের ছেঁড়া কাপড় ,—
তারি মাঝে পথের ধারে খাড়া !

এই ছন্দের বহিরঙ্গিক রূপ ও ছন্দস্পন্দ অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মতোই, কিন্তু কবি অবলীলাক্রমে ক্রিয়াপদগুলিতে চলতি ভাষা ব্যবহার করেছেন। এইজন্যই এই ছন্দের ধ্বনি-গাম্ভীর্যের সঙ্গে চলতি ভাষার বিচিত্র সংমিশ্রণ ঘটেছে। যুগ্মধ্বনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মতো একমাত্রার হলেও, প্রয়োজন হলে দুমাত্রারও হতে পারে। তৎসম শব্দের গুরুগম্ভীর ধ্বনির সঙ্গে চলিত ক্রিয়াপদ মিশিয়ে কবি এক অভিনব কাব্যরীতির সৃষ্টি করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এই ছন্দকে যতদূর সম্ভব প্রবহমান করেছেন—ভাবের স্বচ্ছন্দ প্রবাহের জন্য তাঁর এই ছন্দটি আরো বেশী সার্থক হয়েছে। অক্ষরবৃত্ত ছন্দ বাংলার সবচেয়ে অভিজাত ছন্দ—এই ছন্দের মধ্যে 'দেখ্‌ছি', 'উঠ্‌ছি', 'কর্‌লাম', প্রভৃতি মৌখিক ভাষার ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে কবি সাহসিকতা ও মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছেন। চলতি ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হলেও এ ভাষাকে তরল ও চটুল বলা সম্ভব হবে না। চলতি ক্রিয়াপদগুলিকে যেন অক্ষরবৃত্ত ছন্দের শব্দগাঢ়তা ও ধ্বনিগাম্ভীর্যের দ্বারা কল্লোলিত করে তুলেছেন। উদাহরণস্বরূপ 'আলেখ্য' কাব্যের 'সত্যযুগ' কবিতাটির কথা উল্লেখ করা যায় :

নানা আছে ইহার অর্থ, আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি তার কাছে কাছে,
বুঝতে পার্‌ছি নাক, কিন্তু এটা বুঝতে পার্‌ছি যে তার অর্থ কিছু আছে।
সঙ্কীর্ণ মনুষ্যবুদ্ধি ; অসীম এ ব্রহ্মাণ্ড ; আমরা বুঝ্‌ব তা কি ঠিক ?
আমরা দেখতে পাচ্ছি হেথায় সে মহাস্ফটিকের মাত্র একটি ক্ষুদ্র দিক

দ্বিজেন্দ্রলালের এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে হলে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের অনুরূপ একটি কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার প্রয়োজন। 'আলেখ্য' কাব্যের অন্তর্গত 'বিপত্নীক' (২) কবিতাটির কোনো কোনো অংশকে বাইরে থেকে দেখতে গেলে রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ' কবিতার কথা মনে হবে, কিন্তু ছন্দ বিচারের দিক থেকে পার্থক্য অনেকখানি। 'বর্ষশেষ' কবিতায় আছে :

এবার আসনি তুমি বসন্তের আবেশহিল্লোলে
পুষ্পদল চুমি ;
এবার আসনি তুমি মর্মরিত কূজনে গুঞ্জনে
ধন্য ধন্য তুমি।

'বিপত্নীক (২)' কবিতার একটি অংশ উদ্ধার করা যাক :

এসেছিলে সেদিন তুমি, যেমন ক্লান্ত নিদ্রাবেশে
সুখ-স্বপ্ন আসে ;
এসেছিলে, আসে যেমন কান্তারে চামেলি গন্ধ,
বসন্ত বাতাসে ;

প্রথমটি প্রচলিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দ—প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ অষ্টাদশ মাত্রার, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ ষণ্মাত্রিক। দ্বিতীয় কবিতাটিরও কাঠামো অনুরূপ, কিন্তু এখানে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মধ্যে স্বরবৃত্তসুলভ ঝোঁক সঞ্চারিত হয়েছে—তার ফলে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মতো একটানা সুর নেই।

এই জাতীয় ছন্দ বাংলা ছন্দের একটি বিশেষ সমস্যার উপরে আলোকপাত করেছে। মোহিতলাল বলেছেন : "বাংলা বাক্যচ্ছন্দের প্রকৃতি মূলে যাহাই থাক, দুই ভাষার দুই ভঙ্গিকে একই নিয়মের অধীন করিয়া ছন্দ রচনা করিলে যাহা হয়, দ্বিজেন্দ্রলাল তাহা দেখাইয়া দিয়া, এ বিষয়ে ছন্দরসিকের সব সংশয় দূর করিয়াছেন। এই ছন্দের পয়ারের যতি ও অক্ষরবৃত্তের (Syllabic) ঝোঁক এই দুইয়ের সমন্বয়ের চেষ্টা আছে—বাংলা ভাষার কথ্যরূপটিকে কথ্যভাষার উচ্চারণভঙ্গিতেই ছন্দে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এ ছন্দে কোন প্রকার সুরের অবকাশ মাত্র নাই—খাঁটি সাদা জল, একটু রঙ বা গন্ধ নাই। ইহাতে ছড়ার ছন্দের একঘেয়ে চার-মাত্রার চাল নাই, কাজেই স্বরের নৃত্যভঙ্গিও নাই ; আবার, পয়ারের বা পদভূমক ছন্দের ৮ বা ১০ মাত্রার চাল বজায় থাকিলেও, অর্থাৎ, ইহার যতি পয়ারের মত

হইলেও, ইহাতে হসন্ত ও স্বরান্ত বর্ণের সেই প্রতিযোগিতা নাই (কারণ, হসন্ত বর্ণগুলি উহ্য হইয়া আছে)—যাহার ফলে বাংলা পয়ার ছন্দ সাধারণ ধ্বনিবিজ্ঞানকে উপহাস করিয়া এক অপূর্ব স্বর-বৈচিত্র্যের অধিকারী হইয়াছে।"[১]

'আলেখ্য' কাব্যগ্রন্থের 'নর্তকী', 'রাজা', 'কবি' ও 'ভক্ত'—এই চারটি কবিতাই ষণ্মাত্রিক। কিন্তু ষণ্মাত্রিক হলেও ঐ ছন্দ ঠিক মাত্রাবৃত্ত নয়, স্বরাক্ষরবৃত্তের ষণ্মাত্রিক ছন্দ :

কিন্তু সবই মিথ্যা—মিথ্যা ও চাতুরী
নহে তাহাও কিছু সবিনয় ;
বিনয় ? আমি কহি উদ্ধত আস্পর্দ্ধা
প্রেমের এ নির্লজ্জ অভিনয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের শেষ কাব্যগ্রন্থ 'ত্রিবেণী'-তেও সিলেবিক ছন্দের কিছু কবিতা আছে। কবি সেগুলির নাম দিয়েছেন 'মাত্রিক'। 'ত্রিবেণী'র দশপদী কবিতাগুলিও মাত্রিক। দ্বিজেন্দ্রলাল সনেট না লিখে দশ পঙ্‌ক্তির সিলেবিক ছন্দের কবিতা লিখেছেন। সম্ভবত সনেটের বিধিবদ্ধ গাঢ়বদ্ধ আঙ্গিক-সৌকুমার্য তাঁর প্রতিভার অনুকূল ছিল না। অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত কলেবরের মধ্যে তিনি তাঁর এই অভিনব ছন্দটি পরীক্ষা করেছেন। মাত্র দশটি চরণের মধ্যে যেমন অক্ষরবৃত্তসুলভ মৃদঙ্গধ্বনির সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি পৌরুষের দীপ্তি ফুটে উঠেছে। কোনো কোনো সময় প্রায় একটি বাক্যের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে একটি দশপদীর সৃষ্টি হয়েছে—শব্দ-গ্রন্থনের মধ্যে যেন মিহি ও মোটা সুতো একত্রে মিশে গিয়েছে। এই ধরনের ছন্দের ফ্রেম ও কাঠামো একাধিক যুক্তাক্ষরের ভারেও ভেঙে পড়ে না। যেমন—

জগতে যা যত ভীষণ তত ক্ষণস্থায়ী।—জলোচ্ছ্বাস
ক্ষুধার্তরাক্ষসসৈন্য-সম ঊর্দ্ধে উঠি অকস্মাৎ
পুরপল্লী প্রকাণ্ড ব্যাদানে তাহার করে এসে গ্রাস ;
ভূমিকম্প—রম্য উচ্চ হর্ম্যরাজি করে ধূলিসাৎ ;...... —দুঃখ

দ্বিজেন্দ্রলালের এই অভিনব ছন্দ সম্পর্কে বিখ্যাত ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : "দ্বিজেন্দ্রলালের 'আলেখ্য', এবং অন্যান্য

১। বাংলা কবিতার ছন্দ, পৃঃ ৫৩-৫৪।

কাব্যেরও ছন্দ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তিনি অনেক স্থলেই আমরা যাকে স্বরবৃত্ত বলি ঠিক সেই ছন্দই রচনা করতে চান নি। তিনি চেয়েছিলেন প্রচলিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দকেই একটি Syllabic রূপ দিতে।.....যা হোক, এই জন্যেই দেখতে পাই তাঁর এই Syllabic ছন্দে আমাদের পরিচিত স্বরবৃত্ত ছন্দের যতিস্থাপন ও পর্বসমাবেশ রক্ষিত হয় নি। এমন কি, তাঁর এই Syllabic ছন্দে স্বরবৃত্ত ছন্দের সুপরিচিত তাল এবং সুরটিও ধরা পড়ে না। তার হেতু এই যে, তিনি লোকসাহিত্যের অর্থাৎ গ্রাম্য ছড়া প্রভৃতির স্বরবৃত্ত তালটিকেই অভিজাত-সাহিত্যে স্থান দিতে চান নি। তিনি কাব্যসাহিত্যে প্রচলিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দেরই Syllabic রূপ দিতে চেয়েছিলেন।.... তাঁর এই অভিনব ছন্দে স্বরবৃত্ত ও অক্ষববৃত্ত ছন্দের ধ্বনি-বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছে। তাই তাতে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের শ্লথ-বিন্যস্ত অলস শৈথিল্য নেই.. অথচ তাতে স্বরবৃত্ত ছন্দের নৃত্যপরায়ণতাও নেই, ...এভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের এই অভিনব Syllabic ছন্দে স্বরবৃত্তের চটুলতা ও অক্ষববৃত্তের অলস একটানা সুর বর্জিত হয়ে এক অভিনব পৌরুষ-শক্তি জেগে উঠেছে, যার সন্ধান আমরা পাই ইংরেজি Iambic ছন্দের কবিতায়। আর দ্বিজেন্দ্রলালের এই Syllabic ছন্দেই প্রবহমানতা অর্থাৎ enjambement আনা সম্ভবপর ইংরেজির মতো। আমাদেব পরিচিত স্বরবৃত্তে enjambement আনা সম্ভবপর বলে মনে হয না।”[১০]

বাংলা ছন্দে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান নির্ণয় করতে হলে এর ঐতিহাসিক পটভূমিকার একটু ইঙ্গিত কবা উচিত। তাঁর ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যায যে লৌকিক রীতির ছন্দকে তিনি পূর্ণতর মহিমা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য এরও অনেক আগে রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দকে 'বাংলার স্বাভাবিক ছন্দ বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।' একুশ-বাইশ বছর বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দের সঙ্গে বাংলা ছন্দের একটি স্বাভাবিক যোগের কথা অনুভব করেছিলেন: "যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাংলা ছন্দের গতি হয় তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী

১০। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বরবৃত্ত ছন্দ উদয়ন, ১৩৪০ আশ্বিন।

দ্বিজেন্দ্রলালের এই বিশেষ ধরনের কাব্যরীতি সম্পর্কে ১৩৪০-এর আশ্বিন সংখ্যায় 'ভৈরব' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীসজনীকান্ত দাসের "কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়" প্রবন্ধটিও উল্লেখযোগ্য।

হইবে।"[১১] এই ছন্দোরীতি বাংলা ছন্দের একটি পুরাতন রীতি। তবে রবীন্দ্রকাব্যে এই ছন্দের কৌলীন্য ও বৈচিত্র্য বেড়েছে। রবীন্দ্রনাথের পরেই যাঁরা এই ছন্দকে শক্তিশালী করে তুলেছেন তাঁদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিজেন্দ্রলাল দেখিয়েছেন যে এ ছন্দের মধ্যেও গাম্ভীর্য ও ওজোগুণ সঞ্চারিত করা সম্ভব। এই দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আলেখ্য' কাব্যের একটি বিশেষ মূল্য আছে। 'আলেখ্য' কাব্যের 'সত্যযুগ' কবিতায় কবি বলেছেন :

কি আশ্চর্য! কি সম্পূর্ণ! কি সুন্দর এ বিশ্ব-বিকাশ হচ্ছে অহরহ!
ব্যাপ্তি হতে নীহারিকা, নীহারিকা হতে সূর্য, সূর্য হতে গ্রহ ;
ক্রমে ক্রমে বিকাশ হতে আসে একটা মহাবিনাশ ; সৃষ্টি হতে লয় ;
কি তালে কি মহাছন্দে চলছে এ মহানিয়ম, এ ব্রহ্মাণ্ডময়।

প্রথম প্রথম অনভ্যাসের জন্য এই জাতীয় কবিতা পড়তে অসুবিধা হতে পারে, কিন্তু ৮+৮+৬ মাত্রার ত্রিপদীর মতো যদি পড়া যায়, তা হলে কোনো অসুবিধা বোধ হবে না। বাংলাভাষার অন্তরঙ্গ রূপ দ্বিজেন্দ্রলালের কবিদৃষ্টিতে সহজেই ধরা পড়েছিল। এই ছন্দ যে 'বাংলা ভাষার স্বভাব থেকে উদ্ভূত এবং প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ' এ সত্যও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। এই কবিতার ছন্দটি সম্পর্কে ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন যে মন্তব্য করেছেন, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

"পড়বার ভঙ্গি একবার আয়ত্ত হয়ে গেলে পাঠক সহজেই অনুভব করবেন, কি স্বাভাবিক এই ছন্দ এবং এর শক্তি ও গাম্ভীর্য কত! বোধ করি লৌকিক ছন্দের চরম শক্তি ও গাম্ভীর্য প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতাটিতে ; আর কারও রচনায় লৌকিক ছন্দের শক্তি এর চেয়ে বেশি প্রকাশ পেয়েছে বলে জানি না।"[১২]

১১। ১৯২০ সালের 'ভারতী' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় 'সিন্ধুদূত' নামক কাব্য-সমালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য। প্রবন্ধটিতে লেখকের নাম নেই। কিন্তু প্রবন্ধটি যে রবীন্দ্রনাথের রচনা এ বিষয়ে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন আলোকপাত করেছেন (রবীন্দ্রনাথের লৌকিক ছন্দ ; বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩৫১)

১২। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-শিল্প : প্রবোধচন্দ্র সেন, গল্প-ভারতী, বৈশাখ, ১৩৬৪।

॥ ৫ ॥

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যরীতি সম্পর্কে ছন্দের পরেই উল্লেখযোগ্য হল ভাষা। আসলে তাঁর ছন্দ ও ভাষা পরস্পরের পরিপূরক—ছন্দের অভিনবত্বের একটি প্রধান উপাদানই হল তাঁর ভাষার অভিনবত্ব। 'মন্দ্র' কাব্যের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের 'প্রবল আত্মবিশ্বাস' ও 'অবাধ সাহস' সম্পর্কে সপ্রশংস মন্তব্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটির মূলে ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যকলার স্বকীয়তা সম্পর্কে একটি বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব। দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা ভাষার একটি নূতন সম্ভাবনা দেখেছিলেন। প্রচলিত কাব্যরীতি ও ভাষা-প্রয়োগের বিধিবদ্ধ পথ ছাড়াও যে বাংলা ভাষার মধ্যে নূতন শক্তি আছে তা তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি এড়ায় নি। রবীন্দ্রনাথের সম্রাজ্ঞী-ভাষার ছত্র-ছায়াতলে থেকেও তিনি তাঁর স্বকীয়তা হারান নি। রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাষা পরিমার্জিত ও সুকর্ষিত। সূক্ষ্মতায়, সংবেদনশীলতায় ও ব্যঞ্জনায় রবীন্দ্রনাথের ভাষার শিল্পসৌকর্য অনন্যসাধারণ। গীতিধর্মিতা ও আকাশ-বিস্তারী কল্পনা-প্রসারতা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বাণীরূপ পেয়েছে। 'বলাকা'র একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

তাই যা দেখিছ তারে ঘিরিছে নিবিড়,
যাহা দেখিছ না তাহাদের ভিড়।

দেখার অতীতলোকে না দেখার রহস্যলীলা তাঁর কবিভাষায় রূপায়িত হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় এই ব্যঞ্জনাশক্তি নেই, রবীন্দ্রনাথের ভাষার মতো ভাষার অতিরিক্ত সেখানে কিছু নেই। বক্তব্যকেই তিনি স্পষ্ট করে বলার চেষ্টা করেছেন—বলিষ্ঠতা, ঋজুতা ও স্পষ্টতা তাঁর ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য। দ্বিজেন্দ্রলাল কাব্যের ক্ষেত্রে সঙ্কেত-ব্যঞ্জনার আলো-ছায়ার চেয়ে পৌরুষ-প্রখর বলিষ্ঠতা ও স্পষ্টতার পক্ষপাতী ছিলেন—তাঁর কাব্যের ভাষাও তদনুযায়ী গড়ে উঠেছে। 'আলেখ্য' কাব্যের ভূমিকায় কবি নিজেই স্বীকার করেছেন : "এ গ্রন্থের কোন কবিতা পড়ে, তার মানে দশজনে দশরকম বের করে তাঁদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ করার প্রয়োজন হবে না।" ভাব ও ভাষার সরলতা ও স্পষ্টতার দিকে লক্ষ্য করেই দ্বিজেন্দ্রলাল এই মন্তব্য করেছিলেন। তবে বিষয়ানুযায়ী ভাষাপ্রয়োগের কথাও তিনি স্বীকার করেছেন। 'আষাঢ়ে' কাব্যের ভূমিকায় তিনি এই প্রসঙ্গে যা মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখ্যযোগ্য :

"এ কবিতাগুলির ভাষা অতীব অসংযত ও ছন্দোবন্ধ অতীব শিথিল।...... কিন্তু যেরূপ বিষয়, সেইরূপ ভাষা হওয়া বিধেয় মনে করি। হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করিতে মেঘনাদবধের দুন্দুভি-নিনাদের ভাষা ব্যবহার করিলে চলিবে কেন?" 'আষাঢ়ে' ও 'হাসির গান'-এ কবি এক ভাষার শ্রীক্ষেত্র রচনা করেছেন। শাব্দিক ও ভাষাগত অসঙ্গতি থেকেও হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। তৎসম শব্দের সঙ্গে চলতি শব্দ, এমন কি নানা প্রকার বিদেশী শব্দের অবাধ মিশ্রণ করে দ্বিজেন্দ্রলাল এক নূতন ধরনের ভাষার ও বাক্‌রীতির সৃষ্টি করেছেন। ভাষা-সম্পর্কে তিনি ছিলেন নিরঙ্কুশ। সাধুভাষা ও তথাকথিত অভিজাত শব্দই যে কবিতার ভাষা হবে এ কথা তিনি কোনোদিনই স্বীকার করেন নি। শব্দের শ্রেণীবৈচিত্র্য ও লঘু-গুরু শব্দের পাশাপাশি প্রয়োগ তাঁর ভাষার শক্তিকেই বাড়িয়ে তুলেছে :

আপিসে যাই উর্দ্ধশ্বাসে একটু না থেমে,
ওছট্ এবং ধুলো খেয়ে, দুপুর রোদে, ঘেমে ;
হুঁকো টেনে কোসে,
ভাঙ্গা চ্যারে বোসে,
দিস্তেখানিক কাগজেতে কলম ঘোষে ঘোষে,
মাথায় বেরোল ঘাম ;—এবং ঠোঁটে লাগলো কালি,
গোঁফও গেল ঝুলে, খেয়ে মুনিবদত্ত গালি। —কেরাণী : আষাঢ়ে

এখানে "উর্দ্ধশ্বাস" ও 'ওঁছট্' একই সঙ্গে ব্যবহৃত হযেছে। 'চ্যার' (চেয়ারের অপভ্রংশ) শব্দটিও ইংরেজি শব্দের চলতি সংক্ষিপ্ত রূপ। এখানে 'ঝুলে' শব্দটির প্রয়োগ লক্ষণীয়—তার সঙ্গে কবি 'মুনিবদত্ত' শব্দটির প্রয়োগ করে, চরণটিকে শ্লেষ-গাঢ় করে তুলেছেন। অতি সাধারণ ধ্বন্যাত্মক শব্দের চলতি বুলির সঙ্গে নানাশ্রেণীর ভাষা মিশিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর ছন্দের কাঠামো তৈরী করেছেন। যথা :

এঞ্জিন কল্ল শোঁ, পরে কল্ল পোঁ,
ভক্ ভক্ ভক্, ঘটক ঘটক,
নড়ল সেই গাড়ী, পরে ঘট্ ঘট্ ঘট্,
চল্ল, ষ্টেশন প্লাটফর্ম ক্রমে ছাড়িয়ে গেল চট্।

—হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা : আষাঢ়ে

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যরীতির মধ্যে এমন একটি শোষণশক্তি আছে, যা অনায়াসে বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দকে একই সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে। লঘু-গুরু-বিদেশী-তৎসম-চলতি নানাশ্রেণীর শব্দকে কাব্যরীতির এক কঠিন বন্ধনে তিনি অনায়াসে কংক্রীট করে তুলতে পারেন। শব্দগুলির জাতিগত ও ধ্বনিগত পার্থক্য সত্ত্বেও সবগুলি মিলে বিশেষ ধরনের কাব্যরীতির সৃষ্টি করেছে, যদিও এর ফলে ভাষা ও ছন্দের মসৃণত্ব তিরোহিত হয়েছে। বাংলা কাব্যের আট-পৌরে শব্দ-প্রয়োগ সম্পর্কে পরবর্তীকালে যে বিস্তৃত প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল, তারও অনেক আগে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর 'আষাঢে' ও 'হাসির গান'-এ দৈনন্দিন জীবনের আটপৌরে ভাষাকে এমন কি মৌখিক বুলিকে পর্যন্ত কবিতার ক্ষেত্রে প্রযোগ করেছিলেন। 'কলিযজ্ঞ' কবিতায় তিনি শুধু অভিনব ছন্দকৌশলই দেখান নি, বিচিত্রধর্মী শব্দের প্রযোগও কবিতাটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃতছন্দে বাংলা কৌতুক-কবিতা রচনা ও তার মধ্যে নানাশ্রেণীর লঘু-গুরু শব্দ-প্রযোগ করা—বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এক বিশেষ ধরনের কাব্যরীতি। দ্বিজেন্দ্রলালই যে এই রীতির সর্বপ্রথম লেখক, এ কথা সত্য নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের আগেও কেউ কেউ এই শ্রেণীর অভিনব ভাষা ও ছন্দে কবিতা রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি এই শ্রেণীর কবিতা রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথমবার বিলাত যাত্রা করেন তখন বাঙালী তরুণের বিলাত-যাত্রার প্রযাসকে নিয়ে কৌতুক করে এক কবিতা লিখে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তিনি পাঠিয়েছিলেন। কবিতাটি সংস্কৃত শিখরিণী ছন্দে লেখা

> বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্য-গৌড়ে,
> অরণ্যে যে জন্যে গৃহগ-বিহগ-প্রাণ দৌড়ে।
> স্বদেশে কাঁদে সে, গুরুজন-বশে কিছু হয না,
> বিনা হ্যাট্‌টা কোট্‌টা ধুতি-পিরহনে মান রয় না।[১৩]

দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরী একটি কৌতুককর কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। একবার দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর শ্বশুরভবনে তাঁর বন্ধুবান্ধবদের

১৩। 'ভারতী'তে (আশ্বিন, ১২৮৬) প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে' এই কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

এক 'বিরাট ভোজে নিমন্ত্রণ' করেছিলেন। নিমন্ত্রণপত্রটি ছিল বিচিত্র ধরনের। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার উত্তরে লিখেছিলেন :

ন চ সম্পত্তি ন বুদ্ধিবৃহস্পতি, যমঃ প্রতাপ চ নাহিক মে।
ন চ নন্দন-কানন, স্বর্ণ-স্ববাহন, পদ্ম-বিনিন্দিত পদ-যুগ মে॥
আছে সত্যি পদ-রজ রত্তি,—তা-ও পবিত্র কি, জানিত নে।
চৌদ্দ পুরুষ তব ত্রাণ পায় যদি, অবশ্য ঝাড়িব তব ভবনে॥

কিন্তু,—

মেঘাচ্ছন্ন শনি-অপরাহ্ণে যদি গুরু বাধা না ঘটে মে।
কিম্বা যদ্যপি সহসা চুপি চুপি প্রেরিত না হই পরধামে॥[১৪]

'কলিযজ্ঞ' কবিতায় কবি বাংলা কবিতার মাঝে মাঝে সংস্কৃত বাক্যাংশ সংযুক্ত করেছেন—ইংরেজি ও চলতি শব্দও কম নেই—'হি', 'চ', 'তু' প্রভৃতি ব্যবহার করে কবি এক উদ্ভট কাব্যরীতির সৃষ্টি করেছেন। গুরু-চণ্ডাল দোষ ভাষার এক প্রধান ত্রুটি—কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল এই ত্রুটিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছেন এবং এই দোষকেই এক বিশেষ ধরনের কাব্যরীতিতে পরিণত করেছেন। 'হাসির গান'-এর অনেকগুলি কবিতায় প্রচুর পরিমাণে ইংরেজি শব্দ চালিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে বাংলা শব্দের চেয়ে ইংরেজি শব্দের পরিমাণ অনেক বেশী। কবি অবলীলাক্রমে তাদের ছন্দের ফ্রেমে বেঁধে ফেলেছেন। যেমন :

আমাদের ভাষা একটু quaint as you see
এ নয় English কি Bengali,
করি English ও Bengali-র খিচুড়ি বানিয়ে
Conversation-এ use ;
—কিন্তু একটিও ঠিক কইতে পারি if you think,
তা'লে you are an awful goose.

—Reformed Hindus : হাসির গান

ইংরেজি-বাংলার খিচুড়ি ভাষা সৃষ্টি করে বাংলা কবিতা দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম রচনা করেন নি। উনিশ শতকের বিদ্রূপাত্মক কাব্যে এই ধরনের মিশ্রভাষা প্রয়োগ একটি বিশেষ ধরনের কাব্যরীতিতে পরিণত হয়েছিল। ইন্দ্রনাথ

১৪। দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ২৭০

বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, দেবেন্দ্রনাথ সেন, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকেই বিদ্রূপাত্মক কাব্যে এই মিশ্রভাষা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর পূর্বসূরীদের চেয়ে অনেক বেশী ইংরেজি শব্দ প্রয়োগ করেছেন। পরবর্তীকালে রজনীকান্ত সেন দ্বিজেন্দ্রলালের এই ইংরেজি-বাংলা-মিশ্রিত কাব্যরীতিকে সবচেয়ে সার্থকভাবে অনুসরণ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের এই খিচুড়ি ভাষার একটি বলিষ্ঠ-সরল স্বরূপ আছে। অতিরিক্ত অলঙ্কার ও কারুকার্য এখানে অনুপস্থিত, কিন্তু এর 'স্বাদ ও গন্ধ সাহিত্যের ভোজে অতুলনীয়।'[১৫]

শুধু বিদ্রূপাত্মক কাব্যেই নয়, অপেক্ষাকৃত গভীর-রসাত্মক কাব্যেও দ্বিজেন্দ্রলালের কথ্যভাষার প্রতি পক্ষপাত লক্ষ্য করা যায়। চলতি ক্রিয়াপদ ও সংলাপাত্মক কাব্যরীতি ব্যবহার করে তিনি কবিতায় একটি তীব্র গতিবেগের সৃষ্টি করেছেন। ভাষা ও শব্দ-প্রয়োগ সম্পর্কে তিনি 'আলেখ্য' কাব্যের ভূমিকায় লিখেছেন: "যতদূর স্বাভাবিক ও প্রচলিত ভাষা ব্যবহার কর্তে পারি (সুশ্রাব্যতা, মর্যাদা ও সদর্থ বজায় রেখে) চেষ্টা করেছি। ক্রিয়াপদের সর্বত্রই প্রচলিত আকার ব্যবহার করেছি—যেমন যাচ্ছি, কর্ছিলাম ইত্যাদি। অন্যপদ নির্বাচনে আমার লক্ষ্য প্রধানতঃ প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করা। তবে অপ্রচলিত শব্দ একেবারে বর্জন করি নি। নানা খনি হতে রত্ন আহরণ করায় ভাষার ক্ষতি নাই, বরং তাতে সমূহ লাভ। তবে আমার ধারণা এই যে, যেখানে বাংলা শব্দ বা বচন আসল বাঙ্গলা ভাবটি বেশী জোরে প্রকাশ করে, অথবা যেখানে বাঙ্গালা শব্দটি বা বচনটি বেশ নিজের জোরে দাড়াতে পারে, সেখানে সেই বাঙ্গালা শব্দ ও বচনই ব্যবহার করা কর্তব্য।"

১৫। "গুরুচণ্ডালত্ব পরিহারের সমস্ত নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া সাধুশব্দের সহিত গ্রাম্য শব্দ, সুপ্রচলিতের সহিত অপ্রচলিত, সহজের সহিত উৎকট, বাংলার সহিত ইংরেজি মিশাইয়া তিনি অপূর্ব এক ভুনি-খিচুড়ি সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাদের স্বাদ ও গন্ধ সাহিত্যের ভোজে অতুলনীয়। 'হাসির গান'-এর রচনারীতিতে মাধুর্য, প্রসাদ, লালিত্য, সারল্য প্রভৃতি চিরাচরিত কোন গুণ নাই। কিন্তু নির্গুণ মহাদেবের মত নিজের বিভূতিতে ইহা সব গুণের উপর উঠিয়াছে।"—দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান: অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্ল পাল সম্পাদিত 'সমালোচনা সাহিত্য'।

॥ ৬ ॥

ভারতচন্দ্র বলেছিলেন 'যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস লয়ে।' অষ্টাদশ শতাব্দীর 'কৃষ্ণনাগরিক' ভারতচন্দ্রের মতো, তাঁর দেড়শ বছর পরের 'কৃষ্ণনাগরিক' দ্বিজেন্দ্রলালও অনেকটা এই মতের সমর্থক ছিলেন। তাই রস-সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি ভাষা সম্পর্কে ছিলেন নিরঙ্কুশ। যে কোনোরকম ভাষাকেই তিনি তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন, তা নিয়ে তিনি খুব বিব্রতও বোধ করেন নি। কারণ রং ফলানো বা ভাষাকে পালিশ করে মসৃণ-সুকুমার করে তোলার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল না। তাঁর ভাষার মধ্যে কোনো সঙ্কেত-ব্যঞ্জনা ছিল না, ভাষার ভিতর দিয়ে কোনো রহস্যময় ভাষাতীতকে ফুটিয়ে তোলেন নি। ভঙ্গি বর্জন করে, স্বপ্নাবেশ বর্জন করে তিনি গদ্যাত্মক সরল ঋজু কাব্যভঙ্গি প্রবর্তন করেছিলেন। চলতি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে ও সংলাপাত্মক কাব্যরীতি প্রয়োগ করে তিনি কবিতার ভাষাকে নাটকীয় সংলাপরীতির কাছাকাছি নিয়ে এসেছিলেন। এই ধরনের কাব্যরীতির মধ্যে বিশিষ্টতা আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু রসসৃষ্টিতে অনেক সময় বাধা দিয়েছে। লিরিক কবিতার ভাবের অখণ্ডতা এই জাতীয় কাব্যরীতির দ্বারা পদে পদে ব্যাহত হয়েছে। কবিতার মধ্যে যে এক-একটি অখণ্ড ভাবরূপ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল, উজ্জ্বল-কঠিন ভাষার তীক্ষ্ণধার ছুরিকায ও সংলাপাত্মক ভঙ্গির তীব্র আঘাতে তা বিদীর্ণ হয়েছে। 'মন্দ্র' থেকে আরম্ভ করে শেষদিকের কাব্যে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যরীতির এই বৈশিষ্ট্যগুলি আরো বেশী পরিস্ফুট হয়েছে। তাঁর সংলাপাত্মক কাব্যরীতি অনেক সময় তাঁরই নাটকীয় গদ্যসংলাপগুলির কথা মনে করিয়ে দেয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের এই কাব্যরীতির কি কোনো পূর্বসূরী ছিল না? এইজাতীয় প্রশ্ন মনে হওয়া খুব অস্বাভাবিক নয়। রবীন্দ্র-বরণ ও রবীন্দ্র-বিরোধের এই প্রাথমিক পর্বে দ্বিজেন্দ্রলালের একটি মূল্যবান্ ভূমিকা ছিল। তাঁর কাব্যকে নিঃসন্দেহে 'বিশিষ্ট' প্রতিভার দান বলা যায়। সমসাময়িক কোনো কবির সঙ্গেই তাঁর এই বিশিষ্ট কাব্যরীতির ঐক্য নেই। কিন্তু তা হলে কি দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যরীতি একটি 'বৃন্তহীন পুষ্প'? ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যে তাঁর সমানধর্মী কেউ না থাকলেও, এই যুগের

গদ্য-রচয়িতাদের মধ্যে অনেকেই এই রীতির অনুশীলন করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে হৃদয়বৃত্তির চর্চার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানানুশীলনের বিচিত্র উদ্যম সাংস্কৃতিক জীবনে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাঙালীর আবেগপ্রবণ রসসাধনা ও বুদ্ধিদীপ্ত নৈয়ায়িক মনীষা—দুই-ই এক সঙ্গে বিকাশ লাভ করেছিল। তাই এই যুগের বাংলা সাহিত্যে হৃদয়াবেগপূর্ণ কল্পসাধনার সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চাও পাশাপাশি চলেছিল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জাগরণের ভিতর দিয়ে জীবনের নূতন নূতন কক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হল। এই বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তা-কর্ষিত মননের প্রতিফলনে বাংলা গদ্যসাহিত্যও সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। ভূদেব, অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর প্রভৃতি গদ্য-লেখকদের হাতে বাংলা সাহিত্যের বুদ্ধিবৃত্ত ধারাটি পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। বুদ্ধি, বিচার ও বিশ্লেষণ এই যুগের গদ্যরীতিকে একটি বিশিষ্টতা দিয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের সমৃদ্ধি ও পরিণতি পর্বের কাব্যরীতির উপর বিচার-বিতর্কমূলক গদ্যরীতির একটি গভীর প্রভাব আছে। সাহিত্যে হৃদয়চর্চা ও বুদ্ধিচচার সবচেয়ে সার্থক মিলন ঘটেছিল বঙ্কিম-প্রতিভায়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের ছিল অসাধারণ শ্রদ্ধা।

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যরীতির সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী বাংলা গদ্যরীতির একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে। তিনি প্রবন্ধের গদ্যরীতিকে কাব্যের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। মগ্নচারিতা, আবিষ্টতা, বর্ণবিচিত্র কল্পনার পথে তাঁর কাব্যস্রোত প্রবাহিত হয় নি। কিন্তু তার জন্য আবেগের তীব্রতা কমে নি—বিচারবুদ্ধি ও যুক্তির উপলবন্ধুর পথে সূর্যালোকিত দিবালোকে তাঁর কাব্য বলিষ্ঠ পদবিক্ষেপে অগ্রসর হয়েছে। দূর-দিগন্তের স্বপ্নকুহক তাঁকে বিভ্রান্ত করতে পারে নি। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যরীতিতে একটি বিশেষ ধরনের 'স্টাইল' প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর মনোজীবনের সঙ্গে কাব্যরীতির একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, রচনারীতির সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের এই অদ্বয় সম্পর্কই দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর স্টাইলের মধ্যে ক্লাসিক রীতির স্পষ্টতা ও ঋজুতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু বাঁধুনি সবত্র দৃঢ়-সংহত নয়—মাঝে মাঝে শৈথিল্যও চোখে পড়ে। দ্বিজেন্দ্রলালের বিশিষ্ট ধরনের কাব্যরীতির সর্বোত্তম প্রকাশ হয়েছে তাঁর 'মন্দ্র' কাব্যে—কারণ এই কাব্যে কবির মনোজীবন ও প্রকাশরীতির সবগুলি বৈশিষ্ট্য একত্র প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের বাগভঙ্গির মধ্যে চলতি ক্রিয়াপদ ও সংলাপাত্মক চলতি বাক্যাংশের সঙ্গে তৎসমশব্দপ্রধান ও সমাসবদ্ধ বাক্যের অবাধ মিশ্রণ ঘটেছে।[১৬] চলতি ভাষাকেই যেন তিনি অনেক সময় সাধুভাষার শব্দপেশল অলঙ্কারমণ্ডিত বাগভঙ্গির সাহায্যে প্রকাশ করেছেন—তাই এ ভাষা গদ্যাত্মক হয়েও অনলঙ্কৃত নয়। উদাহরণস্বরূপ 'আলেখ্য' কাব্যের শেষ কবিতা 'সত্যযুগে'র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কবিতাটিতে চলতি ক্রিয়াপদ ও সংলাপাত্মক ভঙ্গি থাকলেও তৎসম শব্দ-গ্রন্থনে ও যুক্তাক্ষর প্রয়োগ-প্রাচুর্যে ধ্বনিগাম্ভীর্যের সৃষ্টি করেছে —

নির্মেঘ অমাবস্যা রাত্রি ; শুয়ে আছি উর্দ্ধমুখে হাতে মাথা রাখি :
বাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে গেছে ; জেগে আছি বাড়ীর মধ্যে আমিই একাকী !
স্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে জলন্ত নক্ষত্রপুঞ্জে চেয়ে দেখি দূরে ;
ভাবি এত মহাজ্যোতি কি মহৎ উদ্দেশে উর্দ্ধে মহাশূন্যে ঘুরে ?
কোথায় সীমা পরিব্যাপ্তির ? কি স্বচ্ছ কি স্তব্ধ আকাশ, কি গাঢ় !
কি কালো !

আচ্ছা—ঐ যে মহাশূন্যের কতখানি অন্ধকার ? আর কতখানি আলো ?
উদ্ধৃত কবিতাটির বলার ভঙ্গি সংলাপাত্মক—কিন্তু চালচলন হালকা নয়, পদক্ষেপে এর আভিজাত্য ও শালীনতা ! 'ক্ষণিকা'য় রবীন্দ্রনাথ হালকা সুরে ও চলতি ভাষায় কবিতা লিখেছেন, কিন্তু ছন্দের সুনির্দিষ্ট রীতিকে কবি অস্বীকার করেন নি, তাই তাঁর এই জাতীয় ছন্দের লঘুস্পর্শ স্মিতহাস্যের সঙ্গে নৃত্যের ললিতভঙ্গি লীলায়িত হয়ে উঠেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা পর্বচারণায় স্বাধীন, অনেক ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশও বটে। তৎসমশব্দপ্রধান সমাসবদ্ধ বাক্যরীতির মধ্যে একটি চিত্রসৌন্দর্য আছে, কিন্তু সে ছবি খোদাই-করা 'রিলিফ' মানচিত্রের মতো—এ যেন চিত্র আর ভাস্কর্যের একটি অর্ধনারীশ্বর

১৬। "সেই অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ছেড়ে একেবারে স্বরবৃত্ত ছন্দে নেমে এলেন। এ অবতরণের ফলে তাঁর হাতে এল একটি নবছন্দের আবিষ্কার যে ছন্দ তাঁর আগে কেউ লেখেনি সাবলীল ভঙ্গিতে। সেই ছন্দই হল স্বরাক্ষরিত ছন্দ যাতে প্রাকৃত ক্রিয়াপদের সঙ্গে কখনো মিশ্রিত হল সাধুভাষার ধ্বনিগাম্ভীর্য—কখনো যোগ দিল ঘরোয়া বাক্যভঙ্গির নিরাভরণ সরলতা—কখনো ওয়ার্ডসওয়র্থ ও ব্রাউনিং-ভঙ্গিম ruggedness বা অলংকৃত জোরালো ইডিয়ম।"—উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল : দিলীপ-কুমার রায়, পৃঃ ১৪৮।

মূর্তি! দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির কাব্যময় গদ্য সংলাপের সঙ্গে কাব্যরীতির একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে। তাঁর নাটকীয় গদ্য-সংলাপ ও কাব্যরীতি একজাতীয় বাগভঙ্গিরই প্রকারভেদ মাত্র।

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যরীতি অনলঙ্কৃত নয়। প্রচলিত কবিপ্রসিদ্ধি ও অলঙ্কারকে তিনি একেবারে গ্রহণ করেন নি এমন নয়, কিন্তু সর্বদাই বাগভঙ্গির ও অলঙ্কারপ্রয়োগের মৌলিকত্বের দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল। তাঁর এই মৌলিকত্বের মূলে ছিল অসাধারণ বাগবৈদগ্ধ্য। প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'আত্ম-কথা'য় নিজেকে 'কৃষ্ণনাগরিক' বলে দাবি করেছেন। কৃষ্ণনগরের মৌখিক ভাষার কথা বলতে গিয়ে তিনি এ ভাষার 'বাকচাতুরী' ও 'স্থিতিস্থাপকতা' গুণের কথা উল্লেখ করেছেন: "যার গলায় সুর আছে সে গান করতে বসলে তার সুর যেমন আপনা হতেই বাঁকে চোরে আর ঘোরে, তেমনি যার মুখের ভাষা ভালো, সেও সেই ভাষাকে ইচ্ছা করলেই ঘোরাতে পারে। ভাষার এই স্থিতিস্থাপকতার সন্ধান কৃষ্ণনাগরিক জানতেন, এরই নাম বাকচাতুরী। ভাষা শুধু কাজের ভাষা নয়, লেখারও ভাষা। ফরাসীরা যাকে *Jeu de mots* বলে, সে খেলার চর্চা সে শহরেও করা হত।"[১৭] কৃষ্ণনগরের ভাষার বাগবৈদগ্ধ্য ও রসিকতার কথা বলতে গিয়ে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের নাম উল্লেখ করেছেন: "সেকালে যারা ছোকরা ছিল, তাদের মধ্যে দুজন লেখক বলে স্বীকৃত হয়েছেন —৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও আমি। আমরা দুজনেই কৃষ্ণনাগরিক। আমাদের দুজনের লেখায় আর যে গুণের অভাব থাক—রসিকতার অভাব নেই। দ্বিজেন্দ্রলালের বিশিষ্ট রচনার নাম 'হাসির গান' আর বীরবলের কথা কান্নার বস্তু নয়।"[১৮]

কবিতার মিলক্রমের মধ্যেও তিনি অনেক সময় মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছেন—এই মিলগুলি যে কত সহজ ও অবলীলাকৃত তার দু-একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে:

দৌড়িল রসনা গিন্নীর দ্রুত এবং চটাং
তদুপরি আমার সেদিন মেজাজ ছিল সটাং;

—কেরাণী: আষাঢ়ে

১৭। আত্মকথা, পৃঃ ১৮।
১৮। ঐ

অন্যত্র : তুই কি একটা মানুষ !

তুই ত পশু, পক্ষী, মৎস্য, লাটিম কিংবা ফানুস।

—অদলবদল : আষাঢ়ে

'সটাং', 'চটাং', 'মানুষ', 'ফানুস'—প্রভৃতি মিলগুলি যেমন অভিনব, তেমনি অবলীলাকৃত। 'হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা' কবিতায় নিরঙ্কুশ মিলের অনায়াস ও অবলীলাকৃত গতি দ্বিজেন্দ্রলালের মৌলিকত্ব ও উদ্ভাবনীশক্তির পরিচয় দেয়। ইংরেজি-বাংলা-মিশ্রিত পদান্তিক মিলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিস্ময়কর মৌলিকতা প্রকাশিত হয়েছে :

রইল না কারো সন্দেহ যে সংসারটা এ ঝকমারি,
যদিও কেউ ছাড়ল না ক ব্যবসা কি নক্‌রি ;
সাত্ত্বিক আহার শ্রেষ্ঠ বুঝে ধর্ল মাংস রকমারি—
'ফাউল বিফ্‌ ও মটন হ্যাম ইন্ অ্যাডিশন টু' বক্‌রি।

—চণ্ডীচরণ : হাসির গান

অনুপ্রাস ব্যবহারের অভিনবত্বের জন্যও অনেক সময় বাগবৈদগ্ধ্য ও হাস্যরস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে : 'নৌকা কি সন ডুবিছে ভীষণ রেলে 'কলিশন' হয়।' অ্যান্টিথিসিসের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত :

আরও অভ্যাস ছবেলা
বাজিয়ে বাজিয়ে তবলা,—
সকল সময় জ্ঞান থাকে না তবলা কি অবলা
বিনা বহু বাক্যব্যয়ে—অতি পরিপাটি
সোজা গিন্নীর বাঁ মস্তকে দিলাম একটি চাঁটি।

—কেরাণী : আষাঢ়ে

দ্বিজেন্দ্রলালের এই কাব্যাংশটি তৎকালে রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।[১৯] কবিতার অন্ত্যমিল-বৈচিত্র্য ছাড়াও এক-একটি চরণের মধ্যে একাধিক অনুপ্রাসের আন্দোলন থাকার জন্য পরিহাসরসিকতা উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। যেমন :

১৯। "এই 'তবলায় কি অবলা'য় কেমন সুন্দর antithesisটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে। এরূপ ছবি অন্য সাহিত্যে বড় বেশী পাইয়াছি বলিয়া বোধ হয় না।"—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় : ভারতী, আষাঢ় ১৩২০।

সাহেব-তাড়াহত, থতমত অঞ্চলস্থ স্ত্রীর
ভূত-ভয়গ্রস্ত, পগারস্থ, মস্ত মস্ত বীর ,

—বলি ত হাসব না : হাসির গান

দ্রুতসঞ্চারী বাক্যাংশের মধ্যে অনুপ্রাসের আন্দোলন কবিতাটির অন্তর্নিহিত রস ফুটিয়ে তুলেছে।

দ্বিজেন্দ্রলালেব কবিতায় সমতলভূমির প্রশান্তগতি খুব বেশী নেই—সুরের ওঠা-নামা, উত্থান-পতনের আকস্মিক লীলা, গভীর কথাকে হালকা সুরে বলা এবং হালকা কথাকে ছদ্ম-গাম্ভীর্যের আবরণে রসিয়ে তোলা তাঁর কাব্যরীতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ক্লাইম্যাক্স ও অ্যান্টিক্লাইম্যাক্সের আকস্মিক চমকে দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের তন্দ্রাতুব চিত্তবৃত্তিকে সচকিত কবে তুলেছেন। 'মন্দ্র' কাব্যের 'কুসুমে কণ্টক' কবিতায় পূর্বাপর একটি ভাবগভীরতা ও মননশীলতার পরিচয় আছে, কিন্তু কবিতার শেষদিকে কবি গুরুগম্ভীর বিষয়ের সঙ্গে একটি তুচ্ছ বিষয়েব তুলনা দিয়েছেন। এই বৈষম্যেব রূঢ় আঘাতে কবিতাটির ভাব-গভীব পবিবেশটি চর্ণ-বিচূর্ণ হযেছে :

ভূধর দুর্বধিগম্য, দূব হ'তে অতি বম্য,
ধূম্রনীল তুষাবকিবীটী
নিকটে বিকট, শীর্ণ, বন্ধুর, কঙ্করকীর্ণ,
শুষ্ক,—যেন উকিলেব চিঠি।

কোথায় 'ধূম্রনীল তুষারকিরীটী', আব কোথায় 'উকিলের চিঠি'। উপমাদি তুলনামূলক অলঙ্কার-প্রয়োগেও দ্বিজেন্দ্রলাল মৌলিকতাব পবিচয় দিয়েছেন। প্রচলিত উপমাবিধি তিনি অনুসরণ কবেন নি—প্রাত্যহিক জগতের তুচ্ছ বিষয়েব মধ্যে তিনি সাদৃশ্য আবিষ্কার কবেছেন। কয়েকটি উদাহবণ নিলে বক্তব্য পরিস্ফুট হবে :

(ক) এ কথাটি এ সময়ে অতি গদ্যময়ী ;—ইহা
হাঁটিয়া আসিতে পথে, শেষে,
গ্যাসের থামের মত, লাগিল, আঘাত যেন,
মদিরাবিভোর শিরে এসে।

—সুখমৃত্যু : মন্দ্র

(খ) পার্শ্বে একটি ভদ্র ব্যক্তি—জানি না লোকটি কে
অতি ফরসা রং, একহারা তার ঢং,
টস্‌-টসে বৃদ্ধ, যেন আম্র সিদ্ধ
বারম্বার সেই ভাবে মগ্ন হরিনাথের দিকে,

—হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা : আষাঢ়ে

(গ) হ'ল শীঘ্র পরামাণিকের নৈপুণ্য প্রমাণ
কাস্তেতে নিহত যেন অগ্রহায়ণের ধান। (ঐ)

(ঘ) বিম্বাধরা হোক কি কাক্রীবদোষ্ঠা,
সুদীর্ঘকেশী কি মাথায় টাক,
সুপংক্তিদন্তা কি গজেন্দ্রদংষ্ট্রা,
বংশীবৎ নাসা কি চাইনীজি নাক , —স্ত্রীর উমেদার : হাসির গান

তুলনাগুলি যেমন উদ্ভট, তেমনি মৌলিক। সর্বশেষ উদাহরণটিতে (ঘ) কবি ঘনবদ্ধ সমাসবহুল সংস্কৃত শব্দের মধ্যে শ্লেষাত্মক ভঙ্গি সঞ্চারিত করেছেন। শব্দ ও অর্থের বৈষম্যে হাস্যরস উদ্রিক্ত হয়েছে।

॥ ৭ ॥

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য সম্পর্কে 'ওযার্ডসওয়ার্থ ও ব্রাউনিং-ভঙ্গিম ruggedness বা অলংকৃত জোরালো ইডিয়ম'-এর কথা উল্লেখ করেছেন। কাব্যের ভাষাকে কবিকল্পনা ও অতিরিক্ত প্রসাধন-বিলাসের সামগ্রী করে তোলা সম্পর্কে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কিছু আপত্তি ছিল। কবিতাকে তিনি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নিকটবর্তী করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁরও আগে স্কটল্যাণ্ডের কৃষক কবি বার্নস (১৭৫৯-১৭৯৬) প্রচলিত আড়ষ্টগতি কাব্যরীতি বর্জন করে একটি সরল, সহজ, বলিষ্ঠ ও অকুণ্ঠিত কাব্যরীতি প্রবর্তন করেছিলেন। সহজ জীবনরসিকতা, প্রত্যক্ষতা ও স্কটল্যাণ্ডের লোকভাষা প্রয়োগের অবাধ নৈপুণ্য তাঁর কাব্যকে জীবন্ত করে তুলেছিল। এক সময় দ্বিজেন্দ্রলাল ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ডের লোকগাথার প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন—'আর্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগের অনুবাদ-সঙ্গীতগুলিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যরীতি প্রসঙ্গে ব্রাউনিংএর কাব্যরীতির কথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়, যদিও ব্রাউনিংএর প্রতিভার স্বরূপ ও মনোজীবনের সঙ্গে বাঙালী কবির পার্থক্য অনেকখানি। কিন্তু ব্রাউনিংএর কাব্যরীতি সম্পর্কে যে প্রশ্ন উঠেছিল, দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কেও সেই জাতীয় প্রশ্ন জাগে। প্রসিদ্ধ সমালোচক উইলিয়ম শার্প তাঁর ব্রাউনিং-জীবনীতে অপর আর একজন সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধার করেছেন: "The poet's processes of thought are scientific in their precision and analysis; the sudden conclusion that he imposes upon them is transcendental and inept."[২০] সমালোচকেরা ব্রাউনিংএর কবিতা পড়ে সিদ্ধান্ত করেছেন যে তিনি কবি হিসেবে ব্যর্থ, দার্শনিক ও মননশীল নৈয়ায়িক হিসেবেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। ভিক্টোরীয় যুগের সার্থকতম দুজন কবি টেনিসন ও ব্রাউনিং শিল্প-কৌশল ও কাব্যরীতির দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মার্গের পথিক ছিলেন। টেনিসনের কাব্যের মসৃণতা, ধ্বনিমাধুর্য ও অলংকৃত পদবিন্যাস ব্রাউনিংএর কাব্যে একেবারে অনুপস্থিত। ব্রাউনিংএর কবিতায় টেনিসনের কবিতার মতো আঙ্গিকসৌকর্য ও গীতিসুষমাও নেই। তাঁর কাব্যপটভূমি রুক্ষ ও বন্ধুর। কথ্যরীতির সংক্ষিপ্ততা ও কর্কশতা তাঁর কবিতার ভাষাকে একটি অভিনবত্ব দিয়েছে। বাইরের পারিপাট্যহীনতাকে তিনি এক ভাবগভীর অর্থদ্যোতনার সাহায্যে ভরে তুলেছেন। ব্রাউনিংএর কাব্যরীতির এই অভিনবত্বের জন্যই অনেকে তাঁর এই রীতিকে কোনো 'শিল্পরীতি' হিসাবেই স্বীকার করেন নি, তাঁরা ব্রাউনিংএর কাব্যরীতিকে 'বৈজ্ঞানিক রীতি' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু যদি তাঁর রীতি শিল্পীর রীতি না হয়ে বৈজ্ঞানিকের রীতিই হত, তা হলে ব্রাউনিং এত বড় কবি হতেই পারতেন না। এ সম্পর্কে একজন সমালোচকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য:

The one supreme difference between the scientific method and the artistic method is, roughly speaking, simply this—that a scientific statement means the same thing wherever and

২০। Robert Browning (English Men of Letters, 1936): G. K. Chesterton, Page 183

whenever it is uttered, and that an artistic statement means something entirely different, according to the relation in which it stands to its surroundings[২১]

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যরীতি সম্পর্কেও প্রশ্ন হতে পারে যে এই পদ্ধতি যথার্থ কোনো কাব্যপদ্ধতি কি না? কারণ ঠিক এই ধরনের অলংকৃত গদ্যপ্রতিম সংলাপাত্মক কাব্যরীতি বাংলা কাব্যে আর কারো লেখায় প্রকাশিত হয় নি—এমন কি উত্তর-প্রত্যুত্তর ছলে যাঁরা কবিতা রচনা করেছেন, সেই কবিওয়ালাদের কাব্যেও নয়। তবে উনিশ শতকের যুক্তিশৃঙ্খলিত গদ্যরীতির সঙ্গে কেউ কেউ দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যরীতির সাধর্ম্য লক্ষ্য করেছেন।[২২] দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য-রীতির মধ্যেও ক্লাসিক্যাল ও রোমান্টিক রীতির একটি বিচিত্র মিশ্রণ আছে। আবেগের তরঙ্গ আছে, বেগও আছে,—কিন্তু মাঝে মাঝে বুদ্ধির চমকপ্রদ দীপ্তি, বিতর্কপ্রবণতা, ব্যঙ্গের বিদ্যুৎশিখা, মহৎ ও তুচ্ছের প্রতি যুগপৎ আকর্ষণ দ্বিজেন্দ্রকাব্যের কলাবিধিকেও প্রভাবিত করেছে।

ব্রাউনিংএর কাব্যরীতির সঙ্গে দ্বিজেন্দ্র-কাব্যরীতির মিল অনুসন্ধান করা নিতান্ত বহিরঙ্গ সাদৃশ্যের অনুসন্ধান করা ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্রাউনিংএর কাব্যরীতির মধ্যে যতই আপাত-বন্ধুরতা থাকুক না কেন, এক জাতীয় স্বর তাতে আছে—অবশ্য এ কথাও ঠিক যে সুইনবার্নের বর্ণমদিরারাগ অতি-চিত্রিত কাব্য পাঠের সংস্কার নিয়ে এ সুর উপলব্ধি করা যাবে না। তা ছাড়া এই রীতির ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি তিনি তাঁর অতলান্ত জীবনদৃষ্টি ও ভাবগভীরতার দ্বারা পূরণ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের এই রীতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে জয়যুক্ত হলেও সর্বাংশে সার্থক হতে পারে নি। তা ছাড়া ব্রাউনিংএর ভাব-গভীরতা তাঁর কাব্যে নেই। যেখানে বিষয়ের সঙ্গে রীতির একটি অখণ্ড ঐক্যবন্ধন আছে, সেখানে তাঁর কাব্যরীতির শিল্পগুণকে অস্বীকার করা যায়

২১। Robert Browning : G. K. Chesterton, Page 134.

২২। "দ্বিজেন্দ্রলালের লেখনীতে এমন একটি তীক্ষ্ণতা, সুস্পষ্ট ছবি গ্রহণের শক্তি, ঋজুতা, বাস্তব বুদ্ধি এবং আমোদ-আনন্দের পরিচয় আছে, যাহা পূর্ব পূর্ব কবিগানের মধ্যে দুর্লভ। গদ্যের ক্ষেত্রে একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেই উহার প্রাকভাস লাভ করিতেছি। .....বলিতে কি, দ্বিজেন্দ্র-লাল নানাদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকারী।"—বঙ্গবাণী : শশাঙ্কমোহন সেন।

না, কিন্তু যেখানে কাব্যরীতি সমস্ত ঐক্যবন্ধন অতিক্রম করে একটি 'ম্যানারিজম-এ পরিণত হয়, তখন তার শিল্পমূল্যও ক্ষুণ্ণ হয়। অপেক্ষাকৃত গভীর রসের কবিতায় হালকা ভাষা ও পরিহাসরসিকতা রসচেতনাকে ব্যাহত করে। কাব্যরীতি যেখানে রসের অখণ্ডতাকে খণ্ডিত করে আপাতবিরোধী মেজাজকে প্রকাশ করেছে, সে সমস্ত কবিতা কাব্য হিসেবে বড নয়। যেমন 'মন্দ্রে'র 'হিমালয দর্শনে', 'সমুদ্রের প্রতি' প্রভৃতি কবিতায এই জাতীয ত্রুটি সবচেয়ে বেশী লক্ষণীয়। কিন্তু 'বাইরণের উদ্দেশে' কবিতায ছন্দ ও ভাষাব একই বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও একটি বিশিষ্ট স্টাইলই আত্মপ্রকাশ করেছে। কারণ এখানে ভাবগত বা রসগত কোনো অসঙ্গতি নেই। তা ছাড়া গুরু-গম্ভীর ভাবকে আকস্মিকভাবে লঘু পরিহাসেরও উপাদান করে তোলা হয নি।

দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায শব্দের দুষ্ট প্রয়োগ ও পদবিন্যাসের কৃত্রিমতা অলক্ষ্যগোচর নয়। প্রথম যুগের কবিতায ও গানে ইংরেজি-ঘেঁষা বাংলার মধ্যে কৃত্রিমতা-দোষ পরিস্ফুট হয়েছে। 'আযগাথা' দ্বিতীয ভাগ সমালোচনাকালে রবীন্দ্রনাথও ভাষাগত কৃত্রিমতার উল্লেখ করেছিলেন "গ্রন্থখানিতে কোন কোন গানে ইংরাজি প্রথার ভাষ আমাদের কানে খাবাপ লাগিযাছে। চেয়োনা বিরাগে মাখি হিম আঁখি তুলি মোর পানে।" ইংরাজিতে cold শব্দের সহিত একটি অপ্রিযভাবের যোগ আছে সেইজন্য হিম আঁখি শব্দটা কানে বিজাতীয ঠেকে।" এই জাতীয ইংরেজি শব্দের অনুবাদমূলক কৃত্রিম প্রয়োগ একাধিক কবিতায আছে। যথা 'বাঁদিব না দীনাহীনা,– কঠোরা তাপসী ঘৃণা', 'শাসিব বিদ্রোহোদ্যম অভিমান দিয়া', 'ঘৃণার তুহিন পাশে প্রেম লো শুকাযে যায',—ইত্যাদি। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকীয সংলাপের মধ্যেও ইংরেজি-ভাষা-সুলভ পদবিন্যাস ও উপমাদি প্রয়োগের অসঙ্গতি দেখা যায। শব্দনির্বাচনের দুর্বলতার ফলেও তাঁর কবিতার কাব্যসৌন্দর্য অনেক সময ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সমাসবদ্ধ চরণের মধ্যেও কষ্টকল্পিত শব্দ প্রয়োগ আছে— 'পূর্ণিমা-হসিত-চন্দ্র-চুম্বিত সাগর সম।' দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যরীতির দোষগুণ সম্পর্কে ডাঃ সুকুমার সেনের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য

"দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যপদ্ধতির প্রধান গুণ হইতেছে ভাবে ভাষায ও ছন্দে অকুণ্ঠ সাহস ও বলিষ্ঠ স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতাই তাঁহার কতকগুলি serious

কবিতাগুলিতে সতেজ নবীন ঝংকার তুলিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ কবিতায় ভাষা নিতান্ত গদ্যঘেঁষা এবং ছন্দোবন্ধন অতিমাত্রায় শিথিল হওয়ায় কাব্য-রসের ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। বস্তুত কাব্যকলায় sustained effort এবং শব্দ নির্বাচন বিষয়ে দুর্বলতা দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় প্রধান দোষ। কচিৎ ইংরেজি ধরণের শব্দপ্রয়োগও অন্যতম দোষ।"[২৩]

উদ্ধৃত মন্তব্যটিতে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যরীতির দোষগুণ সম্পর্কে সুচিন্তিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ছন্দবন্ধনের শৈথিল্যের কথা রবীন্দ্রনাথও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু 'মন্দ্র' ও তার পরবর্তী কাব্যে দ্বিজেন্দ্রলাল ছন্দশৈথিল্যকে অনেকাংশে কাটিয়ে উঠেছিলেন। আর একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর এই অভিনব কাব্যপদ্ধতির দীর্ঘকালব্যাপী অনুশীলন করতে পারেন নি। তাঁর জীবনের আকস্মিক পরিসমাপ্তি এর অন্যতম কারণ সন্দেহ নেই। কিন্তু তার চেয়েও বেশী দায়ী তাঁর সাহিত্যিক জীবনের পটপরিবর্তন। শেষ দশ বছরে তিনি নাটক রচনার দিকেই তাঁর অধিকাংশ প্রচেষ্টা নিবদ্ধ রেখেছিলেন। মঞ্চসাফল্য ও জনপ্রিয়তার উত্তাপ তাঁকে ক্রমাগত স্বক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিচ্ছিল। তাঁর শেষকাব্য 'ত্রিবেণীর' ভূমিকাতেই তিনি প্রকৃতপক্ষে গীতিকাব্যলক্ষ্মীর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন : "সম্ভবতঃ আমার খণ্ডকবিতা রচনার এইখানেই সমাপ্তি! সেইজন্য পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত আমার যাবতীয় কবিতা এই সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে।" স্পষ্টত তিনি কোনো কারণ উল্লেখ না করলেও এ কথা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে নাট্যভারতীর আকর্ষণই তাঁর মনে ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠেছিল।

বাংলা কাব্যের গতানুগতিক সুমসৃণ প্রথাবদ্ধ কাব্যরীতির মধ্যে দ্বিজেন্দ্র-লালের কাব্যরীতি ও কলাবিধি একটি প্রদীপ্ত ব্যতিক্রম। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার ছাপ তাঁর কবিতায় পড়ছে, কিন্তু সে সমস্ত ক্ষেত্রেও তাঁর বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও কাব্যরীতি অনুপস্থিত নয়। তাঁকে মহৎ কবি বললে শুধু উচ্ছ্বাস প্রকাশ করাই হবে, তাঁকে বিচার করা হবে না। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তিনি যে একজন 'বিশিষ্ট' প্রতিভাধর এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ

২৩। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃঃ ৫৫০।

মাত্র নেই। ললিত-মধুর-মসৃণ-তরল রস-সমুদ্রের প্রবলতম জোয়ারের দিনেও তিনি সেই রসস্রোতে গা ভাসিয়ে দেন নি—প্রতিভার বলিষ্ঠতায় ও স্বকীয়তায় তিনি নিজেকে অবিচলিত রেখেছিলেন। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যের পুনর্বিচারের মধ্যে বাঙালী তার কাব্যসাধনার আর একটি দিকের পরিচয়ই পাবে—যে দিক বুদ্ধি-বিশ্লেষণে প্রদীপ্ত, বিতর্কপ্রবণতায় ঋজু-সংহত ও কঠিন পৌরুষে অচল-প্রতিষ্ঠ। রোমান্টিকতা-বিরোধী মননিষ্ঠ কবিতার অভ্যুদয়-লগ্নে তাই দ্বিজেন্দ্রলালের পুনঃপ্রতিষ্ঠা আশা করা অসঙ্গত হবে না।[২৪]

২৪। "দ্বিজেন্দ্রলালের একান্ত বৈশিষ্ট্য তাঁহার পৌরুষ।" 'কাপুরুষতার প্রতি যথোচিত ঘৃণা এবং ধিক্কারের দ্বারা তাহা গৌরববিশিষ্ট।' ইহাই প্রধানতঃ বিপরীত প্রকৃতিবিশিষ্ট বাঙালী সমাজে তাঁহাকে অপ্রিয় করিয়াছে। বাঙালীর প্রকৃতি এখন অনেক বদলাইয়াছে; মনে হয়, দ্বিজেন্দ্রলালকে এযুগের বাঙালী সমাদর করিতে পারিবেন।"

—ভূমিকা : দ্বিজেন্দ্রলালের গ্রন্থাবলী (সাহিত্যপরিষদ সং), পৃঃ ।৶০

প্রহসন ও হাস্যরস

প্রহসন শব্দটিকে ইংরেজি 'Farce'এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ইংরেজ নাট্যতত্ত্ববিদগণ 'মেলোড্রামা'কে ট্রাজেডির স্থূলম্ভ সংস্করণ ও 'ফার্স'কে কমেডির স্থূলভ সংস্করণ হিসেবে নির্দেশ করেছেন। ল্যাটিন 'Farcio' শব্দটি থেকে 'ফার্স' কথাটি উদ্ভূত হয়েছে—ফার্সের বৈশিষ্ট্য হল 'stuffed with low humour and extravagant wit' সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংলণ্ডে এই শব্দটির বহুল ব্যবহার লক্ষিত হয়—কিন্তু শব্দটি ব্যুৎপত্তিগত অর্থের মধ্যে নিবদ্ধ না থেকে সম্প্রসারিত হল। এই সময় থেকে লঘুরসের যে কোনো হাস্যরসাত্মক নাটককেই 'ফার্স' বলা হত। ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দের সমকালবর্তী সময় থেকে দর্শকদের মধ্যেও কিছু রুচিবিকৃতি দেখা দিল—স্থূলরুচির লঘুরসের প্রহসন আস্বাদনের দিকেই তাদের প্রবণতা দেখা গেল। এই সময় থেকেই তিন অঙ্কের লঘুরসের নাটক লেখা শুরু হল—পঞ্চমাঙ্কের পূর্ণাঙ্গ নাটকের তুলনায় এই জাতীয় নাটককে নিকৃষ্ট মনে করা হত। তখন পঞ্চমাঙ্ক কমেডির সঙ্গে তিন অঙ্কের লঘুরসের নাটকের প্রভেদ বোঝাতে গিয়ে তাদের 'ফার্স' আখ্যায় চিহ্নিত করা হল। প্রকৃতপক্ষে স্বল্পপরিসর হাস্যরসাত্মক নাটককেই তখন 'ফার্স' বলা হত। কলেবর সংক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য চরিত্র ও কাহিনী বিন্যাসের সুবিস্তৃত অবকাশ এখানে ছিল না—আতিশয্যধর্মী চরিত্র ও উদ্ভট কৌতুকাবহ ঘটনার প্রাধান্য থাকত।[১] কাহিনীবিন্যাসের সূক্ষ্ম-চাতুর্যের চেয়ে অসম্ভব ঘটনা সৃষ্টির দিকেই প্রহসন-রচয়িতার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। চরিত্রগুলিকেও প্রহসনের মধ্যে অতিরঞ্জিত করে তোলা হয়।[২] হাস্য-

---

১। "As however, in a short play there is usually no time or opportunity for the broader display of character and of pl t, farces come rapidly to deal only with exaggerated, and hence often impossible, comic incidents with frequent resort to mere horse play. With this signification the word has endured to modern times." —The Theory of Drama : A. Nicoll. Page 88.

২। "We have found that its main characteristics are that dependence in it of character and of dialogue upon mere situation. This situation, moreover, is of the most exaggerated and impossible kind, depending not on clever plot-construction, but upon the coarsest and rudest of improbable incongruities." —Ibid, Pp. 213-214.

রসের বিভিন্ন পর্যায়ভেদে প্রহসনকেও একাধিকভাবে ভাগ করা যায়। বাংলা প্রহসনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বিদ্রূপাত্মক প্রহসন ও বিশুদ্ধ প্রহসন—এই দু জাতীয় প্রহসনেরই প্রাধান্য। প্রথমটির মূলরস ব্যঙ্গবিদ্রূপ, দ্বিতীয়টির কৌতুকরস। অবশ্য দীনবন্ধুর প্রহসনগুলি স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত হওয়ার দাবি রাখে। 'সধবার একাদশী'কে প্রহসন না বলে উচ্চ-শ্রেণীর কমেডি বলাই সঙ্গত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে অনেকগুলি নাটক রচিত হয়। সামাজিক দুর্নীতি ও সমস্যাগুলিকে এই যুগের নাটকগুলির মধ্যে রূপায়িত করা হয়েছে। এই সমস্ত নাটকের মধ্যে উগ্র প্রচারপরায়ণতাই সবচেয়ে বেশী আত্মপ্রকাশ করেছে—নাটকের শিল্পগত মূল্য খুব বেশী নেই। সামাজিক নকশা-নাটক ও প্রহসন রচনায় এই যুগে রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৮৬) খ্যাতি লাভ করেন। 'উভয় সঙ্কট' (১৮৬৯), 'চক্ষুদান' (১২৭৬), 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' (দ্বি-সং ১২৭৯) প্রভৃতি প্রহসনগুলির মধ্যে সমাজের নানাপ্রকার দুর্নীতি ও কুপ্রথাকেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) নাটকে ও প্রহসনগুলিতে সমাজচিত্র আছে বটে, কিন্তু নাট্যশিল্প হিসাবে এদের মূল্য নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। প্রহসনের মধ্যে সমসাময়িক সমাজ-জীবনের চিত্র ফুটে ওঠে। সামাজিক কুপ্রথাঘটিত নাটক ও প্রহসন রচনার প্রাচুর্য দেখা যায় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ও তার পরবর্তীকাল থেকে। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচেষ্টায় ও সর্ববিধ আনুকূল্যে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হল। বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে এ যুগে একাধিক নাটক লিখিত হয়। উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ' (১৮৫৬) নাটকটি এই বিষয়ের খ্যাততম নাটক। বিধবা বিবাহ, বাল্যবিবাহ, মদ্যপান, লম্পটের দুর্নীতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এই যুগের সামাজিক নকশা-নাটক ও প্রহসনগুলি রচিত হয়। লঘু হাস্যরস ও স্থূল রসিকতাই এই যুগের অধিকাংশ সামাজিক নাটকের বৈশিষ্ট্য। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবুনাটক' (১৮৫৩ ?) এই যুগের প্রহসনের মধ্যে খ্যাতি লাভ করে।

বাংলা প্রহসনের ইতিহাসেও মধুসূদনের (১৮২৪-১৮৭৩) যুগান্তকারী প্রতিভা অসাধারণত্বের সৃষ্টি করেছিল। পূর্ববর্তী প্রহসনগুলির সঙ্গে মধুসূদনের প্রহসনের একটি পার্থক্য আছে। মধুসূদন যে ধরনের প্রহসন

লিখেছিলেন, বাংলা সাহিত্যে তার কোন আদর্শও তাঁর সামনে ছিল না। রামনারায়ণের সামাজিক নকশা ও সামাজিক কুপ্রথাঘটিত নাট্যগুলি বিষয়-নির্বাচন সম্পর্কে মধুসূদনকে কিছু সাহায্য করতে পারে, কিন্তু শিল্পরূপ সম্পর্কে কোনো প্রেরণাই দেয় নি। মধুসূদনের প্রহসনগুলি একান্তভাবেই মৌলিক।[৩] 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনটিতে 'ইয়ং বেঙ্গল' সম্প্রদায়ের মদ্যপান, দেশীয় আচার-আচরণের প্রতি অশ্রদ্ধা, নৈতিক চরিত্রের বিকৃতি প্রভৃতিকে তিনি বিদ্রূপাত্মক মনোভঙ্গির সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি, সংলাপরচনার স্বাভাবিকত্ব, অতিশয্যহীন কাহিনীবিন্যাস, অনিবার্য ও দ্রুতসঞ্চারী গতি মধুসূদনের প্রহসনটিকে উচ্চতর শিল্পসুষমায় মণ্ডিত করেছে। রস-রুচির সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত প্রহসনটি সম্পর্কে বলেছিলেন : "'Is this civilization ?' is the best in the language' 'একেই কি বলে সভ্যতা'-য় যেমন ইংরেজি-শিক্ষিত, নব্য-সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খলতা ও আচারভ্রষ্টতার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তেমনি 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটিতে বর্ণিত হয়েছে অর্থ-প্রতিপত্তিশালী এক ভণ্ড তপস্বীর গোপন লাম্পট্যের কাহিনী। তাঁদের বাইরে ছিল ধর্মের আবরণ, কিন্তু অন্তরালে তাঁরা চরিত্রহীনতার শেষ ধাপ পর্যন্ত নেমেছিলেন। প্রহসনটির সংলাপবৈচিত্র্য লক্ষণীয়—হানিফ, ফতেমা প্রমুখ চরিত্রের সংলাপে গ্রাম্যচাষীর অসংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, ভক্তপ্রসাদ ও বাচস্পতির মুখ দিয়ে চলতি ভাষাই ব্যবহার করেছেন—কিন্তু সে ভাষা মার্জিত। তাঁর পঞ্চমাঙ্ক গভীর-রসাত্মক নাটকগুলির কৃত্রিমতা ও আড়ষ্টতা এখানে নেই। মধুসূদনই প্রথম বিলাতি ধরনের প্রহসন রচনা করেন। মোলিয়েরের প্রহসন ও 'রেস্টোরেশন যুগে'-র ইংরেজি কমেডির প্রভাব পড়াও বিচিত্র নয়।[৪] মধুসূদনের প্রহসন দুটিতে সমাজ-বিদ্রূপ আছে, কিন্তু বিদ্রূপরসই এখানে মুখ্য হয়ে ওঠে নি—প্রসন্ন কৌতুকের দিকটিই এখানে বেশী ফুটেছে।

প্রহসন রচনায় মধুসূদন মৌলিকত্বের পরিচয় দিলেও, প্রহসন রচনা তাঁর প্রতিভার স্বক্ষেত্র ছিল না। প্রহসনকে উচ্চতর শিল্পকর্মে পরিণত করেছেন

৩। মধুসূদনের প্রহসন : রথীন্দ্রনাথ রায়, শনিবারের চিঠি, ফাল্গুন, ১৩৬৩

৪। মধুসূদন ও ফরাসী সাহিত্য : দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৬১।

দীনবন্ধু মিত্র। আসল কথা, দীনবন্ধুর (১৮৩০-১৮৭৩) নাট্যপ্রতিভার একটি বিশিষ্ট শক্তি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর হাস্যরসসৃষ্টির অসাধারণ মৌলিকতায়। দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ নাটক 'সধবার একাদশী'কে (১৮৬৬) নাট্যসমালোচকেরা প্রহসনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৫] কিন্তু বাংলা সাহিত্যের এই অসাধারণ নাটকখানিকে 'প্রহসন' আখ্যা দিলে বোধ হয় গ্রন্থটির উপর অবিচার করাই হবে। হয়তো অতিরিক্ত মদ্যপানের কুফল দেখানোর জন্যই নাট্যকার নাটক রচনা শুরু করেছিলেন কিন্তু এই জাতীয় প্রচারধর্মী উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে দীনবন্ধু জীবনরহস্যের গভীরে প্রবেশ করেছেন। তাই এখানকার হাস্যরস সহানুভূতির অশ্রুজলে স্নিগ্ধ, জীবনরসের গভীরতায় সমৃদ্ধ।[৬] 'বিয়ে-পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬) ও 'জামাই বারিক' (১৮৭২)—দুটিকে বিশুদ্ধ প্রহসন বলা চলে। প্রথমটিতে রাজীবলোচনের বৃদ্ধবয়সে তরুণ সাজার উৎকট আকাঙ্ক্ষা ও তার 'কৌতুকাবহ অথচ করুণ' পরিণতিকে স্বাভাবিক ও সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কুলীন ও নিষ্কর্মা ঘরজামাইয়ের দ্বিপত্নীক সমস্যা, দৈনন্দিন জীবনের কৌতুকাবহ খণ্ডচিত্রগুলি ও হাস্যরসের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ প্রহসনটিকে একটি বিশিষ্ট শিল্পমূল্য দিয়েছে। প্রহসনের মধ্যেও করুণ রসের একটি অন্তঃশীল ধারা দীনবন্ধুর প্রহসনগুলিতে অভিনবত্ব সঞ্চার করেছে। এ দিক দিয়ে বাংলা প্রহসনের ইতিহাসে দীনবন্ধুর প্রহসনগুলি একটি বিশিষ্ট শ্রেণী বললেও অত্যুক্তি হয় না। মোহিতলাল একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে এর কারণ নির্দেশ করেছেন: "করুণকেও উজ্জ্বলতর করিবার জন্য তিনি

৫। বাংলা নাটকের ইতিহাস: অজিতকুমার ঘোষ, পৃঃ ৭৩। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও সধবার একাদশীকে প্রহসনই বলেছেন। ('কিঞ্চিৎ জলযোগের' সমালোচনা দ্রষ্টব্য: বঙ্গদর্শন, চৈত্র, ১২৭৯) বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য 'প্রহসন' শব্দটিকে একটি বিস্তৃত অর্থেই প্রয়োগ করেছেন।

৬। "হাস্যরসিকের সহানুভূতি অতি সচেতন; কবির ভাবপ্রবণতা ইহাতে নাই, কারণ ইহাও তাহার কাছে হাস্যকর। কিন্তু কবির ভাবকল্পনার মতই তাহার স্বাভাবিক প্রজ্ঞা ও সহজ অনুভূতি জীবনকে সঙ্কীর্ণভাবে না বুঝিয়া স্নিগ্ধনেত্রে ও সমগ্রভাবে গ্রহণ করে। তাই কোন সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক লিখিয়াছেন: The humourist sees life more widely and wisely than any of the seers. It is not an intense and narrow nature.........the humourist can gaze at the totality of the world's life."

—দীনবন্ধু মিত্র: ডঃ সুশীলকুমার দে, পৃঃ ৫৯-৬০

হাস্যরসের অবতারণা করেন ; কারণ এই জাতীয় রসসৃষ্টিতে করুণ ও হাস্য তুল্যমূল্য।[৭]

বিচিত্র-প্রতিভাধর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫) নাটক ও প্রহসন রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। স্বদেশপ্রেমমূলক ঐতিহাসিক নাটক ও অনুবাদ রচনায় তিনি সমধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও প্রহসনের ক্ষেত্রেও তিনি কিছু কিছু নূতনত্বের সৃষ্টি করেছিলেন। উজ্জ্বলমধুর কৌতুকরস ও সুসংযত রুচিবোধ তিনি প্রহসনের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেন। তাঁর প্রহসন-গুলিকে কৌতুকহাস্যোজ্জ্বল 'বিশুদ্ধ প্রহসন'-ও বলা যায়। সামাজিক দিক বাদ দিয়ে প্রহসন রচনা করা সম্ভব নয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসনে সামাজিক বিদ্রূপের ভাবটি যে অনুপস্থিত এমন কথা বলা যায় না—কিন্তু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আক্রমণাক্রম রীতি অপেক্ষা তাঁর প্রহসনে সহজ কৌতুকের স্নিগ্ধতাই প্রাধান্য লাভ করেছে। তা ছাড়া মধুসূদন ও দীনবন্ধু যেমন সমাজদেহের মর্মস্থল পর্যন্ত তাঁদের সন্ধানী দৃষ্টির সাহায্যে আলোকিত করেছিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই নগ্ন বাস্তবতার রূপটি উদ্ঘাটিত করার চেষ্টা করেন নি, শুধু সামাজিক ও ব্যক্তিজীবনের অসঙ্গতিগুলির বহিরাশ্রয়ী রূপকেই কৌতুক-পরিহাসে রসোজ্জ্বল করে তুলেছেন।[৮] তাঁর প্রথম প্রহসন 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' (১৮৭২)-এ কেশবচন্দ্রের প্রতি কটাক্ষ আছে। আতিশয্যধর্মী স্ত্রী-স্বাধীনতা নিয়ে কৌতুককর ঘটনা-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করা হয়েছে--কিন্তু কোথাও বিদ্রূপের জ্বালা নেই ও ব্যক্তিগত আক্রমণের তীব্রতাও নেই। 'এমন কর্ম আর করব না' (১৮৭৭) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দ্বিতীয় প্রহসন। পরে এই প্রহসনটির নাম পরিবর্তন করে 'অলীকবাবু' রাখা হয় (১৯০০)। 'হিতে বিপরীত' (১৮৯৬) 'হঠাৎ নবাব' (১৮৮৪), 'দায়ে পড়ে দায়গ্রহ' (১৩০৯) প্রভৃতি প্রহসনগুলিতেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রহসনকে তিনি একটি সংযত সুষমা দান করেন। শুভ্রোজ্জ্বল হাস্যরস ছাড়াও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের

৭। আধুনিক বাংলাসাহিত্য : পৃঃ ১২২।

৮। "দীনবন্ধু প্রভৃতি ঝড়ো হাওয়ার বেগে সমাজের ছদ্মবেশটি উড়াইয়া লইয়া গিয়াছেন, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৃদু মলয় পবনের ন্যায় সেই বেশটি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন মাত্র ; সুতরাং তাঁহার নাটকে বাস্তবের নগ্নতা ফুটিয়া উঠে নাই।"—বাংলা নাটকের ইতিহাস - অজিতকুমার ঘোষ, পৃঃ ১১৫।

প্রহসনের আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁর প্রহসনগুলি প্রধানত মোলিয়েরের প্রহসনগুলির আদর্শে রচিত হয়েছে। 'হঠাৎ নবাব' ও 'দায়ে পড়ে দায়গ্রহ' প্রহসন দুটি যথাক্রমে মোলিয়েরের 'Le Bourgeois Gentilhomme' ও Murriage Force' প্রহসন দুটির অনুবাদ। এই দুটি প্রহসন ছাড়াও অন্য প্রহসনগুলিতেও মোলিয়েরের কমেডি ও প্রহসনের অল্পবিস্তর প্রভাব আছে। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনই সর্বপ্রথম প্রহসনের ক্ষেত্রে মোলিয়ের-রসিকতাকে প্রবর্তন করেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই অসাধারণ লিপিচতুর ফরাসী নাট্যকারকে বাঙালীর মনোজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ নাট্যকাব মোলিয়েরের পথ অনুসরণ করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম ও নবম দশকে সামাজিক নকশা-নাটক ও প্রহসন রচিত হয। বিধবা বিবাহের জের তখনও ছিল। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের ত্রুটিবিচ্যুতি দেখানোই ছিল এই জাতীয় প্রহসনগুলির মূল উদ্দেশ্য—অনেকক্ষেত্রে ব্যাক্তিগত ও পারিবারিক বিদ্বেষ অত্যন্ত উৎকট হয়ে উঠেছিল। 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রহসনের সমালোচনায বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন প্রহসন সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখযোগ্য

"একেই কি বলে সভ্যতার জন্মাবধি প্রহসনের কিছু ছডাছডি হইযাছে। সেই সকল পাঠে আমরা স্থির করিয়াছি যে হাস্যরসবিহীন অশ্লীল প্রলাপকেই বঙ্গদেশে প্রহসন বলে। দুইখানি প্রহসন এই পরিভাষা হইতে বিশেষরূপে বর্জিত, একেই কি বলে সভ্যতা এবং সধবার একাদশী। সধবার একাদশী অশ্লীলতা দোষে দূষিত হইলেও অন্যান্য গুণে ভারতবর্ষীয় ভাষায এরূপ প্রহসন দুর্লভ। "কিঞ্চিৎ জলযোগ" ঐ দুই প্রহসনের তুল্য নহে বটে কিন্তু ইহাকেও বর্জিত করিতে পারি। ইহাও একখানি উৎকৃষ্ট প্রহসন। এ প্রহসনের একটি গুণ এই যে তৎপ্রণেতা প্রহসন লিখিতে নাটক লিখিয়া ফেলেন নাই। অনেকেরই প্রণীত প্রহসন, প্রহসন নহে, অপকৃষ্ট নাটক মাত্র; এ প্রহসন প্রহসন মাত্র, কিন্তু অপকৃষ্ট নহে।"[৯]

যশস্বী নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৪-১৯১১) নাটকের পরিধি যেমন বিপুল তেমনি বিচিত্র। কিন্তু প্রহসন রচনায় তিনি তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। হাস্যরসের প্রকৃতিও খুব উন্নত শ্রেণীর নয়। তাঁর

৯। বঙ্গদর্শন : চৈত্র, ১২৭৯।

প্রহসনগুলিকে তিনি 'পঞ্চরং' আখ্যা দিয়েছেন। গিরিশচন্দ্রের মতো অমৃতলাল বসুও (১৮৫৩-১৯২৯) ছিলেন একাধারে নট ও নাট্যকার। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক সামাজিক নকশা-নাটক ও প্রহসন-রচয়িতা হিসাবেই প্রধানত অমৃতলালের খ্যাতি। অমৃতলালের প্রহসনগুলিকে কৌতুকরসপ্রধান বিশুদ্ধ প্রহসন না বলে বিদ্রূপাত্মক প্রহসন বলাই অধিকতর সঙ্গত। অমৃতলাল ছিলেন মূলত স্যাটায়ারিস্ট—তাঁর বিদ্রূপ ছিল যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি মর্মান্তিক। দীনবন্ধুর মতো তিনি হিউমারের 'কান্না-হাসির গঙ্গাযমুনায়' জীবনরহস্যকে আবিষ্কার করতে পারেন নি; জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতো কৌতুকহাস্যের সহজ ও নির্দোষ অভিব্যক্তিও তাঁর প্রহসনে ছিল না। বুদ্ধিদীপ্ত বাক্‌চাতুর্য ও কথার মারপ্যাচ অমৃতলালের প্রহসনগুলির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রহসনগুলিতে প্রধানত পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন ও সনাতন-আচার-আদর্শ-ভ্রষ্ট সমাজকেই ব্যঙ্গ করা হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে হিন্দুধর্মের যে পুনরভ্যুত্থান ঘটেছিল, অমৃতলালের প্রহসনগুলিতে তারই ভাবাদর্শ লক্ষ্য করা যায়। গিরিশচন্দ্রের প্রহসনগুলিতেও এই পাশ্চাত্ত্য-অনুকরণপ্রিয়তাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। মধুসূদন ও দীনবন্ধু যেমন ইয়ংবেঙ্গলের নৈতিক বিকৃতি দেখিয়েছিলেন, তেমনি তথাকথিত ধর্মধ্বজীদের গোপন লাম্পট্যের মুখোসকেও উদ্‌ঘাটিত করেছেন। সামাজিক কুপ্রথাগুলির বিরুদ্ধেও পূর্ববর্তীযুগের প্রহসন-রচয়িতারা লেখনী সঞ্চালন করেছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র বা অমৃতলাল সনাতন আদর্শের প্রতিই সহানুভূতি দেখিয়েছেন। 'বিবাহ বিভ্রাট' (১৮৮৪) প্রহসনটিই প্রহসন-রচয়িতা অমৃতলালের খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত করে। শিক্ষিতা মহিলার চিত্তবিকৃতিকে নাটকে খুব রসালো করে ফোটানো হয়েছে। নব্যযুবকদের বিলাত যাত্রার উৎকট নেশা নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে 'কালাপানি'-তে (১৮৯৩)। অমৃতলালের 'বৌমা' (১৮৯৭) প্রহসনটিও এক সময়ে খ্যাতিলাভ করেছেন। শিক্ষিতা তরুণীর উৎকট রোমান্সগ্রস্ততা ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি কটাক্ষ এই প্রহসনটিতে অত্যন্ত পরিস্ফুট হয়েছে।[১০] অমৃতলালের প্রহসনগুলির মধ্যেও মোলিয়েরের প্রভাব

১০। ডাঃ সুকুমার সেন বলেন: "জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'এমন কর্ম আর করব না' প্রহসনের অনুসরণে বধূ কিশোরীর মুখ দিয়া বঙ্কিমের লেখার Parody করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রতি কটাক্ষ এবং তাঁহার একটি কবিতার Parody-ও আছে।"

—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) পৃঃ ৩৮১।

আছে। 'চোরের উপর বাটপাড়ি' (১৮৭৬) প্রহসনের কাহিনীবৈচিত্র্যের উপরে মোলিয়েরের 'The School for Wives'-এর প্রভাব পড়েছে। 'কৃপণের ধন' (১৯০০) প্রহসনটিতে মোলিয়েরের The Miser (L' Avare) প্রহসনটির প্রভাব আছে। অমৃতলালের প্রহসনে বিষয়বৈচিত্র্য কম নয়। কিন্তু বিশুদ্ধ প্রহসনের সংখ্যা সেই তুলনায় কম।

রবীন্দ্রনাথের প্রহসনের সংখ্যা বেশী নয়। কিন্তু স্বল্পসংখ্যক প্রহসনের মধ্যে তাঁর স্বকীয়তা ও অনন্যসাধারণ শিল্পরীতি প্রকাশিত হয়েছে। সূক্ষ্ম রসবোধ, পরিমার্জিত রুচি ও সুসংযত সুবিন্যস্ত সংলাপ রবীন্দ্রনাথের প্রহসনগুলির বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের প্রহসনগুলিতে কোন বিদ্রূপরসপূর্ণ আক্রমণাত্মক ভাব নেই। পরিহাসরসিকতা ও স্নিগ্ধ কৌতুক তাঁর প্রহসনগুলিকে আলোকোজ্জ্বল করে তুলেছে। 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৩০৩) প্রহসনটিতে কেদার ও তিনকড়ির চরিত্রকে পাশাপাশি এনে হাস্যরস সৃষ্টি করা হয়েছে। 'চিরকুমার সভা' (১৩৩২) ও তার মার্জিত সংস্করণ 'শেষরক্ষা' (১৩৩৫) প্রহসন-রচয়িতা রবীন্দ্রনাথেব শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। চিরকুমারদের চরিত্রের কৌতুকাবহ অসঙ্গতি ও ঘটনার জটিলতা এক প্রসন্নমধুর পরিতৃপ্তির মধ্যে পবিসমাপ্ত হয়েছে। লঘু-তরল পরিহাসরসিকতা, ঘটনা ও চরিত্রের কৌতুককব অসঙ্গতি রবীন্দ্রনাথের প্রহসনগুলিব সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। ভাবে ও ভঙ্গিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসনের সঙ্গেই এর একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে।

॥ ২ ॥

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাট্যজীবন-সম্পর্কিত একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধে প্রহসন রচনা বিষয়ে নিম্নোক্তরূপ মন্তব্য করেছেন .

"বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি কলিকাতার রঙ্গমঞ্চসমূহে অভিনয় দেখি। এবং সেই সময়েই বঙ্গভাষায় লিখিত নাটকসমূহের সহিত আমার পরিচয় হয়।...

"প্রথমতঃ প্রহসনগুলির অভিনয় দেখিয়া সেগুলির স্বাভাবিকতা ও সৌন্দর্যে মোহিত হইতাম বটে, কিন্তু সেগুলির অশ্লীলতা ও কুরুচি দেখিয়া ব্যথিত হই। ঐ সময়ে কল্কি অবতার—একখানি প্রহসন গদ্যে পদ্যে রচনা করিয়া ছাপাই।

পরে আমার পূর্বরচিত কতকগুলি হাসির গান একত্রে গাঁথিয়া "বিরহ" নাটক রচনা করি। এবং ক্রমে সে নাটক ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। পরে 'প্রায়শ্চিত্ত' রচনা করি এবং সেখানি ক্লাসিকে অভিনীত হয়।"[১১]

দ্বিজেন্দ্রলাল ছখানি বিদ্রূপাত্মক নাটিকা ও প্রহসন রচনা করেছিলেন : 'সমাজ বিভ্রাট ও কল্কি অবতার' (১৮৯৫), 'বিরহ' (১৮৯৭), 'ত্র্যহস্পর্শ বা সুখী পরিবার' (১৯০০), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০২), 'পুনর্জন্ম' (১৯১২) ও 'আনন্দ বিদায়' (১৯১২)। কিন্তু রস ও রীতির বিচারে এই ছখানি প্রহসনের মধ্যেও নানা পার্থক্য ও বৈচিত্র্য আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম প্রহসন 'কল্কি অবতার'। নাট্যকার নামটির সঙ্গে 'সমাজ-বিভ্রাট' যুক্ত করে বর্ণিত বিষয়টিকে যেন আরও বিশদ করেছেন। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী রচনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই প্রহসনটির স্বরূপ উপলব্ধি করা যাবে। 'একঘরে' নকশার সমাজবিদ্রূপের তীব্রতা এখানেও আছে। নকশাটিতে প্রধানত রক্ষণশীল সমাজপতিদের প্রতিই কটূক্তি করা হয়েছে। কিন্তু প্রহসনখানিতে সমাজের যেখানেই তিনি অসঙ্গতি ও দুর্বলতা দেখেছেন, সেখানেই তিনি কশাঘাত করেছেন। নকশাটিতে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ তীব্রতর, ক্ষেত্রও সঙ্কীর্ণ, কিন্তু প্রহসনটির ক্ষেত্র অনেক বেশী বিস্তৃত। তাই আপাতদৃষ্টিতে এ দুয়ের মধ্যে কিছু মিল থাকলেও প্রকৃতপক্ষে অনেকখানি প্রভেদ আছে। 'একঘরে' নিন্দিত হয়েছিল, কিন্তু 'কল্কি অবতার' অভিনন্দিত হয়েছিল।[১২] 'কল্কি-অবতার' প্রহসনের সঙ্গে এর চার বছর পরে প্রকাশিত 'আষাঢ়ে' (১৮৯৯) কাব্যগ্রন্থটিরও কিছু রীতিগত সম্পর্ক আছে। 'কল্কি অবতারে'র সংলাপগুলি অধিকাংশই "সমিল গদ্যে" লেখা। গদ্যাত্মক সংলাপ-রীতিকে ছন্দের শিথিল বিন্যাসে গেঁথে তোলা হয়েছে। কাব্যরীতির দিক থেকে 'আষাঢ়ে' ব্যঙ্গকাব্যের সঙ্গে এর একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। অবশ্য কাব্যটির রীতি আরও পরিণত।

প্রহসনটিতে নব্যহিন্দু, ব্রাহ্ম, গোঁড়া, পণ্ডিত ও বিলাত-ফেরত—এই পাঁচটি সম্প্রদায়ের উপর বিদ্রূপের শরজাল বর্ষিত হয়েছে। যখন এই পাঁচটি সম্প্রদায়ের

১১। আমার নাট্য-জীবনের আরম্ভ : নাট্য-মন্দির, শ্রাবণ, ১৩১৭।

১২। 'একঘরে' পাঠ করিয়া কবির হিন্দুসমাজভুক্ত আত্মীয়রাও অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কল্কি-অবতার পাঠ করিয়া রক্ষণশীল সমাজের নেতা বঙ্গবাসীও লিখিয়াছিলেন—"এরূপ পুস্তক বঙ্গভাষায় আর হয় নাই।" —দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার ঘোষ, পৃঃ ৬৮

মধ্যে বিরোধ ও বিতর্ক চূড়ান্ত হয়ে উঠল, তখন ব্রহ্মার অনুরোধ বিষ্ণু কল্কিরূপে অবতীর্ণ হলেন। কল্কির এই মধ্যস্থতায় বিবদমান সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মিলন স্থাপিত হল। কল্কিদেব তাঁদের দিলেন বিশ্বাস, প্রেম ও মনুষ্যত্বের মন্ত্র :

কদিন সমাজ একঘরের ভয়ে টিঁকে থাকে
বিশ্বাস, প্রেম, মনুষ্যত্বই সমাজটাকে রাখে।

'কল্কি-অবতার' স্বর্গ ও মর্ত্য, দেবতা ও মানুষ—প্রভৃতি আপাতবিরোধী বিচিত্র উপাদানে রচিত হয়েছে। দেবলোক ও মানবলোক এখানে একই সমাজভুক্ত। বিদ্রূপাত্মক রচনায় এই পদ্ধতি নূতন নয়। নাট্যকার অবশ্য গ্রন্থের ভূমিকায় এ সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ কৈফিয়ত দিয়েছেন। নাট্যকাব আরও বলেছেন যে তিনি এখানে কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে আঘাত করেন নি,—সমাজের সর্বশ্রেণীর দোষত্রুটিকেই তিনি উদ্‌ঘাটিত করেছেন। লেখকের এ কৈফিয়ত মিথ্যা নয়। কারণ বিদ্রূপের তীব্রতা যতই থাক না কেন, বিদ্রূপেব ক্ষেত্র প্রশস্ততব হওয়াব জন্য উপভোগ্য হয়েছে। রাজার কুলপুরোহিত বিদ্যানিধিব পরিকল্পনাটি সবচেয়ে সার্থক হয়েছে। এই 'সুরসিক সর্বভুক' পণ্ডিতটি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ কবে।

'কল্কি-অবতার' প্রহসন হিসাবে উচ্চশ্রেণীর নয়। সংলাপ দুর্বল, চরিত্রও সব সময় অনিবার্য নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যান্য প্রহসনের মত 'কল্কি অবতারে'ব প্রধান ঐশ্বর্য এর হাসির গানগুলি। গানগুলি বাদ দিলে প্রহসনটি নিতান্ত বিশেষত্ববর্জিত। হাসিব গান রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলালেরই আর এক দিক তাঁর প্রহসন। সংলাপবৈচিত্র্য, চরিত্র ও ঘটনার উদ্ভট সমাবেশ থেকে সাধারণত হাস্যরস উদ্ভূত হয় নি—হাসির গানের স্বতঃস্ফূর্ততাই তাঁর প্রহসনগুলির প্রাণ-সঞ্চার করেছে। 'কল্কি-অবতার' প্রহসনে সত্যিকারের কোনো অবিচ্ছিন্ন কাহিনী নেই। অবশ্য প্রহসনের কাহিনীভাগ সাধারণত অকিঞ্চিৎকরই হয়ে থাকে, কিন্তু তার মধ্যেও বাঁধন থাকা উচিত। 'কল্কি অবতার'কে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন কৌতুকচিত্রের সমষ্টি বলা যায়, চিত্রগুলি যেন ঘনবদ্ধ হয়ে একটি অবিচ্ছিন্ন গতিবেগের সৃষ্টি করে নি। ফলে প্রহসনটির গতিবেগ (action) মাঝে মাঝে আকস্মিকভাবে ছিন্ন হয়েছে। সরব ও উচ্চকণ্ঠ হাসি খণ্ড-খণ্ড দৃশ্যের মধ্যে মধ্যে যে তরঙ্গের সৃষ্টি করেছে তা বিচ্ছিন্ন চিত্র হিসেবেই

উপভোগ্য হয়েছে। সুতরাং 'কল্কি অবতার'কে পূর্ণাঙ্গ ও নির্দোষ প্রহসন না বলে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি কৌতুকচিত্রের সমষ্টি বলাই অধিকতর সঙ্গত।

দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় প্রহসন 'বিরহ' (১৮৯৭)। 'কল্কি-অবতার' প্রহসনের মধ্যে সামাজিক বিদ্রূপের সুর সুস্পষ্ট। তাই সেখানে কৌতুকের (fun) সঙ্গে বিদ্রূপের কশাঘাতও (satire) আছে। কিন্তু 'বিরহ'কে বিশুদ্ধ প্রহসন বলা যায়। আখ্যায়িকা-বিন্যাসকে ঘোরালো ও জটিল করে তোলা হয়েছে—মূল কাহিনীর সঙ্গে একটি উপকাহিনীর গ্রন্থন করে লেখক ঘটনার মধ্যে একটি ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করেছেন। প্রহসনটিতে ঘটনার ঘোরপ্যাঁচ ও উদ্ভটত্বই হাস্যরসের উদ্রেক করে। গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর তৃতীয় পক্ষের কুরূপা স্ত্রী নির্মলার কৌতুককর দাম্পত্য কলহ দিয়ে কাহিনীর সূত্রপাত করা হয়েছে। নির্মলার বাপের বাড়ি যাত্রার পর থেকে কাহিনীর গতি দ্বিমুখী হয়েছে। স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে বিরহের জ্বালায় গোবিন্দ ক্রমশ স্থূলকায় হয়ে উঠেছিলেন। ভায়রাভাই ইন্দুভূষণের প্ররোচনা ও রূপসী শ্যালিকার জন্য ফটো তোলার আগ্রহের মধ্যে স্থূলবুদ্ধি গোবিন্দের চরিত্রের কৌতুককর অসঙ্গতি হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। ইন্দুভূষণ ও চপলার ষড়যন্ত্রই কাহিনীটির মধ্যে গতিসঞ্চার করেছে। স্ত্রীর পুরাতন বন্ধু শরৎ হালদারের ছবি গোবিন্দকে সন্দেহাতুর করে তুলেছে। ভৃত্য রামকান্তকে নিজের পুনর্বিবাহের মিথ্যা খবর দিয়ে গোবিন্দ সুকৌশলে কাজ হাসিল করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চপলার কাছে সব শুধু ধরাই পড়ে নি, উলটে চপলাই পুরুষবেশ ধরে এমন করে তাঁকে ঠকিয়েছে যে এক প্রবল হাস্যাবেগের মধ্যে কাহিনীর মিলন-মধুর উপসংহার ঘটেছে।

নাট্যকার 'বিরহ' প্রহসনটি উৎসর্গ করেছেন রবীন্দ্রনাথকে। উৎসর্গপত্রে তিনি প্রহসনটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন : "আমার এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য —অল্লায়তনের মধ্যে বিরহের হাস্যকর অংশটুক দেখানো।" কিন্তু নাট্যকার তাঁর এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন নি। বিরহের রোমান্টিক স্বরূপের মধ্যে হাস্যকর অসঙ্গতি আবিষ্কৃত হলেও, সমগ্র প্রহসনের পক্ষে উক্ত অংশ নিতান্তই গৌণ হয়ে উঠেছে। স্ত্রী-চরিত্র সম্পর্কে গোবিন্দের মনে অমূলক সন্দেহ থেকে আরম্ভ করে হৃদয়নাথ চৌধুরী-বেশী চপলার আবির্ভাব পর্যন্ত ঘটনার মধ্যে বিরহের কোনো হাস্যজনক অংশ দেখানো হয় নি। একটি

অমূলক সন্দেহ দূর করে গোবিন্দ ও তার স্ত্রীর মধ্যে মিলন ঘটিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টার মধ্যেই যেন প্রহসন-রচয়িতার সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়েছে—লেখকের মূল উদ্দেশ্য চাপা পড়েছে। তা ছাড়া আর একটি কারণও আছে। রামকান্ত ও গোলাপীর উপকাহিনীকে এত বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যে, সেখানেও নাট্যকারের আসল উদ্দেশ্য ফুটে উঠতে পারে নি। নাট্যকারের অভিপ্রায়কে গৌণ করে প্রহসনের শেষদিকে উপকাহিনীর বৈচিত্র্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এই দিক থেকে বিচার করলে 'বিরহ' নামকরণটি খুব বেশী যুক্তিযুক্ত হয়েছে বলে মনে হয় না। বোকামিতে চালাকিতে মেশানো রামকান্তের চরিত্রটি ভালো ফুটেছে। প্রহসনটির দৃশ্যসংস্থানের মধ্যে স্থানগত বৈচিত্র্য আছে—কৃষ্ণনগরে গোবিন্দের বাড়ি, হাঁসখালিতে চূর্ণীনদীর একটি নিভৃত ঘাট, হুগলীর একটি ঘাটের সমীপবর্তী পানের দোকান, হুগলীর নীলরতন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি প্রভৃতি চারটি দৃশ্যান্তর আছে। প্লটকে অপেক্ষাকৃত জটিল করাব জন্যই লেখক দৃশ্যবৈচিত্র্যের অবতারণা করেছেন। নীলরতন চট্টোপাধ্যায়ের অন্তঃপুরিকাদের তাসখেলার দৃশ্যটি সম্ভবত 'একেই কি বলে সভ্যতা'-র অনুরূপ দৃশ্যটি থেকে কল্পিত হয়েছে। প্রহসনটির গানগুলিই কৌতুকরসকে জমিয়ে তুলেছে—'হাসির গানে'র কয়েকটি বিখ্যাত গান এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। 'এস এস বধূ এস'-র মতো কীর্তনের প্যারডি রচনা করে নাট্যকার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

॥ ৩ ॥

'ত্র্যহস্পর্শ' বা 'সুখী পরিবার' (১৯০০) প্রহসনটি কোনো দিক থেকেই সার্থক হতে পারে নি। এই প্রহসনটি হাস্যরসিক দ্বিজেন্দ্রলালের খ্যাতিকে ক্ষুণ্ণই করেছে। হাস্যরসের মধ্যে কোনো শালীনতা বা সংযম নেই। বাংলা প্রহসনের "অশ্লীলতা ও কুরুচি" দেখে দ্বিজেন্দ্রলাল এর মোড় ফেরাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যে সর্বত্র তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন নি, তার একটি বড় প্রমাণ 'ত্র্যহস্পর্শ' প্রহসনটি। স্থূল রসিকতা ও "নিম্নস্তরের ভাঁড়ামি" তাঁর প্রহসনটিকে একখানি 'Low Comedy'-তে পরিণত করেছে। লঘুরসই প্রহসনের উপজীব্য। কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা, বাক্‌চাতুর্য ও ব্যঙ্গ-

কৌতুকের সরস পরিবেশনই প্রহসনকে জমিয়ে রাখে। কিন্তু রসিকতারও একটি মাত্রাজ্ঞান থাকা উচিত। সংযম যে কোন আর্টেরই বড় লক্ষণ। রসের অসংযম প্রহসনের মতো লঘুরসাত্মক নাটিকার পক্ষেও অসহ্য। 'ত্র্যহস্পর্শ' প্রহসনটিতে সেই শিল্পবিরোধী রসের অসংযমই দেখা দিয়েছে।

রাজা বিজয়গোপাল, তাঁর মধ্যমপুত্র আনন্দগোপাল ও পৌত্র (জ্যেষ্ঠ পুত্রের পুত্র) কিশোরগোপাল এই তিনজন মিলে ত্র্যহস্পর্শের সৃষ্টি করেছে। 'ত্র্যহস্পর্শে'র কেন্দ্রীয় বিষয় হল একটি বিবাহ-বিভ্রাট কাহিনী। বৃদ্ধবয়সে বিজয়গোপালের বিবাহলিপ্সা, পুত্র আনন্দগোপালের সঙ্গে কৌতুককর সংঘর্ষ, রানীর মিথ্যা মৃত্যুরটনা, বিবাহবাসরে একাধিকবার পাত্রের পরিবর্তন, পিতা-পুত্রের বিবাদ মীমাংসার মুহূর্তেই পিতামহ ও পিতৃব্যের ঈপ্সিত পাত্রীর কিশোরের কণ্ঠে মাল্যদান প্রভৃতি কাহিনী দ্রুতগতিতে ও অবিশ্বাস্তকর ঘটনাসংস্থানের মধ্য দিয়ে একটি মিলনমধুর পরিণতি লাভ করেছে। ভূদেব, শ্যামল ও তার সহচরবর্গ মিলে কাহিনীর একটি সংক্ষিপ্ত উপকাহিনী রচনা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যপ্রতিভার একটি প্রধান দুর্বলতা হল কাহিনীবিন্যাসের শিথিলতা ও অনিবার্যতার অভাব। 'ত্র্যহস্পর্শে'ও এ দুর্বলতা আছে। সংলাপসৃষ্টিতে দীনবন্ধু ও অমৃতলাল যে বাক্যকুশলতা দেখিয়েছেন, দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষে তাও ছিল অনায়ত্ত। 'ত্র্যহস্পর্শে' যে জাতীয় কাহিনীর অবতারণা করেছেন, তা বাংলা প্রহসনের ইতিহাসে অজ্ঞাত নয়। বৃদ্ধ বয়সে বিয়ে করতে গিয়ে বিভ্রাট—বাংলা প্রহসনের একটি অতি পরিচিত কথাবস্তু। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল অনুচিত রসিকতা ও স্থূল ঠাট্টা-ইয়ারকি দিয়ে ঘটনাটিকে ভরে তুলেছেন। একই পাত্রী নিয়ে পিতা-পুত্রের হাতাহাতি, ভূদেব ডাক্তারের রানী সম্পর্কে কুৎসিত রসিকতা, পিতা-মাসী-পিসী নিয়ে রুচিবিগর্হিত পরিহাস (যাদব। নয়ত কি, তোমার বিশ্বাস উনি একটা মাসি পিসি বিয়ে কর্ত্তে চান?) রসচেতনা আহত করে। কোনো সমালোচক ডাক্তার ভূদেব চরিত্রটির প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অলীকবাবুর উল্লেখ করেছেন।[১৩] কিন্তু রস ও রুচির দিক দিয়ে এই দুটি চরিত্র বিপরীতমুখ বললেও অত্যুক্তি হয় না। অলীকবাবুর হাস্যরস সংযম, শালীনতা

১৩। বাংলা নাটকের ইতিহাস : অজিতকুমার ঘোষ, পৃঃ ২০৪।

ও মার্জিতরুচির উপর প্রতিষ্ঠিত, অপরপক্ষে ডাক্তার ভূদেবের হাস্যরসকে কষ্টকল্পিত ভাঁড়ামি বলে মনে হয়।[১৪] এই অক্ষম রচনাটির মধ্যে "পারত জন্ম না কেউ বিষ্যুৎবারের বারবেলা," "হতে পার্তাম আমি মস্ত একটা বীর" প্রভৃতি বিখ্যাত হাসির গানগুলিই একমাত্র সম্পদ।

'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০২) 'বহুৎ আচ্ছা' নামে ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত হয়। 'প্রায়শ্চিত্ত' সমাজবিদ্রূপমূলক প্রহসন। প্রহসনটির উৎসর্গপত্র থেকেই বিষয়বস্তুটিও জানা যায়। বাল্যবন্ধু ব্যারিস্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরীকে গ্রন্থোৎসর্গকালে তিনি লিখেছিলেন: "বিলাতফের্তা সমাজে যে অর্থলোলুপতা, কৃত্রিমতা ও বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে—তাহা তোমাকে স্পর্শ করে নাই"। বিলাতফেরত সমাজের 'অর্থলোলুপতা, কৃত্রিমতা ও বিলাসিতা'-র চিত্র আঁকাই প্রহসনটির উদ্দেশ্য। প্রহসনটির মধ্যে তিনটি কাহিনী গ্রথিত হয়েছে—নব্যহিন্দুগণ ও তাঁদের স্ত্রীদের কাহিনী, ইন্দুমতী, সরোজিনী ও বিনোদবিহারীর কাহিনী ও চম্পাটিসাহেবের কাহিনী। বিলাতফেরত সম্প্রদায়ের আচার-আচরণের আতিশয্য, নব্যহিন্দুদের স্ত্রীশিক্ষা দেওয়ার উৎকট প্রচেষ্টা ও শিক্ষিতা মহিলাদের শিক্ষার নামে কুশিক্ষাকে এখানে ব্যঙ্গ করা করা হয়েছে।

বিলাতফেরত চম্পটি ও নব্যহিন্দুদের উৎকট সাহেবিয়ানার সঙ্গে ইন্দুমতীর বিবাহ ব্যাপারটিকে যুক্ত করে কাহিনীর মধ্যে জটিলতার সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থলিপ্সু, হীনচরিত্র ও ব্যর্থ ব্যারিস্টার চম্পটির সঙ্গে রেবেকার বিবাহ বিচ্ছেদ ও ধনী বিধবা ইন্দুমতীর উৎকট রোমান্সগ্রস্ততাকে সমভাবেই ব্যঙ্গ করা হয়েছে। বিনোদবিহারী ও সরোজিনীর মিলিত ষড়যন্ত্রই চম্পটি এবং ইন্দুমতীকে শিক্ষা দিয়েছে। উগ্র সাহেবিয়ানার পরিণাম দেখানো হয়েছে—নব্যহিন্দু ও তাঁদের স্ত্রীদের মত পরিবর্তন হয়েছে। শেষ দৃশ্যে দেখা যায় যে চম্পটি একেবারে খাঁটি বাঙালীতে পরিণত হয়েছে—তার হাতে এক হুঁকো।

১৪। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনী ও সাহিত্য আলোচনা করতে গিয়ে যাঁরা তাঁর অবিমিশ্র প্রশস্তি রচনাই করেছেন, তাঁদেরও একজন এই প্রহসনটি সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য না করে পারেন নি—"এই প্রহসনের ঘটনাপরম্পরা হাস্যোদ্দীপক হইলেও এবং তাহাতে নীতিশিক্ষার উপাদান থাকিলেও এই পুস্তকের হাস্যরস নির্দোষ বলা যায় না এবং এই পুস্তকে দ্বিজেন্দ্রলালের অনাবিল ব্যঙ্গের সুনাম রক্ষিত হয় নাই।...দ্বিজেন্দ্রলাল এই পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ সঙ্কল্প ত্যাগ করেন।"—দ্বিজেন্দ্রলাল: নবকৃষ্ণ ঘোষ, পৃঃ ৭১-৭২।

তর্কপঞ্চানন তাঁকে 'গোময় ভক্ষণ' করে প্রায়শ্চিত্ত করার নির্দেশ দিচ্ছেন। নাটকের শেষদিকে পরিবর্তিত চম্পটির মুখ দিয়ে লেখক বলিয়েছেন : "দেখছি যে বিলিতি চালের চেয়ে বাঙ্গালীর পক্ষে দেশী চালই বহুৎ আচ্ছা ; বাঙ্গালীর বাঙ্গালিয়ানাই বহুত আচ্ছা।" কিন্তু চম্পটির এই পরিবর্তনকে নিতান্ত আকস্মিক বলে মনে হয়। দ্বিতীয় অঙ্ক ষষ্ঠ দৃশ্যে চম্পটি যখন ইন্দুমতীকে পরিত্যাগ করেছেন, তখন তাঁর কথার মধ্যে আর যে পরিচয়ই থাকুক না কেন, অন্তত বাঙালী হওয়ার কোন আকাঙ্ক্ষাই দেখা যায় নি। চম্পটির এই পরিবর্তনের কারণগুলি সুস্পষ্ট করে তুললে উপসংহারটি আরও সঙ্গত হতে পারত। দ্বিতীয়ত, প্রেম-ও বিবাহ-সম্পর্কিত মাত্রাতিরিক্ত রোমান্সকেও কটাক্ষ করা হয়েছে। চম্পটির উক্তি থেকেই এ ব্যাপারটি পরিস্ফুট হয়েছে : "আমি দু'বার বিয়ে করেছি- -একবার প্রেমের জন্যে, একবার টাকার জন্যে, দুবার ঠকেছি। Logically দাঁড়াচ্ছে যে বিয়ে করাটাই mistake"। ইন্দুমতীর প্রেমোন্মাদনাকেও অতিরিক্ত রং ফলিয়ে পরিহাস করা হয়েছে। ইন্দুমতীর উৎকট আচরণ ও উক্তি প্রবল হাস্যাবেগ সঞ্চার করে : "চম্পটি! চম্পটি! চম্পটি—? [মুখ ঢাকিয়া]—আহা কি মধুর নাম। চেহারার উপযুক্ত নামই বটে। · আর গলার আওয়াজ ঠিক যেন—একেবারে চটি জুতো। আর নাক! আঃ কি নাক!—চম্পটি হে, তোমার পোষাক ভালো, নাম ভালো, গলার স্বর ভালো—কিন্তু সবচেয়ে ভালো তোমার নাকটা।" (২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)

শিক্ষিতা রোমান্সগ্রস্তা নায়িকার চরিত্রের কৌতুককর অসঙ্গতি অমৃতলালের প্রহসনগুলির প্রভাবজাত বলে মনে হয়। তবে অমৃতলালের রচনায় বিদ্রূপের ঝাঁজ অনেক বেশী। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা সম্পর্কে যে সমস্ত চিত্র ও চরিত্র আছে, তার সর্বত্রই রংফলানো। উমেশ ও তাঁর শিক্ষিতা স্ত্রীর আচার-আচরণ অসম্ভব ও বিসদৃশ। হাস্যরসের মূলে থাকে অসঙ্গতি—কিন্তু সেই অসঙ্গতিকেও যত বেশী সম্ভাব্যতার সীমার মধ্যে ফোটানো যায়, হাস্যরস তত বেশী সার্থক। অসঙ্গতি যদি সম্ভাব্যতার সীমা লঙ্ঘন করে, তা হলে হাস্যরস জমে ওঠার পক্ষে বাধা ঘটে। দ্বিতীয় অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যের শেষে 'ইন্দুমতীর গাইতে গাইতে প্রস্থান'—নিতান্ত অর্থহীন। কারণ ঠিক তার আগেই সে চম্পটির কাছ থেকে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে—গান গাওয়ার মতো মানসিক অবস্থা থাকা সম্ভব নয়। বিনোদবিহারীর চরিত্রটি ভালো ফুটতে

পারে নি। পূর্ববঙ্গের ভাষা ব্যবহারের সার্থকতা আছে বলে মনে হয় না—তা ছাড়া এই ভাষার প্রয়োগও সুষ্ঠু হয় নি।

'প্রায়শ্চিত্ত' প্রহসনের ভূমিকা পড়ে মনে হয় নিজের এই সৃষ্টি সম্পর্কে নাট্যকারের একটি উচ্চ ধারণা ছিল। তিনি লিখেছেন: "অনেকে এই পুস্তকখানিকে প্রহসনরূপে অভিহিত করেন। আমার বিবেচনায় সেটি একান্ত ভ্রম। হাস্যবহুল নাটকমাত্রেই যদি প্রহসন হইত তাহা হইলে Moliere-এর Comedy-গুলিও প্রহসন।" লেখকের এই উক্তি থেকে মনে হয় যে তাঁর মতে 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রহসন নয়, কমেডি। শুধু তাই নয়, তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কমেডি-রচয়িতা মোলিয়েরের প্রসঙ্গও উত্থাপন করেছেন। শেক্সপীয়র ও মোলিয়ের, পৃথিবীর নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে দুই কীর্তিভাস্বর গৌরবশৃঙ্গ। এই দুজন নাট্যকারের মৌলিকত্ব ও জীবনবোধের গভীরতা বিস্ময়কর—তাই শেক্সপীয়র বা মোলিয়ের, কারও অনুকরণ সম্ভব নয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে ইংরেজি নাট্যসাহিত্যে মোলিয়েরকে অনুসরণ করার একটা গোষ্ঠীবদ্ধ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু 'রেস্টোরেশন যুগে'র এই লেখকদের প্রচেষ্টা শুধু মোলিয়েরের রচনাগুলির ব্যর্থ অনুকরণেই পর্যবসিত হয়েছিল।[১৫] মোলিয়েরের 'জীবনবোধের সার্বভৌম গভীরতা' তাঁর রচনাগুলিকে তথাকথিত লঘুরসের প্রহসনেই পরিণত করে নি, উচ্চাঙ্গের কমেডিতে পরিণত করেছে।[১৬] কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের 'প্রায়শ্চিত্ত' সম্পর্কে এ বিচার প্রযোজ্য নয়। মোলিয়েরের আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হলেও তার রচনাটি আসলে একটি প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যান্য প্রহসনের মতো এখানেও কয়েকটি হাসির গান

১৫। "That the fine qualities of Molie're, his verse, his buoyancy, ease and success of plot, and sure characterisation, escaped his English imitators is not to be denied; for apart from the circumstance that few of them were men of mediocre parts, the genius of Molie're towers above the imitation of any age."—The Cambridge History of English Literature Vol. VIII. (1934), Page 133.

১৬। "It is comparatively easy to attain those broad farcical effects which fill the groundlings with hilarity. But true comedy is a difficult business, harder even than tragedy, because in art as in life, laughter is so perilously akin to tears....This Molie're achieved. He does more than reflect life, he interprets its hidden significance." Molie're's Comedies. Vol. I (Everyman's Library)—Introduction by F. C. Green. Page XII-XIII.

ব্যবহৃত হয়েছে। স্থান-কাল-পাত্রপাত্রীর সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে গানগুলির আবেদন আরও উপভোগ্য হয়েছে। "আমরা বিলেতফের্তা ক'ভাই," "নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো," "কটি নবকুলকামিনী," "চম্পটির দল আমরা সবে" প্রভৃতি গানগুলি প্রহসনটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনগুলির প্রাণ এই হাসির গানগুলি। কিন্তু 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রহসনেই এই গানগুলি সবচেয়ে বেশী সুপ্রযুক্ত ও কার্যকরী হয়েছে।

॥ ৪ ॥

'প্রায়শ্চিত্ত' রচনার প্রায় দীর্ঘ ন বৎসরের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল আর কোনো প্রহসন রচনা করেন নি—এই সময়ে প্রধানত তিনি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। দীর্ঘ ন বছর পর 'পুনর্জন্ম' প্রহসনটি (১৯১১) প্রকাশিত হয়। এই ক্ষুদ্রকলেবর প্রহসনটিকে দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ প্রহসন বলা যায়। লেখক এই প্রহসনটির জন্য ডীন সুইফটের একটি কাহিনীর কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। নাট্যকার প্রহসনটি সম্পর্কে নীতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন: "প্রহসনের মর্ম যদি কেহ জানিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি যেন একটু চিন্তা করিয়া দেখেন। ইহাতে নীতিকথার অভাব নাই।"—কিন্তু একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে। শিল্পী সচেতনভাবে নীতিকথা প্রচার করেন না—উচ্চতর নীতিকে তিনি রসের ছলেই পরিবেশন করেন। মোলিয়েরের প্রহসনের মধ্যে সামাজিক দুর্নীতিকে কশাঘাত করা হয়েছে—তাঁর রোমান্টিকতাবিরোধী বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি সমাজ-জীবনের নানা অসঙ্গতিকে অভ্রান্ত বিশ্লেষণে ফুটিয়ে তুলেছে—কিন্তু কোথাও নীতিবাদী বা সংস্কারকের উগ্র প্রচারধর্মিতা নেই। চরিত্রচিত্রণের নৈপুণ্যে ও ঘটনাসংস্থানকৌশলেই তিনি তাঁর অভিপ্রায়কে সার্থক করেছেন।

'পুনর্জন্ম' প্রহসনে এক কৃপণ, নির্মম ও স্বার্থপর সুদখোরের হাস্যকর পরিণতি দেখানো হয়েছে। যাদব চক্রবর্তী সুদের টাকা ধার দিয়ে 'মহাজনীর নামে রাহাজানি' করে, দ্বিতীয় পক্ষের 'সুন্দরী শিক্ষিতা স্ত্রীকে' পর্যন্ত পেট ভরে খেতে দেয় না। পয়সা খরচ হবে বলে দুটি ছেলেকে পর্যন্ত শিক্ষা দেয় না। ঘটনাচক্রের প্রভাবে যাদব চক্রবর্তীর পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। কিন্তু

নাটকার তাঁর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়কে সুকৌশলে পরিবেশন করেছেন। যাদব চক্রবর্তীর যে শিক্ষা হয়েছে তা সে নিজের মুখেই বলেছে : "এ আমার পুনর্জন্ম! আজ নূতন বিশ্বাস নিয়ে আবার বেঁচে উঠেছি। মৃত্যুর পরে যা যা ঘটবে আজ চক্ষের সম্মুখে তার অভিনয় দেখলাম।" 'পুনর্জন্মে' একটি নীতি আছে বটে, কিন্তু সে নীতির জন্য আর্ট বিকৃত হয় নি। স্ত্রী-পুত্রকে কষ্ট দিয়ে ও আত্মীয়-পরিজনকে আহত করে ধন সঞ্চয়ের ব্যর্থতা যাদব চক্রবর্তী উপলব্ধি করেছে।

'পুনর্জন্ম' নির্দোষ কৌতুকরস কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। যাদব চরিত্রের এমন একটি রন্ধ্রপথকে নাট্যকার সুকৌশলে অবতারণা করেছেন, যার ফাঁক দিয়ে অনায়াসে কৌতুকরসের প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হয়েছে। যাদব চক্রবর্তী কোষ্ঠী বিশ্বাস করে। তার বৈষয়িক বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, কিন্তু কোষ্ঠীর উপরও তার বিশ্বাস অগাধ। তাই 'দোসরা বৈশাখ দিবা দ্বিপ্রহরে তার নিজের বাড়ীতেই সর্পাঘাতে মৃত্যু হবে'—কোষ্ঠীর এই নির্দেশকে সে অভ্রান্তভাবে স্বীকার করেছে। তাই বাড়িতে যাতে সর্পাঘাত না হয় এইজন্য সেদিন দ্বিপ্রহর পর্যন্ত মল্লিকপুকুরে একগলা জলের মধ্যে চুপ করে বসে ছিল। নাট্যকার যাদবের এই দুর্বলতাকে যথোচিত সদ্ব্যবহার করেছেন। তারপর সেই দুর্বলতাকে কেন্দ্র করে সুকৌশলে ঘটনাকে সাজিয়েছেন। হাস্যরসের মূলে কিছু অসঙ্গতি থাকবেই। সকলে মিলে যখন তাকে জাল যাদব চক্রবর্তী প্রমাণ করেছে, তখনও সে কোষ্ঠীর কথা অবিশ্বাস করতে পারে নি।[১৭] ভগ্নীপতি অশ্বিনীর নেতৃত্বে যাদবকে জাল প্রমাণ করার যে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে, তার কৌতুককর পরিস্থিতি হাস্যরস উদ্রেক করে।[১৮]

১৭। অশ্বিনী। এই কোষ্ঠী আপনার সর্বনাশ করেছে। কোষ্ঠী কখন মিথ্যা হয়?—আপনিই বলুন।

যাদব। তা হয় না বটে।

১৮। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য : "আমাদের অন্তরে বাহিরে একটি সুযুক্তিসংগত নিয়মশৃঙ্খলার আধিপত্য, সমস্তই চিরাভ্যস্ত চিরপ্রত্যাশিত; এই সুনিয়মিত যুক্তিরাজ্যের সমভূমিমধ্যে যখন আমাদের চিত্ত অবাধে প্রবাহিত হইতে থাকে তখন তাহাকে বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারি না—ইতিমধ্যে হঠাৎ সেই চারিদিকের যথাযোগ্যতা ও যথাপরিমিততার মধ্যে যদি একটা অসংগত ব্যাপারের অবতারণা হয় তবে আমাদের চিত্তপ্রবাহ অকস্মাৎ বাধা পাইয়া দুর্নিবার হাস্যতরঙ্গে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে।" কৌতুকহাস্য : পঞ্চভূত।

দশচক্রে যাদব চক্রবর্তী যে নকল, তাই প্রমাণিত হয়েছে। অশ্বিনীর কাছ থেকে খাতকেরা যখন সুদমাপের আশ্বাস পেয়ে চলে গেল, তখন যাদব আর স্থির থাকতে পারে নি। যে টাকা তার কাছে প্রাণাধিক প্রিয়, তাই যখন পরহস্তগত হতে চলেছে, তখন যাদব অশ্বিনীর কাছে সাম্নয়ে বলেছে : "অশ্বিনী। ভাই, আমি কিন্তু মরিনি—দোহাই!" তখন এই বিসদৃশ অবস্থায় হাস্যরস সংবরণ করা কঠিন হয়ে ওঠে। নানাভাবে লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে শেষ পর্যন্ত তার শিক্ষা হয়েছে। এমন কি পুলিশের রুলের গুঁতোয় শেষ পর্যন্ত সে যে যাদব চক্রবর্তী নয়, তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। যাদবের মতপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রহসনটির যবনিকা টেনে দিলে ভালো হত, কিন্তু নাট্যকার যাদবের স্ত্রী সৌদামিনী, অশ্বিনী ও যাদবকে নিয়ে কাহিনীকে আর একটু টেনেছেন—উদ্দেশ্য হল যাদবের পরিবর্তন ও শিক্ষাকে ভালোভাবে জানানো। এই অংশটুকু প্রহসনটির অতিরিক্ত অংশ। সম্ভবত "নীতিকথা"-কে আরও বেশী স্পষ্ট করে তোলা নাটকারের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু শিল্পের দিক থেকে এই অংশ বর্জন করলেই সঙ্গত হত। প্রহসনটিতে লেখকের মাত্রাজ্ঞান, সংযম ও অনাবিল হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বশেষ প্রহসন 'আনন্দ-বিদায়' (১৯১২) অতুলকৃষ্ণ মিত্রের (১৮৫৭-১৯১২) 'নন্দবিদায়' (১৮৮৮) নামক গীতিনাট্যের প্যারডি। প্যারডি-খানিতে রবীন্দ্রনাথকে স্পষ্টভাবে ও অনুচিত ভাষায় আক্রমণ করা হয়। কাব্যে অস্পষ্টতা ও কাব্যে নীতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছিল, তারই চূড়ান্ত ও মর্মান্তিক পরিণতি ঘটেছিল 'আনন্দ-বিদায়' প্যারডির মধ্যে। 'কাব্যে নীতি' সম্পর্কিত আলোচনার পর রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে কোনও মসীযুদ্ধ চলে নি। অবশ্য সমর্থকদের মধ্যে কিছুকালব্যাপী বাদানুবাদ চলেছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন বিদেশে তখন দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর 'আনন্দ-বিদায় প্যারডির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত নগ্নভাবে আক্রমণ করেন (এ সম্পর্কে 'রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল' অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে)।

'আনন্দ-বিদায়' উৎসর্গ করা হয়েছে রসরাজ অমৃতলাল বসুকে। ভূমিকায় নাট্যকার কৈফিয়ত দিয়েছেন : "এ নাটিকায় কোন ব্যক্তিগত আক্রমণ নাই। "মি"-র প্রতি আক্রমণ আছে। ন্যাকামি, জ্যেঠামি, ভণ্ডামি ও বোকামি

লইয়া যথেষ্ট ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। যদি কাহারও অন্তর্দাহ হয় তো তাহার জন্য তিনি দায়ী, আমি দায়ী নহি। ··যদি কোন কবি কোনরূপ কাব্যকে অমঙ্গলকর বিবেচনা করেন, তাহা হইলে সেইরূপ কাব্যকে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে চাবকাইয়া দেওয়া তাঁহার কর্তব্য। Browning মহাকবি Wordsworth-কে এইরূপ চাবকাইয়াছিলেন। Wordsworth মহাকবি Shelley ও Byron-কে কশাঘাত করিয়াছিলেন।" লেখকের এই কৈফিয়ত সত্ত্বেও 'আনন্দ-বিদায়' প্যারডিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ এখানে এত স্পষ্ট ও প্রবল হয়ে উঠেছে যে লেখকের কৈফিযত নিতান্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য অশ্লীল প্রমাণ করার জন্য তিনি 'কড়ি ও কোমল'-এর বিখ্যাত কবিতাগুলিকে খাপছাডাভাবে মাঝে মাঝে দু এক চরণ উদ্ধার করেছেন (প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য দ্রষ্টব্য)। তা ছাডা তিনি স্পষ্টভাবেই একাধিকবার রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা'-তত্ত্ব সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের বিরূপতাও উৎকটভাবে প্রকাশিত হযেছে। ("জানো না মা, আমার জীবন-দেবতা আশে-পাশে উঁকি মাছে'ন (প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য)। দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে কাব্যেব অস্পষ্টতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে তীব্রভাবে বিদ্রূপ করা হযেছে:

আমি লিখেছি যে সব কাব্য মানব জাতির জন্যে
নিজেই বুঝি না তার অর্থ বুঝবে কি অন্যে!
আমি যা লিখেছি এবং আজকাল যা লিখছি,
সে সব থেকে মাঝে মাঝে আমিই অনেক শিখছি।

• 'আনন্দ-বিদায়' প্যারডি নাটিকায় দ্বিজেন্দ্রলালের রুচিহীন আক্রমণ এতদূর চরমে উঠেছিল যে তিনি রবীন্দ্রনাথকে নিতান্ত অশোভনভাবে আক্রমণ করতেও কুণ্ঠিত হন নি।[১৯]

ব্যক্তিগত আক্রমণের উগ্রতা বাদ দিলেও শিল্প হিসাবেও 'আনন্দ-বিদায়' অসার্থক। অসংলগ্ন ও বিচ্ছিন্ন দৃশ্যগুলিব মধ্যে কোন নাটকীয ঐক্য ও

১৯। মালতী। সকলি সম্ভবে কলিকালে—
ভূমিশূন্য রাজা, বিদ্যা-বিহীন হাকিম,
নিরক্ষর কাব্যবিশারদ,
বিষয়ী মহর্ষি। (১ম অঙ্ক; ৪র্থ দৃশ্য)

অনিবার্যতা নেই। এ যেন ব্যঙ্গের জন্যই ব্যঙ্গ করা। নব্যহিন্দুধর্মবাদী ও ব্রাহ্মদের প্রসঙ্গও নাট্যকার উল্লেখ করেছেন। নাটকখানি 'স্টার' থিয়েটারে অভিনীত হয় (১লা পৌষ, ১৩১৯)। কিন্তু সেদিনের দর্শকসাধারণ এই বীভৎস ব্যক্তিগত আক্রমণ সহ্য করতে পারেন নি—এমন কি নাট্যকারও রঙ্গালয় ত্যাগ করতে বাধ্য হন। প্যারডির কাজ হল ব্যঙ্গাত্মক অনুকৃতির ভিতর দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করা। সেখানে দর্শন, বিজ্ঞান, সুনীতি, সুরুচি প্রভৃতি গুরু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে গেলে তার প্রাণশক্তিই নষ্ট হয়—কারণ প্যারডির দর্শকেরা এ জাতীয় গুরুভোজনের জন্য প্রস্তুত থাকেন না। তা ছাড়া হাস্যরস স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত না হলে রসচেতনাকে পীড়িতই করে। 'আনন্দ-বিদায়' প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

"দ্বিজেন্দ্রবাবু বলেছেন যে কাব্যে বিদ্রূপের হাসিরও ন্যায্য স্থান আছে, সেকথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু উপহাস জিনিসটের প্রাণই হচ্ছে হাসি। হাসি বাদ দিলে তার উপ টুকু থাকে, কিন্তু তার রূপটুকু থাকে না। হাসতে হলেই আমরা অল্পবিস্তর দন্ত বিকাশ করতে বাধ্য হই। কিন্তু দন্তবিকাশ করলেই যে সে ব্যাপারটা হাসি হয়ে ওঠে তা নয়, দাঁত খিঁচুনি বলেও পৃথিবীতে একটি জিনিস আছে—সে ক্রিয়াটি যে হাসি নয়, বরং তার উলটো, জীবজগতে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে।"[২০]

কয়েকটি প্যারডিসঙ্গীত ও হাসির গান ছাড়া 'আনন্দ-বিদায়'-এ উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। মোট কথা, 'আনন্দ-বিদায়' দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিজীবন ও শিল্পী-জীবনের কোনো নূতন প্রতিশ্রুতি বহন করে না।[২১]

২০। সাহিত্যে চাবুক সাহিত্য, ১৩১৯, মাঘ।

২১। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরী যতদূর সম্ভব তাঁর পক্ষ সমর্থন করার চেষ্টা করেছেন, তিনি পর্যন্ত লিখেছেন: "তাঁহার আনন্দ-বিদায় নামক অনুকৃতি কৌতুকে (Parody) তিনি যেন কতকটা অশোভনরূপে ও অন্যায়ভাবে ইহার বিরুদ্ধে ভীষণ আক্রমণ করিয়াছিলেন।"—ভারতবর্ষ: শ্রাবণ, ১৩২২।

॥ ৫ ॥

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনগুলির আগে তাঁর কাব্যগ্রন্থদ্বয়—'আর্যগাথা' প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। কিন্তু 'হাসির গান' রচয়িতা ও প্রহসন রচয়িতা হিসাবেই প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যের আসরে তাঁর খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয। প্রহসন-রচযিতা হিসাবে বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান নির্ণয করতে হলে, তাঁর প্রহসনের স্বরূপ নির্ণয় করাব প্রযোজন। তাঁব প্রহসনগুলির, বিশেষত প্রথম চারখানি প্রহসনের প্রাণ হাসির গানগুলি। এই গানগুলি বাদ দিলে তাঁর এই রচনাগুলির রসমূল্য কতখানি, তাও ভেবে দেখার প্রযোজন আছে। চরিত্রসৃষ্টিতে, সংলাপরচনায বা প্লটবিন্যাসে দ্বিজেন্দ্রলাল তেমন বৈশিষ্ট্য দেখাতে পারেন নি। পূর্ববর্তী প্রহসন-রচযিতাদের মধ্যে অমৃতলাল বসুব প্রভাবই তাঁর উপর সবচেয়ে বেশী পড়েছে। অমৃতলালের বেশীর ভাগ প্রহসনই সমাজবিদ্রূপমূলক —অমৃতলালের বিদ্রূপাত্মক কশাঘাত অত্যন্ত নির্মম। স্যাটাযারের আতিশয্য বিশুদ্ধ হাস্যরসকে অনেক সময়ই ব্যাহত করেছে।[২২] দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনে স্যাটাযার থাকলেও তা অমৃতলালের মতো তীব্র ও মর্মভেদী নয। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনগুলিতে ব্যঙ্গের চেয়ে রঙ্গই অধিকতর পরিস্ফুট হযেছে। প্যারডি রচনায দ্বিজেন্দ্রলাল ও অমৃতলাল দুজনেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কিন্তু অমৃতলালেব প্রহসনগুলিতে বাক্‌চাতুর্য (wit) ও শ্লেষ (pun) সৃষ্টিব সুনিপুণ কৌশল লক্ষ্য করা যায। সংলাপসৃষ্টিতে শব্দালঙ্কাব ও অর্থালঙ্কার প্রযোগের প্রাচুর্য লক্ষিত হয। বুদ্ধিদীপ্ত বাক্‌চাতুর্যে ও তীক্ষ্ণচূড এপিগ্রামেব সিদ্ধপ্রযোগে অমৃতলাল কৃতিত্ব দেখিযেছেন। অবশ্য তাঁর এই বাগবৈদগ্ধ্য জীবনেব গভীর তলদেশ থেকে উৎসারিত হয নি। দ্বিজেন্দ্রলালেব প্রহসনগুলির সংলাপের মধ্যে অমৃতলাল-সুলভ বাগবৈদগ্ধ্য নেই। বরং অনেক জায়গায হাস্যরস কষ্টকল্পিত ও আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে। পূর্ববর্তী আর একজন নাট্যকারের প্রহসনের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে—তিনি হলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। কৃপণ ও বিযেপাগলা বুড়োর জব্দ হওয়ার কাহিনী, শিক্ষিতা রোমান্সগ্রস্তা নায়িকার

২২। "The purest of comedy, usually rules satire in any form, out of its province. The appeal of this pure comedy is solely to the laughing force within us.—The Theory of Drama. A. Nicoll. Page 191.

অসঙ্গত আচরণ, ধর্মধ্বজীদের চরিত্রের আড়ালে নৈতিক দুর্বলতা, স্ত্রীস্বাধীনতার প্রতি ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব নিয়ে একাধিক প্রহসন লেখা হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসনেও এর ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু হাস্যরসের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনের সঙ্গে তাঁর প্রহসনের একটি পার্থক্য আছে। এক রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে প্রহসনের ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতো এমন সংযত সুভদ্র হাস্যরসের ব্যবহার অন্য কারও প্রহসনে দেখা যায় না। নির্মম বিদ্রূপ (satire) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ ছিল না। নির্মল সরস কৌতুকহাস্য সৃষ্টিতেই তাঁর সবচেয়ে বেশী অধিকার ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির মধ্যে একটি বেপরোয়া ভাব ছিল— তাই তাঁর হাসি ছিল সরব উচ্চকণ্ঠ—যাকে তিনি বলেছেন "গুম্ফভরা হাসি।" জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাসি এতখানি প্রবল ও উচ্চকণ্ঠ নয়। কৌতুকরস স্মিতহাস্যের রজতরেখায় শুভ্রোজ্জ্বল হয়ে উঠত। তাঁর হাস্যরসের মূলে দ্বিজেন্দ্রলালের মতো হৃদয়াবেগের প্রবলতা ছিল না। কিন্তু শেষোক্ত শ্রেণীর হাসির একটি মারাত্মক ত্রুটিও আছে। হৃদয়াবেগের প্রবলতায় এ হাসি সংযমের শাসনকেও অনেক সময় অস্বীকার করে। বস্তুত, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনে এ ধরনের অসংযমের অভাব নেই।

পাশ্চাত্ত্য সমালোচকেরা কমেডিকে সাধারণভাবে তিনভাগে ভাগ করেছেন: সমালোচনাত্মক বা বিদ্রূপাত্মক কমেডি (Critical comedy), বিশুদ্ধ কমেডি ('Free' comedy) ও উচ্চাঙ্গ কমেডি (Great comedy)। দ্বিজেন্দ্রলালের সমালোচনাত্মক প্রহসনগুলিতে কোনও বিশেষ ধর্ম বা সম্প্রদায়ের উপর পক্ষপাতিত্ব ছিল না। তাঁর প্রহসন ও হাসির গানগুলিকে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে তিনি রক্ষণশীল সম্প্রদায় ও নব্যপন্থী উভয় দলকে নিয়েই সমভাবে ব্যঙ্গ-কৌতুক করেছেন। গিরিশচন্দ্রের ও অমৃতলালের প্রধানত সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতিই প্রীতি-পক্ষপাত ছিল। বিশুদ্ধ প্রহসনের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল প্লটকে তেমনভাবে জমিয়ে তুলতে পারেন নি। একমাত্র 'পুনর্জন্ম' প্রহসনখানিতেই বিশুদ্ধ প্রহসনের আদর্শ রক্ষিত হয়েছে—কারণ এখানে কোন উপকাহিনী নেই, দৃশ্যবিভাগেরও কোনো বৈচিত্র্য নেই। একই বাড়ির বিভিন্ন অংশে ঘটনাগুলি সংঘটিত হয়েছে, এতে স্থান পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু যেখানে এক বা একাধিক উপকাহিনী বিন্যস্ত

করার প্রয়োজন হয়েছে, সেখানেই নাট্যকারের গ্রন্থনশৈথিল্যই প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসন সম্পর্কে কোনো উচ্চাঙ্গ কমেডির প্রসঙ্গ তোলা সঙ্গত নয়। ইংরেজি সাহিত্যে শেক্সপীয়ারের কমেডি, এবং বেন জনসনের দু-একটি কমেডি বাদ দিলে গভীরাশ্রয়ী জীবনবোধ অন্য কোনো কমেডিতে ফুটে উঠতে পারে নি। মোলিয়েরের মতো অসাধারণ কমেডি-রচয়িতা পৃথিবীতে আর জন্মগ্রহণ করেন নি। হাস্যরসাত্মক চরিত্র ও কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার মধ্যে জীবনের চিরন্তন সত্যকে ফুটিয়ে তোলা প্রথম শ্রেণীর শিল্পীব পক্ষেও এক দুর্লভ অধিকাব। বাংলা প্রহসনের ইতিহাসে তাই শেক্সপীয়র বা মোলিয়েরের গভীরাশ্রয়ী জীবনবোধ প্রত্যাশা করা সঙ্গত হবে না। একমাত্র দীনবন্ধু মিত্র তাঁর নিমচাঁদ চরিত্র অঙ্কনে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রহসন-জাতীয় লঘুরসেব রচনায় মানবজীবনের চিরন্তন পরিচয় ফুটে ওঠার অবকাশ অত্যন্ত কম। কিন্তু দীনবন্ধু আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টিব সাহায্যে নিমচাঁদের মধ্যে বিষামৃতময় জীবনরহস্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর নীতিজ্ঞানহীন, সুরাসক্ত ইয়ং বেঙ্গলের সমাজ-চিত্রণের মধ্যে নিমচাঁদ চরিত্রেব যে চিরস্থায়ী আবেদন আছে, তাই 'সধবার একাদশী'কে উচ্চতর কমেডির মহিমা দিয়েছে। হিউমার-জাতীয় হাস্যরসের স্নিগ্ধকরুণ রূপ দীনবন্ধুর প্রহসনকেও উচ্চতর কমেডিব পর্যায়ভুক্ত করেছে।[২৩]

দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গান' ও প্রহসনগুলি আলোচনা করলে তাঁর হাস্যরসসৃষ্টির ক্ষমতা অস্বীকাব কবা যায় না। কিন্তু হাসির গান রচনায় তিনি যেমন সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত হাস্যরস সৃষ্টিতে সার্থক হয়েছেন, প্রহসন রচনায় তেমন সার্থক হতে পারেন নি। এর কারণ কি? গীতিকবিতার

২৩। "সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, পাপ পুণ্য—মানুষের শক্তির অহঙ্কার ও অশক্তির দৈন্য—এই রস-কল্পনায় একটি সমান ভাবরসে অভিষিক্ত হইয়া যে রূপ ধারণ করে তাহাতে হাস্যরসের কোন জ্বালা বা আক্রোশ থাকে না; ইহাতে করুণরসের মধ্যেও একটি উদাসীন নির্লিপ্ত হাসির ব্যঞ্জনা নিহিত থাকে। এইজন্য এইরূপ হাস্যরসে যেমন জ্বালা বা আক্রোশ থাকে না, তেমনই ইহা করুণ রসেরও বিরোধী নয়, Farce এর মধ্যেও খাঁটি হিউমারকে প্রায়ই উঁকি দিতে দেখা যায়, সেই সকল স্থানে লঘু হাস্যরসও উৎকৃষ্ট কাব্যরসে পরিণত হয়

—হাস্যরস ও হিউমার: সাহিত্যবিতান: মোহিতলাল মজুমদার।

ক্ষুদ্রকলেবরের মধ্যে তাঁর শিল্পপ্রতিভা অধিকতর সার্থকতা লাভ করেছে, কিন্তু আখ্যায়িকাবিন্যাস, প্লট রচনার কৌশল, চরিত্র ও ঘটনার কৌতুককর অসঙ্গতি উদ্ভাবন তাঁর প্রতিভার সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল না। গীতিকবিতার সংক্ষিপ্ত কলেবরের মধ্যে যে ভাব কেন্দ্রসংহত ও নিটোল হয়ে প্রকাশিত হয়েছে, প্রহসনের ক্ষেত্রে সেই ভাবই বিক্ষিপ্ত ও শিথিল হয়ে রসের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রধানত কৌতুক-কবি, প্রহসন রচনার জন্য যে স্বতন্ত্র প্রতিভার প্রয়োজন, তা তাঁর প্রতিভার খুব অনুকূল ছিল না। এইজন্য প্রহসন-অন্তর্ভুক্ত হাসির গানগুলি বাদ দিলে এক 'পুনর্জন্ম' ছাড়া অন্য সব প্রহসনগুলি নিতান্ত শুষ্ক ও কৌতুকরসবর্জিত বলে মনে হবে। হাসির গানের কবি দ্বিজেন্দ্রলাল মাঝে মাঝে জীবনের গভীর মর্মমূলে প্রবেশ করেছেন, কিন্তু প্রহসন-রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলাল জীবনের উপরিতলের লঘুলীলার কৌতুকতরল রূপটিই দেখেছেন মাত্র। শিল্পীসুলভ আত্মস্থতা ও সংযমের অভাবে তাও সব সময় সার্থক হতে পারে নি।

॥ ৬ ॥

হাস্যরসিক দ্বিজেন্দ্রলালের বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ নির্ণয় করতে হলে তার বিদ্রূপাত্মক কবিতা ও হাসির গানগুলি আলোচনার প্রয়োজন। কারণ এই সমস্ত কবিতা ও গানের মধ্যে হাস্যরসিক দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা চরম স্ফূর্তি লাভ করেছে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরসের কোনো কৌলীন্য ছিল না। ইউরোপীয় নাট্যসাহিত্যেও শেক্সপীয়ারই প্রথম হাস্যরসকে একটি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের অভাব ছিল না, কিন্তু সেখানে স্থূল রসিকতা ও ভাঁড়ামিই প্রাধান্য লাভ করেছিল। ঠাট্টা, গ্রাম্যরসিকতা, স্থূল পরিহাস অনেক সময় উচ্চতর নীতির মূল্যমানকে পর্যন্ত আঘাত করত। স্থূল আদিরসের সঙ্গেই যেন তার একটি বিশেষ 'কুটুম্বিতার সম্পর্ক' গড়ে উঠেছিল।[২৪]

২৪। প্রাক্-বঙ্কিম যুগের হাস্যরসের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "তৎপূর্বে বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসকে অন্য রসের সহিত এক পংক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না। সে নিম্নাসনে বসিয়া গ্রাব্য অশ্রাব্য ভাষায় ভাঁড়ামি করিয়া সভাজনের মনোরঞ্জন করিত।"

—বঙ্কিমচন্দ্র : 'আধুনিক সাহিত্য'।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯) কবিতায় তৎকালীন কলকাতার নাগরিক মানস রূপায়িত হয়েছে। সমকালীন দেশ-কাল ও সমাজজীবনকে তিনি কৌতূহলের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তাঁব রঙ্গপ্রিয়তা ও বিদ্রূপাত্মক মনোভাবের দ্বারা তিনি সেই যুগেব বিভিন্ন প্রবণতাগুলিকে নানাভাবে ভাষ্য করেছিলেন। তার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মূলরস সমাজ-সমালোচনা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। স্ত্রীশিক্ষার কুফল, বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রতিবাদ, অনুকরণ-প্রিয় বাঙালী সমাজের জন্য চিত্তবিক্ষোভ, ধনাঢ্য ব্যক্তিদের ব্যভিচার, নীলকর সাহেবদের অত্যাচার, কৌলীন্যপ্রথা সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব প্রভৃতি দেশ-কালনির্ভর নানা ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় পাওয়া যায়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৭৮৭-১৮৪৮) সমাজ-বিদ্রূপমূলক রচনায়, 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৭), 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' (১৮৬২) প্রভৃতির মধ্যে সংস্কারপ্রবণতাই মুখ্য ছিল। বিশেষ ব্যক্তি, পরিবার বা গোষ্ঠীর কলঙ্কিত কাহিনীগুলিকেই তাঁরা অম্ল মধুর রসায়ন সংযোগে মুখরোচক করে তুলেছেন। নাগরিক জীবনেব ক্লেদপঙ্কিলতা উদ্ঘাটন করাই ছিল এই যুগেব লেখকদের প্রধান উদ্দেশ্য। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনে ও কবিতায় সমকালীন সমাজজীবনেব অসঙ্গতিকে নানাভাবে বিদ্রূপ করা হয়েছে, কিন্তু বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হিসাবে তিনি প্রতি-পক্ষদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বাণে জর্জরিত করেন নি। তিনি রক্ষণশীল সম্প্রদায় ও নব্যপন্থী—উভয় সম্প্রদায়কেই পরিহাস করেছেন। এ যুগের লেখকেরা প্রধানত সমাজ-জীবনের ভাষ্যকার—সমাজ-সমালোচক। কিন্তু দ্বিজেন্দ্র-লালের হাস্যরসের মধ্যে সামাজিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ একটি দিকমাত্র। তিনি সাধারণভাবে (বিশেষ কোনো সমাজ বা সম্প্রদায়ের নয়) মানবচরিত্রের কতকগুলি অন্তর্নিহিত ও মজ্জাগত অসঙ্গতিকে পর্যন্ত চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। প্রেম ও বিবাহসম্পর্কিত অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা, বিদেশ সম্পর্কিত কাল্পনিক মিথ্যা ধারণা, 'আরাম-কেদারা রাজনীতি' (Arm chair Politics) প্রভৃতির হাস্যকর অসঙ্গতিকে ফুটিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এক পৌরুষদীপ্ত বলিষ্ঠ জীবনকে চেয়েছিলেন—তাই যেখানেই তার ব্যতিক্রম দেখেছেন, সেখানেই তাঁর বিদ্রূপপ্রবণতা সচেতন হয়ে উঠেছে। তাই তাঁর বিদ্রূপাত্মক মনোভঙ্গির আড়ালে একটি কঠিন ও অচলপ্রতিষ্ঠ আদর্শনিষ্ঠা

ছিল। সমাজ সংস্কারের মনোভাব থেকে তাঁর এ ধরনের হাস্যরস উদ্ভূত হয় নি। আতিশয্যদোষ থেকে মুক্ত করে তিনি জীবনকে একটি ভারসাম্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।[২৫]

ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-নকশা-প্রহসন সমস্ত কিছুর মূলেই আছে ইংরেজের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের প্রতিক্রিয়া। সম্পূর্ণ বিদেশী একটি জাতির হাব-ভাব, আচার-আচরণ, বিলাস-ব্যসন প্রভৃতি অনুকরণের ফলে বাঙালী জীবনে যে উৎকট অসঙ্গতি দেখা দিয়েছিল, এ যুগের নকশা-প্রহসন-রচয়িতারা তাকেই তীক্ষ্ণ শরক্ষেপের দ্বারা জর্জরিত করাব চেষ্টা করেছেন। এই আতিশয্যরঞ্জিত ভারসাম্যহীন সামাজিক জীবনের সঙ্গে এই যুগের ব্যঙ্গরসিকদেব সম্পর্ককে ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সংক্ষিপ্ত অথচ নিপুণ বিশ্লেষণের সঙ্গে ফুটিয়েছেন : "ইয়ারকি স্ফূর্তির বহু-বিস্তৃত শোভাযাত্রায় মাতাল-মোসাহেব-বাইজী প্রভৃতিব পশ্চাতে ব্যঙ্গ-প্রহসন-রচযিতারাও স্থান গ্রহণ করিলেন। ভোগরসিক অনিবাযভাবে ব্যঙ্গরসিককে আমন্ত্রণ করিল।"[২৬] এই কর্দমাক্ত পরিবেশ ও দুর্নীতিপরায়ণ জীবন-চিত্রণেব মধ্যে একমাত্র নিমে দত্তের মধ্যেই শেক্সপীয়রীয় জীবনরহস্যের কিছু আভাস পাওযা যায়।

দীনবন্ধু (১৮৩০-৭৩) ও বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪) দুজনেই প্রথম শ্রেণীর হিউমারিস্ট। কিন্তু দীনবন্ধুর হাস্যরসের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রেব হাস্যরসেব পার্থক্য বড কম নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'মুচিরাম গুড' চরিত্রেব উপরে দীনবন্ধুব ঘটিরাম ডেপুটির প্রভাব আছে। কিন্তু 'লোকরহস্য' ও 'কমলাকান্তের দপ্তরে' বঙ্কিমচন্দ্র হাস্যরসসৃষ্টির এক স্বতন্ত্র ক্ষেত্র আবিষ্কার করেছিলেন। রূপক, টুকরো গল্প, স্কেচ, প্যারডি প্রভৃতি নানাজাতীয রচনা লোকরহস্যে স্থান পেয়েছে। হাস্যরস এখানে নির্মলরুচি ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির দীপ্তিতে পরিমার্জিত। লোকরহস্যের বঙ্কিম পর্যবেক্ষণচতুর, বিশ্লেষণনিপুণ ও অসঙ্গতির রন্ধ্রপথ

২৫। "Its sets out definitely to correct manners by laughter; it strives to 'cure excess.' This comedy, then, tends to repress eccentricity, exaggeration, any deviation from the normal: it wields the Meredithian 'sword of common sense.'"

—Restoration Comedy. Bonamy Dobre'e, Page 11.

২৬। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সমালোচনা-সাহিত্য ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাদিত।

আবিষ্কারে পারদর্শী। লোকরহস্যের হাস্যরসের আবেদন প্রধানত বুদ্ধির কাছেই। বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরসের মধ্যে অনন্যসাধারণ বৈচিত্র্য ও কল্পনার প্রাচুর্য আছে। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর কোনো কোনো অংশ বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ হিউমার পর্যায়ভুক্ত। উচ্চশ্রেণীর হিউমারের মধ্যে কল্পনা-প্রসারতা ও গীতিকাব্যোচিত মূর্ছনা থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো কোনো হাস্যরস কল্পনাপ্রসারতায় ও সংবেদনশীলতায় শেক্সপীয়ার ও ল্যাম্বের হাস্যরসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। হাস্যরসের সঙ্গে হৃদয়াবেগের উত্তাপ জড়িত হয়ে 'কমলাকান্তের দপ্তর'কে এক উচ্চতর শিল্পকর্মে পরিণত করেছে। দীনবন্ধুর তীক্ষ্ণ বাস্তবদৃষ্টি কোথায়ও আত্মমুগ্ধ ভাবনার বর্ণে রঞ্জিত হয় নি, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরসের মধ্যে কল্পনার একটি বড় অংশ আছে। কমলা-কান্তের মতো কল্পনাপ্রবণ ও ভাবুক বাংলা সাহিত্যে বিরল। দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনায় দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরস গভীরস্পর্শী নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরসের উপাদান অনেক সূক্ষ্ম, তাতে কল্পনার কারুকার্য ও ব্যঞ্জনার আলোছায়ালীলা আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরস এত সূক্ষ্ম নয়—তাঁর হাসি স্পষ্ট, সরব ও প্রাণভরা। এতে অনেক স্থূল উপাদানও আছে, কিন্তু তিনি এই উপাদানগুলিকে প্রাণের প্রচণ্ড আবেগে এমন একটি সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পরূপে পরিণত করেছেন, যা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী পাওয়া যায় না।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সমাজ ও ধর্মজীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হাস্যরসেরও পটপরিবর্তন ঘটে। নব্যহিন্দুধর্মবাদীদের সক্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্র ব্যাখ্যার সাড়া পড়ে যায়। নারীপ্রগতি, স্ত্রীশিক্ষা, পাশ্চাত্ত্য-প্রভাবিত নীতিবিকৃত যুবসম্প্রদায়, ব্রাহ্মধর্ম প্রভৃতি এ যুগের বিদ্রূপাত্মক রচনার প্রধান লক্ষ্যস্থল হয়ে ওঠে। এই শ্রেণীর সাহিত্যিকদের মধ্যে খ্যাততম হলেন "পঞ্চানন্দ" ছদ্মনামধারী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১)। বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত তাঁর হাস্যরসাত্মক সৃষ্টিকে অভিনন্দিত করেছিলেন এবং তাঁর হাস্যরসকে টেকচাঁদ, হুতোম ও দীনবন্ধুর চেয়ে উচ্চ স্থান

২৭। "রহস্যপটুতায়, মনুষ্যচরিত্রের বহুদর্শিতায়, লিপিচাতুর্যে ইনি টেকচাঁদ এবং হুতোমের সমকক্ষ, এবং হুতোম ক্ষমতাশালী হইলেও পরদ্বেষী পরনিন্দক, সুনীতির শত্রু এবং বিশুদ্ধ রুচির সঙ্গে মহাসমরে প্রবৃত্ত। ইন্দ্রনাথবাবু পরদুঃখেকাতর, সুনীতির পরিপোষক এবং তাঁহার গ্রন্থ

দিয়েছিলেন।[২৭] তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভা ছিল না—'পাঁচুঠাকুর' নামক টীকা-টিপ্পনীগুলিই সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের মতো তাঁরও আধ্যাত্মিকা গ্রন্থনের দুর্বলতা ছিল। তাঁর কোনো কোনো নকশা শ্রেণীর রচনায় ও টীকা-টিপ্পনীর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব ছিল। কিন্তু আতিশয্য-দোষ ও মাত্রাজ্ঞানের অভাব তাঁর হাস্যরসকে সর্বত্র রসোত্তীর্ণ হতে দেয় নি। Mock heroic ঢঙে ব্যঙ্গকাব্য রচনার ভিতর দিয়ে সমসাময়িক রাজনীতির অন্তঃসারশূন্য দিককে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। 'গদ্য-পদ্যের জুড়ি হাঁকিয়ে' তিনি দীর্ঘকাল বাঙালীর মনোরঞ্জন করেছিলেন। তিনি নিজের জীবন-সায়াহ্নে বলেছেন : "এমন করে একা মানুষ মন জোগাবে কত।"[২৮] 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (১৮৫৪-১৯০৫) ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগত শিষ্য ছিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্রের রচনায় হাস্যরস অনেক সময় রুচি-বিগর্হিত বীভৎস রসের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু উদ্ভট প্লটরচনার মৌলিকত্বে, চরিত্রগুলির মধ্যে অসঙ্গতির রন্ধ্রপথ আবিষ্কারে ও অতিরঞ্জন-চিত্রণে (Caricature) তিনি শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। নব্যহিন্দুধর্মবাদীদের মতবাদের ধারক ও বাহক ছিল বঙ্গবাসী পত্রিকা। প্রতিপক্ষকে ব্যঙ্গবিদ্রূপের দ্বারা আক্রমণ করাই এ যুগের ব্যঙ্গ বিদ্রূপের উৎসমূল। দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায়ও সমসাময়িক সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আচার-আচরণের প্রতি বিদ্রূপ আছে। কিন্তু তাঁর আক্রমণের মধ্যে পক্ষপাতদুষ্টতা ছিল না। 'বদলে গেল মতটা' কবিতায় তিনি খ্রীষ্টধর্ম, নব্যব্রাহ্ম সম্প্রদায়, নাস্তিকের দল, নবহিন্দুধর্মবাদী, বৈদান্তিক প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে আমাদের দুর্গতির কথা রসিয়ে রসিয়ে বলেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরস ইন্দ্রনাথ বা যোগেন্দ্রচন্দ্রের তুলনায় অনেক বেশী স্নিগ্ধ—মতবাদসম্পর্কিত অতিনিবদ্ধতা না থাকার জন্য তাঁর হাসির মধ্যে বিদ্রূপের ঝাঁঝ অনেক কম। ব্যঙ্গের চেয়ে সরস-কৌতুক পরিহাসের মাত্রাই বেশী। যে কোনো সম্প্রদায়ের

সুরুচির বিরোধী নহে।...তাঁহার গ্রন্থে বঙ্গদর্শনপ্রিয়তার ঈষৎ মধুর হাসি ছত্রে ছত্রে প্রভাসিত আছে। অপাঙ্গে যে চতুরের বক্রদৃষ্টিটুকু পদে পদে লক্ষিত হয় তাহা না হুতোমে, না টেকচাঁদে, দুয়ের একেও নাই।...দীনবন্ধুর মতো তিনি উচ্চহাসি হাসেন না, হুতোমের মত "বেলেল্লাগিরি"তেও প্রবৃত্ত হয়েন না, কিন্তু তিলার্ধ রসের বিরাম নাই।" (বঙ্গদর্শন, পৌষ, ১২৮১)

২৮। পাঁচু ঠাকুর : পঞ্চম কাণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আতিশয্যকেই তিনি পরিহাস করতে কুণ্ঠিত হন নি। কিন্তু ইন্দ্রনাথ বা যোগেন্দ্রচন্দ্র সম্পর্কে ঠিক এ কথা বলা যায় না।[২৯]

॥ ৭ ॥

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রায় সমসাময়িক আর একজন লেখকের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিদ্রূপাত্মক রচনায় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৮৬১-১৯০৭) সেকালে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহভাজন ছিলেন। তিনি ইন্দ্রনাথেব কাছে প্রেরণালাভ করে ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক রচনায় প্রবৃত্ত হন। কেশবচন্দ্রকে কটাক্ষ করে তিনি 'অবতার' (১৮৮১) নামে একটি প্রহসন রচনা করেন। 'শ্রীফকির চাঁদ' ছদ্মনামে তিনি কয়েকটি বিদ্রূপাত্মক রচনা প্রকাশ করেন। 'হিতবাদী'তে 'রুচি-পিকার' ব্যঙ্গকাব্য (১৮৯৭) প্রকাশিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করা হয়। কিন্তু 'মিঠেকড়া' (১৮৮৮) নামক রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের প্যারডিখানিই বর্তমানকালে কালীপ্রসন্নের একমাত্র পরিচয়ের সূত্র। প্যারডিখানির মধ্যে ব্যঙ্গাত্মক অনুকৃতির চেয়ে ব্যক্তিগত আক্রমণের দিকটিই উগ্র হয়ে উঠেছে।[৩০] ব্যক্তিগত জীবনে কালীপ্রসন্ন তেজস্বী ও আদর্শবাদী ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনে তাঁর বিশিষ্ট দানের কথা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন।[৩১] দেশপ্রেমিকতা, আদর্শনিষ্ঠা, বিদ্রূপাত্মক কবিতা ও প্যারডি

২৯। "ইন্দ্রনাথের প্রতিভা সমাজতত্ত্ব ব্যাখ্যানে ও হিন্দু প্রতিষ্ঠা চেষ্টায় সম্যক পরিস্ফুট হইয়াছিল।"—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্য, বৈশাখ, ১৩১৮।

৩০।

একে রবি তায় কবি,
তায় মথুরায় ছবি
তায় প্রাণ খায় খাবি
বাঁশরী বাজে না তায়।

বাজ্ তোর পায়ে পড়ি
বাজ্ রে কোমল কড়ি
কচুবনে গড়াগড়ি
নহিলে যাইবি হায়!
দারুণ দৈবের দোষে
পড়িলাম মথুরায়।

—(মথুরায় : মিঠেকড়া)

৩১। One of the most genial of men, a brilliant B[illegible]galee writer, a poet of no mean order, a composer of songs of exquisite beauty and pathos, which thrilled the audience of our Swadeshi meetinge...

—A Nation in Making : Page 138

রচনা—কাব্যবিশারদের এই বৈশিষ্ট্যগুলি দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যেও ছিল। তা ছাড়া কালীপ্রসন্নও রবীন্দ্রবিরোধী সাহিত্যিক গোষ্ঠীতেই যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর রুচি ও রসিকতার সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের রুচি ও রসিকতার অনেক পার্থক্য ছিল। কাব্যবিশারদের রসিকতা ছিল সেকেলে ধরনের, রসবোধও তেমন পরিমার্জিত ছিল না। অপর পক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্য পরিশীলিত মনের হাস্যজ্যোতির মধ্যে সুমার্জিত শিল্পবোধের অভাব ছিল না। ব্যক্তিগত আক্রমণ ও উদ্দেশ্যমূলক ব্যঙ্গ ছাড়া কালীপ্রসন্নের অন্য কোনো হাস্যরসের উৎস ছিল না. কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসে ছিল বৈচিত্র্য—সশব্দ অট্টহাস্য থেকে চাপা-বিদ্রূপের ভ্রূভঙ্গি পর্যন্ত এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরস এত সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত ছিল যে, এর জন্য খুব বেশী উপাদানের প্রয়োজন হত না।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরস আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের হাস্যরস সৃষ্টির কথা মনে পড়া খুবই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের হাস্যরসে যে শুভ্রোজ্জ্বল স্বচ্ছতা ও শালীনতা আছে, তা দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসে নেই। রবীন্দ্রনাথের হাস্যরসাত্মক রচনায় সংযম, পরিমিতিবোধ ও সূক্ষ্ম শিল্পকর্মের এক উন্নত আদর্শ আছে। রবীন্দ্রনাথের বিদ্রূপাত্মক রচনার মধ্যেও অনেক সময় অন্তর্নিহিত ও নিগূঢ় অর্থব্যঞ্জনা থাকে। একটি আঘাতপ্রবণতা এখানেও আছে, কিন্তু গভীর মর্মস্থলে প্রবেশ না করলে কবির যথাযথ উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা যায় না। 'হিং টিং ছট্' কবিতাকে এই পর্যায়ে ফেলা যায়। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গ খোলাখুলি জোরালো। দ্বিজেন্দ্রলালের এই জাতীয় কবিতায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার চেয়ে আঘাতপ্রবণতা অনেক বেশী। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ হাস্যরস রচনায় কৌতুকের স্নিগ্ধোজ্জ্বল শুভ্রতা শরতাকাশের লঘু মেঘখণ্ডের মতো সঞ্চরণশীল, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের হাসি যেন ঘন-ঘোর আকাশে বিদ্যুতের "ক্ষিপ্র তীব্র হাসি।"[৩২]

৩২। উদার আঁধার মাঝে বিদ্যুতের মত
উঠেছিল ফুটে তব ক্ষিপ্র তীব্র হাসি
ঘন ঘোর মেঘ ঘেরা দিগন্ত উদ্ভাসি।
দেখায়েছ বাহিরের উদারতা কত॥
—দ্বিজেন্দ্রলাল : প্রমথ চৌধুরী. সাহিত্য, ভাদ্র, ১৩২০

দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৬) প্রসঙ্গ বাদ দেওয়া যায় না। 'কৃষ্ণনাগরিক' হিসাবে প্রমথ চৌধুরী দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে নিগূঢ় সম্পর্ক অনুভব করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গান' সম্পর্কে তিনি একাধিকবার সপ্রশংস আলোচনা করেছেন।[৩৩] 'আত্ম-কথা'য় প্রমথ চৌধুরী দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসের সঙ্গে তাঁর হাস্যরসের একটি সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন: "চিনির মোড়কে যেমন কুইনিনের বড়ি খাওয়ান হয়, দ্বিজেন্দ্রলাল তেমনি হাসির মোড়কে মেকি পেট্রিয়টিজ্ম, ঝুটো ধর্ম ও সামাজিক মিথ্যাচারের উপর তার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করেছেন। বীরবলও তেমনি লোকের অন্তরে মিছবির ছুরি ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন।'[৩৪] কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর এই স্বীকৃতি সত্ত্বেও এই দুজন খ্যাতনামা 'কৃষ্ণনাগরিকের' হাস্যরসের মধ্যে অনেকখানি প্রকৃতিগত পার্থক্য ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল আবেগপ্রবণ, উচ্ছ্বসিত ও উচ্চকণ্ঠ—তাই তাঁর বিদ্রূপাত্মক মনোভাব অনেকখানি অনাবৃত ও স্পষ্ট হয়ে প্রকাশিত হয়েছে; কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর শ্লেষ-বক্রোক্তি যেমন প্রচ্ছন্ন ও সূক্ষ্ম, তেমনি সুকৌশলী। প্রমথ চৌধুরীর হাস্যরসের আবেদন প্রধানত বুদ্ধির কাছে—বাক্‌চাতুর্য ও কথার মারপ্যাঁচ তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির উজ্জ্বল আলোকে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসের আবেদন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হৃদয়ের কাছে—অনেকখানি বেপরোয়া, এবং কখনও কখনও প্রগল্‌ভও বটে—উত্তেজনায় ও উন্মাদনায় সময় সময় মাত্রাজ্ঞানও হারিয়ে ফেলে। প্রমথ চৌধুরী ফরাসী গুরুর শিষ্য—তাই বিতর্কমূলক রচনাতেও উষ্মার চেয়ে যুক্তিই প্রাধান্য লাভ করে। তিনি বলেছেন: "ফরাসি জাতি হাসতে জানে, তাই তারা কথায় কথায় ক্রোধান্ধ হয়ে ওঠে না। তীক্ষ্ণহাসির যে কি মর্মভেদী শক্তি আছে, এ সন্ধান যারা জানে, তাদের পক্ষে কটুবাক্য প্রয়োগ করা অনাবশ্যক।"[৩৫]

৩৩। এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর দুটি প্রবন্ধ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য—'দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতিসভায় কথিত' (সবুজপত্র, ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ) ও 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গান' (সবুজপত্র, ১৩২৩ আষাঢ়)।

৩৪। আত্মকথা, পৃঃ ১৯।

৩৫। ফরাসী সাহিত্যের পরিচয়: নানাকথা।

রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে যখন সাহিত্যিক বিতর্ক প্রবল হয়ে ওঠে, তখন দ্বিজেন্দ্রলাল ও প্রমথ চৌধুরীর রচনাগুলি পাশাপাশি রাখলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রমথ চৌধুরীর প্রতিবাদের ভাষা তীব্র, মর্মভেদী ও শ্লেষাত্মক, কিন্তু প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করতে গিয়েও তিনি মাত্রাজ্ঞান ও সৌজন্য হারান নি। অপর পক্ষে উত্তেজনার প্রাবল্যে দ্বিজেন্দ্রলালের আক্রমণাত্মক রচনাগুলি অনেক সময় অসংযত ও নিরাবরণ হয়ে উঠেছে। কারণ সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। হাস্যরসিক প্রমথ চৌধুরী নির্লিপ্ত, তাই তিনি সাহিত্যিক মসীযুদ্ধের চূড়ান্ত উত্তেজনার মুহূর্তেও তাঁর বাগবৈদগ্ধ্য ও যুক্তিপ্রবণতা হারান নি—তাঁর নিম্নকণ্ঠ চাপা-বিদ্রূপ ও বক্রোক্তির মধ্যে 'উইট্', 'পান' ও 'স্যাটায়া'রের প্রাধান্য। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের প্রাণখোলা উন্মুক্ত হাসি কখনো কখনো সংবেদনশীল 'হিউমার' পর্যায়ে পৌঁছেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির আড়ালে আছেন একজন কবি, সহৃদয় রসিক পুরুষ; অপরপক্ষে প্রমথ চৌধুরীর হাস্যরসের আড়ালে আছে একটি যুক্তিবাদী মন ও বুদ্ধিদীপ্ত মনন।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গান'-এ বৈচিত্র্য কম নেই—ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ থেকে আরম্ভ করে রঙ-তামাশা, ঠাট্টা এমন কি হাস্যরসের স্থূল উপাদান পর্যন্ত অনেক আছে।—কিন্তু কোন উপাদানই প্রচ্ছন্ন ও "প্রণিধান-সাপেক্ষ" নয়। নিতান্ত স্থূল উপাদানগুলিকে নিয়েই তিনি একটি শিল্পরূপ দিয়েছেন। সেখানে তিনি এই স্থূল উপাদানগুলিকে মেজে-ঘষে পালিশ করার চেষ্টা করেন নি—উপাদানগুলিকে অবিকৃতভাবেই গ্রহণ করেছেন। কারণ দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসের জগৎ যেন একটি আলোকোজ্জ্বল হাস্যমুখর পৃথিবী। হাস্যরসের প্রবলতার মধ্যে যে মুক্তি আছে, তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহে উপাদানগুলি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। অথচ তাঁর হাসির মধ্যে তাঁর চরিত্রের আদর্শনিষ্ঠাও বিদ্যুতের মতো ভাস্বর হয়ে উঠেছে।[৩৬]

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান সম্পর্কে কোনো কোনো সমালোচক ইংরেজি

৩৬। "দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের জগতে একটা প্রাণমাতানো নিত্য উৎসব লাগিয়া আছে, তাহা Walpurgis Night-এর স্ফূর্তির আবিলতা হইতে মুক্ত অথচ প্রোজ্জ্বল।"—দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান: অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়: সমালোচনা-সাহিত্য (ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাদিত)।

'কমিক' রচনায় প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন।[৩৭] অবশ্য তাঁর কাব্যরীতি ও কবিতার বহিরঙ্গের কোনো কোনো দিকের উপর যে ইংরেজি কবিতার প্রভাব পড়ে নি একথা বলা যায় না। ইংরেজি ও ফরাসী হাস্যরসিকদের রচনার সঙ্গেও তাঁর গভীর পরিচয় ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ঈশ্বরগুপ্তের হাস্যরসের মূল প্রকৃতির একটি ঐক্য আছে। অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলালের রুচিবোধ ও কবিশক্তির সঙ্গে গুপ্তকবির কোনো তুলনাই চলতে পারে না, এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যঙ্গের তীব্রতা ও অমার্জিত রূঢ় ব্যক্তিগত আক্রমণ গুপ্তকবির হাস্যরসকে অনেক সময়ই পঙ্কিল করে তুলেছে। তা ছাড়া তাঁর ছিল বাস্তব-পর্যবেক্ষণের নৈপুণ্য, বর্ণময় কল্পনার স্থান তাঁর কাব্যে ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসের মধ্যেও গীতিকবির সহজাত কল্পনাপ্রবণতা ছিল। কিন্তু গুপ্তকবির হাস্যরসের মধ্যে ছিল কথার মারপ্যাঁচ ও শব্দকৌশলের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি। এত পার্থক্য সত্ত্বেও বাংলাসাহিত্যের হাস্যরসিকদের মধ্যে গুপ্তকবির সঙ্গেই দ্বিজেন্দ্রলালের মিল সবচেয়ে বেশী। প্রাণবন্ত হাসির এমন স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ অন্যত্র দুর্লভ। রঙ্গ-ব্যঙ্গ, ঠাট্টা-ইয়ার্কি, রঙ-তামাশা, সঙ-ভাঁড়ামি, মস্করা-রসিকতা—প্রভৃতি সবরকম উপাদানকে নিয়েই গুপ্তকবি হাসির ফোয়ারা ছুটিয়েছেন। এমন প্রাণখোলা উচ্চকণ্ঠ হাসি একালে আর দেখা যায় না—প্রাণের সেই রস যেন আর নেই। তাই উচ্চকণ্ঠ প্রাণমাতানো হাসি আজকের 'কালচার বিলাসের' যুগে অমার্জিত রুচিবিকারের পর্যায়ভুক্ত! কিন্তু গুপ্তকবির যুগে বাঙালীর দেহে-মনে যে বলিষ্ঠতা ছিল, তাই রঙদার স্ফূর্তি ও মজাদার হাসির আকারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত, কবি নিজেও বলে উঠতেন: "এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ তবু রঙ্গে ভরা।" ঈশ্বরগুপ্তের পরে বাংলাসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের মত আর কেউ এমন 'রঙ্গভরা' বেপরোয়া প্রাণভরা হাসি হাসতে পারেন নি। কারণ সূক্ষ্ম শিল্প-বুদ্ধির আড়ালে প্রাণের সহজ প্রবাহ আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের ভোজ্যপানীয়বিষয়ক কবিতাগুলি ঈশ্বরগুপ্তের 'পৌষ-পার্বণ', 'পাঁঠাস্তোত্র', 'আনারস', 'অ্যাণ্ডাভরা তপসে মাছ' প্রভৃতি কবিতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

৩৭। "দ্বিজেন্দ্রের ব্যঙ্গসঙ্গীত অল্লাধিক পরিমাণে ইংরেজি Comic রচনার অনুকরণ, কিন্তু অনুকরণ হইয়াও প্রতিভাশালী কবির হস্তে উহা স্বকীয় নিজস্ব সম্পদই হইয়াছে।"
—জগদিন্দ্রনাথ রায়: মানসী, আষাঢ়, ১৩২২।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'সন্দেশ' কবিতায় ভোজনরসিক কবির বিশুদ্ধ রঙ্গবিলাস এক অনাবিল আনন্দে মুখর হয়ে উঠেছে :

উহু, সন্দেশ বুঁদে গজা মতিচুর রসকরা সরপুরিয়া ;
উহু, গড়েছ কি নিধি, দয়াময় বিধি ! কত না বুদ্ধি করিয়া।

* * * *

ওহো, না খেতেই যায় ভরিয়ে উদর, সন্দেশ থাকে পড়িয়ে ;
ওহো, মনের বাসনা মনে রয়ে যায়, চখে বহে যায় দরিয়া !

অপেক্ষাকৃত প্রৌঢ় বয়সে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাসাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্য-সুলভ হাস্যরসের ব্যর্থতার কথা আলোচনা করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরস সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য :

"বঙ্কিমবাবু De-Quincey-র মোলায়েম রসিকতা, বাঙ্গলার গাছমরীচ মিলাইয়া কমলাকান্তের আকারে বাঙ্গালীর হাটে চালাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবুর কমলাকান্ত বঙ্কিমবাবুর জীবনের সরসতা শুকাইতে না শুকাইতে যেন কোথায় মিলাইয়া গেল। আমার বিদেশী আমদানী Satire আমার জীবনের মাধুরীর সঙ্গে শুকাইয়া গিয়াছে। কোনটাই বাঙ্গলায় টিকিল না। তোমার দ্বিজেন্দ্রলাল Humourist বটে, পরন্তু বেজায় emotional, নির্বেদ হইয়া সংসারের উদ্ভটতা ও উৎকটতাকে দেখাতে পারে না ; একটু যেন নিজে মাতিয়া উঠে। বিধাতার আঘাত যখন উহার পিঠে পড়িবে তখন তাঁহার এই অপূর্ব Humour এবং নির্মল তটিনীকল্লোল একেবারেই স্তব্ধ হইয়া যাইবে। কাজেই বলিতে হয় আমাদের এই নূতন আমদানীর মাল বর্তমান বাঙ্গলার হাটে বিকাইল না।"[৩৮]

ইন্দ্রনাথের এই আক্ষেপোক্তির মধ্যে দুটি সত্য আছে।—প্রথমত, বাঙালী জীবনের মধ্যে পশ্চিমী হাস্যরস আমদানি করা দুরূহ—দুয়ের মধ্যে কোথায় যেন একটি বিরোধ আছে। দ্বিতীয়ত, দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসের বৈশিষ্ট্যকে সামান্য একটি মন্তব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসের যে ত্রুটির কথা বলেছেন, তা দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির বৈশিষ্ট্যও বটে—কারণ দ্বিজেন্দ্রলাল ফরাসী 'স্যাটারিস্ট' নন, খাঁটি বাঙালী হাস্যরসিক। মোলিয়েরের পৃথিবী আর তাঁর পৃথিবী এক নয়—বহু পার্থক্য সত্ত্বেও তিনি গুপ্তকবিরই প্রতিবেশী।

৩৮। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, ৩৪ নং) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাট্যপ্রবাহ ও নাটকবিচার

কবি ও প্রহসন-রচয়িতা হিসাবেই দ্বিজেন্দ্রলাল সাহিত্যক্ষেত্রে সর্বপ্রথম খ্যাতি লাভ করেন। নাটকের ক্ষেত্রে তিনি অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে প্রবেশ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে 'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫) নাটক রচনার কাল থেকেই দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যরচনার পূর্ণাঙ্গ যুগ বলা যায়। তার আগে তিনি দুখানি নাটক লিখেছিলেন—'পাষাণী' (১৯০০) ও 'তারাবাই' (১৯০৩)। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক রচনার যুগ অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের হলেও বাল্যকাল থেকেই নাটকপাঠে তাঁর 'আসক্তি' ছিল। তিনি নিজেই বলেছেন :

"বাল্যাবধি কবিতা ও নাটকপাঠে আমার অত্যন্ত আসক্তি ছিল। বিলাত গিয়া ক্রমাগত Shelley পড়িতাম এবং তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া ক্রমাগত Wordsworth ও Shakespeare বারবার পড়িতাম, ও শেষোক্ত কবির নাটকের যে যে অংশ কাব্যাংশে শ্রেষ্ঠবোধ হইত, মখস্থ করিতাম।

"বিলাতে যাইবার পূর্বে আমি 'হেমলতা' নাটক ও 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলাম মাত্র, আর কৃষ্ণনগরের এক সৌখীন অভিনেতৃদল কর্তৃক অভিনীত 'সধবার একাদশী' ও 'গ্রন্থকার' নামক একখানি প্রহসনের অভিনয় দেখি, আর Addison-এর Cato এবং Shakespeare-এর Julius Caesar-এর আংশিক অভিনয় দেখি। সেই সময় হইতেই অভিনয় ব্যাপারটিতে আমার আসক্তি হয়। বিলাতে যাইয়া বহু রঙ্গমঞ্চে বহু অভিনয় দেখি। এবং ক্রমেই অভিনয় ব্যাপারটি আমার কাছে প্রিয়তম হইয়া উঠে।

"বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি কলিকাতার রঙ্গমঞ্চসমূহে অভিনয় দেখি। এবং সেই সময়েই বঙ্গভাষায় লিখিত নাটকগুলির সহিত আমার পরিচয় হয়।"...[১]

যে সময় দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন, তখন বাংলা

১। আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ : নাট্যমন্দির, শ্রাবণ, ১৩১৭।

নাটক ও রঙ্গমঞ্চের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের একচ্ছত্র আধিপত্য। তিনি নিজে সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন, তাই রঙ্গমঞ্চের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও কম ছিল না। তাঁর এই নট-প্রতিভা নাট্যকার-প্রতিভাকে ফুটিয়ে তুলতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর দু বছর আগে গিরিশচন্দ্রের মৃত্যু হয় (১৯১১)। দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-প্রতিভা বিচার প্রসঙ্গে এই তথ্যটি স্মরণ রাখা কর্তব্য। কারণ গিরিশচন্দ্রের মতো জনপ্রিয় নাট্যকারের পাশে তাঁকে নাটক রচনা করতে হয়েছিল। এ যুগে প্রহসন-রচয়িতা ও হাস্যরসস্রষ্টা হিসাবে 'রসরাজ' অমৃতলাল বসুরও খ্যাতি কম ছিল না। অমৃতলালও সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক আর একজন নাট্যকারের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইনি হলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭)। ক্ষীরোদপ্রসাদের রচনাপরিধি যেমন বিপুল, তেমনি বহুবিচিত্র। তাঁর প্রথম নাটক 'ফুলশয্যা' (১৮৯৪) কল্পিত ইতিহাস অবলম্বন করে লেখা হয়েছিল। কিন্তু 'আলিবাবা' (১৮৯৭) নাটকটি ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত হওয়ার পর ক্ষীরোদপ্রসাদের যশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এমন কি স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপ-আদিত্য' (১৯০৩), পদ্মিনী' (১৯০৬), 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৭), 'চাঁদবিবি' (১৯০৭), 'নন্দকুমার' (১৯০৮), 'বাঙ্গালার মসনদ' (১৯১০) প্রভৃতি নাটক একসময় দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পরেও ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রায় চৌদ্দ-বছরব্যাপী অক্লান্তভাবে লেখনী সঞ্চালন করেছিলেন। নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থাননির্ণয় করতে হলে বাংলা নাটকের তৎকালীন পরিস্থিতির কথা মনে রাখতে হবে।

সুতরাং দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্বে সাহিত্যের এই দিকটি যে নিতান্ত বন্ধ্যা ছিল এ কথা বলা যায় না। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক ভক্তিমূলক নাটকগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। বিশেষত তাঁর শেষজীবনের অবতার-মহাপুরুষসম্পর্কিত নাটকগুলি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অলৌকিক জীবনের রসে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। হিন্দুধর্মের এই নবজাগরণের যুগ গিরিশচন্দ্রের ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটকে একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকগুলি প্রধানত উনবিংশ

শতাব্দীর সত্যোজাগ্রত জাতীয়তাবোধকেই বাণীবদ্ধ করেছিল। তার ইতিহাসাশ্রিত শেষ নাটক 'স্বপ্নময়ী' ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল। এর পর তিনি অনুবাদ করেছিলেন ও কখানি প্রহসন লিখেছিলেন। সুতরাং আলোচ্য পর্বে নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কোন সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের 'পাষাণী' (১৯০০) প্রকাশের অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথ কয়েকখানি গীতিনাট্য ও নাট্যকাব্য রচনা করেন। 'রাজা ও রাণী' (১২৯৬) 'বিসর্জন (১২৯৮) ও 'মালিনী' (১৩০২)—এই তিনখানি পঞ্চমাঙ্ক নাটকের সংলাপ রচনায় কবি গিরিশচন্দ্রের গৈরিশছন্দ অনুসরণ করেন নি। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশপ্রেমের যে প্রবল উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হয়েছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ জাতীয় সঙ্গীত রচনা করলেও গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল বা ক্ষীরোদপ্রসাদের মতো ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন নি। সুতরাং দেশব্যাপী এই প্রবল হৃদয়াবেগকে সে যুগে প্রধানত এই তিনজন নাট্যকারই রূপ দিয়েছিলেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জাতীয় ভাবোচ্ছ্বাসকে সর্বপ্রথম রূপ দিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর 'প্রতাপ-আদিত্য' নাটকে। তারপর এলেন গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল। পৌরাণিক নাটকের ভক্তিরসসিক্ত ধর্মভাব রূপান্তরিত হল এক নবভাবপ্রদীপ্ত ইহ-চেতনায়। পৌরাণিক নাটকের দৈবলীলার স্থান অধিকার করল ইতিহাসাশ্রিত মানব-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার কাহিনী। ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক নাটকের পিছনে জাতীয় জীবনের কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থার ইঙ্গিত ছিল না। সমগ্র দেশের সঙ্গে এই নবজাগ্রত ভাবুকতার কোনো যোগ ছিল না। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাঙালীর প্রাণচাঞ্চল্য কলকাতা শহরের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল।[২] প্রতাপাদিত্য, সিরাজদৌল্লা, রানা প্রতাপ, দুর্গাদাস প্রমুখ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চরিত্রগুলির বীরত্ব, স্বদেশপ্রেমিকতা, আত্মত্যাগ

২। "জাতির প্রবল ভাবোদ্দীপনা অন্তরে অনুভব করিয়া তৎকালীন শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণ জাতীয় ভাবানুপ্রাণিত নাটক রচনা করিলেন। দর্শকগণ তাহাদের রাষ্ট্রিক সংগ্রামের প্রেরণা পাইল নাটকের মধ্যে, সুবিপুল উৎসাহে সেই নাটককে তাহারা সম্বর্ধনা জানাইল। আনন্দরসের প্রেক্ষাগৃহ ও আন্দোলনের রাজপথ এক প্রাণের যোগে সম্মিলিত হইয়া গেল।"—বাংলা নাটকের ইতিহাস : অজিতকুমার ঘোষ, পৃঃ ১৯০।

প্রভৃতি কাহিনীকে এ যুগের নাট্যকারেরা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকারখ্যাতির মূলে আছে তাঁর এই ঐতিহাসিক নাটকগুলি। গিরিশচন্দ্র বা ক্ষীরোদপ্রসাদ ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছেন বটে, কিন্তু তাঁরা কেউই যুগজীবনের উত্তাপকে দ্বিজেন্দ্রলালের মতো নাটকীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের অন্তর্ভূক্ত করে তুলতে পারেন নি। শুধু দেশপ্রেমই নয়, কল্যাণ, মৈত্রী ও বিশ্বনীতির আদর্শকে তিনি নাটকের মধ্যে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। ঐতিহাসিক পরিবেশ ও চমৎকারিত্ব ফুটিয়ে তোলায় সাহায্য করেছে তাঁর কাব্যধর্মী ভাষা। চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করে তিনি নাটকীয় সংঘাত-লগ্নগুলিকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন।

কিন্তু সামাজিক নাটকে তিনি সার্থকতা লাভ করতে পারেন নি। ঐতিহাসিক নাটকের রোমাণ্টিক টেকনিক সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রে নিতান্ত অসঙ্গত হয়ে পড়েছে। তিনি পৌরাণিক নাটক দিয়ে তাঁর নাট্যজীবন শুরু করেছিলেন বটে, কিন্তু পৌরাণিক নাটক তাঁর স্বক্ষেত্র ছিল না। কারণ আধ্যাত্মিকতা, ভক্তিরস ও পৌরাণিক বিশ্বাসের চেয়ে তাঁর কাছে বড় ছিল যুক্তিনিষ্ঠ মনের বুদ্ধিধর্মী বিচারপ্রবণতা। তাই পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে তাঁর রচনার বৈচিত্র্য ও প্রসারতাও তেমন নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকারখ্যাতি প্রধানত তাঁর গদ্যসংলাপবাহী ঐতিহাসিক নাটকগুলির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু জনপ্রিয় সাহিত্য হলেই যে উচ্চতর সাহিত্য হতে হবে, এমন কোনো অর্থ নেই। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকেও অনুচিত সংলাপ, অকারণ উচ্ছ্বাস ও অতিনাটকীয় ভাবাতিরেক আছে। নাট্যকারের বস্তুধর্মী নির্লিপ্ততা অনেক সময় গীতিকবির আত্মমুগ্ধ কাব্যধর্মিতায় পরিণত হয়েছে—নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে পরাজিত হয়েছেন। কিন্তু এ সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁর নাট্যপ্রতিভাকে অস্বীকার করা যায় না। বাংলা নাটকের ইতিহাসে দ্বিজেন্দ্রলাল থেকেই আধুনিক যুগ সূচিত হয়েছে। আঙ্গিক, দৃষ্টিভঙ্গি, ভাব-ভাষা প্রভৃতি দিক থেকে তিনি নূতনত্বের সঞ্চার করেছেন। ইউরোপীয় নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে গভীর পরিচয়ের ফলে পাশ্চাত্ত্য নাট্যরীতির ঘনিষ্ঠ প্রভাব তাঁর নাটকগুলিকে নূতন রূপকর্মে ও ভাবসত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে আধুনিকজীবনের সমস্যাগুলিই উদ্ভাসিত হয়েছে। এতে কালানৌচিত্যদোষ (Anachronism)

ঘটেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত জীবন-সমালোচনায় মর্ত্যলোকের দ্বন্দ্ববিড়ম্বিত জীবনের প্রতি একটি সাগ্রহ কৌতূহল প্রকাশিত হয়েছে। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল ইহ-সচেতন ও যুগ-জীবনের কৌতূহলী ভাষ্যকার।

॥ ২ ॥

প্রহসনগুলি বাদ দিলে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটককে তিন ভাগে ভাগ করা যায়: নাট্যকাব্য, ঐতিহাসিক নাটক ও সামাজিক নাটক। নাট্যকাব্যগুলি তার প্রথম দিকের রচনা। স্ত্রী-বিয়োগের পূর্ববর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিজীবন ও ব্যক্তিজীবন যখন প্রণয়ে-উচ্ছ্বাসে-গীতিসুধায় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল, তখনই তিনি নাট্যকাব্যগুলির অধিকাংশই রচনা করেছিলেন। এক 'সোরাব-রুস্তাম' (১৩০৮) ও 'ভীষ্ম' (১৯১৪) ছাড়া অন্যান্য নাট্যকাব্যগুলি তাঁর স্ত্রী-বিয়োগের পূর্বে অর্থাৎ সাহিত্যিক জীবনের প্রথমার্ধেই রচিত হয়েছিল। তাঁর জীবনীকার এই যুগের মনোজীবনের যে পরিচয় দিয়েছেন, তা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

"শুভোদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর প্রায় ছয় বৎসর পরে, অর্থাৎ প্রণয়ের সেই উদ্বেলিত রস-স্নিগ্ধ উচ্ছলিত ভাবাবেগ প্রশান্ত ও প্রশমিত হইতে যে সময়টুকু লাগিয়াছিল তাহার পর হইতে—তাঁহার অন্তর্জাত আনন্দ অন্য এক ভিন্নমূর্তিতে উদ্ভাসিত ও প্রকট হইয়া, এই বিরস-শুষ্ক মৌন-ম্লান বঙ্গদেশকে বিমুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়া তুলিল। উল্লিখিত প্রহসন ও "হাসির গান" ব্যতীত, তাই, এ সময়ে তাঁহার কবি-প্রতিভার সুন্দর-সুরভি প্রসূনগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া মাতৃভাষাকে অতি মোহন সুগন্ধ ও দিব্য সৌন্দর্যে আমোদিত ও গরিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে।[৩]

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকাব্যগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়। 'পাষাণী', 'সীতা' ও 'ভীষ্ম'—এই তিনখানি নাটক পৌরাণিক বিষয়কে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। 'তারাবাই' ইতিহাসাশ্রিত নাট্যকাব্য, আর 'সোরাব-রুস্তাম' ফেরদৌসী-রচিত 'শাহ্‌নামা' কাহিনী অবলম্বনে রচিত অপেরা। হাসির গান ও প্রহসন রচনার যুগে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম গুরুবিষয়ক নাটক 'পাষাণী' (১৯০০)

৩। দ্বিজেন্দ্রলাল: দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ২৭৪।

রচিত হয়। গিরিশচন্দ্র তাঁর সুদীর্ঘ নাট্যরচনার ইতিহাসের ভিতর দিয়ে পৌরাণিক নাটককে একটি বিশেষ পরিণতি দিয়েছিলেন। ভক্তিভাব ও আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত হয়ে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলি বাংলা পৌরাণিক নাটকের মধ্যে একটি নূতন স্বরসংযোগ করেছিল। পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্রের পথই পৌরাণিক নাটক-রচয়িতাদের একমাত্র পথ হয়ে উঠেছিল। গিরিশচন্দ্র-প্রবর্তিত এই পৌরাণিক নাট্যধারার অসাধারণ জনপ্রিয়তার যুগে দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে পুরাণকে নাট্যরূপ দিয়েছেন। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকে ভক্তি-বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতাই প্রাধান্য লাভ করেছে—যুক্তি ও বুদ্ধি সেখানে এক মহিমময় ভাবসাধনায় আচ্ছন্ন।[৪] আদর্শবাদ ও প্রেম-ভক্তিসমন্বিত অধ্যাত্ম-বিশ্বাসের রূপায়ণ হিসাবেই গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলি তখন অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। গিরিশচন্দ্রের নাট্যরচনার যুগ 'হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের যুগ।' বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, প্রমুখ সাহিত্যিকের রচনায় নব-চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির মর্মবাণী উদ্ঘাটিত হয়েছিল। বিশেষত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দুর্লভ সাহচর্যে গিরিশচন্দ্রের নাটকে ধর্মভাব আরও বেশী পরিস্ফুট হয়েছিল। কিন্তু অতিরিক্ত ধর্মভাব ও তত্ত্বদৃষ্টি গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের শিল্পসাফল্যকে অনেক সময় ব্যাহত করেছে। একটি অধ্যাত্মদৃষ্টি নাটকের মানবীয় রসকেও ক্ষুণ্ণ করেছে।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের পুরাণাশ্রয়ী নাটকের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি গিরিশচন্দ্র-প্রবর্তিত ভক্তিভাব ও আধ্যাত্মিকতাকে অস্বীকার করেছেন। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী। এই যুক্তিনিষ্ঠ বুদ্ধিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে সংশয়াতুর করে তুলেছিল।[৫] এক 'পরপারে' নাটকের ভবানীপ্রসাদ চরিত্র ছাড়া আর

৪। অনিশ্চিত অনিশ্চিত! বুদ্ধি পরাজয়,
নির্ণয় না হয়—হায়, কে আছে কোথায়? [কালাপাহাড় ১ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক]।

৫। "তিনি তার্কিক ও যুক্তিবাদী। কিন্তু তর্কের তো কোনও মীমাংসা নাই! তিনি জগতের প্রত্যেক বিষয়ই তর্কের দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিতেন: সুতরাং তর্কের অন্ত না পাইয়া, স্বতঃই অনেক স্থলে সন্দেহবাদী হইয়া পড়িয়াছেন।·· তাঁহার কবিতায় দেখা যায়—তিনি স্বর্গ, নরক, ঈশ্বর, দেব-দেবী সম্বন্ধে বস্তুতঃ বড় বেশী আস্থাবান ছিলেন না। ভাল-মন্দ যাহা কিছু—তিনি প্রত্যক্ষের ভিতর দিয়া দেখিতেন; এবং তিনি প্রধানতঃ পুরুষকার ও নীতি মানিতেন।" —দ্বিজেন্দ্রলাল: দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৬৬৪-৬৬৫।

কোনো চরিত্রকেই ধর্মভাবাপন্ন বলা যায় না। তাই পৌরাণিক নাটক রচনায় তাঁর বস্তুবাদী ও যুক্তিনিষ্ঠ মন অলৌকিক ও দৈব-বিশ্বাসকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছে। 'কল্কি অবতার' প্রহসনে ও 'হাসির গান'-এর কোন কোন রচনায় তিনি দেব-দেবী নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন। 'কল্কি অবতার'-এর ভূমিকায় তিনি তার কৈফিয়তও দিয়েছেন। এতকাল প্রহসন ও হাসির গানের মাধ্যমে তাঁর এই বিশিষ্ট মানসিকতা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু 'পাষাণী' নাটক থেকে তিনি গুরুগম্ভীর বিষয়েও যুক্তিবাদী ও বিশ্লেষণাত্মক মনোভঙ্গি প্রকাশ করলেন। তিনি পুরাণকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে অলৌকিকতার আবরণ উন্মুক্ত করে এক-একটি লৌকিক জীবনের বাস্তবরসসমৃদ্ধ ইতিহাসই আবিষ্কার করেছেন। তাই তাঁর পুরাণাশ্রয়ী নাটকগুলিতে দেব-দেবীর অলৌকিক জীবনাচরণের কথা নেই, আছে নর-নারীর বাস্তবজীবনের মানবীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কাহিনী। পুরাণকে মানবীয় ব্যাখ্যায় মণ্ডিত করার প্রয়াস উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম থেকেই শুরু হয়েছিল। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র হিন্দু পুরাণকে বুদ্ধিমার্জিত মানবীয় ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর যুগজীবনের নূতন জিজ্ঞাসা তাঁদের পুরাণকাহিনীতে আত্মপ্রকাশ করেছিল। পুরাণের ভিতর থেকে তাঁরা মানব-সত্যকেই নূতনভাবে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে উনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিবাদী ও সংস্কারমুক্ত 'পুরাণের নব-রূপায়ণ' পদ্ধতিটি একটি চূড়ান্ত রূপলাভ করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর কবিদের এই পুরাণ-ব্যাখ্যা ছিল মানবমুখী, কিন্তু সে মানুষ ছিল 'Grand fellow'। অপর পক্ষে দ্বিজেন্দ্রলাল পৌরাণিক চরিত্রগুলির মধ্যে সাধারণ মানুষের কথাই বলেছেন। তাঁর অহল্যা পরপুরুষ-আসক্তা কামনাময়ী রমণী, ইন্দ্র পরস্ত্রীলোলুপ লম্পট পুরুষ, রামচন্দ্র ব্যক্তিত্বহীন; এমন কি অম্বা কাহিনীটি যুক্ত করে ভীষ্ম চরিত্রের মধ্যেও তিনি অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছেন।

পুরাণকে বিকৃত করার অপরাধে নীতিবাগীশ মহলে দ্বিজেন্দ্রলালের 'পাষাণী' ও 'সীতা' নাটকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়। 'মন্দ্র' কাব্যের ভূমিকায় তিনি বিরুদ্ধবাদী সমালোচকদের প্রতি এ প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছিলেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

"কোন এক পত্রিকার সম্পাদক মৎপ্রণীত "পাষাণী" নাটিকার সমালোচনায়

কহিয়াছিলেন যে, আমি নাটকে রামায়ণ আখ্যান অনুসরণ করি নাই—যেহেতু, অহল্যাকে স্বেচ্ছায় ব্যভিচারিণীরূপে চিত্রিত করিয়াছি, কিন্তু পৌরাণিকী অহল্যা ইন্দ্রকে গৌতম বলিযা ভ্রম করিয়া ভ্রষ্টা হইয়াছিলেন! তাঁহাব বাল্মীকির রামায়ণখানি উল্টাইয়া দেখিবার অবকাশ হয় নাই। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে তিনি দেখিতেন যে, বাল্মীকিব অহল্যা শুদ্ধ ইন্দ্রকে ইন্দ্র বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন, তাহা নহে, দেবরাজ কিরূপ, জানিবাব জন্য কৌতূহলপববশ হইযা ("দেবরাজকুতূহলাৎ") কামবতা হইয়াছিলেন। ...আমি শুদ্ধ আধুনিক দায়িত্বশূন্য সমালোচনাব উদাহরণ-স্বরূপ উক্ত বিষয়ের উল্লেখ কবিলাম।"

নাট্যকার তাঁর স্বপক্ষে যুক্তি দিলেও তিনি যে রামাযণ-কাহিনীকে সম্পূর্ণ অনুসরণ কবেন নি, এ কথা অস্বীকাব কবা যায় না। নাটকে গৌতম বিশ্বামিত্রের সঙ্গে যখন প্রবাস যাত্রা করেছেন সেই অবকাশে অহল্যা ইন্দ্রেব সঙ্গে ব্যভিচাবে লিপ্ত হয়েছেন। নাটকে বিশ্বামিত্র চরিত্রটি অনাবশ্যক প্রাধান্য লাভ করেছে। নাটকেব শেষাংশে নাট্যকাব নিজস্ব কল্পনাব উপবেই বেশী নির্ভর করেছেন। গৌতমেব অভিসম্পাত বিবরণটি নাট্যকার মোটেই গ্রহণ করেন নি। রামায়ণে বর্ণিত আছে যে গৌতম ইন্দ্র ও অহল্যার বৃত্তান্ত অবগত হয়ে তাঁদের দুজনকেই অভিসম্পাত দিলেন। ঋষিশাপে ইন্দ্র 'বিফল' হলেন এবং অহল্যা 'নিরাহারা' 'বাতভক্ষ্যা', 'ভস্মশায়িনী' পাষাণরূপিণী হলেন।[৬] পরে রামলক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের সঙ্গে মিথিলাগমনকালে যখন

৬। "মমরূপং সমাস্থায় কৃতবানসি দুর্মতে।
অকর্তব্যমিদং যস্মাদ্ বিফলস্তং ভবিষ্যসি॥
গৌতমেনৈবমুক্তস্য সুরোষেণ মহাত্মনা।
পেততুর্বৃষণৌ ভূমৌ সহস্রাক্ষস্য তৎক্ষণাৎ॥
তথা শপ্‌ত্বা চ বৈ শক্রং ভার্যামপি চ শপ্তবান্।
ইহ বর্ষসহস্রাণি বহূনি নিবসিষ্যসি॥
বাতভক্ষ্যা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী।
অদৃশ্যাসর্বভূতানামাশ্রমেঽস্মিন্ বসিষ্যসি॥

(রামায়ণ। বালকাণ্ড, অষ্টচত্বারিংশ সর্গ-
২৭-৩০ শ্লোক)

গৌতমাশ্রমে উপস্থিত হলেন, তখন রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে অহল্যার মুক্তি ঘটল। প্রায়শ্চিত্তান্তে গৌতমও পুনরায় অহল্যাকে গ্রহণ করলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল অভিসম্পাত-বৃত্তান্ত ও অহল্যার পাষাণরূপিণী হওয়ার কাহিনীকে গ্রহণ করেন নি। এর কারণ উপলব্ধি করাও দুরূহ নয়। তিনি প্রধানত পুরাণ-কাহিনীর অতিপ্রাকৃত অংশকে যতদূর সম্ভব বর্জন করে স্বাভাবিক ও বাস্তবধর্মী করার চেষ্টা করেছেন। ইন্দ্রের অভিশাপ অথবা অহল্যার পাষাণে পরিণত হওয়া দুই-ই তাঁর কাছে অবাস্তব ও অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে। নাটকে গৌতমের আশ্রম প্রত্যাগমনের সংবাদ পেয়েই ইন্দ্র ও অহল্যা স্থানান্তরে যাত্রা করেছে। কৈলাস পর্বতের নির্জন শিখরে ইন্দ্র ও অহল্যার সুখসম্ভোগ, ইন্দ্রের আসক্তিতে ভাঁটা পড়া, অহল্যাকে পরিত্যাগকালে অহল্যার ইন্দ্রকে ছুরিকাঘাত, আহত ইন্দ্রকে গৌতম ও চিরঞ্জীবের শুশ্রূষা, পতি-পুত্রবিরহিত আশ্রমে মনোবিকারগ্রস্তা অহল্যার প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি কাহিনী রামায়ণ-অনুমোদিত নয়। কাহিনীর শেষাংশেও নাট্যকার রামায়ণ-কাহিনীকে অনুসরণ করেন নি। অহল্যার দুঃখে ব্যথিত হয়ে রামচন্দ্র গৌতমের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনার নির্দেশ দিলেন। সীতার বিবাহোপলক্ষে গৌতম জনক-ভবনে উপস্থিত হয়েছিলেন। অহল্যা নিজের সমস্ত পাপাচরণ স্বীকার করে ক্ষমাভিক্ষা করছেন, গৌতমও তাঁকে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করে গ্রহণ করছেন।

॥ ৩ ॥

রামায়ণ-কাহিনীর এই পরিবর্তনের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের মনোজীবনের একটি সুরই ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে। সামাজিক পাপ ও তার প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে তিনি একটি নূতন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অহল্যার ব্যভিচারকে তিনি অস্বীকার করেন নি, কিন্তু তার জন্যে তিনি তথাকথিত কঠোর নৈতিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থাও করেন নি। অহল্যার প্রায়শ্চিত্ত-বিধানকে তিনি তাঁর মনোজীবনের ঘাত-প্রতিঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্ব-জর্জরিত অর্ধোন্মাদনার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেছেন। স্থূল শাস্ত্রীয় বিধানকে তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে মনস্তত্ত্ব-সম্মত চিত্তবিকারকেই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু এখানেও স্বামীর

পবিত্র ভালোবাসার তুলনায় নিজের ব্যভিচারবৃত্তিজনিত চিত্তবিক্ষোভ নিতান্ত গৌণ হয়ে পড়েছে। ইন্দ্রের নিষ্ঠুর প্রতারণার কথা মনে করে অহল্যা পুরুষজাতির উপরই বিরূপ হয়ে উঠেছেন। ইন্দ্র কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হয়েও স্বামীর প্রেম তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দেয় নি, তার চেয়ে অনেক বড় হয়েছে প্রেমিকের প্রত্যাখ্যান-জনিত নৈরাশ্যপীড়িত হৃদয়ের প্রতিক্রিয়া।[১] রামের অনুরোধই যেন অহল্যাকে গৌতমের দিকে আকর্ষণ করেছে। প্রত্যাখ্যাতা অহল্যার হৃদয়দ্বন্দ্বের মধ্যে গৌতমের প্রতি আকর্ষণটিকে ফুটিয়ে তুলতে পারলে নাটকীয় উদ্দেশ্যটি আরও বেশী স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারত।

আসল কথা, গৌতম-অহল্যা-ইন্দ্রের কাহিনীটির মূল-পরিকল্পনার মধ্যে নাট্যকারের বন্ধনহীন রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিই প্রাধান্যলাভ করেছে। অহল্যা-চরিত্রে প্রথম থেকেই সম্ভোগবাসনার তীব্রতা দেখানো হয়েছে। কিন্তু নাট্যকার এই যৌবনবেদনার চিত্রটিকে সহানুভূতির সঙ্গে এঁকেছেন অহল্যার এই অতৃপ্ত যৌবনবেদনার মধ্যে একটি কার্যকারণ-সম্পর্ক আছে। বৃদ্ধ গৌতমের জ্ঞানপিপাসু পাঠবিরত শুষ্কহৃদয় অহল্যার সম্ভোগসতৃষ্ণ মনকে কোনদিনই পরিতৃপ্ত করতে পারে নি। তাই মাধুরীর কাছে স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়েছে। অহল্যার সামান্য একটি মন্তব্যের আলোকে গৌতম-অহল্যা সম্পর্কের সম্ভাব্যতা চকিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে :

> তিনি জ্ঞানী, তিনি শাস্ত্রবিশারদ, তিনি
> ধার্মিক। মাধুরী! কিন্তু রমণীহৃদয়
> তার প্রার্থী নহে সখি! থাক কাজ নাই
> নিষ্ফল বিলাপে আর। বুঝিবি না তুই।
> অথবা কি ফল অনুতাপে? [সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস]
>
> [১ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য]

১। অহল্যা। কি বিস্ময়?
তুমি ত পুরুষ!—সব পাবে সে পুরুষ...
ঘুমন্ত পত্নীর গলে বসাইতে ছুরি,
কলঙ্কিতে পাতিব্রত্য পাশব বিক্রমে—
নম্র নবোঢ়ার ; ছুঁড়ে দিতে বালিকার
প্রস্ফুটিত প্রেমপদ্ম লোকাচারপদে। (৪র্থ অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

প্রথমাঙ্ক ষষ্ঠ দৃশ্যে গৌতমের প্রবাসযাত্রার প্রাক্কালে অহল্যা তাঁকে স্পষ্টই বলেছেন—"ভিন্নরূপ গতি দুজনার ভিন্ন দিকে।"—সুতরাং অহল্যার পদস্খলন কাহিনীকে নাট্যকার কোন আকস্মিক ব্যাপার করে তোলেন নি—অহল্যার অতৃপ্ত যৌবনবেদনা ও তীব্র ভোগাকাঙ্ক্ষার মনস্তত্ত্বসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে ইন্দ্রের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারেই অহল্যা বলেছেন: "আমি তব দাসী, তুমি মোর প্রাণেশ্বর।" এখানে অহল্যার মনে কোনো দ্বন্দ্ব-সংঘাত মুহূর্তের জন্যও উদিত হয় নি। যদিও নাট্যকার মদন-রতির আবির্ভাব ঘটিয়ে অহল্যার মনোভাবকে অনেকটা সহজ ও স্বাভাবিক করে তোলার চেষ্টা করেছেন, তবুও এই অংশ আকস্মিকতা থেকে মুক্ত হতে পারে নি।

অহল্যা-চরিত্র অঙ্কনে ও নাটকটির পরিকল্পনায় নাট্যকারের সংস্কারমুক্ত নির্ভীক দৃষ্টিভঙ্গিই জয়যুক্ত হয়েছে। তাই চরিত্রগুলির মধ্যে পৌরাণিক আবেদন নেই বললেই হয়। পুরাণ থেকে ঘটনাসূত্র ও চরিত্রগুলি নিয়ে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা থেকে মুক্ত করে নাট্যকার সাধারণ নরনারীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও প্রেম-জীবনের সমস্যাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। অহল্যা কোনদিনই 'দেবী' বা 'তপস্বিনী' হতে চান নি—তিনি নারী, এইটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। মাধুরীর 'দেবি' সম্বোধনকে প্রতিবাদ করে তিনি বলেছেন:

> আবার ও রূঢ় সম্বোধন!
> "দেবি"? আমি গুরুপত্নী বটে। শিষ্যা তুই,
> তথাপি আমার তুই চিরপ্রিয় সখী;
> আয় সখি, দুই দণ্ড নিস্তব্ধ নিভৃতে
> কহিব প্রাণের কথা।

[১ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য]

ইন্দ্রের কাছে নিজের পরিচয়দানকালেও অহল্যা বলেছেন:

> মিথ্যা কথা বলিয়াছি, আমি শুদ্ধনারী,
> কোন নাম নাহি মোর।

অহল্যাকে নাট্যকার প্রণয়মুগ্ধা নারী হিসাবেই সৃষ্টি করেছেন—পৌরাণিক কাহিনীর যুগযুগান্তরের সংস্কার অস্বীকার করে তিনি নারী-পুরুষের বিষামৃতময় স্বৈরিণী প্রেমকেই চূড়ান্ত করে তুলেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের এই

নাট্যকাব্যখানিতে তাঁর বাধাবন্ধনহীন রোমান্টিক কবিস্বপ্নই জয়যুক্ত হয়েছে। বলাবাহুল্য পুরাণের প্রচলিত নীতি-নির্দেশ অস্বীকার করার জন্য এ নাটকের অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছিল। এমন কি কবির জীবিতকালে কোনো সাধারণ রঙ্গমঞ্চেও এই নাটকটি অভিনীত হয় নি।[৮]

দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বে আর কেউই সংস্কারমুক্ত প্রেমের কথা উচ্চারণ করেন নি, এমন কথা বলা যায় না। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' মধুসূদন 'সোমের প্রতি তারা' পত্রিকায় গুরুপত্নী তারার উচ্ছ্বসিত প্রণয়াবেগের বর্ণনা দিয়েছেন। হৃদয়ের প্রবল বন্যায় সমাজ-সংস্কার সেখানে ভেসে গিয়েছে। অহল্যা চরিত্র আলোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' (১২৯৯) কাব্যনাট্যের চিত্রাঙ্গদা ও 'বিদায়-অভিশাপ'-এর (১৩০০) দেবযানী চরিত্রের কথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই সমাজনীতির প্রশ্ন বড় হয়ে ওঠে নি। কারণ চিত্রাঙ্গদা ও দেবযানী—দুজনেই কুমারী, তা ছাড়া প্রণয়াস্পদকে বিবাহের মন্ত্রের মধ্য দিয়ে সামাজিকভাবে পাওয়ারও অসুবিধা ছিল না। কিন্তু অহল্যা বিবাহিতা ও স্বামী-পুত্রবতী। ইন্দ্রের সঙ্গে তার প্রণয়াসক্তি সমাজবিগর্হিত আচরণ। 'চিত্রাঙ্গদা'য় ও 'পাষাণী'তে বসন্ত ও মদন-রতির ভূমিকা আছে। চিত্রাঙ্গদা বসন্ত ও মদনের কাছ থেকে 'বর্ষভোগ্য মোহিনীকান্তি' ভিক্ষা করে নিয়েছিলেন, কিন্তু সেই ভিক্ষালব্ধ দৈহিক সৌন্দর্যের প্রতি ধিক্কারই শেষপর্যন্ত তাকে মোহমুক্তির জ্যোতির্লোকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।[৯] চিত্রাঙ্গদা প্রেয়সী ও গৃহিণী দুই-ই—বিশুদ্ধ প্রেয়সী-সত্তা তাঁর জীবনের একটি অংশমাত্র, কিন্তু পূর্ণপরিণাম নয়। কিন্তু দেবযানী প্রেয়সী।

৮। "একবার ষ্টার থিয়েটা'রে ঐ নাটকখানি অভিনয় করাইবার প্রস্তাব হয়। উক্ত থিয়েটারের তৎকালীন অধ্যক্ষ নাট্যাচার্য শ্রীঅমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন যে, ঐ নাটকের পাত্র-পাত্রীদের নাম পরিবর্তন করিয়া কাল্পনিক নাম দিলে তিনি ঐ নাটিকা অভিনয় করিতে পারেন—নতুবা নহে।...দ্বিজেন্দ্রলাল অমৃতবাবুর কথামত নাটিকার পাত্র-পাত্রীদের নাম বদলাইয়া দিতে সম্মত হযেন নাই।"—দ্বিজেন্দ্রলাল নবকৃষ্ণ ঘোষ, পৃঃ ১০০।

৯।..."এ যে তার বাইরের জিনিষ, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথেষ্ট চরিত্র-শক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগলজীবনের জয়যাত্রার সহায়।" [সূচনা, চিত্রাঙ্গদা। রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড]।

প্রেমস্পর্ধায় দেবযানী কচের সঞ্জীবনীবিদ্যালাভের প্রতিযোগিনী হয়ে উঠেছেন। দেবযানীর প্রতিহত প্রেম কুপিতা সর্পিণীর মতো লব্ধকাম কচকে দংশন করেছে। অহল্যা মূলত প্রেয়সী, কিন্তু তিনি সন্তানেরও জননী; অথচ প্রণয়ীর সঙ্গে গৃহত্যাগকালে ক্ষুধার্ত সন্তানের কণ্ঠরোধ করতে তাঁর বাধে নি! তৃতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যে স্বহস্তে পুত্রহত্যার কথা মনে হয়ে অহল্যার মনে অনুশোচনার সৃষ্টি হয়েছে—এমন কি বক্ষে ছুরিকাঘাত করতেও উদ্যত হয়েছেন।

চিত্রাঙ্গদা ও দেবযানীর বিহ্বল যৌবনস্বপ্ন ও হৃদয়াবেগের মধ্যে যে চারিত্রিক সংযম ও দৃঢ়তা আছে, অহল্যা চরিত্রে তা সম্পূর্ণই অনুপস্থিত। চিত্রাঙ্গদা ও দেবযানী—দুই কাহিনীরই পুরুষ চরিত্র দুর্বল নয়। কচ কর্তব্যপরায়ণ ও পৌরুষগর্বী, অর্জুনের বীরচিত্তকেও মোহের বন্ধন বেশী দিন বেঁধে রাখতে পারে নি—তাঁর কীর্তিমুখরিত বৃহৎ জীবনের একটি আদর্শও তাঁর সম্মুখে জেগে উঠেছে। কিন্তু পাষাণীর ইন্দ্র লম্পট, পরস্ত্রীলোলুপ ও হীনচিত্ত পুরুষ—তার চরিত্রের কোন ঐশ্বর্য নেই। চিত্রাঙ্গদা ও দেবযানীর প্রেমকাহিনীর মধ্যে প্রেমের বিশ্লেষণ ও বিশেষ ভাবসত্যই উদ্ভাসিত হয়েছে। কিন্তু 'পাষাণী'তে শুধু দেহসম্ভোগের উদ্দাম শিখাই তার লুব্ধ-ফণা বিস্তার করেছে। গৌতমকে আদর্শ চরিত্ররূপে চিত্রিত করা হয়েছে। গৌতম প্রশান্তচিত্ত ও নির্বিকার। অহল্যার সমস্ত পাপকে তিনি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টির সাহায্যে শোধন করে নিয়েছেন। নাট্যকার অহল্যার সমস্ত আচার-আচরণকে একটি মানবীয় সহানুভূতির সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছেন। গৌতমের ক্ষমাশীল চরিত্রটি নাট্যকারের এই দৃষ্টিভঙ্গিকেই সার্থক করে তুলেছে। কিন্তু নাটকীয় চরিত্র হিসাবে গৌতম নিষ্প্রভ—আদর্শের প্রতিমূর্তি মাত্র, কোন মানবীয় দ্বন্দ্ব নেই। এই নাটকে নাট্যকার নারীর সংস্কারমুক্ত হৃদয়াবেগকে সমাজশাসনের উর্ধ্বে রূপ দিতে চেয়েছেন।[১০]

১০। "এই নাটকখানি পরবর্তী বাংলা বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের উপর কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও ইহা যে উনবিংশ শতাব্দীর নৈতিক আদর্শের গণ্ডী উত্তীর্ণ হইয়া বাংলাসাহিত্যে নূতন আদর্শের ইঙ্গিত দিয়াছিল, সেই হিসাবে ইহার মূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাংলা নাট্যসাহিত্যে ইহাতেই সর্বপ্রথম নির্ভীক সংস্কারমুক্ত বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া যায়।"—বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস : আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৬৬৭।

নাট্যশিল্প হিসাবে 'পাষাণী'কে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যকৃতি বলা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর গন্থ রোমান্টিক আখ্যায়িকা ও নাটকগুলির মতো একাধিক উত্তেজনামূলক অংশ আছে। গভীর নিশীথে সদ্যোজাগ্রত পুত্র শতানন্দকে কামমোহিতা জননীর নিষ্ঠুর হত্যা-প্রচেষ্টা, আত্মগ্লানিতে বক্ষে ছুরিকাঘাতের ব্যর্থ সঙ্কল্পের দৃশ্য, ইন্দ্রকে ছুরিকাঘাতের রোমাঞ্চকর ঘটনা—প্রভৃতি দৃশ্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকের কথাসাহিত্য ও নাটকের রোমহর্ষণ অতিনাটকীয় ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পঞ্চমাঙ্কে অহল্যার সঙ্গে গৌতমের মিলনদৃশ্যটিও নিতান্ত বহিরাশ্রয়ী ও আকস্মিক। 'পাষাণী' নাটকের নৈতিক অসঙ্গতিই সেকালের সমালোচকদের বিরুদ্ধ সমালোচনার কারণ হয়েছিল। কিন্তু শিল্পবিচারে নীতির অসঙ্গতির চেয়েও শিল্পগত অসঙ্গতি অনেক বেশী মারাত্মক। পুরাণকে ব্যাখ্যা দিতে হলেও তারও একটি মাত্রাবোধ থাকার প্রয়োজন। পুরাণকে লঘু করে 'কল্কি অবতার'-এর মতো প্রহসন বা বিদ্রূপাত্মক সাহিত্য রচিত হতে পারে, কিন্তু গুরুগম্ভীর নাটক রচনার পক্ষে অতিরিক্ত তরলতা রসাভাস ঘটায়। বিশ্বামিত্রের মতো একজন অচেনা মানুষকে নিয়ে চিরঞ্জীবের রসিকতা অত্যন্ত অসঙ্গত ও শ্রুতিকটু। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ধ্বনিগাম্ভীর্য ও যুক্তাক্ষরবহুল সমাসবদ্ধ বাক্যাংশের সঙ্গে চিরঞ্জীবের তরল রসিকতা নিতান্ত বেমানান হয়েছে। রাজপথের দৃশ্যগুলি ও জনসাধারণের অনুচিত কথোপকথন নাটকখানির ভাবগাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ করেছে। রসগত অসঙ্গতিগুলিই নাটকখানির পক্ষে সবচেয়ে পীড়াদায়ক ত্রুটি। প্রথমাঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে ইন্দ্রের সভা যেন একটি লম্পট জমিদারপুত্রের ইয়ার-মহল!

'পাষাণী' নাটকের মধ্যে চিরঞ্জীব ও মাধুরীর কাহিনীটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চিরঞ্জীব ও মাধুরীর কাহিনীটি সন্নিবিষ্ট হওয়ার জন্য নাট্যকারের মূল বক্তব্য পরিস্ফুট হয়েছে। দস্যু চিরঞ্জীব মহর্ষি গৌতমের স্পর্শে দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করে গৌতমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে, মিথিলার বারাঙ্গনা-শ্রেষ্ঠ মাধুরীও গৌতমের সান্নিধ্যে এসে পরিবর্তিতা হয়েছে। গৌতমের মাধ্যমে চিরঞ্জীব ও মাধুরীর বিবাহ হয়। মাধুরী চরিত্রটি ভাব-বৈপরীত্যের (contrast) দ্বারা অহল্যা চরিত্রটিকে ফুটিয়েছে। অহল্যা যখন তাঁর স্বামীর প্রতি অভিযোগ করেছেন ও অতৃপ্ত যৌবনবেদনার কথা মাধুরীকে জানিয়েছেন, তখন মাধুরী

তার উত্তরে তাদের বিবাহকালে গৌতমের নির্দেশবাক্যেরই প্রতিধ্বনি করেছেন :

বিবাহ বিলাস নহে, প্রেম লিপ্সা নহে।
পতিপত্নী পণ্যদ্রব্য নহে। বাছিবার,
মূল্য দিয়া ক্রয় করিবার বস্তু নহে,
বিবাহ কর্তব্য। প্রেম নিষ্কাম সাধনা।

[১ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য]

নিষ্কাম প্রেমসাধনা, পাতিব্রত্য ও সেবাব্রতই মাধুবীর কাছে সবচেয়ে বড় সত্য। চিরঞ্জীব চরিত্রের আপাত-রসিকতার অন্তরালে একটি গভীর দিক আছে। এই চরিত্র পরিকল্পনায় তিনি গিরিশচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এই নাটকে পৌরাণিক ভাবাদর্শ নেই সত্য, কিন্তু নাট্যকারের নিজস্ব সামাজিক আদর্শ পরিস্ফুট হয়েছে। পরপুরুষাসক্তা ব্যভিচারিণী নারীও ক্ষমার অ[illegible] [illegible]স, এমন কি বারাঙ্গনাকেও সমাজ সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করলে তার মধ্যেও আদর্শ পত্নীর সন্ধান পাওয়া যায়।—এই জাতীয় সামাজিক আদর্শই 'পাষাণী' নাটকে নাট্যকারের মূল বক্তব্য। সুতরাং রামায়ণকাহিনীর ছায়ায় দ্বিজেন্দ্রলাল নিজস্ব সমাজচিন্তাই পরিবেশন করেছেন। কলঙ্কিনী অহল্যার নিজের দোষের চেয়ে 'নীরস পাষাণস্তূপের' মতো স্বামী ও হীনচিত্ত প্রণয়ীর দায়িত্ব যে অনেক বেশী, এ কথাও তিনি অহল্যার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন (৪র্থ অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)। প্রণয়ীর নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানে, সামাজিক বিধানের নির্মমতায়, স্বকৃতকর্মের অনুশোচনায় ও সন্তান-হত্যার স্মৃতির দংশনে অধোন্মাদিনী অহল্যা যথার্থই পাষাণী'। বাস্তবের দিকে পাষাণী না হলেও ভাবের দিক থেকে অহল্যা পাষাণী ছাড়া আর কি ?[১১]

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকাব্যগুলির, বিশেষত 'পাষাণীর', উপরে রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্যগুলির প্রভাব আছে। ১৮৯২-১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই আট বছর রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্য রচনার পর্ব—এই পর্বের প্রথমগ্রন্থ চিত্রাঙ্গদা ও শেষগ্রন্থ

১১। বহ বহ ঝঞ্ঝা কর চূর্ণ ধূলিসাৎ
এই অরাজক রাজ্যে।—ভৈরব উল্লাসে
দাঁড়ায়ে দেখুক তাহা অহল্যা পাষাণী। (৪র্থ অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)

কর্ণকুন্তী সংবাদ। 'পাষাণী'তে 'চিত্রাঙ্গদা'র প্রভাব সবচেয়ে পরিস্ফুট। চতুর্থ অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষে অহল্যার মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা ও শতানন্দের অভিমানক্ষুব্ধ প্রত্যুত্তর 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ'-এর অনুরূপ দৃশ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কাব্যসংলাপগুলি ত্রুটিহীন নয়। মাঝে মাঝে গীতিকাব্যোচিত উন্মাদনা সংলাপগুলিকে গীতশ্রীমণ্ডিত করেছে। অহল্যার কুমারী জীবনের স্মৃতি পর্যালোচনা (১ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য) মধুসূদনের মেঘনাদবধকাব্যের চতুর্থ স্বর্গে বর্ণিত সীতার গোদাবরী-স্মৃতির অনুরূপ। দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথম দুটি দৃশ্যে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে অহল্যার যৌবনবেদনাকে সমন্বিত করে নাট্যকার এক উন্নত কবিশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। 'পাষাণী' নাটকে নাট্যকারকে গৌণ করে রোমান্টিক কবি দ্বিজেন্দ্রলালই প্রাধান্য লাভ করেছেন।

॥ ৪ ॥

পুস্তকাকারে প্রকাশকালের দিক থেকে বিচার করলে 'সীতা' নাট্যকাব্যটি 'তারাবাই'য়ের (১৯০৩) পরবর্তী রচনা (১৯০৮)। কিন্তু রচনাকালের দিক থেকে 'সীতা' নাটকটিই পূর্ববর্তী। এই নাট্যকাব্যটি দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাঙাদা' হরেন্দ্রলাল রায় সম্পাদিত নবপ্রভা পত্রিকায় ১৩০৭-এর ফাল্গুন থেকে ১৩০৯-এর পৌষ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। 'পাষাণী' নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন পুরাণের আধুনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, 'সীতা' নাটকেও তেমনি তিনি আধুনিক যুক্তিবাদী দৃষ্টির সাহায্যে পৌরাণিক কাহিনীর নূতন ভাষ্য রচনা করেছেন। রামায়ণের 'উত্তরকাণ্ড' ও ভবভূতির 'উত্তররাম-চরিত' নাটকের কাহিনী থেকে তিনি উপাদান সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু তিনি বাল্মীকি বা ভবভূতি—দুজনের কারও পথকেই সম্পূর্ণভাবে অবলম্বন করেন নি। নিজের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এই দুটি ক্লাসিক গ্রন্থের কাহিনী-পর্যায়কে প্রয়োজনমত গ্রহণ-বর্জন করেছেন। এই গ্রহণ-বর্জন ব্যাপারের মধ্যে নিজস্ব বিচারবুদ্ধি ও সমাজদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

বাল্মীকি রামায়ণের 'উত্তরকাণ্ড', ভবভূতির 'উত্তরচরিত' ও দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা'—এই তিনটি গ্রন্থের মধ্যে যুগ-জীবনের ব্যবধান বিরাট। দেশ-কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কের মধ্যেও গুরুতর পরিবর্তন

ঘটেছে। বাল্মীকির রামায়ণ 'খাঁটি' ও আদিমযুগের মহাকাব্য (Authentic Epic)। এই বীরযুগের (Heroic age) চারিত্রিক সমুন্নতি ও সামাজিক আদর্শও ছিল স্বতন্ত্র।[১২] কালিদাস-ভবভূতি প্রমুখ পরবর্তী কবিরা বাল্মীকির অক্ষয়ভাণ্ডার থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন বটে, কিন্তু বাল্মীকির জীবন-চিত্রণের সর্বঙ্কর সমগ্রতা ও বিশালতা তাঁদের কাব্যে রূপায়িত হওয়া সম্ভব ছিল না। বাল্মীকির রামায়ণের ঘটনাসূত্র মাত্র অবলম্বন করে ভবভূতি নিজের মতো করেই আখ্যায়িকা-বিন্যাস করেছিলেন। রামায়ণে বাল্মীকির আশ্রমে সীতার বাস, পুনর্মিলন বৃত্তান্ত ও মিলনান্তে পাতাল প্রবেশ প্রভৃতি কাহিনী যে ভাবে পরিকল্পিত হয়েছে, উত্তরচরিতে ঠিক সে ভাবে বর্ণিত হয় নি। উত্তরচরিতে সীতার রসাতল বাস, লবের যুদ্ধ ও রামের সঙ্গে সীতার মিলন সম্পূর্ণরূপেই রামায়ণবহির্ভূত ব্যাপার। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই বলেছেন :

"ভবভূতি মূল রামায়ণের গল্প প্রায় কিছুই গ্রহণ করেন নাই। প্রথমতঃ, রামায়ণের রাম প্রজারঞ্জনার্থ ছলে সীতাকে বনবাস দেন, ভবভূতির রাম প্রজানুরঞ্জনব্রতে বিনা ছলে জানকীকে নির্বাসিত করেন। দ্বিতীয়তঃ, ছিন্নশির শম্বুকের দিব্যমূর্তিগ্রহণ, ছায়াসীতার সহিত রামের সাক্ষাৎ ও লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ রামায়ণে নাই। সর্বাপেক্ষা গুরুতর বৈষম্য—রামের সহিত সীতার পুনর্মিলন।"[১৩]

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রয়োজনমতো রামায়ণ বা উত্তরচরিত থেকে উপাদান সংগ্রহ করলেও আধুনিক যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা তার খ্যাতকীর্তি পূর্বসূরীদের কাহিনীসূত্রকে তিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্জনও করেছেন। বলা বাহুল্য, 'সীতা' নাটকের বিরুদ্ধেও কবির এই স্বাধীন পরিকল্পনার জন্য অভিযোগ করা হয়েছিল। নাট্যকার 'সীতা' নাটকের ভূমিকায় বলেছেন "একজন সুধী সমালোচক কহিয়াছিলেন যে, আমি সীতার চরিত্র মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে গিয়া রাম-চরিত্র খর্ব করিয়াছি।" বাল্মীকি রামায়ণে সীতার নির্বাসন

১২। "কালিদাসের 'রঘুবংশ' পাঠ করিলে মনে হয়, ইহা কোন বিশেষ কবি কর্তৃক রচিত, রামায়ণ পাঠ করিলে মনে হয়, ইহা রচিত নহে—হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূমিভাগে ইহা শস্যের মত উৎপন্ন। কালিদাস আত্মসচেতন নিপুণ ভাস্কর, কিন্তু বাল্মীকি যেন সুনিপুণ কৃষক।"—ত্রয়ী (১ম সং)—ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পৃঃ ১৪।

১৩। কালিদাস ও ভবভূতি, পৃঃ ২৭৬-২৭৭ (বসুমতী সং)

ব্যাপারটি যেভাবে সংঘটিত হয়েছে, তা নাট্যকার সমর্থন করতে পারেন নি। রামায়ণে রামচন্দ্র বয়স্যদের মুখে সীতার লোকাপবাদের কথা শুনে, গঙ্গার অপরপারে তমসা নদীর তীরে সীতাকে নির্বাসন দেওয়ার জন্য লক্ষ্মণকে আদেশ করেছেন। লক্ষ্মণ গন্তব্যস্থানে নিয়ে গিয়ে সীতাকে রামের আদেশ জানালেন। শোকাভিভূতা সীতা অনেক বিলাপ করলেন। মুনিকুমারদের মুখে এই সংবাদ জেনে বাল্মীকি এসে তাঁকে আশ্রমে নিয়ে গেলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টিতে "শুদ্ধ বংশমর্যাদারক্ষার জন্য সীতার বনবাস" সমর্থনযোগ্য বোধ হয় নি, তা ছাড়া তিনি এর মধ্যে একটি "নিষ্ঠুর ছলনাও" দেখতে পেয়েছেন।[১৪] এইজন্য তিনি 'বনবাস-আখ্যানটিতে' ভবভূতিকেই অনুসরণ করেছেন। এর ফলে নাট্যকার রামচন্দ্র চরিত্রটিকে বনবাসের দায় থেকে অনেকখানি মুক্ত করবার চেষ্টা করেছেন। নাটকে দুর্মুখের মুখে সীতার লোকাপবাদের কথা শুনে রামচন্দ্র তাকে তীব্র ভর্ৎসনা করতেও কুণ্ঠিত হন নি।[১৫]

বাল্মীকির রামচন্দ্র চরিত্রে বংশের আভিজাত্য ও সমাজসত্তার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এই সামাজিক সত্তা তাঁর অনমনীয় মানসিক দৃঢ়তার মর্মমূলে, অথচ পত্নীত্যাগের মধ্যেও একটি গভীর বেদনা ছিল। কিন্তু গভীর শোকেও রামচন্দ্র তাঁর হৃদয়ের দৃঢ়তা হারান নি। বাল্মীকির রাম এখানে এমন একটি সমুন্নত মহিমালাভ করেছেন, যার তুলনা বিরল। ভবভূতির রামচরিত্রে সেই গাম্ভীর্য, ধৈর্য ও সমুন্নতি নেই। বাল্মীকির রামায়ণের পশ্চাৎপটে ছিল একটি বীরযুগের জীবনাদর্শ, ভবভূতির কালে আর সে যুগ নেই। সুতরাং

১৪। "মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণে ভগবান রামের চরিত্র যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহাতে এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, রামচন্দ্র শুদ্ধ বংশমর্যাদার জন্য সীতার বনবাস দিয়াছিলেন। তাহার উপরে, লক্ষ্মণের প্রতি তপোবনদর্শনচ্ছলে সীতাকে বনে লইয়া গিয়া সেখানে ছাড়িয়া আসিবার আজ্ঞায়, একটা নিষ্ঠুর ছলনাও লক্ষিত হয়। মহাকবি ভবভূতি এ দুইটির একটি স্থলেও বাল্মীকির অনুসরণ করেন নাই। আমি বনবাস আখ্যানটিতেই ভবভূতির পদানুসরণ করিয়াছি। এরূপ করায় আমার বিবেচনায়, রামের চরিত্র বাল্মীকির চিত্রিত চরিত্র অপেক্ষা হীন না হইয়া মহৎই হইয়াছে।"—ভূমিকা সীতা

১৫। কি কহিলি দুর্মুখ? আস্পর্ধা তোর অতি।
জানিস না কে সে, আর কে তুই দুর্মতি?
পথের কুক্কুর হেয়? —প্রথমাঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য—

'উত্তরচরিতে'র রাম অনেকখানি কোমল-প্রকৃতির।[১৬] দ্বিজেন্দ্রলালের রামচরিত্রে ভবভূতির প্রভাব থাকলেও ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার বিচিত্র দ্বন্দ্বকেই এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দুর্মুখের মুখে সীতার লোকাপবাদ শুনে রামচন্দ্রের হৃদয়াবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল—রাজ্য, ঐশ্বর্য, সমাজ প্রভৃতির শাসনকে অতিক্রম করে রামচন্দ্রের ব্যক্তিহৃদয়ের স্বাধীন বাসনাকে নাট্যকার রূপ দিয়েছেন :

" রাজ্য মিলাইয়া যাক স্বপ্নলব্ধ
ঐশ্বর্যের মত, চূর্ণ হোক পদতলে
এ প্রাসাদ, ভেসে যাক্, সবযূর জলে
এ অযোধ্যাপুরী। সূর্যবংশ ব্রহ্মশাপে
ভস্ম হয়ে যাক। * * *
* * তবু হৃদয়ে আসীন
সীতা—পতিপ্রাণা সীতা রবে চিরদিন
এই বক্ষে, ভস্মীভূত বিশ্বচরাচরে,
ব্যোমব্যাপী ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংসের ভিতরে।

[১ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য]

কিন্তু রামচন্দ্র এই ব্যক্তিসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করাতে পারেন নি। তাই ক্ষণিক স্ফুলিঙ্গের মতো যা জ্বলে উঠেছিল, বশিষ্ঠের নির্দেশে তা মুহূর্তকাল পরেই শীতল ভস্মে পরিণত হয়েছে—ব্যক্তিহৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা সমাজবিধানের রথচক্রতলে নিষ্পিষ্ট হয়েছে, রামচন্দ্রের ইচ্ছাশক্তিও যেন সমাজ-বিধাতারূপী বশিষ্ঠের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে :

১৬। "বাস্তবিক সর্বত্রই, রামায়ণের রামচন্দ্র হইতে ভবভূতির রামচন্দ্র অধিকতর কোমল প্রকৃতির। ইহার এক কারণ, এই উত্তরচরিত্র গ্রন্থ রচনার সময়োপযোগী। রামায়ণ প্রাচীন গ্রন্থ, কেহ কেহ বলেন যে, উত্তরকাণ্ড বাল্মীকি প্রণীত নহে। তাহা হউক বা না হউক, ইহা যে প্রাচীন রচনা তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। তখন আর্যজাতি বীরজাতি ছিলেন—আর্য রাজগণ বীরস্বভাবসম্পন্ন ছিলেন। রামায়ণের রাম মহাবীর, তাঁহার চরিত্র গাম্ভীর্য ও ধৈর্যে পরিপূর্ণ। ভবভূতি যৎকালে কবি তখন ভারতবর্ষীয়েরা আর সে চরিত্রের নহেন। ভোগাকাঙ্ক্ষা আলস্যাদির দ্বারা তাঁহাদের চরিত্র কোমলপ্রকৃতি হইয়াছিল। ভবভূতির রামচন্দ্রও সেইরূপ।"

—উত্তরচরিত : বঙ্কিমচন্দ্র : বিবিধ প্রবন্ধ (১ম খণ্ড)

গুরুদেব। বুঝি না এ বাণী।
তুমি আজ্ঞা কর আমি কার্য করি।
এই মাত্র জানি। [২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য]

আবার মাতা কৌশল্যার অনুনয়ে রামচন্দ্রের মত-পরিবর্তন হয়েছে। মাতৃভক্তির প্রবলতার কাছে গুরু-আজ্ঞাও গৌণ হয়েছে :

…জননী আমার।
সত্যভঙ্গ হোক্ ভস্ম হোক্ রাম ;
মা তোমার হোক্ পূর্ণ মনস্কাম। [২য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য]

দ্বিজেন্দ্রলাল রামচন্দের চরিত্রকে সীতা-নির্বাসনের ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণভাবে দায়মুক্ত করাব চেষ্টা কবেছেন, বশিষ্ঠের আজ্ঞাকেই এর জন্য দাবী করা হযেছে। কিন্তু এত কবেও নাট্যকার রামচরিত্রকে মহৎ কবতে পাবেন নি। বাল্মীকির রাম কতব্যে বলিষ্ঠ, প্রেম ও আদর্শের সুসম সমন্বয়ে মহিমান্বিত। দ্বিজেন্দ্রলালেব বামচরিত্রে ভারসাম্যেব অভাব ঘটেছে। ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগ, গুরু বশিষ্ঠেব সামাজিক শাসন ও মাতৃভক্তি—এই ত্রিধাবিভক্ত তরঙ্গলীলায় তাঁর মনোজীবন আন্দোলিত হযেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের রাম প্রেমিক ও দুর্বলচিত্ত একজন সাধারণ মানুষ। বনবাস ব্যাপারের দাযিত্ব থেকে বামচন্দ্রকে মুক্ত কবেছেন বটে, কিন্তু নাট্যকাব তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে চরিত্রটিকে 'মহৎ' করে তুলতে পারেন নি। সীতাই পতিসত্য রক্ষার জন্য স্বেচ্ছানির্বাসন ববণ করে তাঁর দোলাচলচিত্ত স্বামীকে আসন্ন সঙ্কট থেকে মুক্ত কবেছেন।

উত্তররচবিতের তৃতীয়াঙ্কে বর্ণিত সীতার রসাতলবাসের কাহিনী নাট্যকাব অনুসরণ করেন নি। সীতার নির্বাসনের পরেও রামচন্দ্রের তীব্র অনুশোচনা ও মনোবেদনাকে নাট্যকার উজ্জীবিত রেখেছেন। চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে রামেব অন্তর্বেদনা ও মনস্তাপের তীব্রতাব পরিচয় পাওয়া যায়—এমন কি তিনি কৌশল্যার কাছে তাঁর মৃত্যুকামনা পর্যন্তও ব্যক্ত করেছেন :

এখনো যে বেঁচে আছি,
এই মা আশ্চর্য। এই দেহপাত হলে বাঁচি।
জানো না মা কি যন্ত্রণা, কি যে চিন্তা, জাগরুক
নিত্যবক্ষে, পারি না মা আর—
ফেটে যায় বুক।

অনন্ত নির্ভর তার, অনন্ত বিশ্বাস তার,
অনন্ত সে প্রেমের কি করিয়াছি অবিচার।

[৪র্থ অঙ্ক, ১ম দৃশ্য]

দ্বিজেন্দ্রলালের রামচন্দ্র দুর্বল, সমাজবিধানকেও সর্বান্তঃকরণে মেনে নিতে পারেন নি—অথচ সমাজশক্তিকেও অস্বীকার করার সাধ্য তাঁর ছিল না। তাই সমাজসত্তার পাষাণ কারাগারে অবরুদ্ধ অসহায় ব্যক্তিসত্তা বার বার নিষ্ফল আর্তনাদ করেছে।

শূদ্রকের শিরশ্ছেদ কাহিনীকে দ্বিজেন্দ্রলাল নূতন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। রামায়ণে শূদ্রকহত্যাকে রামচন্দ্র কোনও গর্হিত কাজ বলে মনে করেন নি। নারদ যখন দ্বাপরে শূদ্রের তপস্যাকে পাপ বলে নির্দেশ করলেন, তখন রামচন্দ্রও শূদ্রককে বধযোগ্যই মনে করলেন। এই কার্যের জন্য তিনি নিজেকে অপরাধী মনে করেন নি—তাঁর হৃদয়ে কোনো দ্বন্দ্ব বা অনুশোচনাও হয় নি। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের রামচন্দ্র বশিষ্ঠের নির্দেশে শূদ্রকবধ করেছেন—এখানে রামচন্দ্রের কোনো নিজস্ব অভিমত বা ইচ্ছাশক্তি নেই, নিতান্ত যন্ত্রচালিতের মতো গুরু-আজ্ঞা শিরোধার্য করেছেন। শূদ্রককে হত্যা করার জন্যও রামচন্দ্র তীব্র মর্মযাতনা অনুভব করেছেন। মৃত্যুর পূর্বে শূদ্রকরাজ রামচন্দ্রের কাছে যে অভিনব মানবধর্ম ব্যাখ্যা করেছেন, দ্বিজেন্দ্রলালের রাম চরিত্রকে তা-ও বিচলিত করেছে। কারণ তাঁর আন্তর-সত্যের সঙ্গে সত্যসন্ধ শূদ্রকরাজের কোনো বিরোধ নেই। ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে সমাজচেতনার এই বিরোধ-চিত্রণ দ্বিজেন্দ্রলালের আধুনিক জীবনদৃষ্টির পরিচায়ক। বশিষ্ঠ ও বাল্মীকির বিতর্কের কাহিনী যুক্ত করে দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন একদিকে তাঁর জীবনদর্শনকে সুস্পষ্ট করে তুলেছেন, তেমনি অন্যদিকে সীতাগ্রহণ সমস্যার উপরেও আলোকপাত করেছেন। এখানে বশিষ্ঠ যেমন সমাজসত্তার প্রতিনিধি, বাল্মীকি তেমনি প্রেমসত্তার প্রতিনিধি। বাল্মীকির মতে :

প্রেম সত্য, প্রেম পুণ্য, প্রেম কভু মিথ্যা নাহি কহে।
যেথা ধর্ম সেথা প্রেম ; যেথা পাপ, প্রেম নাহি রহে।
প্রেম প্রভু ; কর্তব্য তাহার ভৃত্য।

[৫ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য]

বাল্মীকির এই অভিনব প্রেমমন্ত্রের প্রভাবেই শেষ পর্যন্ত বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে

সীতাগ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, প্রেম ও কর্তব্যবোধের নূতন মূল্য নির্ণয় নাট্যকারের বক্তব্যকেই সূচিত করেছে।

ভবভূতির নাটকের পরিণতি মিলনান্তক। বাল্মীকির আশ্রমে নাট্যাভিনয়, লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ, রামচন্দ্রের অভিনয়ক্ষেত্রে উপস্থিতি—এ সমস্ত ঘটনাবর্ণনায় ভবভূতি নিজস্ব কল্পনার উপব নির্ভর করেছেন। নাট্যাভিনয়ের ভিতর দিয়েই ভবভূতি রাম-সীতার পুনর্মিলন ঘটিয়েছেন। ভবভূতি রামায়ণের 'সীতার পাতাল প্রবেশ' কাহিনীর অনুসরণ করেন নি। দ্বিজেন্দ্রলাল এক্ষেত্রে ভবভূতিকে অনুসরণ না করে প্রধানত বাল্মীকিরই অনুসরণ করেছেন, কিন্তু সর্বাংশে নয়। ভবভূতির মিলনান্ত পরিণতি অনুসরণ না করার কারণ লেখক নিজেই নির্দেশ করেছেন : "ভবভূতি যে অঙ্কে প্রণয়ী যুগলের চিরবিচ্ছেদ-স্থলে মিলন-সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা অলঙ্কারশাস্ত্রের একটি নিয়ম-রক্ষার্থ। অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়ম এই যে—নাটক সুখ-দৃশ্যে শেষ করিতে হইবে। Tragedy হইবার যো নাই।...আমি এই নিয়মটি অনুমোদন করিতে পারি না।...অভিনয়ে প্রদর্শিত এই গভীর করুণ দৃশ্যের পরে কল্পিত মিলন মৃত্যুর পরে উন্মাদের হাস্যের ন্যায় মনে হয়, পরিত্যক্ত নগরীর উপরে প্রভাতের সূর্যরশ্মির ন্যায় প্রতিভাত হয়, ক্রন্দনের পর বাদ্যের মত প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ভবভূতি কি করিবেন? মিলন করিতেই হইবে। তিনি কাব্যকলাকে বধ করিয়া অলঙ্কারশাস্ত্রকে বাঁচাইলেন।"[১৭]

দ্বিজেন্দ্রলাল ভবভূতির কবিত্ব সম্পর্কে সপ্রশংস মন্তব্য করলেও তাঁর রাম ও সীতা চরিত্র সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যই করেছেন। তিনি বলেছেন : "রাম যেমন স্ত্রৈণ বাঙালী, তাঁহার সীতা সেইরূপ সাধ্বী বঙ্গবধূ।" অথচ বাল্মীকির পাতাল-প্রবেশ বৃত্তান্তকে তিনি স্বাভাবিক একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বাল্মীকির আনুকূল্যে রামচন্দ্র পত্নী ও পুত্রদ্বয়কে পেয়েছেন। এত বিপর্যয়ের পরে যখন মিলনের সেই লগ্নটি এল, তখনই নাট্যকার ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে নাটকের বিয়োগান্ত পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। কারণ বাল্মীকির রামায়ণের পাতালপ্রবেশ কাহিনীটি নাট্যকারের কাছে অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত ব্যাপার বলে মনে হয়েছে। তাই তিনি পাতালপ্রবেশের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হিসাবে ভূমিকম্পের অবতারণা করেছেন। কিন্তু এই

১৭। কালিদাস ও ভবভূতি।

পরিবর্তন নাট্যরসকে ক্ষুণ্ণই করেছে। কারণ ভূমিকম্পের অবতারণা নিতান্তই আকস্মিক। কাহিনীর গাম্ভীর্যের সঙ্গে এই লৌকিক ও তুচ্ছ পরিণতির কোনো মিল নেই। মাত্র কয়েকটি শ্লোকে বাল্মীকি সীতার পাতালপ্রবেশের যে অসাধারণ ছবি এঁকেছেন, তার তুলনা নেই। সীতার অন্তিম প্রার্থনাও এই ভীষণ-রমণীয় পরিবেশের সম্পূর্ণ উপযোগী।[১৮] দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের পরিণতি নিতান্ত অসঙ্গত ও লঘুধর্মী।

নাট্যকারের সহানুভূতি প্রধানত সীতা চরিত্রের দিকেই আকৃষ্ট হয়েছে। রাম চরিত্রকে বনবাসের দায় থেকে মুক্ত করার জন্য নাট্যকার সীতার যে স্বেচ্ছানির্বাসন কল্পনা করেছেন, তাতে সীতা চরিত্রের মাহাত্ম্যই সূচিত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের সীতা যথার্থই 'রামৈকজীবিতা'—অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বরী হয়েও তিনি ভোগবিলাসবঞ্চিতা। নিজের চরম দুঃখের দিনেও অতীতের সেই স্বামিসৌভাগ্যচিন্তায় বিভোর। নাট্যকার তাঁর হৃদয়ের সমস্ত মাধুর্য ও রেখা দিয়ে এই মহীয়সী নারী-চরিত্রটি রচনা করেছেন।[১৯] "পতি-সত্য" রক্ষার জন্য তার স্বেচ্ছানির্বাসন বরণই তাঁর দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে উঠেছে। বনবাস-জীবনের তপস্বিনীদের সঙ্গেও নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে দিতে পারেন নি। সন্তানদের পিতৃপরিচয় দিতে না পেরেও তিনি তীব্র মর্মযাতনা ভোগ করেছেন। অতীত সুখস্মৃতির পর্যালোচনা তার বনবাস-জীবনকে স্মৃতির বেদনায় কণ্টকিত করে তুলেছে। রাম সমাজসত্তা ও ব্যক্তিসত্তার দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন, আর সীতা মহৎ হয়েও বিরুদ্ধ পরিবেশের জন্য দুঃখভোগ করেছেন।

১৮। যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥
মনসা কর্মণা বাচা যথা রামং সমর্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি।
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥—

(রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, সপ্তনবতিতম সর্গ, শ্লোক নং ১৪-১৬)

১৯। "সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতির কথা সুন্দর, চমৎকার। আমি তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি।"—ভূমিকা · সীতা।

প্রথমাঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে রাজ-অন্তঃপুরের দৃশ্যটির মধ্যে চার বধূ ও শান্তা-চরিত্রের যে রেখাঙ্কন আছে, তাতে চরিত্রগুলির সুস্পষ্ট প্রকৃতিধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। অপ্রধান চরিত্র অঙ্কনে, অন্তত এই দৃশ্যটিতে, নাট্যকারের কৃতিত্ব আছে। চিত্রটি প্রথম দৃশ্যের পরিপূরক—পারিবারিক সম্মেলনের এক স্মৃতিমধুর ছবি। কিন্তু পারিবারিক চিত্রগুলির মধ্যে এমন দু-একটি দৃশ্য আছে যা নাটকীয় ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে মোটেই সমন্বিত হয় নি। উদাহরণস্বরূপ লক্ষ্মণ-উর্মিলার দৃশ্যটির (১৷৩) কথা উল্লেখ করা যায়। নাটকীয় ঘটনাসংঘাতের পক্ষে এই জাতীয় দৃশ্য নিতান্ত অবান্তর। নাটকের মধ্যে এই দৃশ্যটি সংযোগ করে নাট্যকার তার কবিত্বশক্তির অপব্যয় করেছেন। নারী-চরিত্রের মধ্যে কৌশল্যা চরিত্রেরই কিছু ভারসাম্য আছে। ভবভূতির ছায়া-সীতার আদর্শে দ্বিজেন্দ্রলাল রামের 'জাগ্রত তন্দ্রায়' সীতার মূর্তি দেখিয়েছেন। কিন্তু ছায়া-সীতাকে তিনি রামের চিত্তদাহ ও মনোবিকারের সঙ্গে যুক্ত করে তাকে মনস্তত্ত্বসম্মত রূপ দিয়েছেন (৪৷৬)। অবশ্য কাব্য-সৌন্দর্যে ভবভূতির 'ছায়া-সীতা' অংশটির সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যাংশের কোন তুলনাই হয় না। সীতার বনবাস জীবনের ও রামচন্দ্রের জন-স্থান-দর্শনের যে স্মৃতিপর্যালোচনা আছে, তারও মূল প্রেরণা ভবভূতির উত্তরচরিত। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে ভবভূতির অতুলনীয় গীতিলাবণ্য অনুপস্থিত। 'গোদাবরী-শীকরশীতল' পঞ্চবটীর সীতাস্মৃতিরঞ্জিত অরণ্যভূমির বর্ণনায় ভবভূতি তাঁর সমস্ত কবিকল্পনাকে নিঃশেষ করে ঢেলে দিয়েছেন। কিন্তু 'সীতা' নাটকের রাম ও সীতার সংলাপের কোনো কোনো অংশ উচ্চাঙ্গের কবিত্বশক্তির পরিচয় দেয়। প্রকৃতি ও মানবের হৃদয়কে একই ভাবসত্যে মণ্ডিত করে দ্বিজেন্দ্রলাল যখন সংলাপ রচনা করেন, তখন সংলাপগুলিকে বিচ্ছিন্ন গীতিকাব্য বলেই মনে হয়—প্রকৃতি মানবহৃদয়ের আনন্দ-বেদনায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠে। বিচ্ছিন্ন গীতিকবিতা হিসাবে এর মূল্য থাকলেও নাটকীয় সংলাপ হিসাবে এই জাতীয় উক্তি সর্বত্র সার্থক হয় নি। কিন্তু এ সমস্ত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও 'সীতা' নাট্যকাব্যটিকে দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি বলা যায়।

॥ ৫ ॥

দ্বিজেন্দ্রলালের তৃতীয় ও সর্বশেষ পৌরাণিক নাটক 'ভীষ্ম' তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় (৮ই জানুআরি ১৯১৪)। নাটকটি নাট্যকারের জীবদ্দশায় রচিত হয়েও অনেককাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি।[২০] দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম দুখানি নাটকে 'রামায়ণ' থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন, আর 'ভীষ্ম' নাটকের উপাদান সংগ্রহ করেছেন মহাভারত থেকে। প্রথম দুটি নাটকের মতো 'ভীষ্ম' নাটকটিতেও দ্বিজেন্দ্রলাল মহাভারতকে সর্বাংশে অনুসরণ করেন নি, প্রয়োজনমতো তিনি মহাভারতীয় কাহিনীর গ্রহণ-বর্জন করেছেন। আবার কোনো কোনো বিষয়ে তিনি নিজস্ব পরিকল্পনার উপর নির্ভর করেছেন। নাট্যকার মহাভারতীয় কাহিনীর যে যে অংশের পরিবর্তন করেছেন ভূমিকায় তাদের উল্লেখ করেছেন। মহাভারতীয় কাহিনীর রূপান্তরের জন্য নাটকটির শিল্পগত তারতম্য ঘটেছে কিনা, তা ই সর্বপ্রথম বিচার্য।

নাটকটির কেন্দ্রীয় চরিত্র ভীষ্ম। এই চরিত্রটির সমুন্নত আদর্শ ও মাহাত্ম্য উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়ে তোলাই নাট্যকারের মূল অভিপ্রায়। তিনি ভীষ্মের সমগ্র জীবনবৃত্ত নাটকে রূপায়িত করতে চান নি, শুধু তার চরিত্রগৌরবকেই আলোকিত করতে চেয়েছেন। তাই মহাভারতের বিপুলায়তন কলেবর থেকে অনেক কাহিনী বর্জন করতে হয়েছে, কিন্তু ভীষ্ম চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার পক্ষে যে অংশ প্রাসঙ্গিক সেইটুকুকেই তিনি নাটকীয় ঘটনার মধ্যে প্রাধান্য দিয়েছেন। অষ্টবসুর বিবরণ বা ভীষ্মের পূর্বজন্মের কাহিনীসূত্রকে নাটকীয় ঘটনার মধ্যে রূপ দেওয়া হয় নি—ভীষণ প্রতিজ্ঞা করে যখন তিনি 'ভীষ্ম' আখ্যা পেয়েছেন, তখনই নাটকের যবনিকা উন্মোচিত হয়েছে। নাট্যকার নিজেই ভূমিকায় তাঁর উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন: "আমি ভীষ্মের জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে বসি নাই। কিংবা ভীষ্ম সম্বন্ধে মহাভারতের বর্ণিত কাব্যটুকু সঙ্কলন করিতেও বসি নাই। ভীষ্মের জন্মবৃত্তান্ত হইতে নাটক আরম্ভ না করিয়া সেইজন্য

২০। "স্টার থিয়েটারের তৎকালীন অধ্যক্ষ জনপ্রিয় অভিনেতা ৺অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এই নাটকখানি উক্ত থিয়েটারে অভিনয় করিতে গ্রহণ করিয়া লক্ষেপ করায় নাটকখানি দ্বিজেন্দ্রলালের জীবদ্দশায় রচিত হইয়াও বহুদিন পড়িয়া ছিল—নাট্যকারের জীবনাবসানের পর তদীয় পুত্র ইহা প্রকাশ করেন।"—দ্বিজেন্দ্রলাল: নবকৃষ্ণ ঘোষ, পৃঃ ২০৭।

আমি তাঁহার প্রতিজ্ঞা হইতে এই নাটক আরম্ভ করিয়াছি, এবং কোন কোন স্থলে বিশুদ্ধ কল্পনার সাহায্য লইয়াছি।" অষ্টবসুর বিবরণ, অভিশাপকাহিনী ও গঙ্গা-শান্তনু উপাখ্যান বর্জন করার ফলে নাটকীয় কাহিনীর ঘটনাসংহতি রক্ষার পক্ষে সহায়ক হয়েছে। কারণ ভীষ্মের দীর্ঘবিস্তৃত জীবনকাহিনীকে নাটকীয় কাহিনীর গ্রন্থন-সংহতির দ্বারা রূপান্বিত করা এমনই একটি দুরূহ ব্যাপার, তার উপর পূর্বজন্মের কাহিনীসূত্র টেনে আনলে তো কোনো কথাই নেই! ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর 'ভীষ্ম' নাটকের (১৯১৩) মধ্যে ভীষ্মের জন্মান্তরের ঘটনা সংযুক্ত করে কাহিনীকে ভারাক্রান্ত ও অযথা-জটিল করেছেন মাত্র। দ্বিতীয়ত, কাহিনীর এই অংশ বর্জন করার মূলে আর একটি কারণ থাকাও সম্ভব। দ্বিজেন্দ্রলাল যতদূর সম্ভব পৌরাণিক কাহিনীকে অতিপ্রাকৃত ঘটনার প্রভাব মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন—তাই তিনি ভীষ্মের পূর্বজন্ম-সূত্র টানতে চান নি।

'ভীষ্ম' নাটকের সুদীর্ঘ অম্বা-কাহিনীটি মহাভারতীয় ঘটনার আর একটি গুরুতর ব্যতিক্রম। নাট্যকারের মতে· "ভীষ্মের সহিত অম্বার সম্প্রীতি নাটকানুসারে কল্পিত হইয়াছে। তাঁহার প্রতিজ্ঞার কঠোরত্ব ও চরিত্রমাহাত্ম্য তাহাতে বর্ধিত হইয়াছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।" মহাভারতে অম্বা-কাহিনী আছে, কিন্তু তা নিতান্তই গৌণ ও সঙ্কুচিত, কিন্তু নাট্যকার তাঁর কল্পনার দীপ্তিতে এই অংশকে বর্ণোজ্জ্বল করে তুলেছেন। ভীষ্মের সঙ্গে অম্বার প্রণয়কাহিনী ও তার ব্যর্থ পরিণতি রোমান্টিক কবি দ্বিজেন্দ্রলালের সৃষ্টি। কিন্তু নাটকীয় ঘটনা হিসাবে এই কল্পিত কাহিনীটির শিল্পমূল্য নির্ধারণ করা উচিত। প্রথমাঙ্ক সপ্তম দৃশ্যের প্রথমে অম্বার সংলাপাংশ থেকেই ভীষ্ম-অম্বার পূর্বরাগবৃত্তান্ত জানা যায়—এমন কি এ ঘটনা সখীদেরও অজানা ছিল না। ভীষ্মের প্রত্যাখ্যান-দৃশ্যের মধ্যে তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা ও কর্তব্য-কঠোরতাই প্রকাশিত হয়েছে—তরুণী অম্বার অসংবরণীয় তীব্র হৃদয়াবেগ ভীষ্মের সঙ্কল্পকঠোর চরিত্রের সমুন্নত পাষাণপ্রাচীরে প্রতিহত হয়েছে। তৃতীয়াঙ্ক ষষ্ঠ দৃশ্য অম্বা-কাহিনীর চূড়ান্ত অংশ। শাল্বের কাছ থেকে নির্মমভাবে লাঞ্ছিত ও প্রতিহত হয়ে অম্বা ভীষ্মের কাছে শেষ প্রচেষ্টার জন্য ফিরে এসেছেন। প্রণয়বিমূঢ়া কাশীরাজকন্যার সঙ্গে কথোপকথনকালে ভীষ্মচরিত্রের মহিমা তুঙ্গস্পর্শী হয়ে উঠেছে। এ দৃশ্যটিতে ভীষ্মচরিত্রটির অগ্নিপরীক্ষা হয়েছে।

সুতরাং অম্বা-কাহিনীর পল্লবিত রূপায়ণে 'ভীষ্মের কঠোরত্ব ও চরিত্র-মাহাত্ম্য' বর্ধিত হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এর দ্বারা নাট্যকারের আর একটি উদ্দেশ্যও সাধিত হয়েছে। মহাভারতের ভীষ্ম চরিত্রটি এক অতিমানবীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, এই চরিত্রে মানবীয় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও দুর্বলতার কোনো অবকাশ নেই। হস্তিনাপুরীর রাজসিংহাসনের মোহ ত্যাগ করে তিনি আমরণ ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করেছিলেন, নারীসম্পর্কিত কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তাঁর চরিত্রে স্থান পাওয়াও সম্ভব ছিল না। কিন্তু নাট্যকার অম্বা-কাহিনীর ভিতর দিয়ে ভীষ্ম চরিত্রের মানবীয় সংঘাতকে রূপায়িত করেছেন। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভীষ্ম যখন অম্বার কাছে শেষ বিদায় নিতে এসেছেন, তখন তাঁর চরিত্রের প্রেম ও কর্তব্যের দ্বন্দ্বটি সম্পূর্ণরূপে মানবীয়

……দেখি ক্ষণকাল তরে
এ স্বর্ণপ্রতিমা, পরে বিসর্জিব তারে
বিস্মৃতিসলিলে। একি অপূর্বগরিমা!

*　　*　　*

এর বিসর্জিতে হবে।—স্বর্গে দেবগণ!
এ হৃদয়ে বল দাও। সন্দেহ দ্বিধায়
কম্পিত ব্যাকুল চিত্ত শান্ত কর আজি।

[১ম অঙ্ক, ৭ম দৃশ্য]

শাল্বের নিকট প্রত্যাখ্যাতা ও লাঞ্ছিতা হয়ে যখন অম্বা শেফালীর মতো ভীষ্মের কাছে প্রণয়-নিবেদন করতে এসেছেন তখন ভীষ্মের উক্তির মধ্যে প্রেমের এক উচ্চতর সুরই ধ্বনিত হয়েছে—কিন্তু তার মধ্যেও মানবীয় দুর্বলতা অনুপস্থিত নয়:

কামজয় করি নাই। করিতাম যদি,
তোমারে এতই ভালবাসি, কামজয়ী
হইতাম যদি, তবে তোমারে সবলে
আঁকড়িয়া ধরিতাম নিজ বক্ষ-মাঝে,
দুগ্ধপোষ্য শিশুসম নিশ্চিন্ত নির্ভয়।

*　　*　　*

না, না ! আমি নহি কামজয়ী। তাই ডরি
আপনারে, তাই ডরি রমণীরে, তাই
মা মা বলে তার পানে ছুটে যেতে চাই
স্নেহের পবিত্র তীর্থে তীর্থযাত্রীসম ;
তাহা হতে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করি,
পলায় যেমতি নর অজগর হতে।

[৩য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য]

ভীষ্ম ও অম্বার সম্প্রীতিমূলক আখ্যায়িকা ভীষ্ম চরিত্রকেই শুধু অনন্য-সাধারণ মাহাত্ম্য দেয় নি, সমগ্র নাটকের মধ্যে ও গতিসঞ্চার করেছে। অম্বার চরিত্রে উচ্ছ্বসিত প্রণয়াবেগ ও তীব্র প্রতিহিংসাস্পৃহা নাটকীয়, কিন্তু মাঝে মাঝে আতিশয্যদোষও আছে।

সত্যবতী কাহিনীর প্রায় সমগ্র অংশই নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত। নাট্যকার এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তিনি 'ভূমিকায়' লিখেছেন : "সত্যবতী ধীবরনন্দিনী, ধর্মভ্রষ্টা কুমারী। তিনি ঋষির নিকট 'অনন্তযৌবন' বর চাহিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ভীষ্মের পতনসংবাদে যে তিনি মুহূর্তে স্থবিরা হইয়া গিয়াছিলেন, ইহা মহাভারতে বর্ণিত উপাখ্যানে নাই। তিনি সে সময় বাঁচিয়া ছিলেন কিনা সন্দেহ। এ স্থলে আমি কাব্য হিসাবে কল্পনার সাহায্য লইয়াছি।" মহাভারতের আদিপর্বেই সত্যবতীর মৃত্যুর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সত্যবতীর চরিত্রকে নিজস্ব কল্পনায় মণ্ডিত করতে গিয়ে নাট্যকারকে অনেকখানি রূপান্তর ঘটাতে হয়েছে। শান্তনু যেন একজন রূপমুগ্ধ, কামুক, বৃদ্ধ আর যেন সত্যবতী তাঁর অতৃপ্তযৌবনা তরুণীভার্যা—দেহসম্ভোগের উদ্দাম কামনায় তাঁর চরিত্রটি আতিশয্য-দোষদুষ্ট। মুমূর্ষু স্বামীকে কঠোর ভাষায় অভিযোগ করতে তাঁর চিত্ত দ্বিধাগ্রস্ত হয় নি :

ক্রীত এই দেহ লয়ে তুষ্ট রহ তুমি ,
এ হৃদয় পাও নাই, পাইবে না কভু।

[২য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য]

শান্তনুর মৃত্যুসংবাদের সঙ্গে সঙ্গেই সত্যবতী যে কথা বলেছেন তা যেমন অসঙ্গত তেমনি বীভৎস :

যাক্! মৃত মহারাজ!
আর পরাধীন নহি। আজ মুক্ত আমি।
আজ স্বেচ্ছাধীন আমি—ওহো কি উল্লাস!
হাঁ, লইব প্রতিশোধ—করিব সম্ভোগ,
কিসের সঙ্কোচ? ধর্ম দিয়াছি শৈশবে;
ধীবরনন্দিনী আমি—অনন্তযৌবনা।

[২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য]

বিধবা মহিষীর শাল্বরাজের কাছে প্রণয়নিবেদন ও ক্ষমতালিপ্সার ছবিটি শুধু অ-মহাভারতীয়ই নয়, সূক্ষ্ম ও সুমার্জিত রসবোধের পরিচায়কও নয়। স্বামীর মৃত্যুর পরমুহূর্তেই পরপুরুষের কাছে আত্মসমর্পণের মধ্যে কোন কার্যকারণ-সম্পর্ক নেই—নিতান্তই আকস্মিক একটি ঘটনা। দ্বিজেন্দ্রলাল সত্যবতীকে লৌকিক জগতের একটি অতৃপ্তযৌবনা ক্ষমতালিপ্সু নারীতে পরিণত করেছেন [illegible] সামাজিক জীবনের 'বৃদ্ধস্য তরুণীভার্যা'-র একটি সম্ভাব্য পরিণতি দেখানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আকস্মিকতা ও আতিশয্যদোষে নাট্যকারের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ব্যাসজননীর এই ঘৃণ্যতম পরিণতি রসচেতনাকেই আহত করে। তা ছাড়াও, নাট্যকারের এই চরিত্রটি তাঁর মূল অভিপ্রায়কে সার্থক করতে পারে নি। সত্যবতী চরিত্রের এই রূপান্তর ভীষ্ম চরিত্রের মাহাত্ম্য ফোটাতে কোনো সাহায্যই করে না। চরিত্রটির অতিবিস্তৃতি নাটকীয় গতিবেগ বা চরিত্র সৃষ্টির কোনো সহায়তাই করে না।

নাট্যকার শাল্ব-চরিত্রকেও অতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়ে তাকে মসীবর্ণে রঞ্জিত করেছেন। দাশরাজ, দাশরাজ্ঞী বা সপার্ষদ শাল্বের আচার-আচরণ নাটককে অনাবশ্যকভাবে লঘু করেছে। হাস্যরস ফোটাতে গিয়ে নাট্যকার নাট্যরসকে ক্ষুণ্ণ করেছেন। দুর্বল ও যক্ষ্মারোগগ্রস্ত বিচিত্রবীর্যকে একজন অলস কবি ও দুর্বল দার্শনিক করে তোলা হয়েছে—এতে নাটকের কোন গৌরববৃদ্ধি হয় নি। অম্বিকা-অম্বালিকা চরিত্র দুটিকে সদাহাস্যময়ী চঞ্চলা বালিকা হিসাবেই চিত্রিত করা হয়েছে। তৃতীয়াঙ্ক প্রথম দৃশ্যে অপরিচিত পুরুষ ভীষ্মের সঙ্গে এই ভগ্নী-যুগলের লঘু পরিহাস মোটেই সঙ্গত হয় নি। কুমারী-জীবনে ও প্রথম বিবাহিত জীবনে এই প্রগল্‌ভা ও পরিহাসচপলা চরিত্রদুটিকে

কোনোক্রমে স্বীকার করে নিলেও, চার পুরুষের ব্যবধানেও যে কেমন করে তাঁরা কুমারীজীবনের মতোই 'মোমের পুতুল' রয়ে গেলেন, এ কথার কোনো সদুত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। সত্যবতী না হয় ঋষির কাছ থেকে অনন্ত যৌবনের বর পেয়েছিলেন, তাঁর পুত্রবধূরা তো পান নি। প্রপৌত্রবতী এই রমণীদ্বয়ের উপরে যেন বয়সের ছায়া পড়ে নি। এমন কি পুত্রবধূ গান্ধারীর কাছে তাঁদের চরিত্র নিতান্ত বেমানান বোধ হয়। মাধব চরিত্রের প্রারম্ভটি সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের মতো, কিন্তু পরিণামে চরিত্রটি গুরুগম্ভীর ভূমিকা নিয়েছেন। চরিত্রটি রচনায় নাট্যকার যে গিরিশচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, এ কথা মনে করা অসঙ্গত হবে না।

নাটকের গঠনরীতি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অসঙ্গতি হয়েছে পঞ্চমাঙ্ক পরিকল্পনায়। প্রথম চার অঙ্কের দীর্ঘমন্থর ঘটনাবিবৃতি ও অনাবশ্যক দৃশ্য-সংযোজনের জন্য পঞ্চমাঙ্কে এসে শুধু ঘটনাপঞ্জীই বিবৃত করতে হয়েছে। চতুর্থ অঙ্কের পরে আর নাটকীয় গতিবেগ নেই—গতি স্তব্ধ হয়ে শুধু যেন ঘটনাই বেড়ে চলেছে। পঞ্চমাঙ্ককে প্রথম চার অঙ্কের পরিশিষ্টমূলক একটি স্বতন্ত্র নাটক বলে মনে হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের অপর দুখানি পুরাণাশ্রয়ী নাট্যকাব্যের তুলনায় 'ভীষ্ম' নাটকটি অনেক বেশী ত্রুটিপূর্ণ। গঠনরীতি, চরিত্রসৃষ্টি ও অন্যান্য নাটকীয় বৈশিষ্ট্য—কোনোদিক দিয়ে এই নাটকটি পূর্ববর্তী নাটক দুটির সমকক্ষতা দাবি করতে পারে না। কিন্তু কোনো কোনো অংশের কাব্যসৌন্দর্য ও সূক্ষ্ম-গীতিধর্মিতা অস্বীকার করা যায় না। প্রেমবুভুক্ষু অম্বার লালসা-শিথিল মোহিনীমূর্তির চিত্রময়ী বর্ণনায় দ্বিজেন্দ্রলাল চূড়ান্ত কবিশক্তির পরিচয় দিয়েছেন (৩।৬)।

দ্বিজেন্দ্রলালের এই তিনখানি নাটক সম্পর্কে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল এই যে নাটক তিনখানিকে 'পৌরাণিক' নাটক বলা যায় কিনা? শ্রেণীনির্ণয়ের দিক থেকে এ জাতীয় প্রশ্ন নিতান্ত অস্বাভাবিক নয়। দ্বিজেন্দ্রলাল পুরাণকে পদে পদে অনুসরণ করেন নি (যথার্থ শিল্পীর পক্ষে তা সম্ভবও নয়)। শুধু তাই নয়, তিনি মনোমোহন, গিরিশচন্দ্র অথবা ক্ষীরোদপ্রসাদের মতো পৌরাণিক নাটকে আধ্যাত্মিক সুর সংযোগও করেন নি। পৌরাণিক নাটক সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র বাংলা নাটকে যে ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল তার বিপরীত পথকেই অনুসরণ করেছেন। মানবীয় ভাবাদর্শে

ও বাস্তব জীবনের পটভূমিতেই তিনি পুরাণাশ্রয়ী কাহিনীকে রূপ দিয়েছেন। তার ফলে সমসাময়িক কালে তাঁর নাটকগুলির সমাদর হয় নি, বরং বিরুদ্ধ সমালোচনাই হয়েছিল। তিনি বিচারপ্রবণ দৃষ্টির সাহায্যে পুরাণকে পরিবর্তিত করে তার নিজের কালের সমস্যা ও মানবীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্র এঁকেছেন। 'সিদ্ধরস'কে লঘু করার দায়িত্বও তাঁর নিতে হয়েছে। পুরাণকে পরিবর্তিত করতে গিয়ে যেখানে শিল্পাংশ দুর্বল হয়ে পড়েছে, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই নাট্যকারের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু যেখানে পুরাণের আধুনিক ব্যাখ্যার সঙ্গে নাটকীয় রসসত্য সমন্বিত হয়েছে, সেখানে নাট্যকারের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টাকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকাব্যগুলিতে রোমান্টিক কবিকল্পনাই জয়যুক্ত হয়েছে। অনেক সময় 'কাব্যহিসাবে কল্পনা'র সাহায্য গ্রহণ করার জন্যও নাট্যরস ক্ষুণ্ণ হয়েছে। 'ভীষ্ম' নাটকে সত্যবতীর আখ্যায়িকা অথবা 'পাষাণী' নাটকে ইন্দ্র-অহল্যার সম্পর্ক কবিকল্পনার এক অসংযত স্বেচ্ছাচার ছাড়া কিছুই নয়। নাটকীয় গতিবেগের সঙ্গে এই জাতীয় বর্ণবিস্তৃত কবিকল্পনার কোনো মুখ্য সম্পর্ক নেই। সুতরাং কবিকল্পনাকে নাটকের সঙ্গে সমন্বিত করতে না পারলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। ইংরেজি সাহিত্যের অতিরিক্ত আনুগত্যও দ্বিজেন্দ্রলালের এই শ্রেণীর নাটকের রসগত অসামঞ্জস্যের কারণ হয়েছে। শান্তনু-সত্যবতীর দৃশ্যটি (ভীষ্ম, ২।৩) শেক্সপীয়রের 'রিচার্ড দি থার্ড' নাটকের (১।২) প্রভাবজাত। কিন্তু দুটি নাটকের দেশ-কাল ও পরিকল্পনাগত পার্থক্যের কথাও বোধ হয় নাট্যকার সাময়িকভাবে বিস্মৃত হয়েছিলেন। সত্যবতীর আকস্মিকভাবে স্থবিরায় পরিণত হওয়া রাইডার হ্যাগার্ডের 'She' নামক রোমান্সের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অহল্যার ইন্দ্রকে ছুরিকাঘাত করার দৃশ্যটিও সুলভ রোমান্সের অনুরূপ। ঊনবিংশ শতাব্দীর গদ্যকাহিনীর ও রোমহর্ষক অতিনাটকীয়তার প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত হতে পারে পারেন নি। এই সমস্ত কারণে দ্বিজেন্দ্রলালের এই তিনটি নাট্যকাব্যকে বিশুদ্ধ পৌরাণিক নাটক না বলে পুরাণাশ্রয়ী রোমান্টিক নাট্যকাব্য বলাই অধিকতর সঙ্গত।

॥ ৬ ॥

দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বপ্রথম ইতিহাসাশ্রিত নাটক 'তারাবাই' (১৯০৩) গদ্য ও কবিতার মিশ্রণজাত সংলাপে রচিত হয়েছে। এই নাটকের কথাবস্তু টডের 'রাজস্থান' গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে।[২১] নাট্যকার 'ভূমিকায়' উপাদান সম্পর্কে কৈফিয়ত দিয়েছেন : "আমি যদিও নাটকের মূল বৃত্তান্ত 'রাজস্থান' হইতে লইয়াছি, তথাপি অপ্রধান ঘটনা সম্পর্কে স্থানে স্থানে ইতিহাসের সহিত এই নাটকের অনৈক্য লক্ষিত হইবে। এ অনৈক্য আমি মারাত্মক বিবেচনা করি না। কারণ, নাটক ইতিহাস নহে।" নাট্যরচনার কতকগুলি বিশিষ্ট শিল্পরীতি আছে—ইতিহাসকে নাটকে পরিণত করতে হলে তাই কোনো কোনো স্থলে কিছু কল্পনার সাহায্যও নিতে হয়। কিন্তু নাট্যকারের এই উদ্ভাবনীশক্তি যদি মাত্রাতিরিক্ত রূপে স্থূলভ রোমান্স ও চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জন্যই ব্যবহৃত হয়, তা হলে তা নিছক ক্ষমতার অপব্যয় মাত্র। 'তারাবাই' নাটক সম্পর্কে এই ধরনের একটি প্রশ্ন জাগে। তা ছাড়া, শুধু টডের উপর নির্ভর করে রাজপুতনার ইতিহাসের ভিতর প্রবেশ করার আর এক জাতীয় বিপদও আছে। টড নিজেও এ বিষয়ে সচেতন ছিল। তাই তিনি ভূমিকায় বলেছেন : "I should observe, that it never was my intention to treat the snbject in severe style of history, which would have excluded many details useful to the politician as well as the curious student. I offer this work as a copious collections of materials for the future historian."[২২] টডের গ্রন্থ 'copious collection of materials'. উপাদানগুলির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে সংহতিগুণেরও অভাব আছে। স্বল্পতা ও বিক্ষিপ্ত উপাদানকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করারও বিপদ আছে।

'তারাবাই' নাটকের আখ্যায়িকাবিন্যাস শিথিল। সংক্ষিপ্ত ঘটনাকে

২১। Annals of Mewar (Chapter VIII) : Annals and Antiquities of Rajasthan (Vol I).

২২। Introduction : Annals and Antiquities of Rajasthan, Page XIII-XIV.

পঞ্চমাঙ্ক নাটকে রূপ দিতে গিয়ে বহু অপ্রয়োজনীয় ঘটনা ও অবান্তর চরিত্রের সংযোজন করতে হয়েছে। তার ফলে পৃথ্বীরাজ ও তারাবাইয়ের কাহিনী কিঞ্চিৎ আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। পৃথ্বীরাজ ও তারাবাইয়ের রোমান্টিক কাহিনীই 'তারাবাই' নাটক রচনায় নাট্যকারকে প্রেরণা দিয়েছিল। কিন্তু নাটকে পৃথ্বীরাজ কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে উঠতে পারেন নি—বিশেষ একটি চরিত্রের একাধিনায়কত্বের অভাবে নাটকটি কেন্দ্রশূন্য ও বিক্ষিপ্তকলেবর। 'ভূমিকা'য় নাট্যকারের কৈফিয়ত থেকেও নাটকের গঠনশৈলীর ত্রুটির পরিচয় পাওয়া যায়: "গ্রন্থখানি ছাপাইতে ছাপাইতে দেখিলাম যে, লিখিত নাটকের কলেবর উচিত সীমা অতিক্রম করিয়াছে। তজ্জন্য মুদ্রিত পুস্তক হইতে সঙ্গ সংক্রান্ত দুইটি দৃশ্য বাদ দিতে বাধ্য হইলাম।" শুধু "সঙ্গ সংক্রান্ত দুইটি দৃশ্য"ই নয়, একাধিক অর্থহীন ও সঙ্গতিহীন দৃশ্য সংযোজিত হয়ে শুধু নাটকের কলেবর বৃদ্ধিই করেছে।

পৃথ্বীরাজের চরিত্রের উপর লক্ষ্য রেখেই নাটক লেখা হয়েছে, কিন্তু চরিত্র কোথায়ও সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠতে পারে নি। পৃথ্বীরাজের কতকগুলি রোমাঞ্চকর কার্যকলাপ ও দুঃসাহসিক অভিযানের বর্ণনা আছে, কিন্তু ঘটনাপঞ্জী ছাড়া এর মধ্যে কোনো চরিত্র বিকশিত হয় নি। পৃথ্বীরাজের চেয়ে তারাবাইয়ের চরিত্র অপেক্ষাকৃত ভালো ফুটেছে। তারাবাই ও তার মায়ের চরিত্রে রাজপুত-রমণীসুলভ যে শৌর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় আছে, তা দ্বিজেন্দ্রলালের পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির অনুরূপ চরিত্রগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পুরুষবেশে তারাবাইয়ের শিকার যাত্রা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা তাঁর চরিত্রকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। তারার প্রেমের মধ্যেও সেই বলিষ্ঠতাই দৃপ্ত হয়ে উঠেছে—প্রেমের চেয়েও দেশপ্রেম তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠেছিল। তারাবাই চরিত্রের পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপেই ইতিহাসানুমোদিত।[২৩] তারাবাইয়ের কোনো কোনো উক্তিতে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার প্রভাব পড়েছে, যেমন:

২৩। "This event led to the recall of Prithwiraj, who eagerly took up the gage disgraced by his brother. The adventure was akin to his taste. The exploit which won the hand of the fair Amazon, who, equipped with bow and quiver, subsequently accompanied him in many perilous enterprizes, will be elsewhere related. —Ibid, Page 274.

আমি নহি বিদ্যুৎ কি জ্যোৎস্না কি সঙ্গীত।
আমি মাত্র তারা।—দোষ আছে গুণ আছে।

(৩য় অঙ্ক, ৭ম দৃশ্য)

তারার প্রতি পৃথ্বীরাজের অমূলক সন্দেহ, ভগ্নীপতি প্রভুরাওকে অপমান করা, প্রভুরাওয়ের ষড়যন্ত্রের সাফল্য, পৃথ্বীরাজের মৃত্যু ও তারাবাইয়ের আত্মহত্যা প্রভৃতি কাহিনী কোনো নাটকীয় গতিধর্মের অনিবার্য পরিণতি নয়। কাহিনীটির মধ্যে নিয়তির নিষ্ঠুর সঙ্কেতই প্রাধান্য লাভ করেছে। নাট্যকার সম্ভবত টড্-বর্ণিত কাহিনী থেকেই এই সঙ্কেতটি পেয়েছিলেন।

'তারাবাই' নাটকের মধ্যে সূর্যমল ও তাঁর পত্নী তমসার চরিত্রটি সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সূর্যমল চরিত্রটির মধ্যে রাজ্যলিপ্সার সঙ্গে বাৎসল্য ও ভ্রাতৃপ্রেমের এক তীব্র দ্বন্দ্বের চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। কারণ সূর্যমল যদিও ভ্রাতুষ্পুত্রদের প্রতি স্নেহপরায়ণ, তথাপি মেবারের রানা হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁকে ভ্রাতুষ্পুত্রদের বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করতে বিচলিত করে নি। তিনি মূলত বাৎসল্যপরায়ণ, তাঁর চরিত্রে সদ্‌গুণেরও অভাব নেই। তবু তাঁর চিত্তের অন্তরালে ছিল এক প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষাই চারণীর ভবিষ্যদ্বাণীতে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। পরে পত্নী তমসার প্ররোচনায় সূর্যমলের উচ্চাকাঙ্ক্ষার মূলে জল সিঞ্চিত হয়েছে। সূর্যমল ও তমসার কাহিনী শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ নাটকের অনুসরণে পরিকল্পিত হয়েছে। কিন্তু নিতান্ত বহিরাশ্রয়ী অনুকরণ ছাড়া নাট্যকার আর কোনো বিষয়ে শেক্সপীয়রের সমকক্ষতা দাবি করতে পারেন না। ম্যাকবেথ বা লেডী ম্যাকবেথ, কোন চরিত্রেরই সমুন্নতি ও ঐশ্বর্য রক্ষা করা দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষে সম্ভব হয় নি। সূর্যমল দুর্বলচিত্ত ও দ্বিধাগ্রস্ত, অপরপক্ষে তমসা চরিত্রটিরও অতিনাটকীয় উদ্ভট পরিণতি শেক্সপীয়রীয় পরিকল্পনা থেকে বহুদূরে।[২৪] তমসা চরিত্রটির পরিবর্তন আকস্মিক ও অতিনাটকীয়। তাঁর ব্যভিচার-কাহিনী পরিকল্পনায় নাটকের কোনো গৌরববৃদ্ধি হয় নি, বরং নাটকটিকে ভারাক্রান্তই করেছে। সুরতানের আলস্যপ্রিয় তরল চরিত্র ও সপার্ষদ প্রভুরাওয়ের নিম্নশ্রেণীর বিলাস ও কৌতুকের চিত্র নাটকের গাম্ভীর্যকে

২৪। "সূর্যমলের পত্নী তমসা লেডি ম্যাকবেথের অক্ষম অনুকরণ মাত্র।"— বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫০): পৃঃ ৩৮৭ : ডাঃ সুকুমার সেন

ক্ষুণ্ণ করেছে। যমুনা চরিত্রটি যেন রক্তমাংসের মানবী নয়—তাকে মানবী অপেক্ষা মূর্তিমতী কবিকল্পনা বলেই মনে হয়। অপ্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে একমাত্র রানা রায়মল চরিত্রেই খানিকটা ভারসাম্য আছে।

'তারাবাই' দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক হলেও, পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক নাটকের সঙ্গে এর কোনো তুলনা হয় না। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে যে ভাবগাম্ভীর্য, আদর্শবাদ ও দেশপ্রেমের জ্বলন্ত মহিমার ছবি পাওয়া যায়, 'তারাবাই' নাটকে তা নেই। 'তারাবাই' নাটকটি দ্বিজেন্দ্রলালের স্ত্রী-বিয়োগের পূর্বে রচিত হয়। এই যুগটি প্রধানত 'হাসির গান' প্রহসন ও নাট্যকাব্য রচনার যুগ। তাই ভাবগভীরতা ও গাম্ভীর্য এখানে পরিপূর্ণভাবে ফুটে উঠতে পারে নি। তা ছাড়া এ যুগটি প্রধানত তাঁর নাট্যকাব্য রচনার যুগ। স্ত্রী-বিয়োগের শূন্যতা ও স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনা—এর কোনোটিই দ্বিজেন্দ্রলালের এই যুগের নাট্যপ্রয়াসকে একটি নূতন ভাবাদর্শে [illegible] করে নি। 'তারাবাই' নাট্যকারের অপরিণত রচনা হলেও এই নাটকেই তিনি সর্বপ্রথম রাজপুতনার গৌরবদীপ্ত ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। পরবর্তীকালের সার্থকতর ঐতিহাসিক নাটকগুলির অধিকাংশই রাজস্থানের অতীত গরিমা-কাহিনীর নাট্যরূপ।

'সোরাব-রুস্তাম'কে (১৯০৮) দ্বিজেন্দ্রলাল 'নাট্যরঙ্গ' বলেছেন। তাঁর ঐতিহাসিক নাটক রচনার সমৃদ্ধির যুগে এই নাট্যরঙ্গ বা অপেরাটি রচিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যান্য নাট্যকাব্যের তুলনায় 'সোরাব-রুস্তম'-এর কতকগুলি পার্থক্য আছে। 'সোরাব-রুস্তম'কে সঙ্গীতবহুল অপেরাধর্মী নাটক বলা যায়। নাট্যকারের অপেরা রচনারই উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সে উদ্দেশ্য সফল হয় নি। তিনি ভূমিকায় লিখেছেন :

"এই পুস্তক রচনা করার একটি উদ্দেশ্য আছে। কিছুদিন হইতে একটি কথা শুনিতে পাইতেছি যে, আমাদের দেশের রঙ্গালয়ের দর্শকবৃন্দ অশ্লীল "হাব-ভাব"-সমন্বিত গ্রাম্য রসিকতা শুনিবার জন্য রঙ্গালয়ে গিয়া থাকেন ; এবং সুরুচিসঙ্গত নাটক বা নাটিকার সম্প্রতি আর আদর নাই। আমি একবার আমার সাধ্যমত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই যে, সুরুচিসঙ্গত অপেরা এখন চলে কিনা।...

" 'সোরাব-রুস্তম' দস্তুরমত অপেরা নয়—অপেরায় কতকগুলি নাচগান

জোড়া দিবার জন্য যেটুকু কথাবার্তার দরকার হয়—সেইটুকু কথাবার্তাই থাকে ; কিন্তু এ নাটকের তৃতীয় অঙ্কে কথাই তাহার প্রাণ। নাচ-গান তাহার আনুষঙ্গিক ব্যাপার মাত্র। আবার এ নাটকের প্রথম অঙ্কে নাচ-গানের যেরূপ প্রাচুর্য আছে, কোন নাটকে তাহা থাকে না। অতএব ইহা নাটকও নহে। এক কথায়—ইহা অপেরায় আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে নাটকে শেষ হইয়াছে।"

নাট্যকার এখানে নিজেই বিচারকের ভূমিকা নিয়েছেন এবং নাটকের আঙ্গিকবিচারের মধ্যে তাঁর তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধিরও স্বাক্ষর আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই গীতাভিনয় নামক এক ধরনের নাট্যসাহিত্য বাঙালীর নাট্যরস-পিপাসা চরিতার্থ করেছিল। একদিকে ইংরেজি নাটকের সংলাপমুখ্য নাট্যরীতি, অন্যদিকে যাত্রার সঙ্গীতপ্রধান রীতির মিশ্রণজাত নাট্যপ্রচেষ্টা এই যুগের গীতাভিনয়গুলির মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। মনোমোহন বসুর গীতাভিনয়ই এই যুগের গীতাভিনয়গুলির আদর্শস্থল ছিল। মনোমোহনের পথকে অনুসরণ করেই ব্রজমোহন রায়, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, মতিলাল রায় প্রভৃতি পালা-রচয়িতারা খ্যাতিলাভ করেন। গিরিশচন্দ্র মনোমোহনের ধারাকেই অধিকতর শিল্পবৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করেছিলেন। কিন্তু সেকালের গীতাভিনয়ের মধ্যে অনেকগুলিই বিকৃতরুচির বাহন হয়ে উঠেছিল। দর্শকবৃন্দের স্থূলরুচি চরিতার্থ করার জন্য নিম্নশ্রেণীর ভাঁড়ামি এই সমস্ত অপেরায় স্থানলাভ করে। কথিত আছে যে মিনার্ভা থিয়েটারে "হিন্দু-হাফেজ" নামক একখানি কুরুচিপূর্ণ অপেরার অভিনয় দেখতে গিয়েই দ্বিজেন্দ্রলাল একখানি সুরুচিসম্মত অপেরা লিখতে মনস্থ করেন—'সোরাব-রুস্তম' সেই প্রচেষ্টারই ফল।[২৫] দ্বিজেন্দ্রলাল এই অপেরাধর্মী নাটকখানিতে পূর্ববর্তী গীতাভিনয়-রচয়িতাদের রীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্র-লালের রচনায় যাত্রা-প্রভাবিত সে যুগের অন্যান্য অপেরাগুলির মতো স্থূল রসিকতা নেই।

"ইহা অপেরায় আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে নাটকে শেষ হইয়াছে"—নাট্যকারের এই মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। অপেরার মধ্যে নাচ-গানই মুখ্য,

---

২৫। নবকৃষ্ণ ঘোষের "দ্বিজেন্দ্রলাল" গ্রন্থের ১৫০-৫১ পৃষ্ঠায় এই ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

কথা গৌণ। নৃত্য ও সঙ্গীতের মিশ্রণজাত লঘু-তরল ভাবোচ্ছ্বাসই অপেরার প্রাণ। সঙ্গীতগুলির মধ্যে সংযোগস্থাপন করে একটি কাহিনীর আভাস সৃষ্টি করাই অপেরার সংলাপ অংশের কাজ—সুতরাং সংলাপ এখানে নিতান্তই গৌণ। 'সোরাব-রুস্তম' নাটকের প্রথমাঙ্ক প্রায় সম্পূর্ণরূপেই অপেরার লক্ষণাক্রান্ত। নৃত্য-সঙ্গীত, হাস্য-কৌতুক ও চাপল্য কাহিনীর মধ্যে লঘুরস ও হালকা সুরের সৃষ্টি করেছে। প্রথমাঙ্কে সঙ্গীতই মুখ্য—চতুর্থ দৃশ্যে সামিঙ্গনের রাজান্তঃপুরে রাজকন্যা তামিনা ও তার তিন সখীর সঙ্গীতমুখ্য হাস্য-কৌতুকের দৃশ্যটি সম্পূর্ণরূপেই অপেরার লক্ষণাক্রান্ত। অপেরার মধ্যে যৌথ সঙ্গীতের অবকাশ প্রশস্ত। সারিয়া ও হামিদার গানে (১।৪) দ্বিজেন্দ্রলাল খুব সার্থকভাবে যৌথ সঙ্গীত ব্যবহার করেছেন। তুরানরাজ ও তাঁর পারিষদবর্গের দৃশ্যটি শুধু লঘুচপল হাস্য-কৌতুক পরিবেশন করেছে। 'সোরাব-রুস্তম'-এর মানব-জীবন-নাট্য ছাড়াও আর একটি অংশ আছে—দিবা, নিশা, সন্ধ্যাতারা, বনদেবী প্রভৃতির সঙ্গীতাংশও নাটকে অংশগ্রহণ করেছে। প্রধানত রোমান্টিক পটভূমি সৃষ্টি করাই এই সমস্ত ছায়াশরীরী চরিত্রগুলির মূল উদ্দেশ্য। মহাকালেরও একখানি গান আছে (২।১)। পরিবেশকে সঙ্গীতবহুল কাব্যস্পন্দী করে তোলা ছাড়া গানগুলির অন্য কোনো নাটকীয় সার্থকতা নেই। চরিত্রগুলির উপরে এই ছায়াশরীরী ভূমিকাগুলি ও তাদের সঙ্গীত কোনোই প্রভাব বিস্তার করে নি।

সঙ্গীতবহুল হাস্যরসাত্মক গীতাভিনয়ের তরল পটভূমি থেকে নাট্যকার ক্রমশ অন্তর্দ্বন্দ্বপ্রধান নাটকের ভাবগভীরতার দিকে সরে এসেছেন। এমন কি একই চরিত্রের আচার-আচরণের মধ্যে নাটকের প্রথম ও শেষ দিকের মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য দেখা যায়। তুরানরাজের মতো একটি ভাঁড়-চরিত্রও প্রথমাঙ্কের তুলনায় তৃতীয়াঙ্কে (৩।৪) একটু যেন গভীর হয়েছে। নাটকের প্রথম দিকে নাট্যকার অন্তর্দ্বন্দ্বের ও ভাবগভীরতার কোনো অবকাশ রাখেন নি। রুস্তম-তামিনার পূর্বরাগের দৃশ্যটির মধ্যে নাট্যকারের নাট্যশক্তি বিকাশ করার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। কিন্তু তিনি সদ্যোনিদ্রোত্থিত রুস্তমের নিদ্রালস মনে প্রেমাকাঙ্ক্ষার ছবি ফুটিয়ে তুলে দৃশ্যটিকে কাব্যধর্মী করে তুলেছেন। এইভাবে একটি নাটকীয় সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে। পারস্যরাজ কৈকায়ুশ চরিত্রটিও রাজোচিত নয়

—তাঁর ব্যক্তিত্ব নেই, বরং তাঁর স্ত্রীর চরিত্রে একটি মর্যাদাবোধ ও বলিষ্ঠতার পরিচয় আছে। কিন্তু তৃতীয়াঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে রুস্তমের প্রতি আচরণ নিতান্ত আকস্মিক বলে বোধ হয়—তাঁর পূর্ববর্তী আচরণের সঙ্গে কোনো সঙ্গতি নেই।

রুস্তম নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। কিন্তু প্রথম অঙ্কে রুস্তম চরিত্র একেবারেই ফোটে নি। তুরানরাজের সভায় তাঁর আগমনদৃশ্যটি আগাগোড়াই অসম্ভব ও আকস্মিক—পারস্যের শ্রেষ্ঠ বীরের উপযুক্ত মর্যাদা সেখানে নেই। কিন্তু পরবর্তী অংশে, বিশেষত তৃতীয় অঙ্কে, রুস্তমের চরিত্র খানিকটা নাটকীয় হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কে সোরাবের যুদ্ধযাত্রার পর থেকে সর্বপ্রথম নাটকীয় সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে রুস্তমের চরিত্র ফুটেছে যুদ্ধোদ্যমপূর্ণ কর্মময় জীবন আরম্ভ করার পর থেকে। নাটকের পরিণতিকেও বিষাদগম্ভীর করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। বহিঃপ্রকৃতির দুর্যোগময় পটভূমিকায় পুত্রের মৃতদেহের পাশে রুস্তমের শোকস্তম্ভিত পাষাণমূর্তি নাটকের পরিণতিকে বিষাদগম্ভীর করে তুলেছে। সোরাব ও রুস্তমের সম্পর্ক-বৈচিত্র্যের মধ্যেও নাটকীয় রস ফুটেছে। সোরাবের পিতৃসন্ধানের ব্যাকুলতা, রুস্তমের বীরত্বকাহিনী শুনে সোরাবের বীরহৃদয়ের স্পন্দন, সোরাব ও রুস্তম দুজনেরই মনেই পরস্পরের পরিচয় সম্পর্কে সংশয়ের বিচিত্র আন্দোলন প্রভৃতি অংশগুলির মধ্যে নাটকীয় সম্ভাবনার অবকাশ আছে। একদিকে সোরাব পিতৃপরিচয়ের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন, কিন্তু হুজীরের ষড়যন্ত্র তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হতে দেয় নি। অপরপক্ষে বালক সোরাবের সঙ্গে পারস্যের শ্রেষ্ঠ বীর রুস্তমের যুদ্ধ,—রুস্তমের পক্ষে মর্যাদাহানিকর মনে হয়েছে। তাই অভিমানী রুস্তম সোরাবের কাছে তাঁর পরিচয় প্রকাশ করেন নি,—এমন কি সোরাব যখন তাঁকে একবার পিতৃপরিচয় দিলেন, রুস্তম যেন সে কথায় কর্ণপাতই করলেন না। এ কথা যথার্থ যে, 'সোরাব-রুস্তম' ক্রমশ লঘু-তরল অপেরা থেকে নাটকীয় সম্ভাবনার দিকে অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু তবুও অন্তর্দ্বন্দ্ববহুল সার্থক নাটক হয়ে উঠতে পারে নি।

আফ্রিদ চরিত্রটি সর্বাপেক্ষা অবাস্তব। এই কল্পিত চরিত্রটিতে নাট্যকার এত বেশী বর্ণসঙ্কার করেছেন যে তাকে কোথায়ও রক্তমাংসের মানবী বলে মনে হয় না। চরিত্রটির মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য বা ভাবগত ঐক্য নেই।

সোরাবের প্রতি প্রেম, পিতৃভক্তি ও দেশপ্রেম—এই তিনটি বৃত্তির মধ্যে নাট্যকার প্রাণপণে সামঞ্জস্য স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। এই অক্ষম প্রচেষ্টাই চরিত্রটি ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম কারণ। সোরাবের বক্ষরক্তে হস্ত রঞ্জিত করে পিতৃহন্তার প্রতি প্রতিহিংসাগ্রহণকার্য সফল হলে সে নিজের বক্ষে ছুরিকাঘাত করেছে অর্থাৎ একই সঙ্গে সে পিতৃহন্তা ও দেশবৈরীর উপর প্রতিহিংসা গ্রহণ করেছে, এবং প্রণয়াস্পদকে না পাওয়ার ব্যর্থতায় আত্মহত্যা করেছে। এই জাতীয় যান্ত্রিক সামঞ্জস্য মানুষের জীবনে ঘটা সম্ভব নয়, কারণ মানুষের হৃদয়বৃত্তিগুলি ঐ ভাবে ভাগ করা যায় না। বিভিন্ন বৃত্তির সমন্বয়েই মানুষের অখণ্ড সত্তা গড়ে ওঠে—কোন একটি বৃত্তিকে তখন আর একটি বৃত্তি থেকে পৃথক করে দেখানো সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়ত, আফ্রিদ চরিত্রে দুই বিরুদ্ধবৃত্তির তেমন তীব্র দ্বন্দ্বও নেই। এই চরিত্র নাটকীয় সম্ভাবনাকে ব্যর্থ করেছে মাত্র। নাটকের আবহাওয়ার মধ্যেও ইরান-তুরানের পটভূমিকাগত কোনো বৈশিষ্ট্য ফোটে নি। পারসিক রমণীদের কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীত নিতান্তই বিসদৃশ। ঘোটক-ঘোটকীসম্পর্কিত স্থূল রসিকতা রুচিবিরুদ্ধ (১।৪)।

প্রকৃতপক্ষে 'সোরাব-রুস্তম' নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল গুরুতর বিষয়বস্তু নিয়ে তরলরসাত্মক অপেরা রচনা করতে চেয়েছেন। বিষয়বস্তুটিই লঘুরসাত্মক অপেরার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ফেরদৌসীর 'শাহনামা' মহাকাব্য পারস্যের বীরযুগের শৌর্য-বীর্য ও কীর্তিমণ্ডিত অধ্যায়ের আখ্যায়িকা। রুস্তমের কাহিনী এই বীরযুগের সবচেয়ে খ্যাতনামা অধ্যায়, তার মধ্যে 'সোরাম-রুস্তম' আখ্যায়িকা বীর ও করুণরসের নির্ঝর। এই বিষয়কে অবলম্বন করে গুরুগম্ভীর ট্রাজেডি রচনার অবকাশ ছিল। কিন্তু নাট্যকার এই সুবিদিত আখ্যায়িকা নিয়ে যে লঘুরসের অবতারণা করেছেন, তা মোটেই বিষয়ানুসারী হয় নি। নাট্যকার হাস্যরসাত্মক সঙ্গীতসংবলিত অপেরা দিয়ে শুরু করলেও পরিণতিতে বীররসাত্মক বিষাদান্তক পরিণতিকে অস্বীকার করতে পারেন নি। 'সোরাব-রুস্তম' অপেরায় আরম্ভ ও নাটকে শেষ—তার প্রধান কারণ হল রচনারীতির সঙ্গে বিষয়বস্তুর রসগত অসামঞ্জস্য। 'সোরাব-রুস্তম' নাটক রচনার উপাদান ঠিক ইতিহাস নয়, পুরাবৃত্ত। কিন্তু এই নাটকটি তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের গৌরবময় অধ্যায়ের যুগে লিখিত। তাই আফ্রিদ

চরিত্রের মধ্যে দেশপ্রেমের একটি জলন্ত রূপ লক্ষ্য করা যায়। সে সুর নিঃসন্দেহে নাট্যকারের যুগের মর্মবাণী।

॥ ৭ ॥

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা প্রধানত তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলির উপরেই নির্ভরশীল। অবশ্য 'তারাবাই' নাট্যকাব্যটির মধ্যেই তাঁর ঐতিহাসিক নাটক রচনার সর্বপ্রথম প্রয়াস দেখা যায়, কিন্তু তখনও তিনি তাঁর নিজস্ব শৈলী আবিষ্কার করতে পারেন নি। ইতিহাসের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধের যে জলন্ত রূপ তাঁর পরবর্তী নাটকে পাওয়া যায়, এক তারাবাই চরিত্রের সামান্য একটু অংশ ছাড়া এখানে তার আভাস মাত্র ফুটে ওঠে নি। টডের ইতিবৃত্তকে তিনি বিশেষ কোনো তাৎপর্যে মণ্ডিত করতে পারেন নি। তবু টডের কাহিনী তাঁকে এমন এক জগতের সন্ধান দিয়েছিল, যা তাঁর মনোজীবনের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে তিনি কাব্যসংলাপ সম্পূর্ণ বর্জন করে কাব্যধর্মী গদ্যসংলাপ ব্যবহার করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটকগুলির মূলে তাঁর যুগজীবনও অনেকখানি কার্যকরী হয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনার মধ্যে বাঙালী চিত্তের যে জাগরণ হয়েছিল, দ্বিজেন্দ্রলাল সেই জাগরণকে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ইতিহাসের মধ্যে জাতীয় জীবনের শৌর্য-বীর্য ও আদর্শবাদের কথা থাকে। দ্বিজেন্দ্রলাল অতীত ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়গুলি থেকে জাতীয়-ভাবোদ্দীপ্ত মহৎ চেতনাকে তাঁর নাটকে সঞ্চারিত করেছেন। অতীতকে তিনি যুগজীবনের সমস্যার সঙ্গে সমন্বিত করে নূতন ধরনের ঐতিহাসিক নাটক পরিবেশন করেছেন।[২৬]

২৬। "The above movements too would have proved short-lived, were not the aforesaid dramas produced at that time. At such time of the greatest need, these dramas acted like a great inspiration and changed the servile mentality of the people."

—The Indian Stage (Vol. IV) : H. N. Dasgupta.

দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাসকে জীবন্ত করে তুলতে পারতেন। অতীতের মধ্যে একটি রোমান্স আছে, সেই রোমান্সের বর্ণবৈচিত্র্য ও অনুকূল পরিবেশ রচনায় তিনি অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। ঐতিহাসিক উপাদান নিয়ে নাট্যকার যখন নাটক রচনা করেন, তখন ইতিহাসকে শুধু তথ্য-বিবৃতি হিসেবে গ্রহণ না করে, তাকে মানব-জীবনরহস্যে মণ্ডিত করে তোলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল অতীত ইতিহাসের চরিত্রগুলির মধ্যে তীব্র মানবীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছেন। তাঁর শাজাহান, নূরজাহান, চাণক্য প্রভৃতি চরিত্র তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে আলোড়িত হয়েছে—বহু পূর্বে অভিনীত জীবননাট্যকে তিনি ইতিহাসের কবরভূমি থেকে উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের সেই উত্তপ্ত মুহূর্তে ইতিহাসবিখ্যাত বীরগণের সংগ্রামশীল জীবনের ইতিবৃত্ত ও আত্মোৎসর্গ-কাহিনী এই যুগের নাট্যকারদের মনেও প্রেরণার সঞ্চার করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই ঐতিহাসিক নাটক রচিত হয়েছে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে যে সমস্ত ঐতিহাসিক নাটক রচিত হয়েছিল, তাদের ভাবাদর্শ ছিল স্বতন্ত্র। বিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে জাতীয় আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ আরও সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই যুগের নাটকগুলিতে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি স্থাপনের একটি প্রচেষ্টাও লক্ষিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের একাধিক নাটকে এবং ক্ষীরোদপ্রসাদের কোনো কোনো নাটকে হিন্দু-মুসলমান মিলন-স্থাপনের কিছু উগ্র প্রচেষ্টাও আছে।

পূর্ববর্তী ও সমকালবর্তী ঐতিহাসিক নাটক রচয়িতাদের সঙ্গে তুলনা করলেই এই শ্রেণীর নাটক রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব কতখানি তা উপলব্ধি করা যায়। মধুসূদন টডের কাহিনী নিয়ে ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটক লিখেছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের সঙ্গে জাতীয় ভাবোদ্দীপনা এখানে সংযুক্ত হয় নি, হওয়াও সম্ভব ছিল না। মধুসূদনের এই নাটকে ঐতিহাসিক যুগজীবনের ‘tone and temperament’-ও ছিল না। বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের যথার্থ পথিকৃৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকেই সর্বপ্রথম দেশপ্রেমের বাণী সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের মূল প্রেরণার কথা উল্লেখ করে বলেছেন: “হিন্দুমেলার পর হইতে কেবল আমার মনে হইত—কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি

উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্বগাথা ও ভারতের গৌরব-কাহিনী কীর্তন করিলে হয়ত কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।"[২৭] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চারখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন—'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪), 'সরোজিনী' (১৮৭৫), 'অশ্রুমতী' (১৮৭৯) ও 'স্বপ্নময়ী' (১৮৮২)। পুরুবিক্রম নাটকে পুরু চরিত্রটি জাতীয়-ভাবোদ্দীপ্ত ইংরেজ-লাঞ্ছিত ভারতবাসীরই প্রতীক হয়ে উঠেছে। 'স্বপ্নময়ী' নাটকেও মোগলশক্তির বিরুদ্ধে শোভাসিংহের বিদ্রোহকে যুগোচিত দেশাত্মবোধের বর্ণে রঞ্জিত করা হয়েছে। 'অশ্রুমতী'তে প্রতাপসিংহের সংগ্রামশীল জীবনকে অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ইতিহাসাশ্রিত নাটকগুলিতে ইতিহাসের স্থান নিতান্তই গৌণ, ইতিহাসের সামান্য একটু আভাস অবলম্বন করে তার নাটকে অবাধ কল্পনাই সম্প্রসারিত হয়েছে। 'অশ্রুমতী' নাটকে প্রতাপসিংহের কাহিনী নিতান্ত সঙ্কীর্ণ স্থান অধিকার করেছে, সেলিম-অশ্রুমতীর কল্পিত প্রেমকাহিনীই শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়েছে। 'স্বপ্নময়ী' নাটক ঔরঙ্গজীবের রাজত্বকালীন শোভাসিংহের বিদ্রোহকে অবলম্বন করে লেখা হয়েছে—কিন্তু নাট্যকার ইতিহাসকে অতিক্রম করে তার কল্পনাকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে দেশপ্রেমের একটি প্রবল ও যুগোচিত সুর ধ্বনিত হয়েছে, কিন্তু ইতিহাস নিতান্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনাকে মিশিয়ে যে একজাতীয় ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স-নাট্য পরবর্তীকালের নাট্যকারদের উপরে প্রভাব বিস্তৃত করেছিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে তার পথপ্রদর্শক বলা যায়।

'সিরাজদ্দৌলা' রচনার পূর্বে গিরিশচন্দ্রের 'চণ্ড', 'সৎনাম', 'অশোক' প্রভৃতি কখানি নাটকে ইতিহাসের ক্ষীণ ছায়া ছিল মাত্র। 'সিরাজদ্দৌলা' (১৯০৫), 'মীরকাশিম' (১৯০৬) ও 'ছত্রপতি শিবাজী' (১৯০৭) নাটক তিনখানিকেই গিরিশচন্দ্রের যথার্থ ঐতিহাসিক নাটক বলা যায়। তিনখানি নাটকই স্বদেশী আন্দোলনের আবহাওয়ায় রচিত। গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাসকে অনেক বেশী যত্ন ও সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্যাদি সম্পর্কে তাঁর সযত্ন অনুসন্ধানের কথা তিনি 'সিরাজদ্দৌলা'

২৭। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি : বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১৪১।

নাটকের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।[২৮] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে ক্ষীরোদপ্রসাদ পর্যন্ত নাট্যকারেরা ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন, কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য সন্নিবেশের যাথার্থ্যে কেউই গিরিশচন্দ্রকে অতিক্রম করতে পারেন নি। কিন্তু ইতিহাসকে তিনি নাটকীয় সত্যে মণ্ডিত করতে পারেন নি—অনেক সময় তা সুদীর্ঘ বিবৃতিতে পরিণত হয়েছে মাত্র। পৌরাণিক নাটকের ভক্তি-বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে অথবা মধ্যবিত্ত বাঙালীর পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রে তাঁর নাট্যশক্তি যেমন সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে, ঘাতপ্রতিঘাতমুখর ইতিহাসের মধ্যে তা তেমন শিল্পিত হয়ে উঠতে পারে নি।

✓ দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যা তাঁর পূর্ববর্তী নাট্যকারদের মধ্যে ছিল না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে ইতিহাসের তুলনায় কল্পনার স্থান অনেক বেশী। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকেও কল্পনার স্থান আছে, কিন্তু ইতিহাস তুলনায় গৌণ হয়ে পড়ে নি। গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাসের যাথার্থ্য অনেক বেশী, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের মতো তিনি চরিত্রগুলিকে অন্তর্দ্বন্দ্বময় ও ঘটনাকে নাটকীয় করে তুলতে পারেন নি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকেও দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় নাটকীয় কলাকৌশলের স্থান খুবই কম—চরিত্রসৃষ্টির মধ্যেও জটিলতা নেই। দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িককালে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় ঐতিহাসিক নাটক রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন, এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করতে হলে কালের স্বভাবোদ্দীপ্ত ঐতিহাসিক নাট্যকার হিসেবে তাঁকেই পথিকৃৎ বলতে হয়। এই ধরনের ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে তাঁর 'প্রতাপ-আদিত্য' (১৯০৩) নাটকই সর্বপ্রথম জনপ্রিয়তা লাভ করে।[২৯] কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদের সঙ্গে

২৮। বিদেশী ইতিহাসে সিরাজ চরিত্র বিকৃত বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিত সুধীগণ অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে বিদেশী ইতিহাস খণ্ডন করিয়া রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল সিরাজ চরিত্রের স্বরূপ চিত্র প্রদর্শনে যত্নশীল হন। আমি ঐ সমস্ত লেখকগণের নিকট ঋণী।"—ভূমিকা সিরাজদ্দৌলা।

২৯। "অবশ্য এ কথা এখানে স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই যে ভিন্নমুখী স্রোত, এই যে

দ্বিজেন্দ্রলালের অনেক পার্থক্য আছে। সমকালীন এই দুজন নাট্যকারই ঐতিহাসিক নাটক রচনায় রোমান্সের আশ্রয় নিয়েছেন—কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে আছে রোমান্সের আতিশয্য। অতীত ইতিহাসের মধ্যে রোমান্সের অবকাশ আছে, বিস্মৃতপ্রায় যুগজীবনের সঙ্গে নিজের দীর্ঘশ্বাসকে মিলিয়ে দিয়ে রোমান্টিক কবিরা কাব্য রচনা করেছেন। কিন্তু জীবনধর্মী নাটকের মধ্যে কল্পলোকের স্বপ্ন কতখানি স্থান পেতে পারে, তাও বিশেষভাবে বিবেচ্য। এই রোমান্স যদি নাট্যশক্তিকে ক্ষুণ্ন করে শুধু বহির্বৈচিত্র্য বৃদ্ধির জন্যই নাটকে স্থান পায়, তা হলে নিঃসন্দেহে তা শিল্পাংশে দুর্বল হয়ে পড়ে। ক্ষীরোদপ্রসাদের অলৌকিক ও অবাস্তব জগতের প্রতি একটি গভীর কৌতূহল ছিল। তাঁর মন দ্বিজেন্দ্রলালের মতো বিচারপ্রবণ ছিল না এবং তিনি মানব-চরিত্র পর্যবেক্ষণেও তেমন তৎপর ছিলেন না। তাই ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে চরিত্র ফোটানোর চেয়ে কাহিনীকে বর্ণময় করে তোলার দিকেই অধিকতর প্রবণতা দেখা যায়।[৩০] কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল চরিত্র সৃষ্টির দিকেই প্রধানত দৃষ্টি দিয়েছেন। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের অপেক্ষাকৃত সংখ্যাল্পতা সত্ত্বেও অন্তর্দ্বন্দ্বময় চরিত্রের সংখ্যা ক্ষীরোদপ্রসাদের চেয়ে অনেক বেশী—ক্ষীরোদ-প্রসাদের চরিত্রগুলি দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্রের তুলনায় অধিকাংশক্ষেত্রেই অস্পষ্ট ও ছায়াশরীরী। ক্ষীরোদপ্রসাদের চরিত্রগুলিকে রোমান্সের রহস্য আবৃত করে রাখে, দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি রোমান্সের কুহেলিকার মধ্যে মানব-হৃদয়ের তীব্র আলোড়নগুলির স্পষ্ট ছবি ফুটিয়ে তোলে—আর যেখানে তা তোলে না, সেখানে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালও সমভাবেই ব্যর্থ।

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে আর একটি প্রসঙ্গও স্মরণীয়। বাংলা নাটকে দীর্ঘকাল শেক্সপীয়রের নাট্যরীতিকে অনুসরণ করার চেষ্টা চলেছে। মধুসূদন, দীনবন্ধু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি পূর্ববর্তী নাট্যকারেরাও পাশ্চাত্য নাট্যরীতিকে অনুশীলন করার চেষ্টা করেছেন। গিরিশচন্দ্রও

প্লাবন, ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপ-আদিত্যে'। প্রতাপাদিত্যের পূর্বে বহুকাল ধরিয়া বাঙ্গালার নাট্যশালায় ঐতিহাসিক নাটক স্থান পায় নাই।"—রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর : অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৯৬।

৩০। "ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্য রচনার প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে কাহিনীর মনোহারিত্ব ও প্লটের গল্পরস।"—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫০) ডাঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ৩৯৬।

শেক্সপীয়রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবু পাশ্চাত্ত্য নাট্যরীতি দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকেই সবচেয়ে বেশী সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। তাঁর নাটকে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। নাটকীয় গতিবেগ, চরিত্রসৃষ্টি, অন্তর্দ্বন্দ্ববচনা, ট্রাজিকরস সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি পাশ্চাত্ত্য নাটকের দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হন। বিলাত-প্রবাসকালে পাশ্চাত্ত্য জীবনচর্যার প্রতি তিনি শুধু অনুরক্তই হন নি, ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়ের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল।[৩১] শেক্সপীয়রের জন্মভূমি ও সমাধিবেদী দেখে তরুণ দ্বিজেন্দ্রলাল আবেগবিহ্বল কণ্ঠে যে কথা বলেছিলেন তাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

"ঘুমাও কবিবর! যেখানে ইংরাজি ভাষা বিদিত সেখানে তোমার নাম অশ্রুত থাকিবে না। * * দূরে গঙ্গাতীরবাসী আর্যাবর্তের শ্যামল সন্তান তোমাকে ভারতীব বরপুত্র কালিদাসের প্রিয় ভ্রাতা, জগতের প্রিয় কবি বলিয়া আলিঙ্গন ও আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিবে।"[৩২]

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকে অসঙ্গতি ও অতিনাটকীয়তারও অভাব নেই। মোগল-রাজপুত সংঘাতের পটভূমিকায় নাটক রচনা করতে গিয়ে তিনি তৎকালীন দেশ-কালের বস্তুধর্মী চিত্র আঁকতে পারেন নি—নিজের দেশ-কালের কথাই বড় হয়ে উঠেছে। মুসলমান যুগের ইতিহাসের উপর তাঁর নিজস্ব কাল ও তার বিবিধ সমস্যার ছায়াপাত ঘটেছে। তৎকালীন জাতীয় জীবনের প্রবল ভাবাবেগ ও অনিয়ন্ত্রিত উচ্ছ্বাস অনেক সময় নাট্যকারদেরও মনোজীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালও কালের এই অমোঘ শাসনকে অতিক্রম করতে পারেন নি। তাই অকারণ উত্তেজনা, স্থূলভ ভাবোচ্ছ্বাস, সস্তা চমৎকারিত্ব, অসঙ্গত চরিত্র, অসংলগ্ন ও অতিনাটকীয় ঘটনা প্রভৃতি অনেকগুলি দুর্লক্ষণ তাঁর নাটকেও আছে। কিন্তু এই সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলিকে বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের স্বর্ণযুগের চূড়ান্ত পরিণতি হিসাবেই নির্দেশ করা যায়—

৩১। "বিলাতে যাইয়া বহু রঙ্গমঞ্চে বহু অভিনয় দেখি এবং ক্রমেই অভিনয় ব্যাপারটি আমার কাছে প্রিয়তর হইয়া উঠে।"

—আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ : নাট্য-মন্দির, শ্রাবণ, ১৩১৭।—

৩২। বিলাত-প্রবাসী (বিলাতের পত্র) : ১৬নং চিঠি।

কারণ পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক নাটক রচয়িতারাও মূলত দ্বিজেন্দ্র-প্রবর্তিত পথেরই অনুসরণ করেছেন।) ['দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব' অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য]

'তারাবাই' রচনার পর দ্বিজেন্দ্রলাল সাতখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন : 'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫), 'দুর্গাদাস' (১৯০৬), 'নূরজাহান' (১৯০৮), 'মেবার পতন' (১৯০৮), 'সাজাহান' (১৯০৯), 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১), 'সিংহল বিজয়' (১৯১৫)। কিন্তু প্রকৃতিগত দিক থেকে এই সাতখানি ঐতিহাসিক নাটককে একই শ্রেণীভুক্ত করা সম্ভব নয়। 'প্রতাপসিংহ' থেকে 'সাজাহান' পর্যন্ত পাঁচখানি নাটকের উপাদান মুসলমান যুগের ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই পাঁচখানি নাটকের মধ্যে মোগলযুগের ভারতবর্ষের কিঞ্চিদধিক শতবর্ষের ইতিহাস স্থান পেয়েছে। সুতরাং এই পাঁচখানি নাটককে একত্রে 'শতবর্ষ' নাম দেওয়া অসঙ্গত নয়।[৩৩] রাজ্যভ্রষ্ট রানাপ্রতাপের চিতোর উদ্ধারের কঠিন সঙ্কল্প থেকে আরম্ভ করে দুর্গাদাসের কাহিনী পর্যন্ত কাল নাট্যকার গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কালগত দিক থেকে এই নাট্যপঞ্চকের মধ্যে কিছু কিছু সংযোগসূত্র থাকলেও প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। 'প্রতাপসিংহ' 'দুর্গাদাস' ও 'মেবারপতন'—এই তিনখানি নাটকের সঙ্গে 'নূরজাহান' ও 'শাজাহান' নাটকের স্পষ্ট পার্থক্য চোখে পড়ে। প্রথম তিনখানি নাটকে রাজপুত ইতিহাসকেই প্রাধান্য দিয়ে তাদের শৌর্য-বীর্য, দেশপ্রেমিকতা ও আদর্শবাদকে উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত করা হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের একটি বিশেষ দর্শন এই তিনখানি নাটকের ভিতর দিয়ে নানা শাখায় পল্লবিত হয়েছে। 'প্রতাপসিংহ' নাটকে যে জ্বলন্ত দেশপ্রেম বহ্নিমান হয়ে উঠেছে, কল্যাণ-মৈত্রী-বিশ্বপ্রেমের ভিতর দিয়ে নাট্যকার তাকেই একটি মহত্তর রূপ দিয়েছেন 'মেবারপতন' নাটকে। 'শতবর্ষে'র দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রন্থদ্বয়ে—'নূরজাহান' ও 'শাজাহান' নাটকে নাট্যকার প্রধানত জাহাঙ্গীর ও শাজাহানের পারিবারিক জীবনের উপরই লক্ষ্য রেখেছেন—রাজপুত ইতিহাস এখানে অপেক্ষাকৃত গৌণ। এই দুখানি নাটকে নাট্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ববহুল জটিল চরিত্র অঙ্কন করেছেন। একাধিক বৃত্তির দ্বন্দ্বসংঘাতে মানবহৃদয়সমুদ্র কি ভাবে আলোড়িত হয়, তারই

৩৩। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর 'বঙ্গ-বিজেতা', 'মাধবীকঙ্কণ', 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' ও রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা'-কে একত্রিত করে 'শতবর্ষ' নাম দিয়েছিলেন।

সার্থক মনোবিজ্ঞানসম্মত চিত্র এখানে বিদ্যমান। শেক্সপীয়রীয় ট্রাজেডির শৈলীকেও এখানে অধিকতর যত্নের সঙ্গে অনুসরণ করা হয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল 'চন্দ্রগুপ্ত' ও 'সিংহল-বিজয়' নাটক দুখানি রচনা করেন। এই দুখানি নাটকই তাঁর হিন্দু-যুগ নিয়ে লেখা নাটক।[৩৪] 'শাজাহান' নাটকের পরেই 'চন্দ্রগুপ্ত' রচিত হয়। এই জন্য অন্তর্দ্বন্দ্ববহুল সংঘাতজটিল চরিত্র রচনার ধারা তখনও অব্যাহত ছিল। কিন্তু ইতিহাসের উদ্দীপনা ও প্রাণশক্তি এখানে অনেকখানি মন্থরগতি। 'মোগল-রাজপুত' যুগের ঐতিহাসিক নাটকে যে 'ইতিহাস-রস' ছিল এখানে তা যেন গৌণ হয়ে পড়েছে। পূর্ববর্তী নাটকগুলির তুলনায় 'সিংহল-বিজয়' নাটকের ইতিহাস অংশ নিতান্তই গৌণ—যেটুকু ঐতিহাসিক অংশ আছে তাও ইতিহাস নয়, ইতিকথা বা পুরাবৃত্ত। নাটকটির মধ্যে বিজয়-লীলা-কুবেণীর সম্পর্কবৈচিত্র্য ও ভাবদ্বন্দ্বই প্রধান হয়ে উঠেছে। 'সিংহল-বিজয়' পুরাবৃত্তাশ্রযী নাট্যরোমান্স। এই নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর অভিনব প্রেমতত্ত্বকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তুলনামূলকভাবে বিচার করতে হলে মোগল-রাজপুতসম্পর্কিত 'নাট্যপঞ্চক' রচনার যুগকেই দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটক রচনার শ্রেষ্ঠযুগ বলা যায়।

॥ ৮ ॥

'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫) নাটকের আখ্যায়িকা দ্বিজেন্দ্রলাল টডের রাজস্থান থেকে গ্রহণ করেছেন। তথ্যানুরক্তি ও ঐতিহাসিক বিশুদ্ধির দিক থেকে এই নাটককে ত্রুটিহীন বলা যায়। রাজ্যভ্রষ্ট রানা প্রতাপের চিতোর উদ্ধারের কঠোর সঙ্কল্প থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় পঁচিশ বছরের কাহিনী এই নাটকে বর্ণিত হয়েছে। 'প্রতাপসিংহ' প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতী'-র কথা মনে পড়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু 'অশ্রুমতী'র পটভূমিকার তেমন বিস্তৃতি

৩৪। "মিনার্ভা থিয়েটারের অভিনেতা শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ…একদিন কথায় কথায় দ্বিজেন্দ্রলালকে বলেন, "রায়সাহেব, এতদিন পিঁয়াজ রসুন খাইয়ে গায়ে গন্ধ দিয়েছেন, এইবার একবার ঘি আলোচাল খাইয়ে দিন না।" দ্বিজেন্দ্র উত্তর দেন, 'আচ্ছা এইবার তাই হবে।" দ্বিজেন্দ্রের অন্তরঙ্গ সুহৃদ শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মজুমদার মহাশয় 'লেন—'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক সেই প্রতিশ্রুতির ফল।"—দ্বিজেন্দ্রলাল : নবকৃষ্ণ ঘোষ, পৃঃ ১৮৬।

নেই; দ্বিতীয়ত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে ইতিহাসের চেয়ে কল্পনার স্থান অনেক বেশী; কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল একই কাহিনী নিয়ে বিশ্বস্তভাবে ইতিহাসের অনুসরণ করেছেন। ইতিহাসের প্রধান চরিত্রগুলিকে নাট্যকার অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় নাট্যকার বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপ-সিংহের শৌর্য, বীর্য, দেশপ্রেম ও অতুলনীয় আত্মত্যাগের মহিমময় চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রতাপের সংগ্রামশীলতা ও দেশের জন্য দুঃখবরণের কাহিনী সে যুগের রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে নূতন প্রেরণার সঞ্চার করেছিল। কিন্তু তথ্যানুগত্য থাকলেও প্রতাপসিংহ চরিত্রটি তেমন পরিস্ফুট হয় নি। ঐতিহাসিক প্রতাপসিংহের অন্তরালে মানুষ প্রতাপসিংহের ব্যক্তিচরিত্র নাটকীয় অন্তঃসংঘাতের আলোকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি—সুতরাং অন্তর্দ্বন্দ্ব-বহুল নাটকীয় চরিত্র হিসাবে চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে নি।

শক্তসিংহের চরিত্র অঙ্কনে নাট্যকার সর্বপ্রথম জটিল চরিত্রসৃষ্টির দিকে প্রবণতা দেখিয়েছেন। শক্তসিংহও ঐতিহাসিক চরিত্র, কিন্তু নাট্যকার নিজস্ব দৃষ্টির সাহায্যে চরিত্রটির রূপান্তর ঘটিয়েছেন। শক্তসিংহ যুক্তিবাদী, এমন কি যুক্তিবাদের দ্বারা তিনি দেশের প্রতি আনুগত্য ও কর্তব্যকেও খণ্ডন করতে চান: "আমি এখানে না জন্মে সমুদ্রবক্ষে বা ব্যোমপথে জন্মাতে পার্তাম" (১।১)। শক্তসিংহ উন্নতহৃদয় বীর, নির্ভীক, স্পষ্টবাদী ও উদ্ধত। তিনি বিদ্বান ও দার্শনিক। তাঁর দর্শন নাস্তিকতার দর্শন। প্রচলিত সমাজ ও ধর্মের শাসনকে তিনি অস্বীকার করেছেন; এমন কি প্রেমের মতো সুকোমল হৃদয়বৃত্তিকেও তিনি যুক্তিবাদী মনের দ্বারা বিশ্লেষণ করতে ছাড়েন নি—নারী সম্পর্কে তার ধারণাও সংশয়বাদী দার্শনিকের ধারণা: "এই ত নারী। নেহাৎ অসার! নেহাৎ কদাচার! আমরা লালসায় মাত্র তাকে সুন্দর দেখি। শুদ্ধ নারী কেন, মনুষ্যই কি জঘন্য জানোয়ার" (৪।১)। দৌলতউন্নিসার প্রেম ও প্রতাপসিংহের দেশপ্রেমের আদর্শই শক্তসিংহকে জীবনের নূতন পথের নির্দেশ দিয়েছে। জীবনের প্রতিও তাঁর যেন কোনো সুগভীর আসক্তি নেই। তাঁর জীবিতকালের মতো মৃত্যুঘটনার মধ্যেও বৈচিত্র্য আছে। তাঁর চরিত্র একটি প্রবল ঘূর্ণিবায়ুর মতো, আকস্মিক মৃত্যুদৃশ্য তদনুযায়ী অসঙ্গত হয় নি। এই ঐতিহাসিক চরিত্রটি নিয়ে নাট্যকার তাঁর কতকগুলি বিশিষ্ট চিন্তাকেই রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

শুধু শক্তসিংহ চরিত্রসৃষ্টিতেই নয়, আরও একাধিক চরিত্রে নাট্যকার সমাজ, ধর্ম, প্রেম, মনুষ্যত্ব সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণার পরিচয় দিয়েছেন। ইরা, মেহেরউন্নিসা ও দৌলতউন্নিসা—এই তিনটি কাল্পনিক নারীচরিত্র দ্বিজেন্দ্রলালের মতবাদের বাহন। ইরা রক্তমাংসের মানবী নয়, নাট্যকারের এক সমুন্নত ভাবাদর্শের প্রতীক। ইরার কাছে দেশপ্রেমের চেয়েও মনুষ্যত্ব, পরোপকারবৃত্তি ও বিশ্বপ্রেম অনেক বড। তাই এই আদর্শবাদিনী রাজপুত-কন্যার কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছে: "না বাবা, এ পৃথিবীই একদিন স্বর্গ হবে। যেদিন এ বিশ্বময় কেবল পরোপকার, প্রীতি, ভক্তি বিরাজ কর্বে, যেদিন অসীম প্রেমের জ্যোতিঃ নিখিলময় ছডিয়ে পডবে, যেদিন স্বার্থত্যাগেই স্বার্থলাভ হবে -সেই স্বর্গ" (৩।৭)।[৩৫] ইরা চরিত্রে পরবর্তী নাটক 'মেবারপতন'-এর পূর্বাভাস পাওয়া যায়। দৌলতউন্নিসা চরিত্রের মধ্যে নাট্যকার প্রেমের বিশ্ববিজয়িনী মহিমাকে দেখিয়েছেন। মেহেরউন্নিসার চরিত্রের মধ্যে একটি বিচারপ্রবণতা আছে। সমাজধর্মের ঊর্ধ্বে মনুষ্যত্বের জয়গানই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। শক্তসিংহ ও দৌলতউন্নিসার বিবাহ ব্যাপারকে তিনি তাঁর সঙ্কীর্ণচিত্ত পিতার কাছে মনুষ্যত্বের যুক্তি দিয়ে সপ্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন: "ধর্ম এক! ঈশ্বর এক! নীতি এক! মানুষ স্বার্থপরতায়, অহঙ্কারে, লালসায়, বিদ্বেষে তাকে বিকৃত করেছে। * * * মানুষ এক, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে বলে তারা ভিন্ন নয়" (৩।২)। মানসিংহ চরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকার ইতিহাসকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করলেও তাঁর মুখ দিয়ে নাট্যকার হিন্দু-সমাজের অনুদারতা ও সঙ্কীর্ণতার কথা বলেছেন (৫।৬)। যোশীচরিত্রের মধ্যে রাজপুতরমণীর আভিজাত্যবোধ, তেজস্বিতা ও চারিত্রিক দৃঢতা বলিষ্ঠ রেখায় অঙ্কিত হয়েছে। পৃথ্বীরাজের কবিচিত্তকে যোশীই তার সঙ্কল্পকঠোর চরিত্রের দ্বারা উদ্বোধিত করেছেন। যোশী নামটিই শুধু কাল্পনিক, কিন্তু চরিত্রটি ও তার রোমাঞ্চকর পরিণতি সম্পূর্ণরূপেই ঐতিহাসিক।[৩৬] শক্তসিংহের বিবাহ-ব্যাপারটিকে আকবরের

৩৫। তুলনীয় 'সত্যযুগ' কবিতা (আলেখ্য)

৩৬। "On retiring from the fair, she found herself entangled, amidst the labyrinth of apartments by which egress was purposely ordained, when Akbar stood before her but instead of acquiescence, she drew a

মতো প্রতাপসিংহও সুনজরে দেখতে পারেন নি। প্রতাপসিংহের মতো দেশপ্রেমিক যে বংশমর্যাদার সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে পারেন নি, নাট্যকার তাও স্পষ্ট করে তুলেছেন।[৩৭] আকবর গুণগ্রাহী রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ। তিনি তার কৈফিয়ত দিয়েছেন: "অনেকে ভাবিবেন যে এ গ্রন্থে আমি সম্রাট আকবরের চরিত্র মূল হইতে অন্যায় রূপে বিকৃত করিয়াছি। তাহা করি নাই, আকবরের চরিত্র আমি ঐরূপই বুঝিয়াছি। স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবুও ঐরূপই বুঝিয়াছিলেন।" টডের কাহিনীতেও আকবরের ইন্দ্রিয়লালসার কাহিনী আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের আকবর প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ, কিন্তু "রিপুর অধীন হইলে তিনি জঘন্য কার্য করিতে পারিতেন।"

'প্রতাপসিংহ' নাটকে কয়েকটি গুরুতর অসঙ্গতি আছে। মেহেরউন্নিসা ও দৌলতউন্নিসা চরিত্রদ্বয়ে এই অসঙ্গতি সবচেয়ে উৎকটরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। হলদিঘাটের যুদ্ধের সঙ্কটময় মুহূর্তে শক্তসিংহের শিবিরে নির্ভয়ে প্রবেশ করে একজন অবিবাহিত প্রৌঢ়পুরুষের কাছে অবাধে প্রেম-নিবেদন করা, যেমন অবাস্তব, তেমনি অসঙ্গত। নিতান্ত কার্যকারণ-সম্পর্কশূন্য স্থূলভ রোমান্সের সঙ্গে এই আদর্শদীপ্ত গম্ভীর নাটকখানির কোনো সঙ্গতি নেই। মেহেরউন্নিসার সঙ্গে আকবরের কথোপকথন (৩।৫) যে সুরে গিয়ে পৌঁচেছে, তাতে তাকে আর পিতা-পুত্রীর সংলাপ বলে মনে হয় না। পিতার সঙ্গে কন্যার এই জাতীয় কথোপকথন নিতান্ত অসঙ্গত ও রুচিবিগর্হিত। পিতার সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ও প্রতাপসিংহের গিরিগুহায় আশ্রয় অনুসন্ধান অর্থহীন ও উৎকট। শক্তসিংহের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও তাঁর নিজের কথা থেকেই যতটুকু জানা যায়—তা ছাড়া নাটকের মধ্যে কোথায়ও এই গোপন প্রেমের কোনো পরিচয় নেই। সম্ভবত, নাট্যকার মেহেরউন্নিসার প্রেমের ভিতর

poniard from her corset, and held it to his breast, dictating, and making him repeat the oath of renunciation of the infamy to all her race.

—Rajasthan (Vol. I. S. K. Lahiri Ed.)—Page 319-20.

৩৭। "কবি তাঁহার প্রতাপসিংহ নাটক মুখ্যতঃ এই কথাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে যদি আদর্শ উচ্চ না হয়, তবে প্রতাপসিংহের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও বীরত্বও ফলদায়ক হইতে পারে না।... বংশগৌরব অপেক্ষা যে স্বদেশ অনেক গুণে বড়, এবং স্বদেশ বলিতে যে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য বুঝায় না, এ কথাও নাটকের দুই তিন স্থলে কবি বুঝাইয়া গিয়াছেন।"

বিজয়চন্দ্র মজুমদার : প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩২০।

দিয়ে 'নিষ্কাম ভালবাসার' নিগূঢ় তত্ত্ব ফোটাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নাটকে কোথায়ও তা ফুটে উঠতে পারে নি। ইরা কবি দ্বিজেন্দ্রলালের সৃষ্টি—নাটকীয় চরিত্র হিসাবে তার অনেক ত্রুটি আছে। তার কাব্যধর্মী সংলাপ ও উচ্চতর দার্শনিক বিবেক নাট্যকারেরই নিজস্ব মত। দ্বিজেন্দ্রলালের অনেক নাটকের মতো 'প্রতাপসিংহ' নাটকে অতিনাটকীয়তা থাকলেও দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া খুব বেশী উৎকট হয়ে ওঠে নি। স্ত্রী-বিয়োগের পর কৌতুকরসের কবি জীবনগভীরে অবতরণ করার চেষ্টা করেছেন—তার সর্বপ্রথম প্রমাণ 'প্রতাপসিংহ' নাটক। কিন্তু নাটকটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দীর্ঘসংলাপযুক্ত বিবৃতিধর্মী হয়ে উঠেছে—নাটকীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব ও গতিধর্মের তেমন তীব্রতা নেই। ঐতিহাসিক নাটক রচনায় তিনি অনেকখানি অগ্রসর হয়েছেন বটে, কিন্তু ইতিহাসকে সম্পূর্ণরূপে জীবনরসরহস্যে মণ্ডিত করতে পারেন নি।

'দুর্গাদাস' (১৯০৬) নাটকটিও তিনি প্রধানত টডের 'রাজস্থান' কাহিনীর 'মাড়বারের ইতিহাস' অবলম্বন করেই রচনা করেছিলেন। কিন্তু পূর্ববর্তী নাটকের তুলনায় এই নাটকটিতে ঐতিহাসিক বিশ্বস্ততা অনেকখানি কম। গঠনরীতির দিক থেকেও এই নাটকটি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ।—অতিরিক্ত ঘটনার ভিড়ে ও অনাবশ্যক দৃশ্য-সংযোজনে নাটকটির কেন্দ্রীয় ঐক্য বহুধা-বিচ্ছিন্ন। তার ফলে নাট্যকারের মূল অভিপ্রায়টি অনেক ক্ষেত্রেই দ্বিধাগ্রস্ত ও গৌণ হয়ে পড়েছে। নাটকটির মধ্যে প্রায় ত্রিশ বছরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। অজিত সিংহের জন্ম (১৬৭৯) থেকে ঔরংজীবের মৃত্যুকাল (১৭০৭) এবং তারও কিছুকাল পর পর্যন্ত নাটকীয় ঘটনার বিস্তৃতি। ঔরংজীবের রাজত্বকালের শেষার্ধ নানা কারণে ভারত-ইতিহাসে এক সংঘাত-জটিল অধ্যায়। এই ঘটনাপ্রধান ঐতিহাসিক ক্রান্তিলগ্নকে নাট্যকার অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবেই রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই ঘটনাবহুল ঐতিহাসিক যুগকে কোনো একখানি নাটকে রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। নাট্যকার মোগল, মেবার, মাড়বার, মারাঠা—এই চারটি কেন্দ্রের উপরেই সমভাবে দৃষ্টি রাখার চেষ্টা করেছেন। এর ফলে কেন্দ্রগত ঐক্য রক্ষিত হওয়া কোনোক্রমেই সম্ভব হয় নি। এ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যেও নির্বাচনের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু নাট্যকার মুখ্য গৌণ সমস্ত ঘটনাকেই সমানভাবে নাটকে স্থান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। আকবরের কাহিনীকে,

জয়সিংহ-কমলা-সরস্বতীর ঘটনাকে, শম্ভুজীর আখ্যায়িকাকে নাটকে প্রয়োজনাতিরিক্ত স্থান দেওয়া হয়েছে। বিশেষত, রানা জয়সিংহের পারিবারিক ঘটনার সঙ্গে ইতিহাসের বা নাটকের বিন্দুতম সংযোগ পর্যন্ত নেই। 'প্রতাপসিংহ' নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল মোটামুটিভাবে একটি বিশেষ দিকেই তাঁর নাটকীয় দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন, কিন্তু 'দুর্গাদাস' নাটকে নাট্যকারের দৃষ্টি সপ্তদশ শতাব্দীর ঝটিকাবিক্ষুব্ধ ভারত-ইতিহাসের প্রবল-বাত্যায় বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে।

নাট্যকার দুর্গাদাস চরিত্রকে নায়ক এবং কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। কিন্তু নাটকের পূর্বাপর দুর্গাদাসের উপস্থিতি সত্ত্বেও কোথায়ও যেন তিনি তেমন পরিস্ফুট হন নি। তার কারণ দুটি : প্রথমত, অতিরিক্ত ঘটনা ও অনাবশ্যক চরিত্রের ভিড় ; দ্বিতীয়ত, দুর্গাদাস চরিত্রে আদর্শের আতিশয্য। অসাধারণ বুদ্ধিচাতুর্য, বীরত্ব, আত্মত্যাগ, আভিজাত্যবোধ, প্রভুভক্তি, আশ্রিতবাৎসল্য, কর্তব্যবোধ, সুমহান দেশপ্রেম প্রভৃতি দেবদুর্লভ গুণাবলী দ্বারা তিনি এই রাঠোর বীরের চরিত্রকে ভূষিত করেছেন। এই সর্বগুণান্বিত চরিত্রটির মধ্যে মর্ত্যের মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায় না—মানবীয় দুর্বলতা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কোনো পরিচয়ই এই চরিত্রটিতে পরিস্ফুট হয় নি।[৩৮] 'দুর্গাদাস' চরিত্রের মধ্যে নাট্যকার তাঁর পিতার 'দেব-চরিত্র' ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। নাট্যকার 'ভূমিকায়' নাটকটিকে ট্র্যাজেডি বলতে চেয়েছেন : "ইহার 'ট্রাজেডি'ত্ব' চিরজীবনের উপাসনার নিষ্ফলতায়, আজন্ম সাধনার অসিদ্ধতায়, প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত চেষ্টার পরাজয়ে। ইহার 'ট্রাজেডিত্ব' ঐ এক কথায়—"ব্যর্থ হয়েছে—পার্লাম না এ জাতিকে টেনে তুলতে।" কিন্তু নাট্যকারের এই বিচার অভ্রান্ত বলে মনে হয় না। প্রথমত দুর্গাদাসের মতো নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের পক্ষে ট্রাজেডি ঘটা সম্ভব নয়।[৩৯] দ্বিতীয়ত,

৩৮। "দ্বিজেন্দ্রলালের 'দুর্গাদাস' নাটক পাঠ করিয়া তাঁহার বন্ধু মনস্বী ৺লোকেন্দ্রনাথ পালিত আই-সি-এস মহাশয় বলেন যে, দুর্গাদাস চরিত্র "bundle of qualities" হইয়াছে, যদি গুণের সঙ্গে weakness-এর উন্মেষ থাকিত, তাহা হইলে চরিত্র আরও ফুটিত।"

—দ্বিজেন্দ্রলাল : নবকৃষ্ণ ঘোষ (দ্বিতীয় সং), পৃঃ ১৫৩-১৫৪।

৩৯। "As we have seen, the idea of the tragic hero as a being destroyed simply and solely by external forces is quite alien to him

দুর্গাদাস চরিত্রের মধ্যে তেমন কোনো অন্তর্দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই—তাঁর পরিণতি কোনো গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বাভাবিক পরিণাম নয়। দুর্গাদাস চরিত্রটি পূর্বাপর এক ঐতিহাসিক আবর্তে আলোড়িত হয়েছে। নাট্যকার তাঁর অন্তর্জীবনকে তেমনভাবে উদ্‌ঘাটিত করতে পারেন নি। তৃতীয়ত, 'চিরজীবনের উপাসনার নিষ্ফলতা', 'আজন্ম সাধনার অসিদ্ধতা', কিংবা 'প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পরাজয়'—এর কোনোটিই দুর্গাদাস চরিত্রে পরিস্ফুট হয় নি —নাট্যকারের অভিপ্রেত থাকলেও নাটকে তার কোনো চিহ্ন নেই। একমাত্র শেষ দৃশ্যে দুর্গাদাসের ভাবনার অবকাশ এসেছে, কিন্তু সেখানেও নাট্যকার-বর্ণিত বিশেষত্বগুলি ট্রাজেডির সমুচ্চতা লাভ করে নি।

ঔরংজীব পরধর্মদ্বেষী, ইসলামধর্মের সংরক্ষক; রাজনৈতিক কূটবুদ্ধিরও তাঁর অভাব ছিল না। পরবর্তীকালের 'সাজাহান' নাটকটিতে দ্বিজেন্দ্রলাল তরুণতর ঔরংজীবের যে ক্রূর, কুটিল, দ্বন্দ্বজটিল চরিত্র ফুটিয়েছেন, এখানে তার সামান্য দু-একটি ইঙ্গিত আছে মাত্র। 'দুর্গাদাস' নাটকের ঔরংজীব চরিত্রকে নাট্যকার অযথা মসীবর্ণে রঞ্জিত করেন নি। তিনি 'ভূমিকায়' বলেছেন: "ঔরংজীবকে আমি পিশাচরূপে কল্পনা করি নাই—যেরূপ টড্ ও অর্ম করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে 'সরল ধার্মিক মুসলমান রূপে কল্পনা করিয়াছি। তাঁহার অত্যাচার অত্যধিক গোঁড়ামির ফল। ইসলাম ধর্ম প্রচারের দৃঢ়-সঙ্কল্প-প্রসূত।"—ঔরংজীবের শেষ-জীবনের বিষাদময় পরিস্থিতি নাট্যকার খানিকটা ফুটিয়ে তুলেছেন। নিজের কতকগুলি ভ্রান্তনীতির জন্য বিশাল সাম্রাজ্যের চারদিকে নানা বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়েছে—তাঁর জীবিতকালেই পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে কলহ দেখা দিয়েছিল, আকবর বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। শেষজীবনে ঔরংজীব মেবার ও মাড়বারের সম্মিলিত শক্তির কাছে পর্যুদস্ত, শক্তিমান দুর্গাদাস ও দিলীর খাঁ দ্বারা উপেক্ষিত। মারাঠা শক্তিও সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল। ঔরংজীব

(Shakespeare); and not less so is the idea of the hero as contributing to his destruction only by acts in which we see no flaw. But the fatal imperfection or error, which is never absent, is of different kinds and degrees."

—Shakespearean Tragedy (1941): A. C. Bradley. Pp. 21-22.

ক্ষমতাপ্রিয়া গুলনেয়ারের খেয়াল-খুশি চরিতার্থ করার একটি ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছেন।[৪০]

নাট্যকার গুলনেয়ার চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তোলার চেষ্টা করেছেন।[৪১] গুলনেয়ারের তীব্র প্রতিহিংসাস্পৃহা, ক্ষমতালিপ্সা ও ইন্দ্রিয়লালসা নাটকে উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু এই চরিত্রটিতে অসঙ্গতিও চূড়ান্তরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। যশোবন্ত সিংহের বিধবা রানীর পূর্বকৃত এক অপরাধের জন্য প্রতিহিংসা গ্রহণে অসমর্থ হয়ে কারাগারে দুর্গাদাসের প্রতি আকস্মিক প্রণয়-নিবেদন যেমন অনৈতিহাসিক, তেমনি অসঙ্গত। দুর্গাদাসকে দর্শনমাত্রেই তাঁর প্রেমে-পড়া মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়েও সম্পূর্ণ অসম্ভব—অন্তত, প্রণয়কাহিনীকে যুক্তিসঙ্গত করতে হলে দু-একটি দৃশ্যে এর বীজ ও কার্য-কারণ সম্পর্ক দেখানো উচিত ছিল। প্রণয়ীকে প্রেম-নিবেদন করতে এসে এই কামাতুরা সম্রাজ্ঞীর সঙ্গী হয়েছে কামবক্স, যে তাঁরই গর্ভজাত-পুত্র (৪।৮)! পিতামহী গুলনেয়ার ও পৌত্রী রাজিয়া পরস্পরের ব্যর্থ প্রেমাকাঙ্ক্ষা নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তা নিতান্তই দৃষ্টিকটু হয়েছে। রাজিয়া চরিত্রের কোনো নাটকীয় মূল্য নেই। কাহিনীর গঠনশৈথিল্য, অবান্তর দৃশ্য ও চরিত্র সংযোজন নাটকের স্বাভাবিক গতিধর্মকে ব্যাহত করেছে।

'প্রতাপসিংহ' নাটকের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল শক্তসিংহ, মেহেরউন্নিসা ও ইরার মুখ দিয়ে নানা সামাজিক ও দার্শনিক চিন্তার অবতারণা করেছেন। 'দুর্গাদাস' নাটকে হিন্দু-মুসলমানের মিলনবাণীকে তিনি রূপ দেওয়ার চেষ্টা

৪০। "The last year of Aurangzib's life were unspeakably gloomy. In the political sphere he found that his life-long endeavour to govern India justly and strongly had ended in anarchy and disruption throughout the empire. A sense of unutterable loneliness haunted the heart of Aurangzib in his old age...his last wife Udipuri, a low animal type of partner, whose son Kam Bakhsh broke his imperial father's heart by his freaks of insane folly and passion. His domestic life was darkened, as bereavements thickened round his closing eyes."

—A Short History of Aurangzib : J. N. Sarkar. Pp 380-81.

৪১। গুলনেয়ার ঐতিহাসিক নাম নয়। গুলনেয়ার সম্ভবত কামবক্স-মাতা উদিপুরী মহল। মোগল-যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের ভাষায়—"She retained her charms and influence over the Emperor till his death, and was the darling of his old age."—Ibid—Page 15.

'নূরজাহান' নাটকেই সর্বপ্রথম তিনি নায়িকার চরিত্রের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বসংঘাতের সৃষ্টি করেছেন। 'নূরজাহান' নাটকটি 'দুর্গাদাস' ও 'মেবার-পতন' নাটক দুটির মধ্যবর্তীকালে রচিত হয়—কিন্তু পূর্ববর্তী বা পরবর্তী নাটকের কোনো প্রভাব এখানে নেই। বরং নাট্যাদর্শের দিক থেকে 'সাজাহান' নাটকের সঙ্গেই এর আত্মিক সম্পর্ক আছে। নাট্যকার নিজেই নাটকের 'ভূমিকায়' এ সম্পর্কে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন: "মৎপ্রণীত অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটক হইতে নূরজাহান নাটকের অনেক বিষয়ে প্রভেদ লক্ষিত হইবে। প্রথম প্রভেদ এই যে, আমি এই নাটকে দেবচরিত্র সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করি নাই। আমি এই নাটকে দোষগুণ-সমন্বিত মনুষ্য-চরিত্র অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। দ্বিতীয় প্রভেদ এই যে, এই নাটকে বাহিরের যুদ্ধ অপেক্ষা ভিতরের যুদ্ধ দেখাইতেই আমি আপনাকে সমধিক ব্যাপৃত রাখিয়াছি।"

'নূরজাহান' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র নূরজাহান। এই চরিত্রটিকে মনস্তত্ত্ব-সম্মত রূপ দিতে গিয়ে নাট্যকার কোনো কোনো সময় ইতিহাসানুমোদিত পথে অগ্রসর হন নি। নাট্যকার ইতিহাসের মোটামুটি কাঠামো ঠিক রেখে নূরজাহান চরিত্র বিকাশের জন্য যতটুকু কল্পনার প্রয়োজন আছে, ততটুকুই গ্রহণ করেছেন। শের আফগান ও নূরজাহানের দাম্পত্য জীবনের বিস্তৃত বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া সম্ভব নয়। নাট্যকার নূরজাহান জীবনের এই অংশটি চরিত্রটির সামগ্রিক পরিকল্পনা অনুযায়ীই রচনা করেছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীরের সঙ্গে বিবাহের পূর্ববর্তী চার বছর সম্পর্কে নানা রোমান্টিক ঘটনার কথাই পূর্বতন ঐতিহাসিকেরা বলেছেন। নাট্যকার নূরজাহানকে প্রতিহিংসাময়ী করে সৃষ্টি করেছেন। নাটকের নূরজাহান তাঁর স্বামিহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য স্বামিহন্তাকে বিবাহ করতে স্বীকৃত হয়েছেন (২।৫) এবং পরবর্তী আর একটি দৃশ্যে কন্যা তাঁর প্রতিহিংসাবৃত্তির সহায়িকা হয়েছে (২।৮)। এর কোনো ঘটনাই ঐতিহাসিক নয়, নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত। নূরজাহানকে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে বিবাহের জন্য আসফ খাঁর প্ররোচনাও সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। নাটকে নূরজাহান জাহাঙ্গীরকে তাঁর ক্ষমতালিপ্সার একটি প্রধান হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন, ভালোবাসেন নি। কিন্তু ইতিহাসে নূরজাহানের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা থাকলেও

জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তাঁর বিবাহিত জীবন যে সুখের হয়েছিল, তাও বলা হয়েছে।[৪৫] খসরুর মাতা মানসিংহের ভগিনী (মানবাঈ, রেবা নয়) জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহণের পূর্বেই আত্মহত্যা করেন। সুতরাং রেবার সঙ্গে নূরজাহানের ঈর্ষার ব্যাপারটি নূরজাহান-চরিত্রেরই একটি দিক প্রকাশ করেছে—কিন্তু ঘটনাটি ঐতিহাসিক নয়। লয়লা চরিত্রের ইতিহাস-স্বীকৃতি থাকলেও, নাট্যকার তাকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়ে চমৎকারিত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। ইতিহাসের সঙ্গে সবচেয়ে বড় অসঙ্গতি আছে নূরজাহানের পরিণাম-বর্ণনায়। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর ভারতসম্রাজ্ঞী নূরজাহানের উন্মাদনা ও শোচনীয় পরিণতি সম্পূর্ণরূপেই নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত।[৪৬]

'নূরজাহান' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র নূরজাহান। এই চরিত্র অঙ্কনে নাট্যকার মনস্তত্ত্বসম্মত জটিল চরিত্রসৃষ্টির কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। নূরজাহান চরিত্রে একাধিক বিরুদ্ধ-বৃত্তির সংঘাতলীলা পরিস্ফুট হয়েছে। নাটকের প্রথম থেকেই একটি তীব্র আলোড়ন সঞ্চারিত হয়েছে। প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যেই নূরজাহান চরিত্রের বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয়েছে। বর্ধমানের দামোদর-তটের উদ্যানবাড়িতে শের খাঁ ও মেহেরউন্নিসার দাম্পত্য জীবনের একটি নিশ্চিন্ত পরিবেশ সৃষ্টি ক'রা হয়েছে। শের খাঁর মনে একটি পরিতৃপ্তির আনন্দ,

৪৫। বেণীপ্রসাদ তাঁর 'History of Jahangir'-এ বলেছেন :

"She loved Jahangir intensely. She mourned him intensely."

অন্যত্র বলেছেন :

"It was in perfect harmony with her character that she was intensely ambitious...Nurjahan added practical capacity of the of the highest order."—Chapter VIII

৪৬। নূরজাহানের শেষজীবন সম্পর্কে ইংরেজ ঐতিহাসিকের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য : "She never henceforward spoke upon state affairs, or allowed the subject to be mentioned in her presence. ...Though her passions were violent her chastity was never impeached, and she lived an eminent pattern of conjugal fidelity. ...She died in the city of Lahore eighteenth years after the death of Jahangir."—Nurjahan and Jahangir. Robert Counter. বেণীপ্রসাদও বলেছেন : "Henceforward she wore only white cloth, abstained from parties of pleasure and lived privately in sorrow, chiefly at Lahore, with her daughter, the widow of Prince Shahriyar."—Chapter XXII

কিন্তু নূরজাহানের মনের উপর পড়েছে সংশয়ের ঘন-ছায়া—তাই পরিপূর্ণ সুখের মধ্যেও নূরজাহানের দীর্ঘশ্বাস পড়েছে—"কিন্তু এত সুখ বুঝি সইবে না।" নূরজাহানের এই উক্তিটি একটি নাটকীয় আয়রনি। এই মিতাক্ষর মন্তব্যটির আড়াল থেকে নূরজাহান চরিত্র ও শের খাঁ-নূরজাহানের দাম্পত্য-জীবনের স্বরূপটি যেন এক মুহূর্তে বিদ্যুতের শিখার মতো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। পর-মুহূর্তে আসফের মুখে জাহাঙ্গীরের সিংহাসন আরোহণ করার খবর শুনে তাঁর মনে এক দুর্নিবার হৃদয়াবেগ জেগে উঠেছে, কিন্তু তাকে জোর করেই তিনি দমন করার চেষ্টা করেছেন: "সেলিম সম্রাট্! আবার সে কথা কেন মনে আসে?—না, সে চিন্তাকে আমি মনে আসতে দিব না—না না না। সে প্রথম যৌবনের একটি খেয়াল মাত্র। এখন আবার সে চিন্তা কেন? সেলিম সম্রাট্, তাতে আমার কি?" (১।১) নূরজাহান যে প্রথম থেকেই প্রবল হৃদয়াবেগশালিনী রহস্য-জটিল চরিত্র, তার ইঙ্গিত শের খাঁর উক্তি থেকেও জানা যায়—"মেহের মাঝে মাঝে বিচলিত হয় বটে, কিন্তু এত বিচলিত হতে তাকে সম্প্রতি কখনো দেখি নি।" (১।১)।

শের খাঁর মৃত্যুর পূর্বে আরও দুটি দৃশ্যে নাট্যকার নূরজাহান চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেছেন। প্রথম অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যে আগ্রায় শের খাঁয়ের গৃহে নূরজাহান তাঁর বান্ধবীর কাছে নিজের কুমারীজীবনের ভোজসভায় নৃত্যের বৃত্তান্ত ও সেলিমের রূপোন্মাদনার কথা বর্ণনা করেছেন। নূরজাহান আত্মসচেতনা নায়িকা, তাই অনেক সময় তিনি নিজের হৃদয় বিশ্লেষণ করেছেন। জাহাঙ্গীরের প্রতি বর্তমান মনোভাবের কথা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন: "না, তাকে আসক্তি বলে না, সে একটা উদ্দাম প্রবৃত্তি। হয় ত উচ্চাশা—হয় ত অহঙ্কার। কিন্তু আসক্তি নয়।" সেলিমের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ থেকেও নূরজাহান চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। সেদিন সেলিমকে মোহমুগ্ধ করে তিনি এক অভূতপূর্ব বিজয়গর্ব অনুভব করেছিলেন (১।৪)। শের খাঁ যখন শেষবারের মতো নূরজাহানের কাছে থেকে বিদায় গ্রহণ করেন, তখন নূরজাহানের উক্তিটি লক্ষণীয়: "স্বামী! যদি ভক্তি প্রেমের শূন্যতা পূর্ণ করতে পারত, তবে সে ভক্তি তোমার পায়ে ঢেলে দিতাম" (১।৮)। প্রথমাঙ্কের নূরজাহান চরিত্র থেকে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, তিনি শের খাঁ বা জাহাঙ্গীর কাউকেই ভালোবাসতে পারেন নি

—একজনকে ভক্তি করেছেন এবং আর একজনকে মুগ্ধ করার জন্য এক তীব্র আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছেন।

শের খাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নূরজাহান-জীবনের একটি অধ্যায় পরিসমাপ্ত হয়েছে। আগ্রাপ্রাসাদে আসার পর থেকেই নূরজাহান চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব জটিলতর আবর্ত রচনা করেছে। যে 'শয়তানী' তাঁকে আগ্রায় টেনে এনেছে, তাকে প্রাণপণে দমন করার চেষ্টা করেছেন—এইখান থেকেই স্পষ্টভাবে তাঁর অন্তর্জীবনে আত্মক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু হয়েছে (২।৩)। নূরজাহানের মুক্তির প্রার্থনা যেদিন মঞ্জুর হল, সেদিন তাঁর জীবনে এল চূড়ান্ত পরীক্ষার মুহূর্ত। প্রথমে তিনি তাঁর "শয়তানী প্রবৃত্তি" দমন করার জন্য বর্ধমানে গিয়ে স্বামীর স্মৃতি ধ্যান করতে চেয়েছিলেন। একদিকে স্বামীর স্মৃতি ও কন্যার প্রতি কর্তব্যবোধ, অন্যদিকে উচ্চাশা ও ক্ষমতালিপ্সা—নূরজাহান-চরিত্রটি এই বিপরীত-বৃত্তির সংঘাতে আন্দোলিত হয়েছে। তাঁর বিশ্লেষণ-পরায়ণ মন তাই প্রশ্ন করেছে: "মানুষের মধ্যে কি দুটো মানুষ আছে? তা না হলে অশ্রান্ত দ্বন্দ্ব চলেছে কার সঙ্গে?" (২।৫) নিরন্তর আত্মক্ষয়ী সংগ্রামের জন্য নূরজাহানের মনের একটি দিক ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণুতার পথে চলেছিল —তাই আসফের প্ররোচনায় ও অনুরোধে তাঁর মনের পত্নীসত্তা মাতৃসত্তা দুই-ই এক শয়তানী বাসনার মধ্যে লীন হয়ে গেল। প্রথম দু অঙ্কের মধ্যেই নূরজাহান চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ট্রাজেডির স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। শের খাঁর মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত বধূ মেহেরের চরিত্র। প্রেমহীন দাম্পত্যজীবনের মধ্যে মাঝে মাঝে উচ্চাকাঙ্ক্ষার উদ্দাম প্রবৃত্তি তাঁকে বিচলিত করে তুলত। শের খাঁর মৃত্যুর পর থেকে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে বিবাহের পূর্ববর্তী চার বছরের ইতিহাস নূরজাহান জীবনের সন্ধিপর্ব। এই সংক্ষিপ্ত পর্বটিতে নূরজাহান শেষ পর্যন্ত শয়তানীর কাছে আত্মবিক্রয় করেছেন।

সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ইতিহাস এক অব্যাহত স্বেচ্ছাচার ও ক্ষমতালিপ্সার কাহিনী। তাঁর স্বেচ্ছাচারিতার যূপকাষ্ঠের প্রথম বলি রেবা ও তাঁর পুত্র খসরু। রেবার প্রতি ঈর্ষার জন্যই তিনি সাজাহানকে খসরুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছেন। তাঁর এই আচরণের মধ্যে সাজাহানের প্রতি বিন্দুমাত্র ভালোবাসা ছিল না—খসরু হত্যার হাতিয়ার হিসাবে তাকে ব্যবহার করে সাজাহানের পরিবারকেও তিনি 'অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ' করতে চেয়েছেন (৩।২)।

তাতেও নিশ্চিন্ত না হয়ে পাপিষ্ঠ বন্দররাজকে গোপনে খসরু হত্যার জন্য নিয়োগ করেছেন। নূরজাহান ক্ষমতার মদিরা আকণ্ঠ পান করেছেন। তাঁর অবাধ স্বেচ্ছাচারের পথে প্রধান বাধা দুজন—সম্রাটের তৃতীয় পুত্র সাজাহান ও সেনাপতি মহাবৎ খাঁ। খসরু হত্যার দায়িত্ব সাজাহানের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছে—মহাবৎ খাঁও বিদ্রোহী হয়েছেন। নূরজাহান-মোহমুগ্ধ জাহাঙ্গীরের অনুরোধে সম্রাজ্ঞীব মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা শেষ পর্যন্ত রহিত হয়েছে। নূরজাহানের শেস প্রচেষ্টা শারিয়ারকে সম্রাট করা—তাও শোচনীয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। জাহাঙ্গীরের মৃত্যু, সাজাহানের সিংহাসনারোহণ ও ক্ষমতালিপ্সা, নূরজাহানেব শোচনীয় ব্যর্থতা তাঁর পবিণতিকে মর্মান্তিক করে তুলেছে। ক্ষমতার উচ্চতম শৃঙ্গ থেকে পতনই নূরজাহানেব ট্রাজেডির মূল কাবণ নয়, অবশ্য এই পতনই তাঁর ট্রাজিক পরিণতিকে বিস্তৃত ও ত্বরান্বিত করেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

নূবজাহানের ট্রাজেডিব আসল সত্য নিহিত আছে তাঁরই অন্তর্জীবনের মর্মমূলে—রূপান্তবিত ব্যক্তিসত্তার অশান্ত অস্থিবতার মধ্যে, আত্মক্ষয়ী সংগ্রামের বিক্ত নিঃস্ব পবিণতিব মধ্যে। নাট্যকার অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সঙ্গে তাঁর এই আত্মিক অপচয়েব নাটকীয় চিত্র এঁকেছেন। প্রথম অঙ্কে বধূ মেহেরের বিবাহিত জীবনের দ্বন্দ্ব, দ্বিতীয় অঙ্কে বপ মেহের ও মাতা মেহেরের প্রাণপণে আত্মরক্ষাব শেষ প্রচেষ্টার সঙ্গে সম্রাজ্ঞী নূবজাহানেব শয়তানীবৃত্তির দ্বন্দ্ব ও শেষোক্ত বৃত্তির জয়লাভ, তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কে সম্রাজ্ঞী নূরজাহান তাঁর স্বেচ্ছাচাবের ও শক্তিমদমত্ততার শকট চালিয়েছেন—তার লৌহচক্রের নীচে জাহাঙ্গীরের রাজনৈতিক জীবন ও পাবিবাবিক জীবন পিষ্ট হয়েছে। চতুর্থ অঙ্কের শেষ দিক থেকেই নূবজাহানের আত্মক্ষয়কাবী সংগ্রাম পতনের ঢালুপথ অবলম্বন করেছে—জীবনের সমস্ত বৃত্তিকে ছাপিয়ে একটি বৃত্তিই চূড়ান্ত হয়ে উঠেছে—সেখানে শুধু আছেন নূরজাহান ও তাঁর ধ্বংস। তাই তিনি বলেছেন: "আজ সব বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়েছি। এ বিশাল সংসারে আজ আমি একা। আর কাকে ভয়?—দাও, ঘোড়া ছুটিয়ে দাও নূরজাহান! পড়ো, পড়বে। হয় জয়, না হয় মৃত্যু। আর আমার সাধও নাই যে আমাকে ফিরাই।" (৪।২) নূরজাহানের দ্বৈত সত্তা এখানে সুন্দরভাবে ফুটেছে। নূরজাহান নিজেই বহ্নি এবং নিজেই তার ইন্ধন।

পঞ্চমাঙ্কে নূরজাহানের ট্রাজেডির পূর্ণাহুতি ঘটেছে। চতুর্থ অঙ্কেই আত্মক্ষয়ী সংগ্রাম ও অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে যে শূন্যতার হাহাকার উত্থিত হয়েছিল, এখানে তার ব্যাপকতা ও পরিণতি বিদ্যুৎ-রেখায় ফুটে উঠেছে। জগৎ-বিধানের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক ও তার একটি ব্যর্থ পরিণাম নূরজাহানের চোখের সম্মুখে ভেসে উঠেছে :

"আমরা সব সংসারের খেলার পুত্তলী। সে এই মুহূর্তে কাউকে অত্যাদর করে কোলে তুলে নেয়, আবার পরমুহূর্তেই তাকে অবহেলায় ভূতলে নিক্ষেপ করে।····· তার বিরাট কারখানা, মানুষের সুখ-দুঃখ তার উৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গ ও ধূমরাশির মত। সেদিকে তার লক্ষ্য নাই। কালের নেমি বিশ্বঘটনাবক্ষ দলিত করে ছুটেছে—বিশ্বের বেদনার দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নাই।" (৫ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

বধূ মেহের ও মাতা মেহেরের অপমৃত্যু ঘটিয়ে পিশাচী নূরজাহানের তাণ্ডব-নৃত্য শুরু হয়েছিল। ধীরে ধীরে তার রাজত্বও চলে যাচ্ছে—তাই এক মর্মান্তিক হাহাকার ও শূন্যতার বেদনা পঞ্চমাঙ্কের শেষদিকে নূরজাহান চরিত্রটিকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করেছে। মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রবলতাই তাঁর স্বাভাবিক বোধশক্তি ও সুস্থ ভাবনাকেও বিকৃত করেছে।[৪৭] নূরজাহান-চরিত্রের সঙ্গতি সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। কেউ কেউ চরিত্রটির মধ্যে কোনো সঙ্গতিসূত্র খুঁজে পান নি।[৪৮] নূরজাহান চরিত্রের পরিবর্তনের লগ্নগুলি

৪৭। ডাঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্যের একটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : "নূরজাহানের যে নূরজাহানের বড় ট্রাজেডি ইহাই নাট্যকার নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন। বধূ-মেহেরকে গলা টিপিয়া মারিয়া, মাতা মেহেরকে আত্মাবমাননার অতল পঙ্কে নিমজ্জিত করিয়া, ক্ষমতার মদিরা পান করিতে করিতে যে মত্ত নূরজাহান দেখা দিল, তাহার মধ্যে আপাত শক্তিবিক্ষেপের অন্তরালে দেখা দিয়াছে সুদুঃসহ নৈতিক রিক্ততার হাহাকার—ঘনান্ধ নৈরাশ্যের মৃত্যুস্থির মহাশূন্যতা। 'বধূ-মেহের' 'মাতা মেহেরের' শবের উপর ও প্রেত পিশাচী নূরজাহানের ভৈরব-নৃত্যের পরিকল্পনায়—তথা ব্যক্তিটির আত্মক্ষয়ের মহাশূন্যতায় ট্রাজিকত্ব শুধু যে অক্ষুণ্ণই আছে তাহা নহে, অদ্ভুত তীব্র সংবেদনা লইয়াই বিস্ফুরিত হইয়াছে।"

—নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাট্যবিচার (তৃতীয় খণ্ড) পৃঃ ১১২-১৩

৪৮। "নূরজাহানের চরিত্রে সঙ্গতি নাই। সে স্বামীকেও ভালবাসে নাই, জাহাঙ্গীরকেও নয়, অথচ তার মনোভাব পরিবর্তনের কোন উপযুক্ত কারণ দেখানো হয় নাই।"—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড—১৩৫০) : ডাঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ৩৮৯।

করে দেওয়া থেকে আরম্ভ করে চতুর্থ অঙ্কে তাঁর সমুদ্রগর্ভে মৃত্যুর দৃশ্যটি পর্যন্ত ঘটনা সম্পূর্ণভাবেই কাল্পনিক। বিজয়ের রাজপুত্র-বন্ধু বিজিত, দুজন সহচর উরুবেল ও অনুরোধ। মহাবংশে বর্ণিত আছে যে সিংহলবিজয়ের পর, বিজয়ের এক-একজন সহচর তাঁদের নিজেদের নামানুযায়ী এক-একটি নগর পত্তন করলেন—অনুরোধ, উরুবেল এবং বিজিত এই তিনটি নাম নাট্যকার সেখান থেকেই গ্রহণ করে থাকবেন।[১৬] কুবেণী চরিত্রটি প্রকৃতপক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের নিজস্ব সৃষ্টি হলেও মহাবংশ থেকেই তিনি মূল পরিকল্পনাটি পেয়েছেন। মহাবংশে বর্ণিত কুবণ্ণা (কুবর্ণা) নামক যক্ষিণীই এখানে কুবেণীতে পরিণত হয়েছেন। এই যক্ষিণীর কাহিনী বিজয়সিংহ আখ্যায়িকার অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে।—বিজয়ের সঙ্গে তার প্রণয়কাহিনীকেও বর্ণনা করা হয়েছে।[১৭] উৎপলবর্ণের চরিত্র মহাবংশে না থাকলেও বিজয়ের সহচরদের হাত বেঁধে দেওয়া ও গায়ে জল ছিটিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটি মহাবংশ-সম্মত[১৮] —তবে এটি করেছিলেন ভগবান বুদ্ধের অনুরোধে স্বয়ং ইন্দ্র। যক্ষরাজ কালসেনের নামটিও মহাবংশের টীকায় পাওয়া যায়।

মহাবংশের ছায়া নিয়ে নাটকের কোনো কোনো অংশ রচিত হলেও নাটকটিতে নাট্যকারের কল্পনার যথেচ্ছাচার লক্ষ্য করা যায়। কাহিনীর এমন শিথিলতা ও বিক্ষিপ্ততা দ্বিজেন্দ্রলালের অন্য কোনো নাটকে নেই[১৯]—

১৬। "Anuradhagama was built by a man of that name near the Kadamba river ;...There other ministers built, each for himself, Ujjeni, Uruvela, and the city of Vijita"—Ibid—Chapter VII. Verses 43-45.

১৭। "At the foot of a tree she made a splendid bed, well-covered around with a tent, and adorned with a canopy. And seeing this, the king's son, looking forward to the time to come took, her to him as his spouse and lay (with her) blissfully on that bed ; and all his men encamped around the tent."—Ibid—Verses 28-29.

১৮। "...And when he had spoken so and sprinkled water on them from his water-vessel and had wound a thread about their hands..." Ibid—Verses 8-9.

১৯। ডাঃ সুকুমার সেনের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য : 'সিংহল-বিজয় নাটকের প্লট ঐতিহাসিক নয়, পারিবারিক ষড়যন্ত্রের কাহিনী মাত্র।'—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫০), পৃঃ ৩৮৯।

কাহিনীতেও অযথা জটিলতা সৃষ্টি করা হয়েছে। কাহিনীর অযথা জটিলতা, অবান্তর চরিত্র ও অপ্রয়োজনীয় ঘটনা নাটকটির গতিকে পদে পদে অবরুদ্ধ করেছে। 'সিংহল-বিজয়' দ্বিজেন্দ্রলালের দীর্ঘতম নাটক। নাটকীয় গতির উত্তাপেই নাটকীয় ঘটনার সৃষ্টি হয়, কিন্তু এই নাটকের অধিকাংশ ঘটনাই গতিবেগের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট হয় নি। আকস্মিকতার চমক, উদ্ভট রোমাঞ্চকর ঘটনার সংযোজনা, দূরবিস্তৃত অরণ্য-সমুদ্র-জনহীন-দ্বীপভূমি-পরিবেষ্টিত পটভূমিকা বর্ণময় রোমান্সের জগৎই সৃষ্টি করেছে। কিংবদন্তীমূলক আখ্যায়িকাসূত্র অবলম্বন করে নাট্যকারের রোমান্স-সৃষ্টির মোহ সর্বপ্রকার সঙ্গতি অতিক্রম করেছে। রোমান্সের বিষয়বস্তুও প্রতিভাবান নাট্যকারের হাতে প্রথম শ্রেণীর নাটকে পরিণত হতে পারে। শেক্সপীয়রের 'টেম্পেস্ট' নাটক তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণস্থল। রোমান্স-কুহকিনী সেখানে শেক্সপীয়রের নাট্যশক্তিকে মোহগ্রস্ত করতে পারে নি, তাই রোমান্সের স্বর্ণমরীচিকাকে তিনি জীবনের রসে পরিণত করেছেন। কিন্তু 'সিংহল-বিজয়' নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল যেন রোমান্স-রসেই নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছেন।

'সিংহল-বিজয়' নাটকের প্লট-রচনার মধ্যেও পরিচ্ছন্নতার অভাব আছে। সিংহবাহু-রানী-সুমিত্রা-সুরমা চরিত্র নিয়ে বঙ্গদেশীয় কাহিনী, বিজয় ও তার সঙ্গিদল নিয়ে আর একটি কাহিনী ও কালসেন-জয়সেন-বসুমিত্রা কুবেণী নিয়ে সিংহল-কাহিনী। নাট্যকার এই নাটকটিতে প্রত্যেক কাহিনীর উপরেই সমানভাবে নজর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাই তিনটি কাহিনীই অনাবশ্যক-ভাবে দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। অবশ্য বিজয়সিংহ চরিত্রই এই তিনটি কাহিনীর সংযোগসূত্র, কিন্তু বিজয় তিনটি কাহিনীর মধ্যে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকলেও কোথায়ও যেন তাঁর ব্যক্তিত্ব সুস্পষ্ট নয়—বঙ্গকাহিনীতে উজ্জ্বলতম চরিত্র সিংহবাহু এবং সিংহল-কাহিনীতে স্ফুটতম চরিত্র কুবেণী। নাটকীয় দৃশ্যসংস্থানের মধ্যেও ঐক্যসূত্র তেমন দৃঢ় নয়—বঙ্গদেশ, শ্যামদেশ, কন্যা-কুমারিকার সন্নিহিত সমুদ্রবক্ষ, বঙ্গদেশের অরণ্যভূমি প্রভৃতি দূরবিস্তৃত ভৌগোলিক জগৎ নাটকটির পরিধি! প্লটকে এতখানি ছড়িয়ে দিলে তার রশ্মি সংহত করা কঠিন হয়ে পড়ে। 'সিংহল-বিজয়' নাটকেও তাই হয়েছে।

'সিংহল-বিজয় নাটকে পারিবারিক ষড়যন্ত্র ও পারিবারিক বিরোধের কাহিনীই প্রধান স্থান অধিকার করেছে। বিজয়সিংহ 'বিমাতার ষড়যন্ত্রে

পিতৃপরিত্যক্ত, অপর পক্ষে সিংহল-রাজনন্দিনী কুবেণী মাতৃ-উপেক্ষিতা এবং মাতার দ্বিতীয় স্বামী কর্তৃক অপমানিতা। এই দিক থেকে দুটি কাহিনীর মধ্যে কিছু বাহ্য সাদৃশ্য আছে। সিংহবাহুর চরিত্রের মধ্যে নাট্যকার অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছেন। পুত্রবৎসল সিংহবাহু ও স্ত্রৈণ সিংহবাহুর মনের বিচিত্র আন্দোলন লক্ষ্য করা যায়। সিংহবাহু স্নেহপ্রবণ পিতা, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর প্রভাবে তিনি ব্যক্তিত্বহীন। পরবর্তীকালে তাঁর চরিত্রে রাজসত্তার প্রাবল্য লক্ষণীয়। ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধ ও রাজকীয় আভিজাত্যই তাঁর স্নেহবৃত্তির কণ্ঠরোধ করেছে—দ্বিতীয়বার তিনি বিজয়কে অপমান করে মারাত্মক ভুল করেছেন। তৃতীয়াঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে সিংহবাহুর আদেশে তাঁর প্রিয়তমা মহিষীকে অন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই দৃশ্যে সিংহবাহুর চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য। সিংহবাহু তাঁর জন্মসূত্র থেকে পশু ও মানুষের জন্মের উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন,—চরিত্রে ও সংলাপে তাঁর সেই স্বরূপ ফুটে উঠেছে। সিংহবাহুর মৃত্যুদৃশ্যও করুণ-রস সঞ্চার করে। চরিত্রটির মধ্যে ট্র্যাজিক সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু নানা কারণে তা পরিস্ফুট হতে পারে নি।

'সিংহল-বিজয়' নাটকের শেষদিকে লঙ্কা-কাহিনীরই প্রাধান্য। প্রেমের চিরন্তন 'এয়ী'-ই নাট্যকার এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিজয়সিংহের ভাগ্য-বিড়ম্বিত জীবনে দুই নারীর প্রেমানুভূতির স্বাতন্ত্র্য তাঁকে অবলম্বন করেই রূপায়িত হয়েছে। সিংহল-রাজকন্যা যক্ষিণী কুবেণী তাঁর প্রণয়াস্পদের পায়ে সমস্ত কিছুই অঞ্জলি দিয়েছেন, কিন্তু কুবেণীর প্রেম 'সর্বগ্রাসী'—এক অস্থির চঞ্চল প্রমত্ত হৃদয়াবেগ। পুরুষকে নিজের রূপের জালে আবদ্ধ করে সম্ভোগ করাই তার একমাত্র কামনা—কুবেণী নারীর কামনাময়ী উর্বশীসত্তা। কিন্তু বিজয়কে সে মোহবন্ধনে আবদ্ধ করা সম্ভব হয় নি। বিজয়ের কাছে তাঁর দেশের আহ্বান এসে পৌঁছেছে। কুবেণী তাঁর সেই অনাসক্ত প্রেমিককে বার বার মোহবন্ধনে আবদ্ধ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। স্বামীর উপর ইন্দ্রজাল প্রয়োগ করেছেন, সপত্নী লীলার উপর তাঁর কুপিত প্রেম বার বার দংশনোদ্যত হয়েছে। প্রেমানুভূতির দিকে কুবেণী যদি কুমেরু প্রান্ত হয়, তবে বিজয়ের প্রথমা স্ত্রী লীলা এর সুমেরু প্রান্ত। লীলা নিষ্কাম প্রেমের উপাসিকা—প্রেম তাঁর কাছে তপশ্চর্যা। প্রেমাদর্শের দুই বিপরীত ভাববৃত্তিই নাটকের শেষদিকে প্রাধান্যলাভ করেছে। লীলা স্বামীকে রক্ষার জন্য উদ্যত

ছুরিকা নিজের বুক পেতে গ্রহণ করেছেন—মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাঁর মহীয়সী প্রেম আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বাংলা দেশ থেকে বিজয় আবার বুদ্ধের বাণী নিয়ে সিংহলে গিয়েছিলেন—কিন্তু ঘটনাচক্রে কুবেণীর তখন মৃত্যু আসন্ন। একদিকে বুদ্ধের অমৃতময় বাণী, আর একদিকে অতৃপ্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষার বেদনার্ত উপসংহার—'সিংহল-বিজয়' নাটকের আসল ফলশ্রুতি এইখানে।

'সিংহল-বিজয়' ঐতিহাসিক নাটক নয়, পুরাবৃত্ত-আশ্রয়ী নাট্য-রোমান্স। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক নাটকের সঙ্গে এর কতকগুলি নিগূঢ় সংযোগসূত্র আছে। 'প্রতাপসিংহ' নাটক রচনার সময় থেকেই দেশপ্রেমিকতা ও বিশ্বপ্রেমিকতার যে দুটি তত্ত্বরূপ বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়েছিল, তাই 'মেবার-পতন' নাটকের মানসী চরিত্রে পরিণতি লাভ করে। 'মেবার-পতন নাটকের বিশ্বপ্রেমের আদর্শ দেশপ্রেমের পটভূমিকায় ফুটে উঠেছে, 'সিংহল-বিজয়' নাটকে লীলার বিশ্বপ্রেমাদর্শ ও নিষ্কাম ভালোবাসা কুবেণীর কামনাময় সম্ভোগের পাশে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সুতরাং 'মেবার-পতন' নাটকের মানসীর কণ্ঠই লীলার মধ্যে নূতন ভাবে প্রাণ পেয়েছে। কুবেণী বলেছেন: "আমার সেই প্রেম সর্বগ্রাসী, অধীর, অসহ্য, অস্থির প্রেম। বিশ্বে আর কিছু জানি না, মানি না—চাই না—শুধু তাকেই চাই।" বালকবেশিনী লীলা বলেছেন: "জানি তুমি প্রতিদানের জন্য ব্যাকুল। কিন্তু আর এক ভালোবাসা আছে জেনো মহারাণী! যা নিত্য বিশ্বের কল্যাণে আপনাকে জাগিয়ে তোলে, যা আপনাকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়; সুখী করে সুখী হয়। তার ভালোবাসা এক কণা পাই, তো আপনাকে ধন্য জ্ঞান করি, কিন্তু যদি না পাই, ক্ষতি নাই—কারণ, সে ভালবাসার আশা করি না।" (চতুর্থ অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)। অহৈতুকী প্রেমের তত্ত্বই এখানে লীলার মুখ দিয়ে ঘোষিত হয়েছে।

'সিংহল-বিজয়' নাটকেও দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেমের আদর্শটি পরিস্ফুট হয়েছে। বিমাতানির্যাতিত পিতৃপরিত্যক্ত বিজয়সিংহ সমুদ্রে অরণ্যে যক্ষ-অধ্যুষিত দ্বীপে পরিভ্রমণ করেছেন, তবু দেশের কথা ভুলতে পারেন নি। রাজ্য পেয়েছেন, ঐশ্বর্য পেয়েছেন, কুবেণীর রূপ-যৌবন পেয়েছেন। তবু তাঁর মন স্বদেশের বেদনাময় স্মৃতিতে উদাসীন। মাতৃহারা বিজয়, জন্মভূমিই তাঁর মা। তাই রূপসী যক্ষিণীর তপ্ত যৌবন তাঁকে তৃপ্ত করতে পারে না—

শ্যামল বাংলার মাঠ-ঘাট তাঁকে আহ্বান করে। চতুর্থ অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে বিজয়ের মুখে মাতৃভূমির বন্দনাটি গদ্যে রচিত কাব্য, দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেম সঙ্গীতের সঙ্গে এই সংলাপটির একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে। গঠনশৈলী, দৃশ্যসংস্থান, চরিত্রসৃষ্টি, নাটকীয় গতিবেগ—কোনো দিক দিয়েই 'সিংহল-বিজয়' উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি নয়। এমন কি দ্বিজেন্দ্রলালের শেষ নাটকটিতে অতিপ্রাকৃতের প্রাধান্যও দেখা যায়। মন্ত্র-তন্ত্র, ইন্দ্রজাল চমকপ্রদ নাটকটিকে রোমাঞ্চকর করে তুলেছে। শেষ নাটকটিতে নাট্যকারের প্রতিভার রশ্মিজালও যেন ম্লান ও মন্দীভূত হয়ে উঠেছে।

॥ ১৩ ॥

দ্বিজেন্দ্রলাল দুখানি সামাজিক নাটক লিখেছিলেন—'পরপারে' (১৯১২) ও নাট্যকারের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'বঙ্গনারী' (১৯১৬)। ঐতিহাসিক নাটক রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, সামাজিক নাটকে তেমন কিছু নূতনত্বের সৃষ্টি করতে পারেন নি। প্রকৃত পক্ষে 'সাজাহান' নাটক রচনার কালই দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যপ্রতিভার চূড়ান্ত সিদ্ধির সীমা। পরবর্তী নাটক 'চন্দ্রগুপ্তে'র মধ্যে নাট্যশক্তি থাকলেও প্রতিভার সূর্য যেন মধ্যাহ্নগগন থেকে খানিকটা সরে এসেছে, তাই এই নাটকের মধ্যেই নাট্যকারের প্রতিভার দীপ্তির সঙ্গে অপরাহ্নিক ম্লানিমার চকিত আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু 'পরপারে', 'বঙ্গনারী' ও 'সিংহল-বিজয়' নাটকে তাঁর অস্তোন্মুখ প্রতিভার অপরাহ্নিক অবসাদ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই তিনখানি নাটকের মধ্যে 'বঙ্গনারী' এবং 'সিংহল-বিজয়' নাটকদ্বয় নাট্যকার সম্পূর্ণরূপে পরিমার্জিত ও সংশোধিত করতে পারেন নি, এমন কি সবগুলি গানও বসিয়ে যেতে পারেন নি। 'বঙ্গনারী' নাটকের 'মুখবন্ধ' অংশে কবিপুত্র দিলীপকুমার রায় মহাশয় লিখেছেন :···"নাটকখানি স্বর্গীয় পিতৃদেব কর্তৃক সম্যক সংশোধিত ও পরিবর্তিত হয় নাই ; এ জন্য ইহাতে দোষ থাকিবার সম্ভাবনা।" সুতরাং শেষের দুটি নাটককে দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার পূর্ণাঙ্গ নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করলে নাট্যকারের উপর অবিচারই করা হবে।

কিন্তু 'পরপারে' নাটক সম্পর্কে ঠিক এ কথা বলা যায় না। এই নাটকটি

দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর প্রায় এক বছর পূর্বে প্রকাশিত হয়। নাটকটিকে দ্বিজেন্দ্রলালের সামাজিক নাটকের নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করা চলে। বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনকে অবলম্বন করে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথম দিকে প্রহসন রচনা করেছিলেন। 'পুনর্জন্ম' প্রহসনটি 'পরপারে' নাটকের এক বৎসর পূর্বে রচিত হয়। সুতরাং নাট্যকারের মনে এই সময় সামাজিক নাটক রচনার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। প্রথম যুগের প্রহসনগুলির মধ্যেও নাট্যকারের সামাজিক মতামতগুলির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি 'আষাঢ়ে' ও 'হাসির গান'-এর মধ্যেও দ্বিজেন্দ্রলালের সমাজদৃষ্টির বিদ্রূপাত্মক প্রকাশ লক্ষণীয়। দুখানি সামাজিক নাটকের সঙ্গে তাঁর প্রথম যুগের প্রহসন ও হাসির গান মিলিয়ে পড়লেই নাট্যকারের বিশিষ্ট মনোভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দশকেই বাংলা সামাজিক নাটকের একটি রূপ চোখে পড়ে। সামাজিক নাট্যচিত্র, সামাজিক নকশা-নাটক, সমাজ-সংস্কারমূলক বিদ্রূপাত্মক প্রহসন রচনা থেকেই এ যুগের নাট্যকারদের বিশেষ ধরনের মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। রামনারায়ণ তর্করত্নের সামাজিক নাট্যচিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহের সামাজিক নকশা-নাটক, মধুসূদনের প্রহসনদ্বয়, দীনবন্ধুর প্রহসন ও নাটক এই সামাজিক নাটকের গতিপথ নির্দেশ করেছে। সমসাময়িক দেশ-কালের পটভূমিকায় রচিত এই যুগের নাট্যপ্রচেষ্টাগুলি থেকে সে যুগের সমাজ-জীবনের একটি নিখুঁত ছবি পাওয়া যায়। কিন্তু এই যুগের নাট্যকারদের মধ্যে দীনবন্ধুর সামাজিক নাটকের আদর্শই পরবর্তীকালের নাট্যকারদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরবর্তী অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী দীনবন্ধুর সামাজিক নাটকেরই নানাপ্রকার রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালের যশস্বী নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকের উপর দীনবন্ধুর সামাজিক নাটকের প্রভাব সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ।

গিরিশচন্দ্রের খ্যাততম সামাজিক নাটক 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯)। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রভাব সত্ত্বেও গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকের মৌলিকতা ও বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করা যায় না। কলকাতায় মধ্যবিত্ত বাঙালী সংসারের কাহিনীকে তিনি পূর্ববর্তী নাট্যকারদের চেয়েও অধিকতর

বাস্তবসম্মত দৃষ্টিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাঙালী মধ্যবিত্তের ঘরের কথা ও তার সামাজিক-পারিবারিক জীবনের সমস্যাকে তিনি অনেকখানিই পরিস্ফুট করতে সমর্থ হয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি পরবর্তী সামাজিক নাট্যকারদের আদর্শস্থল হয়ে উঠেছিলেন। বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধরা-বাঁধা নিস্তরঙ্গ জীবনের মধ্যে নাটকীয় বৈচিত্র্যসৃষ্টির অবকাশ কম। তা ছাড়া, জীবনের বিস্ময়কর বিকাশের চমকপ্রদ কাহিনী বা রাজনৈতিক জীবনের দ্রুত-পরিবর্তনশীলতার ফেনিলাবর্ত বাঙালী সামাজিক জীবনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে নি—সামাজিক বিধি-নিষেধ ও শাসনের কক্ষপথেই জীবনের বৈচিত্র্যহীন পুনরাবৃত্তির নীরস রোমন্থন চলেছিল। তাই গিরিশচন্দ্র এই নিস্তরঙ্গ জীবনের মধ্যে বৈচিত্র্য সঞ্চার করার জন্য জাল-জোচ্চুরি, মারপিট, বীভৎস হত্যা, নেশাখোরের মাতলামি, সুকৌশলে প্রতারণা করে সম্পত্তিহরণ, সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে প্রকাশ্য বেশ্যাসক্তি, মামলা-মোকর্দমা, ষড়যন্ত্র প্রভৃতি রোমাঞ্চকর অতিনাটকীয় ব্যাপার নাটকের মধ্যে আমদানি করে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন।[৮০] 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯), 'হারানিধি' (১৮৯০), 'বলিদান' (১৯০৫), 'শাস্তি কি শান্তি' (১৯০৮), 'গৃহলক্ষ্মী' (১৯১২) প্রভৃতি নাটকে গিরিশচন্দ্র প্রায় একই রকম টেকনিক ব্যবহার করেছেন।

গিরিশচন্দ্র সামাজিক নাটকে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের ছবি এঁকেছেন বটে, কিন্তু তার সঙ্গে কতকগুলি টেকনিকগত দুর্লক্ষণও সামাজিক নাটকের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন, যা বর্তমানকাল পর্যন্তও আমরা সম্পূর্ণরূপে কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হই নি। চটকদার ঘটনা ও রোমহর্ষণ পরিবেশ বাংলা সামাজিক

৮০। গিরিশচন্দ্র একসময় বলেছিলেন : "দোষগুণ লইয়া নাটক রচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙ্গলার গুণ দূরে থাকুক, বড় রকমের একটি দোষও নাই। দোষের বিষয় বড়জোর নাবালককে ঠকাইয়াছে, কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে, কৌটনসুলি র জেরাতে হটে নাই, গৃহে অন্নহীন দুই একজন পাইক ছিল, তাহাদের মারিয়া ডাকাইত করিয়াছে, এইমাত্র দোষের চিত্র। লাম্পট্য দোষের বিবরণ দুই একটি বেশ্যা রাখিয়াছে, কেহ বা একপরিবারস্থ থাকিয়া কুলাঙ্গনাকে বাহির করিয়াছে, কেহ বা পড়শীর কুলাঙ্গনা বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছে। গুণের কথা বড়জোর কেহ পিতৃশ্রাদ্ধে কাঙ্গালীভোজন করাইয়াছিল; রাস্তা নির্মাণের জন্য 'টাইটেল' আশে রাজাকে চাঁদা দিয়াছে।"
—গিরিশ-প্রতিভা : হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পৃঃ ৪৮১।

নাটককে অনেক সময় সস্তা ও অসম্ভব ঘটনানির্ভর গোয়েন্দাকাহিনীতে পরিণত করেছিল। কিন্তু বাংলা সামাজিক জীবনের বিশেষত্ববর্জিত নিস্তরঙ্গ জীবনের উপর রোমাঞ্চকর ঘটনা ও পরিবেশের উদ্যত অসির আস্ফালন নিতান্ত আকস্মিক ও অসামঞ্জস্যকর। ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক নাটকের টেকনিকই বাঙালী নাট্যকারেরা তাঁদের সামাজিক ও পারিবারিক নাটকে ব্যবহার করেছেন। ইতিহাসের অতীতাশ্রয়ী জগতে যে অসাধারণত্বের আলো-ছায়া-মণ্ডিত জগৎ আছে, সেখানে জীবনের অসাধারণ বিকাশ ও বর্ণাতিশয্য অনেক সময় সামঞ্জস্যেরই সৃষ্টি করে। শেক্সপীয়রের নাটকেও অসাধারণ ঘটনাসংঘটন ও রোমান্টিক দৃশ্যবিন্যাসের অভাব নেই। কিন্তু তার সঙ্গে একটি কথাও মনে রাখার প্রয়োজন যে, আধুনিক কালে আমরা যে অর্থে 'সামাজিক নাটক' শব্দটিকে ব্যাখ্যা করি, শেক্সপীয়রের কোনো নাটকই সে পর্যায়ে পড়ে না। রোমান্টিক ঐতিহাসিক নাটক রচনায় শেক্সপীয়র যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, ঠিক সেই পদ্ধতি (তাও নিতান্ত স্থূলভাবে) সামাজিক নাটকে প্রয়োগ করা চলে না। বিষয়বস্তুর সঙ্গে নাট্যরচনারীতির এই চূড়ান্ত অসামঞ্জস্য গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকে নিতান্ত উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

অথচ ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই ইউরোপীয় সাহিত্যে সামাজিক নাটকের এক ভিন্নতর পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। ইবসেন, বার্নার্ড শ, গলসওয়ার্দি প্রভৃতি খ্যাতনামা নাট্যকারেরা সমাজসমস্যামূলক নাটক রচনায় সম্পূর্ণ নূতন এক পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ কিরূপে পরিবর্তিত হয়ে নূতন এক-একটি সামাজিক বিপর্যয় ঘটিয়ে তুলছে, তারই এক-একটি নূতন আবিক্রিয়া তাঁদের নাটকে নূতন-অর্থগৌরবমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। সামাজিক দুর্নীতি ও গ্লানিকে তাঁরা বিশ্লেষণাত্মক বুদ্ধি ও মননশীলতার সঙ্গে রূপ দিয়েছেন। রোমান্স ও কবিকল্পনার উত্তুঙ্গ শীর্ষ থেকে তাঁরা প্রাত্যহিক জগতের ধূলিধূসরিত পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন। আধুনিক ক্ষয়িষ্ণু সমাজ-জীবনের নানা বৈষম্য, রূঢ় অসঙ্গতি ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ব্যক্তিক ও পারিবারিক জীবনকে কতখানি বিপর্যস্ত করে, আধুনিক সমাজ-সমস্যামূলক পাশ্চাত্ত্য নাটকে তাও প্রতিফলিত হয়েছে। গলসওয়ার্দি অধিকাংশ নাটকেই এ যুগের অর্থনৈতিক বৈষম্য ও তার অনিবার্য পরিণামকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রূপ দিয়েছেন। বার্নার্ড শ তাঁর মননসমৃদ্ধ দৃষ্টি ও মর্মভেদী

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সাহায্যে প্রচলিত সামাজিক ধারণা ও মূল্যবোধকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে তাদের শূন্যগর্ভতা ও অসারতাকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এ যুগের পাশ্চাত্ত্য সমাজসমস্যামূলক নাটকগুলির রূপায়ণে রোমান্টিক নাট্যশৈলী সম্পূর্ণভাবে বর্জিত হয়েছে—সংলাপে, সংস্থানসৃষ্টিতে, প্লট-বিন্যাসে—কোথায়ও কবিকল্পনার আতিশয্য অথবা অযথা রঙ ফলানোর চেষ্টা নেই।

কিন্তু বাংলা সামাজিক নাটক এর বিপরীত পথেই অগ্রসর হয়েছে। সুখের সংসারে আকস্মিক বিপর্যয়, হত্যাকারীর নৃশংসতা, বন্ধু বা ভ্রাতার প্রতারণা, পুলিশ-মামলা-মোকর্দমা প্রভৃতি উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা নাটকীয় প্লটকে অসম্ভবরূপে জটিল করে তোলে সত্য, কিন্তু সেই কর্দমাক্ত জলে জীবনের কোনো গভীরার্থদ্যোতক সত্যচিত্র উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে না। ঘটনার ঘনঘটা বা "পতন ও মৃত্যু"-র সংখ্যাধিক্য ঘটিয়ে সামাজিক ট্র্যাজেডির যথার্থ রস ফুটিয়ে তোলা যায় না। আমাদের ঘটনাবিরল নিস্তরঙ্গ পারিবারিক জীবনে যেখানে একটু সামান্য বোঝাপড়ার অভাব হলেই জীবনের কেন্দ্রচ্যুতি ঘটে, সেখানে জোর করে বাইরে থেকে কতকগুলি উত্তেজনামূলক ঘটনা সংযোজন করলে নাটকের সূক্ষ্মরস সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকের উপস্থাপনার মধ্যে প্রচুর পরিমাণেই নাটকীয় সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু অতি-নাটকীয় আবহাওয়ায় ও রোমান্টিক শৈলীর প্রয়োগে তার অধিকাংশই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের সামাজিক নাটক আলোচনার প্রসঙ্গে বাংলা সামাজিক নাটকের এই সাধারণ প্রকৃতির কথা মনে রাখার প্রয়োজন। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর দুখানি সামাজিক নাটক রচনার পূর্বে বিদ্রূপাত্মক কবিতা ও প্রহসনের মধ্যে সমাজ-সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু প্রহসন রচনার লঘুচপল মনোভঙ্গির মধ্যে সামাজিক নাট্যাদর্শের সম্ভাবনাটি পরীক্ষিত হয় নি। 'পরপারে' ও 'বঙ্গনারী'র মধ্যে গভীররসাত্মক সামাজিক নাটক রচনার শক্তি পরীক্ষিত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের সামাজিক নাটকের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকের প্রভাব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, দু-একটি ক্ষেত্রে দীনবন্ধু ও অমৃতলালের প্রভাবও আছে। ইবসেনের নাটকের সঙ্গেও তাঁর গভীর পরিচয় ছিল। 'শান্তা' (পরপারে) ও 'সুশীলা' (বঙ্গনারী) চরিত্রের মধ্যে ইবসেনীয়

নায়িকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও বিদ্রোহী মনোবৃত্তির কিছু ছায়াপাত ঘটেছে। তবু দ্বিজেন্দ্রলাল সমসাময়িক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সামাজিক নাটক রচনার টেকনিক আয়ত্ত করতে পারেন নি—এ বিষয়ে তিনি পূর্ববর্তী বাঙালী নাট্যকারদেরই পথ অনুসরণ করেছেন। গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' নাটকে পণপ্রথা ও 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকে বিধবা-সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু দু ক্ষেত্রেই বাইরের দিকটিই বড় হয়ে উঠেছে, সমস্যার মর্মমূলে প্রবেশ করতে পারেন নি। দ্বিজেন্দ্রলালের 'বঙ্গ-নারী' নাটকেও তেমনি বাইরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াটিই প্রবল হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয়ত, দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যপ্রতিভা রোমান্টিক নাটক রচনারই অনুকূল। দীর্ঘকালব্যাপী পুরাণাশ্রয়ী ও ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্টিক নাটক রচনার ফলে ঐ রীতিটিই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রীতিতে পরিণত হয়েছিল। তাই সামাজিক নাটক রচনা করতে বসেও তিনি রোমান্টিক নাটকের টেকনিকই অবলম্বন করেছিলেন।

'পরপারে' (১৯১২) নাটকের মূল পরিকল্পনাটি দুর্বল, পরিণতিটিও আকস্মিক। প্রথমাঙ্ক প্রথম দৃশ্য থেকেই অসঙ্গতির শুরু হয়েছে। দয়ালের মহিমের মাতৃভক্তি সম্পর্কে সংশয়, মহিমের শঙ্কা, দ্বিতীয় দৃশ্যে সরযূর মুখে 'এ বিবাহে আমি সুখী হব না' উক্তির মধ্যে কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। মহিমের মাতৃভক্তির কোনো যথার্থ পরিচয় নেই, এমন কি বিবাহের পরেই এমন কোনো ঘটনা ঘটে নি, যাতে মহিমের শঙ্কাতুর হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। ব্যাপারটি যেন জ্যামিতির সম্পাদ্যর (Theorem) মতো—আগে থেকে সূত্র নির্দেশ করা হয়েছে, সেই সূত্রানুযায়ী নাট্যকার ঘটনা সাজিয়ে গিয়েছেন। মহিম যে মাতৃভক্ত ছিলেন নাটকে তার প্রমাণ থাকা উচিত ছিল, তারপরে কি ভাবে তার ভক্তি বিরাগে পরিণত হল, তারও বাস্তবসম্মত বিশ্লেষণ থাকা উচিত ছিল। প্রথমাঙ্ক পঞ্চম দৃশ্যে মাতার প্রতি মহিমের আচরণও বিস্ময়কর—কোনো সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। মহিমের চরিত্রটি কোথাও ফুটতে পারে নি—এমন কি যে সরযূকে কেন্দ্র করে তার মাতার প্রতি বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রতিও মহিমের অনুরাগের কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। স্ত্রীর জন্য মাকে পরিত্যাগ করা, মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তি, শান্তাকে গুলি করা, ফেরারী আসামীর জীবনযাপন, সরযূর দয়ায় ফাঁসির হাত থেকে অব্যাহতি ও সর্বশেষে শান্তার কাছে পরপার-

সম্পর্কিত আধ্যাত্মিক দীক্ষাগ্রহণ—এই সমস্ত ব্যাপারই এমন দ্রুতবেগে ও রোমাঞ্চকরভাবে আবর্তিত হয়েছে যে সেখানে মহিমকে পাওয়া যায় না, তার বদলে পাওয়া যায় কতকগুলি রোমহর্ষণ ঘটনার ঘূর্ণাবর্তকে !

বিশ্বেশ্বর চরিত্রকে সরল বিশ্বাসী ভালোমানুষ করে আঁকার চেষ্টা করা হয়েছে। সরযূর সঙ্গে তাঁর স্নেহমধুর সম্পর্কটি যেমন স্নিগ্ধ, তেমনি কৌতুকরসোজ্জ্বল। স্নেহময় বৃদ্ধ বিশ্বেশ্বরের একমাত্র অবলম্বন তাঁর পৌত্রী বিয়ের পরে সরযূ যখন তাঁকে প্রশ্ন করলেন যে সে শ্বশুরবাড়ি চলে গে[illegible] তিনি কি করবেন, বিশ্বেশ্বর তার উত্তরে বলেছেন. "এই সঙ্গীহীন বি[illegible]- ছানার মতো আমি নিজের লেজের সঙ্গে খেলা কর।"—ছোট্ট একটি উপমার মধ্য দিয়ে বিশ্বেশ্বরের স্নেহপ্রবণ মনটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। কিন্তু এই চরিত্রটিরও দু[illegible] [illegible]তি চোখে পড়ে। প্রথমত, বিশ্বেশ্বরের সরলতা ও বিশ্বাস মাত্রাতিরিক্তরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। দ্বিতীয়াঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে বিশ্বেশ্বরের পার্বতীকে টাকা দেওয়ার ব্যাপারটি নিতান্ত আতিশয্য ছাড়া আর কিছু নয়। দ্বিতীয়ত, বিশ্বেশ্বরের অনুতাপ ও আত্মহত্যা নাটকে কোনো করুণ আবেদনের সৃষ্টি করে না। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বেশ্বরের পরাজয়ই হয়েছে।

পার্বতী একটি নর-পিশাচ চরিত্র। দ্বিজেন্দ্রলালের সমগ্র নাটকের মধ্যে পার্বতী একক। পার্বতী মানুষ নয়—পাপকার্য ও দুষ্কৃতির একটি যন্ত্র— তাঁর রক্তমাংসের মানবসত্তা কোথায়ও ফুটে ওঠে নি। কালীচর[illegible] চরিত্রের উপর দীনবন্ধুর নিমচাঁদ চরিত্রের প্রভাব পড়েছে। কালীচরণ [illegible]ার্বতীর সংসর্গে থেকেও নিষ্কলঙ্ক—তার নীতিবোধটিও সুস্পষ্ট। কিন্তু নিমচাঁদ চরিত্রের ভাবগভীরতা ও শিল্পোৎকর্ষ এই চরিত্রটিতে অনুপস্থিত। কালীচরণ নিমচাঁদের অক্ষম অনুকরণ মাত্র। হিরণ্ময়ীর কাহিনীটি রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক' (গল্পগুচ্ছ—দ্বিতীয় খণ্ড) গল্পকে স্মরণ করিয়ে দেয়। চরিত্রটি পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়। শান্তা চরিত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল পতিতা চরিত্রের মহত্ত্ব ও নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য উজ্জ্বল রেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন। শান্তার মুখ দিয়ে নাট্যকার প্রেম ও বিবাহতত্ত্বের আলোচনা করেছেন: "বিবাহ ?—বিবাহ নৈলে প্রেম নিষিদ্ধ ? কে বলে। বিবাহ ? সে তো রেজেষ্টারি কবুলিয়ৎ লিখে দেওয়া—বেড়া দিয়ে জমি ঘিরে নেওয়া। তাই বা

কৈ ? প্রজাও জমি ছেড়ে দিতে পারে, বিক্রয় কর্তে পারে। কিন্তু স্ত্রী আমৃত্যু ক্রীতদাসী" (৩।২)। শান্তা চরিত্রের মধ্যে আতিশয্য। তা ছাড়া চরিত্রটিকে বিশিষ্ট মতবাদ ঘোষণার যন্ত্র বলে মনে হয়।[৮১]

'পরপারে' নাটকে আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। নাট্যকার নাটকটির শেষে আধ্যাত্মিক পরিণতির চিত্র আঁকার চেষ্টা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল যুক্তিবাদী ও সংশয়বাদী ছিলেন, তাঁর অনেকগুলি চরিত্রে যুক্তিবাদ ও সংশয়বাদের প্রাধান্য দেখা যায়। তাঁর শেষজীবনে মতপরিবর্তন হয়েছিল—'ত্রিবেণী' কাব্যের কোনো কোনো কবিতায় তার পরিচয় আছে।[৮২] কিন্তু এই জাতীয় পরিণতির জন্য নাট্যকারকে কতকগুলি অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছে। সরযূর জন্য মহিম ও শান্তার জন্য সরযূ প্রাণদণ্ড থেকে মুক্ত হয়েছে। যখন মহিম ও সরযূর মধ্যে মিলনের আর কোনো বাধা নেই, তখনই নাট্যকার বিশেশ্বর সরযূর পরপর মৃত্যু ঘটিয়ে মহিমকে শ্মশানচারী সন্ন্যাসী করে তুললেন। অথচ মহিম চরিত্রের মধ্যে কোথাও এ জাতীয় পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা ছিল না. সরযূর মৃত্যুর পর মহিমের মনে তীব্র অন্তর্জ্বালাও সৃষ্টি করা হয় নি। প্রশান্তচিত্ত ভবানীপ্রসাদের মুখে শ্যামাসঙ্গীত দিয়ে নাট্যকার নাটকটির মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু নাটকের মধ্যে কোনো আধ্যাত্মিক রস ফুটে ওঠে নি। 'পরপারে' নামকরণেরও কোনো সার্থকতা নেই—ইহকালের গোলাগুলি ছোড়া ও খুন-জখমই নাটকটির অধিকাংশ জুড়ে আছে।[৮৩] নাটকের শেষদৃশ্যে শান্তার সুদীর্ঘ বক্তৃতায়

৮১। নাট্যকারও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। কিন্তু আদর্শবাদের আতিশয্যের জন্যই তিনি এই চরিত্রটিকে অঙ্কন করেন। নাটকটির ভূমিকায় তিনি বলেছেন "নাটকে শান্তার চরিত্র একটু অস্বাভাবিকভাবে উজ্জ্বল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বেশ্যা এরূপ কিনা তাহা জানি না। বেশ্যার স্বার্থত্যাগের কথা শুনিয়াছি। যদি সে কথা সত্য হয়, হৌক, একথা ভাবিতেও আমার আনন্দ হয়। এ চিত্র যদি কাল্পনিক হয় হৌক।"

৮২। "এই নাটকখানি রচনাকালে কবির হৃদয়ে যে আধ্যাত্মিক ভাবের উন্মেষ হইয়াছিল, তাঁহার জীবনেতিহাসে তাহার আভাষ পাওয়া যায়।"—দ্বিজেন্দ্রলাল নবকৃষ্ণ ঘোষ, পৃঃ ১৯৭।

৮৩। ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় যথার্থই বলেছেন "পরপারে (১৩১৯) নাটক বালকোচিত উৎকট রোমান্টিক melodrama মাত্র, সামাজিক নাটক নয়।"

—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫০), পৃঃ ৩৯০।

পরপারের ইঙ্গিত আছে। শান্তার দিব্যদৃষ্টিরও কোনো অর্থ হয় না—নাটকের পূর্বাপর ঘটনার সঙ্গে এই দৃশ্যটির কোনো মিল নেই—বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো জেগে আছে।

'বঙ্গনারী' (১৯১৬) দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর দুবৎসর পূর্বেই রচিত হয়েছিল। কিন্তু এই নাটকটির মধ্যে একটি গণিকা-চরিত্র এতই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল যে, সেই চরিত্রটিকে নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে তিনি 'পরপারে' নাটকটি রচনা করেছিলেন। 'বঙ্গনারী' পাণ্ডুলিপি অবস্থায় পড়ে ছিল—কবির মৃত্যুর তিন বছর পরে প্রকাশিত হয়। এই নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল বাল্যবিবাহ ও পণ-প্রথা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই নাটকটির উপর গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' নাটকের প্রভাব অত্যন্ত পরিস্ফুট। সদানন্দ চরিত্রটি নাট্যকারের মতবাদের বাহক হয়ে উঠেছে। বাল্যবিবাহের কুফল ও বর্তমান সমাজের পণপ্রথা দূর করা সম্ভব কিনা—এই দুটি বিষয় নাটকের মধ্যে অনেকখানি অংশ অধিকার করেছে। নাটকের মধ্যে কেদার চরিত্রটি সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই কৌতুকপ্রবণ আধপাগলা চরিত্রটি বন্ধু দেবেন্দ্রকে সব দিক থেকে রক্ষা করেছে। কেদার শুধু দেবেন্দ্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রেরই গ্রন্থিমোচন করেন নি, তাঁর প্রাণশক্তি ও সরসতা নাটকের মধ্যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে।

নাটকের মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র উপেন্দ্র। উপেন্দ্রের মধ্যে ধর্মধ্বজী ভণ্ড চরিত্রকে শ্লেষাত্মকভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। এই ধরনের চরিত্রকে নিয়ে তিনি প্রহসন ও হাসির গানের যুগে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছেন। একদিকে যেমন তিনি উপেন্দ্র চরিত্র সৃষ্টি করে ধর্মধ্বজী ভণ্ডকে কশাঘাত করেছেন, তেমনি বিলাত-ফেরত বিনয় চরিত্রটি এঁকে তিনি বিলাত-ফেরতকে নিয়ে সামাজিক প্রতিক্রিয়ার দিকটিও দেখিয়েছেন। প্রথম যৌবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা দ্বিজেন্দ্রলাল পরিণত বয়সেও বিস্মৃত হতে পারেন নি। প্রথম যুগের কবিতায় প্রহসনে ও 'একঘরে' নকশায় যা বলেছিলেন, দেবেন্দ্রের মুখ দিয়ে তা আবার বলিয়েছেন: "চুরি কর, জাল কর, বেশ্যা রাখ—সমাজ সব সৈবে, কিন্তু বিলেত-যাত্রা অমার্জনীয়!" 'বঙ্গনারী' নাটকে প্রহসন-রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলালের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—উপেন্দ্র ও তাঁর ভক্তদলের দৃশ্য কৌতুকরসোজ্জ্বল। সুশীলা ইংরেজিশিক্ষিতা, যুক্তিবাদিনী বিদ্রোহিনী নারী। কিন্তু সুশীলার মধ্যে রক্তমাংসের মানবীসত্তার কোনো রূপ বিকশিত হয় নি,

সে যেন মূর্তিমতী মতবাদ। নাটকের মধ্যে নানা ধরনের সামাজিক বিতর্ক আছে, কিন্তু কোনটিই চরিত্রসৃষ্টির সহায়তা করে নি। অথচ রোমাঞ্চকর ঘটনার অভাব নেই। যজ্ঞেশ্বর ও উপেন্দ্রের চক্রান্তে বন্দিনী বিনোদিনী, যজ্ঞেশ্বরের আকস্মিক পরিবর্তন, দস্যুকবলিতা সুশীলার আকস্মিক বিপন্মুক্তি প্রভৃতি রোমান্টিক দৃশ্যগুলি নাটকের সহজগতি রুদ্ধ করেছে।

জীবনের শেষপ্রহরে দ্বিজেন্দ্রলাল সামাজিক নাটক রচনা শুরু করেছিলেন, কিন্তু কোনো নূতন দিক্‌-নির্দেশ করতে পারেন নি। প্রকৃতপক্ষে বাংলা সামাজিক নাটকের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্র যে উপাদান ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, সেই নির্দিষ্ট পথই দ্বিজেন্দ্রলালের সামাজিক নাটকের যাত্রাপথ। 'বঙ্গনারী'-র দেবেন্দ্র চরিত্রটি যেন গিরিশচন্দ্রেরই শোকদুঃখজর্জরিত বিভ্রান্তচিত্ত বাঙালী গৃহকর্তার ছবি। 'পরপারে'র ভবানীপ্রসাদ, পার্বতী, দয়াল জাতীয় চরিত্রও গিরিশচন্দ্রের এই জাতীয় চরিত্রের ভাঙাচোরা। কিন্তু গিরিশচন্দ্রে যে আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মবোধের সুরটি সহজ ও স্বাভাবিক হয়েছে, দ্বিজেন্দ্রলাল তাকে ফুটিয়ে তুলতে অনেক কষ্টকল্পিত ঘটনার আশ্রয় নিয়েছেন। '[illegible]' নাটকে অতিনাটকীয় উপাদান তুলনামূলক ভাবে অনেক কম, কিন্তু [illegible] ভূমিকা ও ভক্তবৃন্দপরিবৃত উপেন্দ্রের কাহিনীটি ছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে প্রচারধর্মিতার ভাব পরিস্ফুট হয়েছে। সদানন্দ, সুশীলা, বিনয় প্রভৃতি চরিত্র এক-একটি মতবাদের বাহন।—চরিত্র হিসাবে সজীব হয়ে উঠতে পারে নি। সদানন্দ নাট্যকার নিজেই—দ্বিজেন্দ্রলালের পরিণত বয়সের সামাজিক মতামতই এই চরিত্রটির মুখ দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সদানন্দের মুখ দিয়ে নাট্যকার তাঁর ব্যক্তিজীবন ও শিল্পজীবনের পরিবর্তনের কথা মর্মভেদী বেদনার সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন : "প্রেমের গান আর গাই না, হাসির গান আর গাই না। সেদিন গিয়েছে। হাসি-তামাসার দিন গিয়েছে, আমারও গিয়েছে, সমাজেরও গিয়েছে।"—এই উক্তিটির আলোকে শিল্পী দ্বিজেন্দ্রলালের মনোজীবনের একটি নিগূঢ় সঙ্কেত পাওয়া যায়। বক্তব্য ও তত্ত্বের দিকে যাই হোক না কেন, সামাজিক নাটক রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাট্যের নানা প্রসঙ্গ

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যপ্রতিভা আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর সংলাপরচনাপদ্ধতির বিচার হওয়া প্রয়োজন। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক বিচার করতে গিয়ে অধিকাংশ সমালোচকই তাঁর নাটকীয় সংলাপ ও ভাষার আলোচনা করেছেন। তা ছাড়া নাটকীয় গতিসৃষ্টির পক্ষেও সংলাপের দায়িত্ব অনস্বীকার্য। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের সংলাপ বিচারের পূর্বে তাঁর নিজস্ব অভিমত আলোচনা করা প্রয়োজন। কাব্যসংলাপ (Verse dialogue) ও গদ্যসংলাপ (Prose dialogue) ভেদে তিনি দু-জাতীয় সংলাপই ব্যবহার করেছেন। তিনি এই দু-জাতীয় সংলাপ সম্পর্কেই আলোচনা করেছেন:

"প্রথমে Shakespeare-এর অনুকরণে Blank Verse-এ নাটক লিখিতে আরম্ভ করি। 'তারাবাই' প্রকাশ হইবার পরে স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্র সেনকে তাঁহার অনুরোধে এক কপি পাঠাই। তিনি পড়িয়া এই মত প্রকাশ করেন যে এ নূতন ধরণের অমিত্রাক্ষর, মাইকেলের ছন্দোমাধুরী ইহাতে নাই—এ অমিত্রাক্ষর চলিবে না। সেই সঙ্গে স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদনের দৈববাণী মনে হইল,—যে অমিত্রাক্ষরে নাটক এখন চলিতে পারে না। দীর্ঘ বক্তৃতা অমিত্রাক্ষরে চলে। কিন্তু দ্রুত কথোপকথনের কথা ত গদ্যের মত হইতেই হইবে। Shakespeare-এর অমিত্রাক্ষর Milton-এর অমিত্রাক্ষর হইতে পৃথক।...Shakespeare-এ খানিক গদ্য খানিক পদ্য, তথাপি দুইটি খাপ খাইতেছে। কারণ ইংরাজি ভাষায় সেরূপ অবস্থা আসিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গলাতে "তুমি যদি আস সখি, আমি যেথা যাবো" ইহার পরে "নবীন নীরদ শ্যাম নিকুঞ্জবিহারী" এরূপ রচনা অসহ্য বিসদৃশ বোধ হইবে। কিন্তু গদ্যে একত্রে উভয়ই চলে। গদ্যের এখন সে অবস্থা আসিয়াছে।"[১]

দ্বিজেন্দ্রলালের এই মন্তব্যটি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, তিনি নাটকীয় সংলাপ-রচনায় বাংলা নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের উপযোগিতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন। তিনি মধুসূদনের 'দৈববাণী'র কথা উল্লেখ করেছেন।

১। আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ: নাট্য-মন্দির, শ্রাবণ, ১৩১৭, পৃঃ ৫১-৫৩।

কিন্তু মধুসূদন, নাটক রচনার যুগ যে বাংলা সাহিত্যে তখনো আসে নি, সেই কথাই উল্লেখ করেছেন, তার সঙ্গে নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা অস্বীকার করেন নি। কিন্তু এর জন্য আমাদের কান তৈরী করতে হবে, এ কথাও তিনি বলেছেন।[২] মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যেও একটি ক্রমপরিণতি লক্ষণীয়। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে', 'পদ্মাবতীনাটকে' এই ছন্দের আড়ষ্টতা আছে। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র শেষ দিকেই এ ছন্দের অধিকতর পরিণত রূপ লক্ষ্য করা যায়। 'মেঘনাদবধকাব্যে'র ছন্দের মধ্যে মহাকাব্যোচিত মেঘমন্দ্র ও গীতিসুষমা দুই-ই আছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের নাট্যসম্ভাবনাই এক্ষেত্রে বিচার্য। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের সর্বাপেক্ষা নাট্যগুণসমৃদ্ধ রূপ 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র ছন্দ। একাত্মক নাট্যভাষণের (Dramatic monologue) পদ্ধতিতেই মধুসূদনের পত্রকাব্যখানি রচিত হয়েছে। এর ফলে ঘাতপ্রতিঘাতপ্রধান অন্তর্জীবনকে মধুসূদন নাট্যকারের বস্তুধর্মী শিল্পরীতির সাহায্যে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। এই কাব্যের মধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের নাট্য গুণ প্রকাশিত হয়েছে।

নাটকীয় সংলাপ রচনায় 'গৈরিশ ছন্দ' একটি নতুন পথ নির্দেশ করেছিল। গিরিশচন্দ্রের এই ছন্দটি প্রকৃত পক্ষে 'ভাঙা অমিত্রাক্ষর' ছন্দ। তিনি 'রাবণ বধ' নাটকে (১২৮৮) এই ছন্দ সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। অবশ্য গিরিশচন্দ্রই এই ছন্দের প্রবর্তক বা আবিষ্কর্তা নন। তার পূর্বে ব্রজমোহন রায় ও রাজকৃষ্ণ রায় এই ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন।[৩] কিন্তু গিরিশচন্দ্রই এই ছন্দকে সুসংস্কৃত ও সুমার্জিত করে নাটকে ব্যবহার করেন। সুতরাং অমিত্রাক্ষর ছন্দের দ্বারা যে নাটক রচনা করা সম্ভব নয়, এ কথা বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথও তাঁর প্রথম যুগের 'রাজা ও রাণী' 'বিসর্জন' 'চিত্রাঙ্গদা' প্রভৃতি নাট্যকাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন। 'দ্রুত কথোপকথনের' ভাষাও এই ছন্দেই রূপ পেয়েছে। এই কারণেই নাটকের সংলাপরচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল অমিত্রাক্ষর ছন্দের যে অনুপযুক্ততার কথা বলেছেন, তা স্বীকার করা যায় না।

২। "But this is not the age of drama to flourish. We want the public ear to be attuned to the melody of the Blank Verse"—রাজনারায়ণ বসুর কাছে লিখিত চিঠি,—মধুস্মৃতি (১৯২০), নগেন্দ্রনাথ সোম পৃঃ ১৭৬।

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫০) : সুকুমার সেন, পৃঃ ৩৬৪।

আসল কথা, দ্বিজেন্দ্রলালের অমিত্রাক্ষর ছন্দ সর্বত্র সার্থক হয় নি—অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবহমানতার মধ্যে একটি স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীলতা থাকে। কিন্তু অনেক সময়, বিষম মাত্রায় ছেদ পড়ার জন্য দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যসংলাপ গতিহীন হয়ে পড়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম দুটি নাট্যকাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগের মধ্যে অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। কোথায়ও আট-ছয়ের বিভাগটি অতিরিক্ত সার্থকভাবে অনুসরণ করার ফলে যন্ত্রের দিকটিই বড় বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—কলাকৌশলকে গোপন করে প্রথম শ্রেণীর শিল্প হয়ে উঠতে পারে নি। 'তারাবাই' নাটকের অমিত্রাক্ষর ছন্দের গতি পদে পদে ব্যাহত হয়েছে—অনেক জায়গায় শ্রুতিকটুও বটে :

শুনিয়াছি—যাহা শুনি নাই
পূর্বে কভু—শস্ত্রধ্বনি, সমর চীৎকার,
মরণের আর্তনাদ—বিমিশ্রিত ঘোর
অসীম বিকট কোলাহলে। করিয়াছি
যুদ্ধ আজি তুচ্ছ করি, জীবন, প্রবল
বিরাট উৎসাহে। আনিয়াছি বন্দী করি
এই হস্তে মজফরে আজি।

—(তারাবাঈ · চতুর্থ অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)

উদ্ধৃত সংলাপটির মধ্যে কৃত্রিমতা ও আড়ষ্টতা লক্ষণীয়। পরবর্তী নাট্য-কাব্যগুলিতে অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরিণততর রূপ লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবত দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, তাই পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে তিনি গদ্যসংলাপ ব্যবহার করেছিলেন।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যসংলাপের আর একটি দিকও আছে। সাধারণ কথোপকথনের নিরুত্তাপ রূপ দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যসংলাপে অসঙ্গত হয়েছে—কিন্তু উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগকে তিনি অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর চিত্রময়ী ভাষায় রূপ দিয়েছেন। 'ভীষ্ম' নাটকে অম্বার প্রতি ভীষ্মের এই উক্তি লক্ষণীয় :

এ ত তুমি নহ। দেখিতেছি
কোন এক উন্মাদিনী সুন্দরী রমণী।

আরক্তিম শুভ্রবর্ণ পূর্ণ গণ্ড দুটি
কামনা মদিরাপানে। চক্ষুর জ্বালায়
জ্বলিছে নিরয়বহ্নি। বিম্ব ওষ্ঠ দুটি
সগরল হাস্যরসে—লালসা-শিথিল। (ভীষ্ম ৩য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য)

মদন ও রতির চক্রান্তে বসন্তবিহ্বলা পৃথিবীর দিকে চেয়ে অহল্যা যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে নিজের যৌবনস্বপ্নকে ছড়িয়ে দিয়েছেন, সেখানে দ্বিজেন্দ্রলালের অমিত্রাক্ষর ছন্দের কাব্যসংলাপ অপরূপ হয়ে উঠেছে :

আহা! কি মধুর! মুঞ্জরিত ঘনশ্যাম
নিকুঞ্জ, গুঞ্জরে ভৃঙ্গ, রঞ্জিত সুন্দর
পল্লবিত পণ্যবীথি সন্ধ্যার কিরণে।
সুদূর তটিনী বহে ঘন তরুচ্ছায়ে
অর্ধাবগুণ্ঠনবতী, ক্ষিপ্র পদক্ষেপে
বন্ধুর কান্তার দিয়া।…
…… সবার উপরে
এক গাঢ় নীলাকাশ নিস্পন্দ, নির্মল,
সদ্যমেঘমুক্ত নত চুম্বিতে ধরার
সুখস্মিত বিম্বাধর—রক্তিম লজ্জায়।
(পাষাণী ২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)

উদ্ধৃত অংশদ্বয়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সার্থক রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়। প্রেম ও প্রকৃতিকে নিয়ে যেখানে নাটকীয় চরিত্রের প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ স্পন্দিত হয়ে ওঠে, সেখানে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যসংলাপ অধিকতর সার্থক হয়েছে। কিন্তু নাটকীয় সংলাপরচনায় ঐটুকুই যথেষ্ট নয়।

নাটকে কাব্যের অধিকার কতখানি থাকা সঙ্গত—এই সমস্যা নিয়ে পাশ্চাত্ত্য সমালোচকদের মধ্যে অনেকেই আলোচনা করেছেন। একদলের মতে উৎকৃষ্ট নাটকের কাব্যগুণসমন্বিত হওয়ার প্রয়োজন আছে (সুইনবার্ন, অ্যাব্যারক্রম্বি প্রভৃতির মত)। আর একদলের মতে কাব্য ও নাটক পৃথক বস্তু—নাটকের মধ্যে কাব্যের প্রবেশাধিকার নিতান্ত অসঙ্গত। প্রাচীন গ্রীক নাটক ও এলিজাবেথীয় যুগের নাটক কাব্যগুণসমৃদ্ধ, সুতরাং নাটকের এলাকা থেকে কাব্যকে সম্পূর্ণ বহিষ্কার করা সম্পর্কেও সংশয় জাগে, আবার

কাব্যের অতিপ্রাধান্যও উচ্চতর নাটককে অনেক সময় "লিরিকের জলাভূমি" করে তোলে। আসল কথা, নাট্যকাব্যে কাব্য ও নাটকের পূর্ণ সামঞ্জস্যের প্রয়োজন। যেখানে কাব্য নাটকের শাসনকে অস্বীকার করে নিজের কারু-কার্য ও অলঙ্কারের বিলাস দেখাতে চায়, সেখানকার কাব্যসংলাপ নিঃসন্দেহে দোষাবহ। কিন্তু যেখানে কাব্য ও নাটক 'পার্বতী-পরমেশ্বর' একাত্মতায় বিধৃত, সেখানকার কাব্য নাটকীয়তাকে আরও সমৃদ্ধই করে। শেক্সপীয়রের নাটকগুলি এর চরম উদাহরণস্থল—কাব্যের মাধ্যমেই সেখানে নাটকীয় গতিধর্ম অসাধারণত্ব লাভ করেছে।[৪]

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যসংলাপ সম্পর্কেও এই দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যেই বিচার করতে হবে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে তাঁর রোমান্টিক কবি-প্রতিভার স্বাক্ষর আছে। কাব্য হিসাবে সে সমস্ত অংশের মূল্য থাকলেও সব সময় নাটক হিসাবে খুব বেশী সার্থকতা নেই। তাই তাঁর নাট্যকাব্যগুলির কোনো কোনো অংশ গীতিকবিতা হিসাবে শিল্পসার্থকতামণ্ডিত, কিন্তু নাটকীয় সংলাপ হিসাবে খুব বেশী সার্থকতা থাকে না। কারণ সার্থক নাট্যকাব্য কাব্যের স্ব-মহিমা প্রকাশ করার ক্ষেত্র নয়। কিন্তু কাব্যগুণের সঙ্গে যেখানে কাব্যের নাটকীয়তার সমন্বয় ঘটেছে সেখানকার কলাকৌশল অস্বীকার করা যায় না। দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে কাব্যসংলাপের দিক থেকে 'ভীষ্ম' নাটকটিই অপেক্ষাকৃত পরিণত। 'পাষাণী' ও 'তারাবাই' নাটকের সংলাপগত ত্রুটি এখানে অনেকখানি সংশোধিত হয়েছে।—কাব্য ও নাটকের মাল্যবন্ধনও অনেকখানি সার্থকতা লাভ করেছে। শ্রেষ্ঠ নাটকে কাব্য ও নাটকের সামঞ্জস্য ঘটে। কিন্তু নাটকের কাব্যসংলাপের মধ্যেও বৈচিত্র্য সৃষ্টির অবকাশ আছে। কাব্যসংলাপের মধ্যে যে সুগভীর হৃদয়া-বেগকেই শুধু রূপায়িত করা যায়, এমন কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই;

৪। এই প্রসঙ্গে কবি-সমালোচক টি. এস. এলিয়টের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

"For I start with the assumption that if poetry is merely a decoration, an added embellishment, if it merely gives people of literary tastes the pleasure of listening to poetry at the same time that they are witnessing a play, then it is superfluous. It must justify itself dramatically and not merely be fine poety shaped into a dramatic form."

—Poetry and Drama: Theodore Spencer Memorial Lecture, Harvard University (1950).

চলতি ভাষার মেজাজকেও কাব্যসংলাপে ফুটিয়ে তোলা যায়। শেক্সপীয়রের নাটক থেকে এই ধরনের চলতি মেজাজের কাব্যসংলাপের উদাহরণ দেওয়া সম্ভব। ফলকন ব্রিজ (কিং জন) ও 'রোমিও জুলিয়েট' নাটকের নার্স চরিত্রটির সংলাপরীতি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে কাব্যসংলাপের সীমানা কতদূর বাড়ানো সম্ভব। শেক্সপীয়র তাঁর কাব্যসংলাপের সাহায্যে সর্ববিধ রস পরিবেশন করেছেন—প্রাত্যহিক জীবনের অতি সাধারণ চলতি সুর থেকে সুগভীর হৃদয়াবেগ পর্যন্ত তিনি এই সংলাপের দ্বারা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যসংলাপ একটি বিশেষ ধরনের ভাবাবেগকে প্রকাশ করারই উপযোগী, শেক্সপীয়রের সংলাপের মতো বিচিত্র ধরনের ভাব প্রকাশক নয়।

॥ ২ ॥

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকাব্যের মধ্যে 'সীতা' নাটকের সংলাপে কিছু বৈচিত্র্য আছে। 'সীতা' নাটকে পূর্বাপর কাব্যসংলাপই ব্যবহার করা হয়েছে, অপর নাট্যকাব্যগুলিতে কাব্যসংলাপের সঙ্গে গদ্যসংলাপও ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই নাটকে নাট্যকার অন্ত্যমিল কবিতায় সংলাপ রচনা করেছেন। তৃতীয়ত, এই নাটকে নাট্যকার বিভিন্ন ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। পূর্বাপর কাব্যসংলাপ ব্যবহার সম্পর্কে কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। শেক্সপীয়রের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু কাব্য ও গদ্যের এই জাতীয় সংমিশ্রণ রসাস্বাদনের পক্ষে বিঘ্ন ঘটায়। এলিজাবেথীয় যুগের দর্শকদের একটি সাধারণ সংস্কার ছিল যে গ্রাম্য ও নিম্নশ্রেণীর চরিত্ররা গদ্যে কথা বলবেন, অপর পক্ষে নায়কজাতীয় চরিত্ররা (যাঁরা সামাজিক পদমর্যাদায় বড়) কাব্যসংলাপ ব্যবহার করবেন কিন্তু অন্ত্যমিল কবিতায় সংলাপ রচনা নাটকের পক্ষে পরিহার্যই হওয়া উচিত। মিত্রাক্ষর কবিতায় কেউ কেউ নাটকীয় সংলাপ রচনা করেছেন বটে, কিন্তু খুব সার্থক হতে পারেন নি। রেস্টোরেশন যুগের ইংরেজি নাটকে ড্রাইডেনের মতো প্রতিভাবান লেখকও এই ধরনের সংলাপরচনায় সার্থক হন নি। এ বিষয়ে নাট্যসমালোচক নিকোলের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য

Blank Verse is rhythmical, it allows of the expression of the most poetical of thoughts, and yet because of its structure,

it remains close to real life. In listening to it we are not startled by the artificiality of the expression. In blank verse we hear the language of ordinary life rarefied and made more exalted. In choice between it and rimed verse, therefore we may unhesitatingly decide for the former....[৫]

এর প্রধান কারণ হল এই যে মিত্রাক্ষর কাব্যসংলাপে মিলের দিকে অতিরিক্ত নজর দেওয়ার জন্য সংলাপের স্বাভাবিকত্ব ও প্রবহমানতা ব্যাহত হয়। একখানি সুদীর্ঘ পঞ্চমাঙ্ক নাটকে পূর্বাপর অন্ত্যানুপ্রাসের দিকে লক্ষ্য রাখলে কৃত্রিম হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে—কবিতার মিলের প্রতি অতিরিক্ত আনুগত্যের ফলে চরিত্রানুযায়ী সংলাপ রচনার দিকে আর দৃষ্টি দেওয়ার অবকাশ ঘটে না। নাটকীয় সংলাপ চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলবে ও নাটকীয় গতিধর্মের (action) বাহক হবে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নাটকের সংলাপ অধিকাংশ স্থলেই 'বিশুদ্ধ কাব্য'ই—নাটকীয় সংলাপ নয়। উর্মিলার একটি উক্তি থেকে উদাহরণ নেওয়া যাক :

সূর্য অস্তে যায়। দূরে অনিমেষে চাহে
বঞ্চিত প্রান্তর। স্তব্ধ সরযূ প্রবাহে
রবির কনকরশ্মি ঘুমাইছে আসি।
হস্তে দীপ, আবক্তিম মুখে মৃদুহাসি,
আসিছে আনত নেত্রে ধূসর বসনে,
অর্ধাবগুণ্ঠনবতী সন্ধ্যা সঙ্গোপনে
ধীর পদক্ষেপে, এ বিশ্ব-মন্দিরে। (সীতা : ১ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)

এই উক্তিটির মধ্যে নিঃসন্দেহে কাব্যগুণ আছে, কিন্তু নাটকের মূল প্রবাহের সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। মিত্রাক্ষর কাব্যসংলাপে নাট্যকারের প্রধান দৃষ্টি রয়েছে কাব্যমোহ সৃষ্টির দিকেই। দীর্ঘ নাটকের মধ্যে অনেকগুলি অন্ত্যানুপ্রাস নিতান্ত শ্রুতিকটু হয়েছে—কষ্টকল্পিত মিলও আছে।

'সীতা' নাটকে নানাপ্রকার ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এমন কি তার সবগুলি অক্ষরবৃত্ত ছন্দও নয়। অবশ্য নাট্যকার একাধিক স্থানে ছন্দের

৫। The Theory of Drama (1937), Page 140.

বৈচিত্র্যও দেখিয়েছেন। সীতা যেখানে রামচন্দ্রের সঙ্গে গোদাবরীতীরের মধুর স্মৃতি আলোচনা করেছেন, সেখানে তাঁর উক্তি লক্ষণীয় :

মনে পড়ে প্রিয় ? ঢালিত অমিয়
এমনি চন্দ্রমা সেই দিন।
গোদাবরী তীর, সে পর্ণকুটির,
সেই দিন আর এই দিন।—(সীতা ১ম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

সীতার এই উক্তিটি ভবভূতির উত্তরচরিতের ভাবানুবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই নাটকের সংলাপরচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু অন্ত্যানুপ্রাস রক্ষার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার জন্য তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে—নাটকীয় সংলাপ হিসাবে এর অনুপযোগিতাই প্রকট হয়েছে। এমন কি চতুর্দশ মাত্রার অন্ত্যমিল কাব্যসংলাপও অনেক সময় লালিত্যহীন ও শ্রুতিকটু হয়েছে। যেমন—

রাম। কি কহিলি দুর্মুখ ? আস্পর্ধা তোর অতি।
জানিস না কে সে, আর কে তুই দুর্মতি ?
পথের কুক্কুর হেয় ? (সীতা ১ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য)

প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে লক্ষ্মণ ও উর্মিলার কথোপকথন (দ্বৈত সঙ্গীত ?) অংশটি নাটকে অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিত নয়—এই অংশটি নাট্যকারের কাব্য-বিলাস মাত্র। ছন্দ, অলঙ্কার বা রূপকল্পনা (Image) পরীক্ষার ক্ষেত্র নাটক নয়, কাব্য। কিন্তু নাট্যকার নাটকের মধ্যে তাঁর কাব্যকৌতূহল পরিতৃপ্ত করার চেষ্টা করেছেন। 'সীতা' নাটকটিতে কাব্যই যেন নাটকের আকারে লেখা হয়েছে। সুতরাং এলিয়টের মতানুযায়ী 'সীতা' নাটকের কাব্যসংলাপকে "poetry is merely a decoration, an added embellishment" বলা যায়।

দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বশেষ নাটক 'সিংহল-বিজয়'এর সংলাপ অংশ থেকে দু-একটি মূল্যবান তথ্য আহরণ করা যায়। নাটকটি প্রথমে কাব্যে রচিত হয়েছিল, পরে একজন বিশিষ্ট বন্ধুর পরামর্শে তিনি কাব্যসংলাপ ভেঙে

গদ্যসংলাপে কাব্যখানি রচনা করেন।[৬] এইজন্য নাটকখানিতে কাব্য-সংলাপ, গদ্যসংলাপ এবং তার সঙ্গে এই দুয়ের মাঝামাঝি একটি স্তরের আদর্শও পাওয়া যায়। 'সিংহল-বিজয়' নাটকের আগেই দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্যসংলাপের নাটকগুলি রচিত হয়েছে—তাই গদ্যসংলাপ আড়ষ্টতা থেকে অনেকখানি মুক্ত হয়েছে। পরিমাণে অনেক কম হলেও কাব্যসংলাপও আছে—একেবারে বর্জন করলে আরও ভালো হত। কিন্তু কাব্য ভেঙে গদ্য রচনার জন্য গদ্যের মধ্যেও অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়েছে। চলতি গদ্যের মধ্যে সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদবিন্যাস 'গুরু-চণ্ডাল' দোষের কারণ হয়েছে, যেমন :

"বিজয়। স্বর্গে দেবগণ। আমি মহাপাপী, আমায় ক্ষমা কর। ক্ষমা কর যে, পিতাকে এ দোষে দোষী করেছি। আর এমন বাপ—পুত্রস্নেহ-বিগলিত-স্তনধার-সম। মেঘ কেটে যাবে। বাবা! ক্ষমা কর যে, স্বপ্নেও ভেবেছি যে এও সম্ভব। আমি হলাম কি—মন্ত্রী মহাশয়।"

[সিংহল-বিজয় : ১ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য]

উদ্ধৃত সংলাপাংশটি গদ্য-পদ্যের একটি উদ্ভট বর্ণসঙ্কর মাত্র—কাব্যও নয়, আবার কাব্যধর্মী গদ্যও নয়। গদ্যের সহজ সচলতা এ ভাষায় নেই। অথচ 'সিংহল-বিজয়' নাটকটিতে গদ্যসংলাপ অনেকখানি সহজ হয়ে এসেছে, সে কথাও অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু কাব্য ভেঙে গদ্য করতে গিয়ে মাঝে মাঝে উৎকট মিশ্রণের সৃষ্টি হয়েছে।

॥ ৩ ॥

দ্বিজেন্দ্রলাল 'তারাবাই' নাটক রচনার পর, অধিকাংশ নাটকই গদ্যে রচনা করেন ('সোরাব-রুস্তম', 'সীতা', 'ভীষ্ম' ও 'সিংহল-বিজয়' নাটকের কিয়দংশ ছাড়া)। বাংলা অমিত্রাক্ষর ছন্দে সর্বপ্রকার নাটকীয় সংলাপ রচনা সম্ভব নয়, এই ছিল তাঁর অভিমত। এইজন্য তিনি অপেক্ষাকৃত পরিণত শক্তির

৬। "নাটকখানি প্রথমে পদ্যে রচিত হয়। পরে কবির আত্মীয় বন্ধু অধরবাবু তাঁহাকে বলেন যে তাঁহার গদ্যের force তাঁহার কবিতায় নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া নাটকখানি পদ্য ভাঙিয়া গদ্যে লিখিতে আরম্ভ করেন।"—দ্বিজেন্দ্রলাল : নবকৃষ্ণ ঘোষ, পৃঃ ২১৪।

নাটকগুলি গদ্যেই রচনা করেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই তাঁর অভিপ্রায়ের কথা বলেছেন :

"Carlyleএর মতে সামান্য হইতে গভীরতম এমন কোন ভাব নাই যাহা পদ্য অপেক্ষা গদ্যে সুন্দরতর রূপে প্রকাশ করা না যায়। পদ্যের ঝঙ্কার গদ্যে দেওয়া যায় কিন্তু গদ্যের স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাগতি পদ্যে নাই। বঙ্কিমবাবুর গদ্য অনেক স্থলে ত পদ্য। Schiller, Lessing, Ibsen, Molie're ইত্যাদি মহানাট্যকারগণের বহু মহা-নাটক গদ্যে লেখা আছে, তাহাতে তো তাঁহাদের মহিমা কমে নাই। তদুপরি নাটক অভিনয়ের জিনিষ। সেইজন্য উক্তিগুলি যত স্বাভাবিক হয় (ভাষার মর্যাদা রক্ষা করিয়া অবশ্য) ততই শ্রেয়। লোকে কথাবার্তা পদ্যে করে না, গদ্যে করে। অতএব পদ্যে নাটক রচনা করিলে উক্তিগুলি অস্বাভাবিক ঠেকিবেই।

" সেইজন্য আমি তারাবাইয়ের পরবর্তী নাটকগুলি (রাণা প্রতাপ, দুর্গাদাস, নূরজাহান, মেবার পতন ও সাজাহান) যথাক্রমে গদ্যেই রচনা করি। কিন্তু কবিতায় আমার অত্যধিক আসক্তি থাকায় আমি গদ্যের ভাষাকে কবিতার আসনে বসাইবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারি নাই। অথচ যেখানে সংস্কৃত শব্দ অপেক্ষা প্রচলিত শব্দ বেশী জোরের সহিত ভাবপ্রকাশ করে বলিয়া বোধ হইয়াছে, সেখানে প্রচলিত শব্দই ব্যবহার করিয়াছি।"[৭]

উদ্ধৃত অংশটি দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্যসংলাপ বিচারের পক্ষে একটি মূল্যবান নির্দেশিকা। তিনি প্রধানত গদ্যসংলাপ ব্যবহারের স্বপক্ষে দুটি যুক্তি দেখিয়েছেন। প্রথমত, গদ্যে সামান্য থেকে গভীরতম ভাব প্রকাশ করা যায়, দ্বিতীয়ত, গদ্যসংলাপ কাব্যসংলাপের চেয়ে অনেক বেশী স্বাভাবিক, কারণ লোকে গদ্যেই কথাবার্তা বলে। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম বক্তব্য সম্পর্কে নানা বিতর্কের অবকাশ আছে। অধিকাংশ সমালোচকের মতেই কাব্যসংলাপের দ্বারাই গভীর হৃদয়াবেগ সর্বাধিক ব্যক্ত করা সম্ভব। শেক্সপীয়রের নাটকের কবিত্বগুণও কম নয়—রাজা লীয়র, ম্যাকবেথ, ওথেলো, প্রস্পেরো প্রমুখ চরিত্রের তীব্র হৃদয়াবেগমণ্ডিত সংলাপগুলি কাব্যাংশেও অতুলনীয়।

৭। আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ : নাট্যমন্দির, শ্রাবণ, ১৩১৭, পৃঃ ৫১-৬০।

এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যকারেরা তাঁদের নাটকে কাব্যসংলাপকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এমন কথাও কেউ কেউ মনে করেছেন যে গদ্যসংলাপ উচ্চাঙ্গ ট্রাজেডি রচনার অনুকূল নয়।[৮] অথচ উইলিয়াম আর্চার প্রমুখ সমালোচকেরা নাটকের ক্ষেত্রে কাব্যের প্রবেশকে অনধিকারপ্রবেশ বলেই মনে করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় যুক্তি, গদ্য সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ভাষা। তিনি ইবসেন, মোলিয়েরের প্রসঙ্গ তুলেছেন। কিন্তু ইবসেন ও মোলিয়েরের নাটকের মূল প্রকৃতির কথা তিনি উল্লেখ করেন নি। ইবসেন সমাজসমস্যামূলক নাটক লিখেছেন, সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের কথা বলেছেন। মোলিয়েরের প্রহসন ও কমেডিগুলির মধ্যেও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রাধান্য লাভ করেছে। সেখানে গদ্যসংলাপকে সাধারণ জীবনের বাহক করে তোলা হয়েছে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল সর্বপ্রথম অবিমিশ্র গদ্যসংলাপে নাটক রচনা করেন 'প্রতাপসিংহ'। 'প্রতাপসিংহ' প্রাত্যহিক জীবনাশ্রয়ী সামাজিক বা পারিবারিক নাটক নয়। সুতরাং দ্বিজেন্দ্রলাল পরবর্তী ঐতিহাসিক নাটকে গদ্যসংলাপ ব্যবহার করেছেন বটে, কিন্তু বিষয়ের পরিবর্তন করেন নি। তাই তাঁর গদ্যও ঠিক প্রাত্যহিক জীবনের গদ্য নয়, সেখানে উচ্ছ্বাস, বর্ণ ও অলঙ্কারের আতিশয্য আছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই বলেছেন যে, তিনি 'গদ্যের ভাষাকে কবিতার আসনে' বসানোর প্রলোভন ত্যাগ করতে পারেন নি। তাঁর স্বীকৃতি অনুযায়ী তাঁর ভাষাকে 'Poetic prose' বলা যায়। তাঁর গদ্যসংলাপ কাব্যধর্মী, কিন্তু তার স্বরূপ-সার্থকতা ও নাটকীয় উপযোগিতা নির্ণয়ের প্রয়োজন। কাব্যসংলাপ বিচারের আদর্শেই কাব্যধর্মী গদ্যসংলাপযুক্ত নাটকেরও বিচার করা যায়। কাব্যধর্মী গদ্য নাটকে ব্যবহার করলে সেই গদ্যকে সর্বপ্রকার নাটকীয়তার বাহন হয়ে উঠতে হবে—কাব্যের স্ব-মহিমা ও মনোহারিত্ব দেখাতে গেলেই সে ভাষা নিছক অলঙ্করণে পরিণত হবে। কাব্যধর্মী গদ্যের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাটকের এই ধরনের সংলাপের কথা মনে পড়বে। রবীন্দ্রনাথের নাটকীয় গদ্যে সূক্ষ্ম সুরের লীলা ও গীতিকবিতার অপরাজেয় মোহ বিদ্যমান। কিন্তু

৮। "In general, it may be said, it would appear that the Elizabethan dramatists were right in their tragedies, and that the more modern prose development is uninformed, an experiment dangerous and antagonistic to the spirit of high tragedy."—The Theory of Drama : Nicoll, Page 140.

রবীন্দ্রনাথের ভাবনাট্যে বা তত্ত্বনাট্যে এই জাতীয় সংলাপ সুসঙ্গত হয়েছে। 'ফাল্গুনী' নাটকের অন্ধ বাউল বলেছেন : "আমার কথা বুঝবার জন্য নয়, বাজবার জন্য।" গোপন ও গুহাহিত সত্যকে প্রকাশ করতে গেলে ভাষার যে ইঙ্গিতময়তা ও সংকেতগূঢ় রহস্যব্যঞ্জনার প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তার সর্ববিধ অভিব্যক্তি ঘটেছে। তাঁর গীতিকবিতার সঙ্গেই নাটকীয় কাব্যধর্মী গদ্যের একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্যসংলাপের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। তাঁর ভাষা উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগমণ্ডিত ও অলঙ্কারবহুল। তাঁর পূর্বে এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কোনো নাট্যকার গদ্যে এমন কবিত্বপূর্ণ ও বেগবান নাটকীয় সংলাপ ব্যবহার করেন নি। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকীয় ভাষা যেন অপ্রতিহতগতি একটি বর্ণের প্লাবন। উপমা-উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি দিয়ে যেমন তিনি তাঁর ভাষাকে চিত্রধর্মী করে তুলেছেন, তেমনি দ্রুতসঞ্চারী ক্লাইম্যাক্স-অ্যান্টিক্লাইম্যাক্সের আন্দোলনে তিনি তাকে গতিবেগসমৃদ্ধ করেছেন। চলতি ক্রিয়াপদের ব্যবহার করলেও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকীয় গদ্য হালকা নয়, প্রকৃতিধর্মের দিক থেকে এ ভাষা সাধুভাষারই প্রকারভেদ মাত্র। তৎসম শব্দের প্রাচুর্য, সমাসবহুলতা ও গাম্ভীর্য এ ভাষাকে ঐশ্বর্যময়ী করে তুলেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্যে কাব্যধর্মিতার সঙ্গে ওজোগুণের সমন্বয় ঘটেছিল। তাঁর নাটকের মঞ্চসাফল্যের অন্যতম কারণ তাঁর এই ঐশ্বর্যশালী দৃপ্ত ভাষা। গদ্যসংলাপের দ্বারা যে হৃদয়াবেগের আলোড়ন ও অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতাকে এমন গীতিকাব্যোচিত উন্মাদনার সঙ্গে প্রকাশ করা যায়, দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বে বাংলা নাটকে তার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নি। টডের 'রাজস্থান' অবলম্বন করে মধুসূদন গদ্যসংলাপবাহী 'কৃষ্ণকুমারী' লিখেছিলেন। কিন্তু মধুসূদনের গদ্য নাটকীয় সংলাপের অনুপযুক্ত, বাংলা ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যই সেখানে ফুটে উঠতে পারে নি। নাটকীয় সংলাপের যে সজীবতা ও সচলতা থাকার প্রয়োজন মধুসূদনের গদ্যসংলাপে তা নেই। মধুসূদনের গদ্য মহাকাব্যেরই অলঙ্কারবহুল একটি গদ্যরূপান্তর মাত্র—অলঙ্কারের আতিশয্যে তার গতি আড়ষ্ট। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকের ভাষাও বিশেষত্ববর্জিত ও গতিহীন।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের গদ্যসংলাপ তীব্র অন্তর্দাহ, উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ, মর্মভেদী শোকোচ্ছ্বাস রূপায়িত করার উপযুক্ত ভাষা। তাই চরিত্রের ঘাত-

প্রতিঘাত ও হৃদয়বৃত্তির আলোড়ন স্পষ্টরেখায় ফুটিয়ে তুলতে এ ভাষার উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না। দ্বিজেন্দ্রলালের উক্তি থেকেই জানা যায় যে, গদ্যের ভাষাকে তিনি কবিতার আসনে বসানোর চেষ্টা করেছিলেন। শব্দসংস্থানের লাবণ্য, পদবিন্যাসের সুষমা ও আলঙ্কারিক কারুকার্য নাটকীয় সংলাপের মধ্যে এক সাঙ্গীতিক মূর্ছনার সৃষ্টি করেছে।[৯] নূরজাহানের রূপে মুগ্ধ জাহাঙ্গীরের উচ্ছ্বসিত উক্তিটি লক্ষণীয় :

"সেদিন গবাক্ষপথে দেখ্‌লেম—কি সে মূর্তি!—যেন তুষারের উপর ঊষার উদয়; যেন স্তব্ধ নিশীথে ইমনের প্রথম ঝঙ্কার; যেন মনুষ্যের প্রথম যৌবনে প্রেমের প্রভাত!—সে একটা নিঃসঙ্গ সুখের মত, মধুর রাগিণীর মত নয়, প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত নয়।" [নূরজাহান : ১ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য]

রূপমুগ্ধ জাহাঙ্গীর গবাক্ষপথে নূরজাহানকে দেখে সেই রূপের স্মৃতি রোমন্থন করছেন। রূপবিহ্বল প্রেমিকচিত্তের হৃদয়রাগে রঞ্জিত হয়ে এই অংশটি সঙ্গীতময় হয়ে উঠেছে। নাট্যকারও যেন স্থান-কাল-পাত্র বিস্মৃত হয়ে বিহ্বল রূপতৃষ্ণাকেই কাব্যধর্মী গদ্যে রূপায়িত করেছেন। কিন্তু এই ধরনের সংলাপের মধ্যে দুর্বলতার বীজও আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল যেন কাব্যের গীতিতরঙ্গেই নিজেকে ভাসিয়ে দেন, নিজের কাব্যকুহকের মধ্যে নিজেই পথ হারিয়ে ফেলেন —ক্ষণিকের জন্য ভুলে যান যে এ কাব্য নয়, নাটক! তা ছাড়া এই বিশিষ্ট রীতিটি ভিন্ন আর কোনো ভঙ্গি তাঁর সংলাপে রূপায়িত হয়ে ওঠে না। কিন্তু একই ভঙ্গির যত্র-তত্র-প্রয়োগ শেষ পর্যন্ত মুদ্রাদোষে (mannerism) পরিণত হয়। তা ছাড়া কাটা-কাটা ইংরেজি-ঘেঁষা সংলাপ অনেক সময় শ্রুতিকটু হয়েছে। সংলাপের মধ্যে 'একটা' শব্দের অতিরিক্ত ব্যবহার নাট্যকারের অন্যতম মুদ্রাদোষ; যেমন—"একটা সৌন্দর্য, একটা গরিমা, একটা বিস্ময়।"

[মেবার-পতন : ১ম অঙ্ক, ৭ম দৃশ্য]

এই জাতীয় এক-একটি অসমাপ্ত কাটা-কাটা বাক্যাংশের অতিরিক্ত প্রয়োগ অনেক সময় সংলাপকে অস্বাভাবিক করে তুলেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যধর্মী অলঙ্কারবহুল সংলাপের মধ্যে এটি হল একটি প্রধান ত্রুটি।

৯। "তাঁহার নাটকীয় চরিত্রের কথাবার্তার মধ্যেও অনেক সময় সঙ্গীত-জাতীয় উচ্ছ্বাস এবং রসোদ্গারই লক্ষ্য করিবেন; সময় সময় এক একটি কথা ... বিদ্যুৎ-বিভাসের ন্যায়, সঙ্গীতের আকস্মিক আবেগ-মূর্ছনার ন্যায়, উচ্ছ্বাস পরিস্ফুট করিয়াই হয়ত অচিরে বিলীন হইতেছে।"

—বঙ্গবাণী; শশাঙ্কমোহন সেন, পৃঃ ১৪৯।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল যেখানে তাঁর সংলাপরচনায় চরিত্রের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে পেরেছেন, সেখানে এর নাটকীয় সার্থকতা ও শিল্পোৎকর্ষ অস্বীকার করা যায় না। ঝটিকা-বিদ্যুৎময় রাত্রিতে আগ্রাদুর্গে বন্দী সাজাহানের অন্তর্জীবনের প্রবল আলোড়নকে নিপুণ শিল্পসাফল্যে মণ্ডিত করা হয়েছে

—"ইচ্ছে কর্চ্ছে জাহানারা, যে এই রাত্রির ঝড়বৃষ্টি অন্ধকারের মাঝখান দিয়ে একেবারে ছুটে বেরোই। আর এই সাদা চুল ছিঁড়ে, এই বাতাসে উড়িয়ে, এই বৃষ্টিতে ভাসিয়ে দিই। ইচ্ছে কর্চ্ছে যে আমার বুকখানা খুলে বজ্রের সম্মুখে পেতে দিই। ইচ্ছে কর্চ্ছে যে এখান থেকে আমার আত্মাকে টেনে ছিঁড়ে বার করে তা ঈশ্বরকে দেখাই। ঐ আবার গর্জন!—মেঘ বার বার কি নিষ্ফল গর্জন কর্চ্ছ? তোমার আঘাতে পৃথিবীর বক্ষ খান খান করে দিতে পারো? অন্ধকার? কি অন্ধকার হয়েছে! তোমার পিছনে ঐ সূর্য নক্ষত্রগুলোকে একেবারে গিলে খেয়ে ফেলতে পারো?"

[সাজাহান ৫ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য]

অপহৃতা কন্যাকে ফিরে পেয়ে চাণক্যের হৃদয়বৃত্তির আলোড়নকে নাট্যকার সার্থকভাবে রূপ দিয়েছেন

—"কাত্যায়ন! নাড়ী দেখতে জানো? দেখ ত [হাত বাড়াইলেন] আমি বেঁচে আছি কিনা? দেখ ত এ আমার ইহকাল না পরকাল?—এ স্বপ্ন, না সত্য? এ আলোকের উচ্ছ্বাস, না অন্ধকারের বন্যা? এ সৃষ্টির সঙ্গীত, না প্রলয়কল্লোল?—দেখ ত!—নহিলে এও কি সম্ভব এতদিন পরে আমারই কন্যা—ভারতের শাসনকর্তার কন্যা তারই দ্বারে এসেছে ভিক্ষা কর্তে।—কাত্যায়ন! কাত্যায়ন! [ক্রন্দন]" [চন্দ্রগুপ্ত · ৫ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য]

উদ্ধৃত অংশটিতে উচ্ছ্বসিত আপাত-অসংলগ্ন উক্তিগুলির মধ্যে চাণক্য চরিত্রটিরই মর্মমূল উদ্ঘাটিত হয়েছে। স্থান কাল-পাত্রানুযায়ী সংলাপটি রূপায়িত হয়েছে—তাই পরস্পরবিরোধী উক্তিগুলির মধ্যে এক নিগূঢ় সামঞ্জস্য বিদ্যমান। গদ্যে এই ধরনের সংলাপ সৃষ্টি বাংলা নাটকে সত্যই বিরল। কিন্তু এই চাণক্যই যখন চন্দ্রগুপ্তকে নন্দের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার জন্য মাতৃভক্তি সম্পর্কে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন, তখন তা রীতিমত অসহ্য হয়ে ওঠে

"মা—রোগে, শোকে, দৈন্যে দুর্দিনে তোমার দুঃখ যে নিজের বক্ষ পেতে নিতে পারে, তোমার ম্লান মুখখানি উজ্জ্বল দেখাবার জন্য যে প্রাণ

দিতে পারে, যাঁর স্বচ্ছ স্নেহমন্দাকিনী এই শুষ্ক তপ্ত মরুভূমিতে শতধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে যাচ্ছে ; মা যার অপার শুভ্র করুণা মানব-জীবনের প্রভাত-সূর্যের মত কিরণ দেয়—বিতরণে কার্পণ্য করে না, বিচার করে না, প্রতিদান চায় না ; উন্মুক্ত, উদার কম্পিত আগ্রহে দুহাতে আপনাকে বিলাতে চায়,—এই সেই মা !" [চন্দ্রগুপ্ত : ২য় অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য]

চাণক্যের এই উক্তিটি রীতিমত আতিশয্য ও নাট্যাতিরিক্ত। আদর্শবাদ ও কতকগুলি গুণবাচক বিশেষণ বাদ দিলে সংলাপটিতে কিছুই থাকে না। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে যখন একত্র হাত মিলিয়ে থাকেন, তখন সংলাপের সার্থকতা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু যখন কবি, নাট্যকারের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে খেয়াল-খুশির আকাশকুসুম চয়ন করেন, তখনই সংলাপ অতিনাটকীয় ভাববিলাসে পরিণত হয়।

॥ ৩ ॥

দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্যসংলাপে মালোপমা উৎপ্রেক্ষা ও ক্লাইম্যাক্স প্রচুর পরিমাণে লক্ষণীয়। ক্লাইম্যাক্স ও অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্সের দ্বারা বাক্যাংশের মধ্যে তিনি তীব্র গতিসঞ্চার করেছেন। সমাসোক্তি অলঙ্কারের দ্বারা তিনি তাঁর বক্তব্যকে সজীব করে তুলেছেন। Oxymoron ও Epigram-জাতীয় বিরোধমূলক অলঙ্কারসৃষ্টিতেও তাঁর নৈপুণ্য ছিল। এপিগ্রামের বিদ্যুচ্চমকে তিনি বক্তব্যকে রমণীয় করে তুলেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষার মধ্যেও দৃঢ়তার অভাব নেই, যুক্তাক্ষরবাহুল্য ও সমাসবদ্ধতা তার বাঁধুনিকে একটি গাঢ়সংহত রূপ দিয়েছে। রঙ ও রেখার সুস্পষ্টতায় দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষার চিত্রধর্মিতা ও সঙ্গীতময়তা যেমন আমাদের সশ্রদ্ধ অনুমোদন লাভ করে, তেমনি নাটকারের ব্যর্থতা ও অপচয়ও ব্যথিত করে।

নাট্যধর্মকে ক্ষুণ্ণ করে কাব্যের স্ব-মহিমা প্রচার করা তাঁর সংলাপের একটি প্রধান ত্রুটি হলেও, এইটিই একমাত্র ত্রুটি নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের সংলাপের মধ্যে পদবিন্যাসগত ও গঠনরীতির ত্রুটিও আছে। ইংরেজি বাগ্বিধির অতিরিক্ত অনুসরণের ফলে ভাষা অনেক সময় বাংলা বুলির স্বকীয়তা হারিয়ে ইংরেজি-ঘেঁষা হয়ে পড়েছে—বেশ বোঝা যায় যে, ইংরেজি বাক্যাংশের

গঠনরীতির দিকে নজর রেখে যেন তিনি তার তর্জমা করেছেন। পর পর তিনটি বাক্যাংশকে একত্র গ্রথিত করে ক্লাইম্যাক্সের সৃষ্টি করা দ্বিজেন্দ্রলালের সংলাপরচনার অন্যতম কৌশল—কিন্তু এই কৌশল অনেক ক্ষেত্রেই কৃত্রিম ও বিজাতীয় হয়ে উঠেছে। 'নূরজাহান' নাটকে রেবার মৃত্যুসংবাদ শুনে লায়লা বলেছেন: "অভাগিনী পুত্রহারা সম্রাজ্ঞী। পৃথিবী থেকে একটা গরিমা চলে গেলো।—একটা আলোক, একটা সঙ্গীত, একটা প্রার্থনা।" [নূরজাহান ৩য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য]। এই জাতীয় কাটা-কাটা বাক্যাংশ মুহূর্তের চমক সৃষ্টি করতে পারে মাত্র, কিন্তু একটি অখণ্ড সংলাপের রস পরিবেশন করতে পারে না। দ্বিজেন্দ্রলাল অনেক সময় অচেতনের উপর চেতনের গুণ আরোপ করে সমাসোক্তি অলঙ্কার সৃষ্টি করেছেন। সমাসোক্তি অলঙ্কারের প্রয়োগে বর্ণনীয় বস্তু স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষবৎ হয়ে ওঠে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের সংলাপে এই জাতীয় অলঙ্কার কোনো কোনো সময় বক্তব্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে— ভাষাকে কৃত্রিম কারুকার্যে মণ্ডিত করতে গিয়ে তাকে তিনি অনেক সময় দুর্বল করেই ফেলেছেন। 'পরপারে' নাটকের বিশ্বেশ্বর নানাভাবে প্রতারিত হয়ে মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন—তাই তিনি দয়ালকে বলেছেন

"প্রেম, দয়া, স্নেহ, পাতিব্রত্য, বাৎসল্য সব মুছে দিয়ে যাও দয়াময়ি। প্রেমে শুধু কাম থাকুক, বন্ধুত্বের উপর ঈর্ষা রাজত্ব করুক, উপকারের শিয়রে কৃতঘ্নতা পাহারা দিউক। আহারে বিষ থাকুক, শরীরে ব্যাধি থাকুক, ঐশ্বর্যে অহঙ্কার থাকুক, দারিদ্র্যে ঘৃণা থাকুক।" [পরপারে ৫ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য]

এই জাতীয় সংলাপ বিসদৃশ। সবচেয়ে বিসদৃশ হয়েছে তাঁর সামাজিক নাটক দুটিতে। ঐতিহাসিক নাটকে স্থান-কাল-পাত্রভেদে অনেক ক্ষেত্রে যা মানায়, সামাজিক নাটকে তা মোটেই শোভা পায় না। আসল কথা, দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় বৈচিত্র্যের অভাব আছে। তাঁর গদ্যসংলাপ হৃদয়াবেগের চূড়ান্ত অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করতেই সক্ষম। কিন্তু সমস্ত চরিত্র সব সময় তো একই ভাষায় কথা বলতে পারে না। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল উচ্চ-নীচ বা স্ত্রী-পুরুষভেদে সংলাপের মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারেন নি। আলেকজাণ্ডার যে ভাষায় কথা বলেন, উচ্ছ্বসিত হয়ে 'বিচিত্র দেশে'র বর্ণনা করেন, মুরাও সেই ভাষায়ই তাঁর বাৎসল্য প্রকাশ করেন, নূরজাহান যে ভাষায় কথা বলেন তাঁর কিশোরী কন্যা লায়লাও সেই ভাষায় কথা বলেন,

জাহানারা যে ভাষায় ঔরংজীবকে তিরস্কার করেন জহরৎ সেই ভাষায়ই পিতৃশত্রুর উপর অভিশাপ বর্ষণ করেন, শান্তা বেশ্যা যে ভাষায় সমাজ সমালোচনা করেন, বিশেশ্বরও সেই ভাষায় আক্ষেপ করেন। বীররস, উচ্ছ্বসিত আদর্শবাদ, উদ্দীপ্ত দেশপ্রেম এবং যৌবনস্বপ্নের উন্মুখর হৃদয়াবেগকেই দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা স্ন্দর করে ফুটিয়ে তুলতে পারে। কিন্তু জীবন তো একটানা উঁচু সুরেই বাঁধা নয়—সেখানেও চড়াই-উতরাই আছে। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা যত কাব্যময়ই হোক না কেন, জীবনের বহুবিচিত্র অভিব্যক্তিকে নাট্যরূপ দিতে পারে নি।

সংস্কৃত নাটকে পাত্রপাত্রীর সামাজিক অবস্থানুযায়ী বিভিন্ন প্রকার সংলাপ ব্যবহারের রীতি ছিল। দীনবন্ধু মিত্র ভদ্র ও ভদ্রেতর চরিত্রের মধ্যে ভাষার পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন—নবীনমাধব যে ভাষায় কথা বলেন তোরাপ সে ভাষায় কথা বলে না। ভদ্রসমাজের ভাষাসৃষ্টিতে তিনি ব্যর্থ হলেও, চরিত্রানুযায়ী ভাষাসৃষ্টির সার্থকতা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এবং ভদ্রেতর চরিত্রের ভাষাসৃষ্টিতে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। গিরিশচন্দ্রও তাঁর নাটকের গদ্যসংলাপ রচনায় চরিত্রানুযায়ী ভাষা ব্যবহার করেছেন। গিরিশচন্দ্রের গদ্যসংলাপে দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষার মতো মর্মভেদী সঙ্গীতোচ্ছ্বাস নেই সত্য, কিন্তু এ ভাষার ভারসাম্য অনেক বেশী। একটি উদাহরণ দিলে বক্তব্যটি সুস্পষ্ট হবে। 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের বাড়িওয়ালী মাসী বা থাকোমণির সংলাপের সঙ্গে 'পরপারে' নাটকের হিরণ্ময়ী বা শান্তা চরিত্রের সংলাপের তুলনা করলেই বোঝা যাবে। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা কৃত্রিম, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের কথনি-ঘেঁষা ভাষা স্বাভাবিক ও চরিত্রানুগ।

দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্যসংলাপের কথা আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের নাটকের গদ্যসংলাপের কথা মনে হবে। 'চিরকুমার সভা' বা 'শেষরক্ষা' জাতীয় রচনায় সংলাপ কোথায়ও বিজাতীয় হয় নি। প্রাত্যহিক জীবনের ভাষাকেই সেখানে ব্যবহার করা হয়েছে। চরিত্র-অনুচিত ভাষাও সেখানে ব্যবহার করা হয় নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'তত্ত্বনাট্য'গুলি সম্পর্কে ঠিক সে কথা বলা যায় না। এই নাটকগুলিতে সবরকম চরিত্রই একই ভাষায় কথা বলে। 'তপতী' ও 'রক্তকরবী' নাটকে কবিকল্পনার প্রাধান্য যেন আরও বেশী। নন্দিনী ও রাজা যে ভাষায় কথা বলেন, ফাগুলাল ও খোদাইকরেরাও

সেই ভাষায় কথা বলে, অধ্যাপক যে ভাষায় কথা বলেন কিশোরও সেই ভাষায় কথা বলে। রবীন্দ্রনাথের 'তত্ত্বনাট্যে' ভাবেরই প্রাধান্য, সেই অশরীরী ভাবকে একমাত্র সঙ্কেতব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। আমাদের প্রাত্যহিক জগতের সঙ্গেও সে জগতের প্রভেদ আছে। তাই চরিত্রগুলির সংলাপের মধ্যে বৈচিত্র্য না থাকলেও ক্ষতি নেই। চরিত্রগুলিও সেই ভাবলোকের রহস্যে মণ্ডিত, এইজন্য সাধারণ নাটকের সংলাপবৈচিত্র্যের আদর্শে তাদের বিচার করা চলে না। কিন্তু সাধারণ নাটকে সংলাপের মধ্যে চরিত্রানুযায়ী বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা অত্যাবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের নাটকীয় সংলাপ সম্পর্কে আর একটি কথা মনে পড়ে: বাক্-পরিমিতির সঙ্গে মিশেছে কবিকল্পনার সূক্ষ্মরস। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় মেঘমন্দ্র আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আছে সূক্ষ্মসুরের মৃদু মূর্ছনা।

নাটকীয় টেকনিকের দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল কিছু কিছু নূতনত্ব সৃষ্টি করেছিলেন। আধুনিক নাটকে স্বগতোক্তি বর্জিত হয়েছে। তার কারণ স্বগতোক্তির মধ্যে একটি কৃত্রিমতা আছে। কিন্তু শেক্সপীয়র স্বগতোক্তির ব্যবহার করেছেন, শুধু তাই নয়, শেক্সপীয়রের নাটকের বহু স্বগতোক্তি বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়। স্বগতোক্তি যেন চরিত্রের নিজেরই আত্মগত কথা, দর্শকদের শোনানো উদ্দেশ্য নয়—এইভাবেই ধরে নিতে হবে, কিন্তু এই নীতি শেক্সপীয়রের নাটকেও উৎকটভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে—চরিত্রটি দর্শকদের সঙ্গে সোজাসুজিই কথা বলেছেন।[১০] তা ছাড়া এ ভঙ্গিটিই অস্বাভাবিক, এইজন্য আধুনিক নাট্যকারেরা এই কৃত্রিম রীতিটি পরিহার করেছেন।[১১] দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বে বাংলা নাটকে স্বগতোক্তি ব্যবহৃত হয়েছে—এমন কি

১০। " . . in one or two the actor openly speaks to the audience. Such faults are found chiefly in the early plays, though there is a glaring instance at the end of Belarius's speech in Cymbeline (III, iii 99 ff) and even in the mature tragedies something of this kind may be traced '

—Shakespearean Tragedy (1941) : Bradley, Page 72.

১১। "The practical disappearance of both formal soliloque and incidental aside from our greater contemporary drama, notwithstanding the fact that this drama is so largely psychological in its interest, is thus a most significant index of a general change in our ideas of dramatic technique."

—An Introductiin to the Study of Literature (1944) : Hudson, Page 197.

দ্বিজেন্দ্রলালেরও প্রথম যুগের নাটকে ও প্রহসনে স্বগতোক্তি ছিল, পরে অবশ্য তিনিই অনেক ক্ষেত্রে পরিমার্জিত করেন। মধুসূদনের নাটকীয় সংলাপের একটি প্রধান দুর্বলতাই হল স্বগতোক্তির আতিশয্য। যে কথা তিনি সাধারণ সংলাপে অনায়াসে প্রকাশ করতে পারতেন, তাকেও প্রকাশ করতে তিনি স্বগতোক্তির আশ্রয় নিয়েছেন—তাতে পদে পদে সংলাপ বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

'নূরজাহান' নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল সর্বপ্রথম স্বগতোক্তি বর্জন করেছেন। স্বগতোক্তি বর্জনের কারণটি তিনি নিজেই নাটকের ভূমিকায় স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন: "...আমি এই নাটকে দ্বিতীয় ব্যক্তির সমক্ষে কাহারও স্বগতোক্তি একেবারে বর্জন করিয়াছি। একজনের এরূপ চীৎকার করিয়া স্বগতোক্তি যাহা সমস্ত শ্রোতৃগণ শুনিতে পাইতেছেন কেবল তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান নট নটীই শুনিতে পাইতেছেন না, এ অনিবার্য ব্যাপার আমার কাছে একটু হাস্যকর ঠেকে।" দ্বিজেন্দ্রলাল কৃত্রিমতা দূর করার জন্য 'পার্শ্বে দণ্ডায়মান নটনটী'র সম্মুখে স্বগতোক্তি বর্জন করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর চরিত্রের একাত্মভাষণগুলিই (Monologue) সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কোনো চরিত্র সম্মুখে নেই, সেই নির্জন অবকাশই একক মন প্রকাশ করার উপযুক্ত মুহূর্ত। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই মুহূর্তকে সদ্ব্যবহার করেছেন। অপরের সম্মুখে হৃদয়ের যে কথা প্রকাশ করা যায় না, এই নির্জন অবকাশে তাও প্রকাশ করা সম্ভব। এরূপ অবস্থায় পার্শ্ববর্তী চরিত্র থাকে না বটে, কিন্তু দর্শকদের শোনার পক্ষে কোনো অসুবিধা ঘটে না। নূরজাহান, ঔরংজীব, চাণক্য প্রভৃতি চরিত্র এই জাতীয় একাত্মভাষণের ফলেই অধিকতর পরিস্ফুট হয়েছে। তাঁদের মনের জটিল চিন্তা দর্শকদের কাছে পরিস্ফুট হলেও নাট্যোল্লিখিত চরিত্রদের কাছে অপ্রকাশিত। 'সাজাহান' নাটকে কূটকৌশলী ঔরংজীবের একটি সংলাপ লক্ষণীয়। মোরাদ প্রবেশ করার আগে ঔরংজীব সমস্ত পূর্ববর্তী কাজের পর্যালোচনা করে ভবিষ্যতের কর্তব্য নির্ধারণ করছেন। পরিত্যক্ত প্রান্তরে গভীর নিশীথে ঔরংজীবের নির্জন উক্তি এক শ্বাসরোধকারী অশুভ আবহাওয়ার সৃষ্টি করে:

"আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঝড় উঠবে। একটা নদী পার হয়েছি; এ আর এক নদী—ভীষণ, কল্লোলিত, তরঙ্গসঙ্কুল। এত প্রশস্ত যে, তার ওপার

দেখতে পাচ্ছি না। তবু পার হতে হবে—এই নৌকা নিয়েই।” [শাজাহান : ১ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য]

‘নূরজাহান’ নাটকে নূরজাহান যখন একাকিনী তখনই যেন তাঁর অন্তঃস্তল সবচেয়ে বেশী উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। নূরজাহান চরিত্রের আত্মক্ষয়কারী সংগ্রামের পরিণতি এ পদ্ধতিতে আরও বেশী পরিস্ফুট হয়েছে :

“বৃথা! বৃথা! বৃথা! হারে মূঢ় মানুষ।—হাস্যমুখে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে ছুটেছিস সর্বনাশের দিকে। বাঁচিস শুধু মৃত্যুর সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ হবার জন্য। যত পাকছিস তত পচছিস!!!- এ জীবন একটা জীবন্ত মৃত্যু। হাস্য হাহাকারের বিকার! আলোক অন্ধকারের আর্তনাদ।—আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি যে, এ বৃথা আয়োজন।···বিনাশের কল্লোল শুনতে পাচ্ছি।···নিয়তির অদৃশ্য তর্জনী অদূরে লক্ষ্য করে আমায় যেন ডেকে বলছে—‘ঐখানে তোমার সর্বনাশ, তবু তোমার ঐখানেই যেতে হবে।’ ধ্বংসের ওষ্ঠে একটা হিম-কঠিন শাণিত হাসি দেখছি,—সে হাসির অর্থ—এই যে! তোমার জন্য শেষ-শয্যা পেতে বসে আছি।—এসো।” [নূরজাহান : ৫ম অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য]

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাটকে স্বগতোক্তি বর্জন করেছেন বটে, কিন্তু তার অনেকখানি অভাব পূরণ করেছেন এই জাতীয় একাত্মভাষণ (monologue) ব্যবহার করে। এতে স্বগতোক্তির কৃত্রিমতাও নেই, আবার স্বগতোক্তির উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের নূতন পদ্ধতিটি নিঃসন্দেহে নাটকীয় টেকনিককে সমৃদ্ধ করেছে।

॥ ৫ ॥

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যসাহিত্যের সম্যক আলোচনা করতে হলে তাঁর নাটকের গঠনশৈলী আলোচনা করার প্রয়োজন। গল্পাংশ বা উপাদান পৌরাণিক. ঐতিহাসিক অথবা সামাজিক যাই হোক না কেন,—সেই উপাদানকে নাটকীয় বিন্যাসে গ্রথিত করাই নাট্যকারের কাজ। নাটকের কোনো ঘটনাই বহিরাগত নয়, গতিধর্মের (action) আবেগেই নাটকীয় ঘটনার সৃষ্টি হয়। যেখানে গতির তীব্র ক্রিয়াশীলতায় নাটকীয় ঘটনার সৃষ্টি না হয়ে বাইরে থেকে কতকগুলি ঘটনা এসে জমা হয়, সেখানে নাট্যকার সম্পূর্ণভাবেই ব্যর্থ হন। উপন্যাসের সঙ্গে নাটকীয় ঘটনার এইখানেই পার্থক্য। উপন্যাসের কাহিনী

পূর্বেই সংঘটিত হয়েছে, মন্থর বিবৃতির মধ্য দিয়ে সেই সংঘটিত কাহিনীকেই রূপ দেওয়া হয়, কিন্তু নাটকে ঘটনা আগে ঘটে না, গতির উত্তাপে ঘটনার সৃষ্টি হয়। সুতরাং নাটকীয় কাহিনীর মূলে থাকে একটি ক্রিয়াশীল ঘটমান জীবন। তাই গতিবেগ বা চরিত্রসৃষ্টির পক্ষে যে ঘটনার প্রয়োজন নেই, তার কোনো মূল্যই নাটকে স্বীকৃত হয় না।

ইউরোপীয় নাটকের অনুশীলন করলেও বাংলা নাটকে যাত্রারীতিকে অনেককাল পর্যন্ত কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় নি। ইউরোপীয় নাটকের বাহ্যরূপের দ্বারা বাঙালী নাট্যকারেরা অনেক আগেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য নাটকের নিগূঢ় রহস্যকে—তার গতিধর্মের স্বরূপপ্রকৃতিকে নিজেদের নাটকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা এসেছে অনেকদিন পরে। তার কারণ সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য ও যাত্রার সংস্কার সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করতে সময় লেগেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে তীব্র গতিধর্ম আছে। এই গতিধর্মের প্রকৃতির উপর নাটকের গঠনশৈলীও অনেকখানি নির্ভর করে। স্থূলত, তাঁর নাটকগুলির মধ্যে তিনটি অংশ দেখা যায়—প্রথমাংশে নাটকীয় ঘটনার উপস্থাপনা—এমন ঘটনা যার মধ্যে গতিধর্মের সম্ভাবনা আছে, দ্বিতীয়াংশে, প্রথমাংশের ঘটনাই পল্লবিত হয়ে জটিল আকার ধারণ করে; তৃতীয়াংশে সমস্ত ঘটনা, চরিত্র ও গতিবেগ সংহত হয়ে নাটককে অনিবার্য পরিণতির দিকে অগ্রসর করায়। এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের নিজের নির্দেশটি প্রণিধানযোগ্য :

"নাটকের গতি নদীর স্রোতের মত; অন্যান্য উপনদী তাহার উপর আসিয়া পড়িয়া তাহাকে পরিপুষ্ট করিতেছে মাত্র। নাটকের আকার মোচার মত, একস্থান হইতে বাহির হইয়া পরে বিস্তৃত হইয়া একস্থানেই তাহা শেষ হইতে হইবে। প্রেম নাটকের মুখ্য বিষয় হইলে, সেই প্রেমের পরিণামেই নাটক শেষ করিতে হইবে; যেমন রোমিও ও জুলিয়েট। লোভ মুখ্য বিষয় হইলে লোভের পরিণামেই নাটক শেষ করিতে হইবে; যেমন ম্যাকবেথ।"[১২]

দ্বিজেন্দ্রলাল এখানে শেক্সপীয়রীয় নাট্যশৈলীর দিকে দৃষ্টি রেখেই নাটকীয় গঠনরীতি সম্পর্কে সাধারণ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর

১২। কালিদাস ও ভবভূতি (প্রথম সং) : দ্বিজেন্দ্র-গ্রন্থাবলী (প্রথম ভাগ—বসুমতী সং) পৃঃ ৩০৬-৭।

নাটকে এই রীতি কতদূর সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়েছেন, সেই হল বিচার্য। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম নাটক 'পাষাণী'। এই নাটকে অপরিণতির চিহ্ন আছে। কিন্তু গঠনশৈলীর দিক থেকে নাট্যকার তাঁর প্রথম নাটকে প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রথম অঙ্কে অহল্যার যৌবনবেদনা ও অতৃপ্ত প্রেমপিপাসার বর্ণময় চিত্র আছে। মাধবীর সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের মধ্যে যে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়, তার মূলকারণ যে দাম্পত্য-জীবনের অসঙ্গতি, গৌতমের বিদায়দৃশ্যে তা পরিস্ফুট হয়েছে। প্রথমাঙ্কের শেষ দৃশ্যে ইন্দ্র ও মদনের ষড়যন্ত্রের ভিতর দিয়ে পরবর্তী ঘটনার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। সুতরাং প্রেমবুভুক্ষু অহল্যা ও সম্ভোগলিপ্সু ইন্দ্র—দুটি চরিত্রেরই প্রাথমিক অবস্থার পরিচয় দিয়ে নাট্যকার নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের বীজ বপন করেছেন। দ্বিতীয়াঙ্কে বীজ মুকুলিত হয়েছে—মদন ও রতির চক্রান্ত সার্থক হয়েছে। ইন্দ্র ও অহল্যা পরস্পর প্রণয়াসক্ত হয়ে উঠেছেন। এই অঙ্কে অহল্যা ইন্দ্রের সঙ্গে পলায়ন করেছেন। তৃতীয় অঙ্কে নাটকীয় গতি চূড়ান্তশীর্ষে (climax) উঠেছে। এই অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে ইন্দ্রের সম্ভোগ-তৃষ্ণায় ভাঁটা পড়েছে, অহল্যার মধ্যেও অনুশোচনা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। অহল্যার আত্মহত্যাপ্রয়াস ও ইন্দ্রকে ছুরিকাঘাত—এই দুটি ঘটনা নাটকীয় গতির মধ্যে উত্তপ্ততার সৃষ্টি করেছে। এই অঙ্কেই দশরথ ও জনক রাজার দুটি দৃশ্য সংস্থাপিত করা হয়েছে। চতুর্থ অঙ্কে অহল্যার অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্রম-পরিণতি ও রামলক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চমাঙ্কে ঘটনার সমস্ত স্রোত একই পরিণতির মধ্যে মিলিত হয়েছে। জনকভবনে দশরথ রামচন্দ্র প্রভৃতি একত্রিত হয়েছেন। গৌতম ও অহল্যাও সেখানে মিলেছেন। নাট্যকার মোটামুটিভাবে গঠনশৈলী বিকৃত করেন নি। বীজ ক্রমশ বিচিত্র ধারায় পল্লবিত হয়ে একটি বিশেষ লক্ষ্যের অভিমুখী হয়েছে। চিরঞ্জীব-মাধুরীর কাহিনী মূল কথাবস্তুকেই আরও পরিস্ফুট করেছে।

কিন্তু 'তারাবাই'য়ের মধ্যে গঠনশৈলীর মারাত্মক ত্রুটি আছে। এখানে কেন্দ্রীয় বিষয়টি (theme) পরিস্ফুট নয়। কাহিনীর মধ্যে ঐক্য নেই—সূর্যমল-তমসা-দারঙ্গদেবের কাহিনী অনুচিত প্রাধান্য লাভ করেছে। নাট্যকার কাহিনীকে অকারণে বিস্তৃত করে তার রশ্মি সংহত করতে পারেন নি। দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে 'তারাবাই'-ই দুর্বলতম সৃষ্টি। নাটকে

দু রকম প্লট থাকতে পারে—সরল (simple) ও জটিল (complex) জটিল প্লটে একাধিক উপকাহিনী (subplot) সন্নিবেশিত হতে পারে। উপকাহিনী নাটকের মূলধারার বহির্ভূত কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। উপকাহিনী মূলকাহিনীর ভাবানুসারী (parallel) অথবা বিপরীতধর্মী কাহিনী হতে পারে, যা বৈপরীত্যের (contrast) দ্বারা মূল কাহিনীকেই পরিস্ফুট করার সহায়তা করে। মোটকথা, উপকাহিনী মূলকাহিনীকেই নানাভাবে ব্যাখ্যা করে।[১৩] কিন্তু সূর্যমল-তমসা-সারঙ্গদেব কাহিনীর সঙ্গে মূলকাহিনীর কোনো যোগ নেই। নাট্যকার কাহিনীটিকে অযথা পল্লবিত করেছেন, সেই ঘনবিন্যস্ত শাখাপল্লবে মূল কাহিনীর আর পদচিহ্নও পাওয়া যায় না।

'সীতা' নাটকের গঠনশৈলীর মধ্যেও অযথা জটিলতা নেই—কাহিনীকেও বহু শাখা-প্রশাখায় অতিপল্লবিত করা হয় নি। মূলকাহিনীর সঙ্গে দণ্ডকারণ্য আখ্যায়িকা যুক্ত হয়েছে মাত্র। কিন্তু এই নাটকের প্রথম দুটি অঙ্কই গঠন-রীতির দিকে সর্বাঙ্গসুন্দর। তৃতীয়াঙ্ক থেকে দণ্ডকারণ্য কাহিনী যুক্ত হয়েছে। এই কাহিনীটি অবান্তর না হলেও নাট্যকার খুব ঘনবিন্যস্ত করতে পারেন নি। 'সীতা' নাটকের প্রথমাঙ্কের শেষদৃশ্যে দুর্মুখের মুখে সীতা সম্পর্কে প্রজাদের মন্তব্য শুনে রামচন্দ্রের হৃদয়ে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। পরিপূর্ণ সুখের সংসারের মধ্যে সর্বপ্রথম আকস্মিক দিক থেকে আঘাত এসেছে। দ্বিতীয় অঙ্কে সীতাবিসর্জন ব্যাপারে বিভিন্ন চরিত্রের প্রতিক্রিয়া ও সর্বশেষে সীতার সিদ্ধান্ত বর্ণিত হয়েছে। নাটকের এই অংশটির তুলনায় পরবর্তী অংশ অপেক্ষাকৃত শিথিল। 'ভীষ্ম' নাটকটি অপেক্ষাকৃত পরিণত হাতের রচনা হলেও গঠনরীতির দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ। সত্যবতীর ক্ষমতালিপ্সা ও সম্ভোগ-স্পৃহা নাটকের মূল রসকেন্দ্রের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কান্বিত নয়। অম্বা অম্বিকা দাশরাজ প্রভৃতি চরিত্র অনাবশ্যক বললেও হয়। অপরপক্ষে অম্বা-কাহিনী মূল ঘটনাপ্রবাহের উপরেই আলোকপাত করেছে। তৃতীয়াঙ্কের শেষদৃশ্য শুধু নাটকীয় দৃশ্য হিসাবেই শ্রেষ্ঠ নয়—এই দৃশ্যই নাটকীয় গতির চূড়ান্তশীর্ষ (climax)।

১৩। "......the Elizabethans and Shakespeare in particular, frequently made the sub-plot a duplication or an explanation of the main theme of the play."—The Theory of Drama (1937) : Nicoll, Page 113.

দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্যে রচিত ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে গঠনশৈলীর দিক থেকে 'দুর্গাদাস' নাটকটিই সর্বাপেক্ষা দুর্বল। 'দুর্গাদাস' নাটকটির মধ্যে কোনো কাহিনীগত সংহতি নেই—'unity of action'ও ব্যাহত হয়েছে। নাটকীয় গতিধর্মের মূলসূত্রটি বিস্মৃত হয়ে নাট্যকার নাটকের ঘটনাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু 'প্রতাপসিংহ' নাটকে ঘটনার অনিবার্যতা, ঘাতপ্রতিঘাতের নাটকীয় ফলশ্রুতি ও কেন্দ্রাভিমুখী পরিণতি সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে। 'নূরজাহান' ও 'সাজাহান' নাটকের মধ্যবর্তীকালে রচিত হলেও 'মেবার-পতন' নাটকে নাট্যকারের প্রচারধর্মিতার জন্য এর শিল্পকর্ম ক্ষুণ্ণ হয়েছে। নাটকটির মূল বক্তব্যের মধ্যেই একটি বিরোধ আছে। মেবার-পতনের মধ্যে একটি আপাত-বিরোধ আছে। মেবার-পতনের মধ্যে একটি জাতীয় জীবনের পরাজয়ের বেদনা যেমন সঞ্চিত হয়েছে, তেমনি মানসীর মুখ দিয়ে নাট্যকার বিশ্বমৈত্রীর বাণীও শুনিয়েছেন। প্রথম অঙ্কের আটটি দৃশ্যের মধ্যে সাতটি দৃশ্যেই দুই পক্ষের রাজপুত মোগলের সংঘর্ষের প্রস্তুতি ও যুদ্ধের কথাই বর্ণিত হয়েছে। নিষ্ক্রিয় অমরসিংহকে গোবিন্দসিংহ ও সত্যবতী যুদ্ধে উৎসাহিত করেছেন—"মেবার পাহাড়" সঙ্গীতে নাটকটির মধ্যে উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে। মোগল পক্ষের যুদ্ধোদ্যম সম্পর্কেও দুটি দৃশ্য আছে। ষষ্ঠ দৃশ্য ও সপ্তম দৃশ্যের দৃশ্যান্তরে মানসীর আদর্শবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রশ্ন হল এই যে, নাটকটির মূল রসকেন্দ্র কি ?—মেবার পতন না বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ প্রচার করা ? মেবার-পতন নাটকটি গতিচঞ্চল না হলেও নাটকটির অধিকাংশ জুড়ে আছে মেবার-পতন কাহিনীই। সগরসিংহ, অজিতসিংহ ও গোবিন্দসিংহের মৃত্যুর সঙ্গে রাজপুত মোগল সংগ্রামের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংযোগ আছে। মহাবৎ-সত্যবতীর মিলন, সাজাহানের ঔদার্য, মানসী-কল্যাণীর সংলাপ, সর্বশেষে অমরসিংহ-মহাবতের সম্মুখ যুদ্ধের মাঝখানে মানসীর আবির্ভাব ও চারণীর সঙ্গীত নাটকের উপরে যেন শান্তিবারি বর্ষণ করেছে। ক্ষতাক্ত মেবারের উপর বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ নাটকীয় মূলগতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত নয়, কিন্তু নাট্যকার নাটকের পরিণতির মধ্যে তারই জয়ধ্বনি উচ্চারণ করেছেন। আদর্শবাদের আতিশয্য নাটকটিকে কেন্দ্রচ্যুত করেছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের দুখানি শ্রেষ্ঠনাটক 'নূরজাহান' ও 'সাজাহান'-এর গঠনরীতি আলোচনা করলে তাঁর নাট্যরচনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যাবে। 'নূরজাহান'

নাটকের প্রথমাঙ্কে আকবরের মৃত্যু থেকে শের খাঁ হত্যার কাল পর্যন্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এই অঙ্কটিতে বধূ মেহেরের দাম্পত্য-জীবনের চিত্রের পাশাপাশি জাহাঙ্গীর-রেবার ব্যর্থ দাম্পত্য-জীবনের ছবি আঁকা হয়েছে—দুটিই ব্যর্থতার ছবি। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দিকে বধূ মেহেরকে রক্ষা করতে গিয়ে নূরজাহান শয়তানী বৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, সর্বশেষে শয়তানীর সঙ্গে সন্ধি করে বিবাহে সম্মতি দিয়েছেন। ঐ অঙ্কেরই শেষদিকে নরজাহান চরিত্রের পটভূমিকা অঙ্কন করা হয়েছে। তৃতীয়াঙ্কে মুখ্যত রাজনৈতিক ঘটনাই বর্ণিত হয়েছে—নূরজাহান নানাভাবে সাজাহানকে পর্যুদস্ত করতে চেয়েছেন। চতুর্থ অঙ্কে ও পঞ্চমাঙ্কের প্রথম তিন দৃশ্যে মহাবৎ-প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে—নূরজাহানের আত্মক্ষয়কারী ট্রাজেডির সংহারধ্বনি এখন শুধু পটভূমিকায় নেই, পুরোভাগে এসে পড়েছে। পঞ্চমাঙ্কের শেষদিকে শারিয়ারের পরাজয়ে ও সাজাহানের সিংহাসনলাভে নূরজাহানের বিষের পাত্র পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু 'নূরজাহান' নাটকের গঠনশৈলীর মধ্যে প্রধান ত্রুটি এই যে নূরজাহানের জীবনবৃত্তকে সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত করা হয় নি। কোনো কোনো অংশের প্রয়োজনীয়তাও নেই—যেমন চতুর্থ অঙ্কের পঞ্চম ও সপ্তম দৃশ্য। মহাবৎ-কাহিনীকেও অতিরিক্ত প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় নাট্যাংশকে অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়াঙ্কের শেষদিকে ঘটনার তড়িৎ-গতি লক্ষণীয়।

'নূরজাহান' নাটকের গঠনশৈলীর সর্বপ্রধান দোষ এই যে নাট্যকার পরিমাণ-সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেন নি। অনাবশ্যককে অনেক সময় প্রাধান্য দিয়ে, অত্যাবশ্যককে গৌণ করে ফেলেছেন। কিন্তু গঠনরীতির এই 'অতি-কথন' ও 'সামান্য-কথন' দোষের অভাবপূরণ করেছে নূরজাহানের অন্তর্দ্বন্দ্ব-বহুল চরিত্র ও জটিল মনস্তত্ত্বসম্মত ট্রাজেডি। নাট্যকার নাটকের কেন্দ্রস্থলে নূরজাহানকে স্থাপিত করে নাটকীয় ঘটনাকে মূল গতির অনিবার্য প্রকাশ রূপেই দেখিয়েছেন। প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে ঘটনা ও চরিত্রগুলি কেন্দ্রীয় চরিত্রটিকেই আলোকিত করেছে। নূরজাহান নাটকের কাহিনীবিন্যাসের অসঙ্গতি সত্ত্বেও এই কারণেই নাটকীয় রস খুব বেশী ব্যাহত হয় নি।

'সাজাহান' নাটকের গঠনরীতির মধ্যে অকারণ জটিলতা নেই। নাটকে বিশ্বাসঘাতকতা, কপটতা, হীন ষড়যন্ত্র, হত্যাকাণ্ড আছে বটে, কিন্তু বিশেষ

কোনো একটি ঘটনার প্রতি অতিনিবদ্ধতা নেই। উপকাহিনীগুলিও নিজস্ব মহিমা প্রকাশ করে নি। ইতিহাসের দ্রুতগতি ঘটনাপ্রবাহ একদিকে, অন্য-দিকে আগ্রা দুর্গে বন্দী বৃদ্ধ স্থবির সাজাহান। সাজাহান জীবন্মৃত। ভারত-ইতিহাসের দুর্যোগময় পরিবেশ—যা একদিকে সাজাহানের পারিবারিক জীবনের ও ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনীও বটে, তাঁকে আঘাতের পর আঘাত করেছে—আর সেই আঘাতের মূলে আছেন, তাঁরই পুত্র ঔরংজীব। 'সাজাহান' নাটকেব ঘটনাকে ভারত-ইতিহাসের বিস্তৃত ঘটনাবলীর মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে—কিন্তু কোথায়ও কেন্দ্রচ্যুতি ঘটে নি। তবে নাটকের মধ্যে সাজাহানের দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি সঙ্গত হয় নি—দ্বিতীয়াঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যের পর একেবারে চতুর্থ অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্যে সাজাহানকে দেখা যায়। অবশ্য এই সুযোগে নাট্যকার ইতিহাস অংশকে রূপায়িত করেছেন। তবু সাজাহানের দীর্ঘ অনুপস্থিতি নাটকীয় রসোপলব্ধির পক্ষে কিঞ্চিৎ বিঘ্ন ঘটায়।

'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের জনপ্রিয়তা ও মঞ্চসাফল্য যতই থাকুক না কেন, এই নাটকের গঠনশৈলীর মধ্যে প্রভূত দুর্বলতা আছে। নাটকটির মধ্যে একাধিক উপকাহিনী আছে—প্রথমত, গ্রীক উপকাহিনী, দ্বিতীয়ত, চন্দ্রকেতু-ছায়ার উপকাহিনী, তৃতীয়ত চাণক্য-নন্দ ও আত্রেয়ীর উপকাহিনী। প্রত্যেকটি উপধারায় সমান দৃষ্টি দেওয়ার জন্য নাটকের মূলকাহিনীর গতিপথ বিঘ্নসঙ্কুল হয়েছে।[১৪] নাটকের স্থানগত ঐক্যও শিথিল—সবচেয়ে মারাত্মক হল জন্ম-রহস্য সন্ধানের জন্য অ্যান্টিগোনাসের সুদূর গ্রীক পল্লীতে যাত্রা ও তাঁর মাতার কাছে পিতৃপরিচয় শোনার দৃশ্যটি। নাট্যকার অন্যভাবেও ঘটনাটি শোনাতে পারতেন। গঠনশৈলীর শিথিলতা সবচেয়ে উৎকট হয়ে উঠেছে নাট্য-রোমান্স 'সিংহল-বিজয়ে'। রোমান্স-কুহকিনী নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালকে এখানে মোহগ্রস্ত করেছে—স্থানগত ঐক্যও এখানে দ্বিধাগ্রস্ত। এখানে নাটকীয় উপধারাগুলির স্ব-স্ব-প্রাধান্যের জন্য মূলধারা ক্লিষ্ট হয়েছে।

১৪। এই প্রসঙ্গে ডা: সাধনকুমার ভট্টাচার্যের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য :

"প্রত্যেকটি উপধারার মধ্যে ক্রমপরিণতি ও গতিসৃষ্টি করিতে যাইয়া নাট্যকার প্রত্যেকটিকে যতখানি পরিসর দিয়াছেন এবং যে পরিমাণে ভাব-মুখর ও আবেগ-চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে প্রধান ধারার গতি বেশ ব্যাহত হইয়াছে বলিতেই হইবে।"—নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক-বিচার (১ম খণ্ড), পৃঃ ৭৫।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের একটি প্রধান ত্রুটি কাহিনীবিন্যাসের দুর্বলতা। কখনো কখনো আকস্মিক চমৎকারিত্ব সৃষ্টির দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক দেওয়ার জন্য এই দুর্বলতা অত্যন্ত প্রকট হয়েছে। কয়েকটি প্রবল ও উত্তেজিত মুহূর্তকে বেগমণ্ডিত করার দিকেই যেন নাট্যকারের প্রবণতা, কিন্তু এই মুহূর্তগুলি সব সময় সামগ্রিক নাটকীয় ফলশ্রুতি বহন করে না। দ্বিজেন্দ্রনাট্যের কাহিনীবিন্যাসের যে শৈথিল্য দেখা যায়, তার মূলে এর চেয়েও বড়ো আর একটি কারণ আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের অধিকাংশ নাটকেরই রসকেন্দ্র একটি বিশেষ চরিত্র, অথবা একটি বিশেষ নীতি বা ভাবাদর্শ। নাট্যকার সেইদিকেই তাঁর দৃষ্টিকে অতিরিক্ত নিবদ্ধ করার ফলে নাটকের সামগ্রিক ঐক্য রক্ষিত হয় না। একটি চরিত্র বা একটি ভাবাদর্শ নাটকীয় ঐক্যবন্ধনকে ছিন্ন করে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই অসঙ্গতি দ্বিজেন্দ্রলালের নাটককে অনেক সময় ভারসাম্যহীন ও দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলেছে।৮ উদাহরণস্বরূপ, 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকটির কথা বলা যায়। এই নাটকের মূল পরিকল্পনাটি চাণক্যকে অবলম্বন করেই পল্লবিত হয়েছে। কিন্তু চাণক্য ছাড়া, আর কোনো চরিত্র ও ঘটনা তেমন নাটকীয় সৌন্দর্যে মণ্ডিত হতে পারে নি। নাট্যকারের দৃষ্টি ঐ একটি চরিত্র ও তার পরিণাম চিত্রণে এত বেশী নিবদ্ধ যে নাটকের সামগ্রিক রূপটি অনেকখানি অবহেলিত হয়েছে। নাট্যকারের পক্ষে এই জাতীয় ত্রুটি গুরুতর সন্দেহ নেই। নাটকীয় চরিত্র বা ঘটনার বিকাশলক্ষণ অন্যরকম। গতিবেগ, দ্বন্দ্বসংঘাত কাহিনীকে যেমন সৃষ্টি করে, তেমনি চরিত্রেরও আভ্যন্তরীণ বিকাশ ঘটায়। তা ছাড়া উন্নত নাট্যশৈলীর মধ্যে একটি সামগ্রিক ঐক্য (Organic unity) থাকে। সেখানে 'সমগ্রে'র সঙ্গে সমন্বিত হয়েই 'বিশেষ'— 'বিশেষ' যখন 'সমগ্র'কে অস্বীকার করে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে চায়, তখনই নাট্যশিল্প দ্বিধাগ্রস্ত হয়। গীতিকবির পক্ষে যা সম্ভব, নাট্যকারের পক্ষে তা সম্ভব নয়। ৮ গীতিকবি একটি বিশেষ ভাবকে লীলায়িত করে তোলেন, কিন্তু নাটক সম্বহুলের শিল্প—সেখানে বহুর সঙ্গে মিলেই এককে বিকশিত হতে হবে। কবি দ্বিজেন্দ্রলালই যে নাটক রচনা করেছেন, এ থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলির আলোচনাপ্রসঙ্গে একটি মূল বিষয় আলোচনার প্রয়োজন। তিনি নাটকীয় গঠনরীতি বিষয়ে রোমান্টিক পদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন। গঠনরীতি বিষয়ে ক্লাসিক্যালপন্থী ও রোমান্টিকপন্থীদের মধ্যে

বিরোধ আছে। ক্ল্যাসিক্যালপন্থীরা গঠনরীতি বিষয়ে ধরাবাঁধা রীতিনীতিগুলি মেনে চলতেন। কিন্তু রোমান্টিকরা এ বিষয়ে ছিলেন নিরঙ্কুশ। তাঁরা ক্লাসিক্যাল নাট্যতত্ত্ববর্ণিত ত্রিবিধ ঐক্যনীতির মধ্যে একমাত্র 'unity of action'-ছাড়া আর কিছু মানেন নি। এমন কি শেক্সপীয়রের নাটকে স্থান ও কালের ঐক্য অনেক সময় লঙ্ঘিত হয়েছে। তাই ক্লাসিক্যালপন্থী ভল্‌টেয়ারও শেক্সপীয়রের রোমান্টিক নাটককে সুনজরে দেখতে পারেন নি, ক্লাসিক্যালপন্থীদের কাছে যেন জনসন শেক্সপীয়রের চেয়েও বড় নাট্যকার বিবেচিত হয়েছেন। নিয়মনিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধা, সংযম ও সামঞ্জস্য ক্লাসিক্যালপন্থীদের নাট্যরীতির প্রধান আদর্শ। রোমান্টিক নাটক কল্পনার স্পর্ধিতগতি ও কাহিনীর বৈচিত্র্য-সৃষ্টি ক্লাসিক্যাল বিধিনিষেধকে অস্বীকার করেছে। ক্ল্যাসিক্যালপন্থীদের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রধান অভিযোগ এই যে, তাঁরা (ক্লাসিক্যালপন্থী) নিয়ম ও নীতির অতিরিক্ত বন্ধনে নাটককে দুর্বল করেছেন, নাট্যকারের কোনো স্বাধীনতার অবকাশ রাখেন নি। সমালোচক মৌলটন রোমান্টিক নাটকের গঠনরীতির মূলতত্ত্বটিকে চমৎকারভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছেন

—Put briefly, the romantic drama is the marriage of drama and story, it is produced by the amalgamation on the popular stage of the Ancient Classical drama with the story of Mediaeval Romance [১৫] .

মৌল্টনের মতে রোমান্টিক নাটক, নাটক ও রোমান্টিক কাহিনীর মিলন। তাই রোমান্টিক নাটকে কাহিনীর মধ্যে নূতন রসসৃষ্টির একটি মোহ থাকে। এইজন্য প্লটের মনোহারিত্বের দিকেও এখানে অনেকখানি নজর দেওয়া হয়। শাখাকাহিনী ও উপকাহিনীর সংযোগে একটি জটিল ও রমণীয় নাটকীয় কাহিনী সৃষ্টি করা হয়। অবশ্য গতিধর্মের কেন্দ্রীয় আকর্ষণকে প্রথম শ্রেণীর রোমান্টিক নাটকেও প্রাধান্য দেওয়া হয়। রোমান্টিক পদ্ধতির মধ্যে যেমন নাট্যকারের একটি স্বাধীনতার অবকাশ আছে, তেমনি রোমান্সের আতিশয্যের ফলে নাটকে গঠনরীতিগত ও চরিত্রগত অনেক অসঙ্গতি ঘটারও সম্ভাবনা থাকে। দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন : "নাটক—কাব্য ও উপন্যাসের

১৫। The Ancient Classical Drama, Page 427

মাঝামাঝি ; তাহাতে কবিত্ব চাই, গল্পের মনোহারিত্ব চাই।"[১৬] দ্বিজেন্দ্রলালের মনে যে রোমান্টিক নাটকের সংস্কারই প্রবল ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দ্বিজেন্দ্রনাট্যের গঠনরীতির ত্রুটিবিচ্যুতির কথা আলোচনার সময় রোমান্টিক নাট্যপদ্ধতির সার্থকতা ও আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কথাও স্মরণ রাখতে হবে।

॥ ৬ ॥

দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্রসৃষ্টির মধ্যেও নূতনত্ব আছে। নাটকীয় চরিত্রগুলিকে পরিস্ফুট করার জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে অন্তর্দ্বন্দ্ববহুল ও গতিচঞ্চল করে তুলেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বে বাংলা নাটকে 'নূরজাহান', 'চাণক্য', 'সাজাহান' জাতীয় অন্তর্দ্বন্দ্ববহুল চরিত্র রচিত হয় নি। অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতর আলোড়নে চরিত্রের নিগূঢ় অন্তঃস্তল পর্যন্ত আলোকিত হয়ে ওঠে। যেখানে অন্তর্দ্বন্দ্বের তেমন প্রবলতা নেই, সেখানে চরিত্রটির মৃদু আন্দোলন মাত্র লক্ষিত হয়—মনের গহনে চিত্তবৃত্তিগুলির নেপথ্যলীলা অস্ফুটই থাকে—এই জাতীয় চরিত্রগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য ও প্রাণময়তা থাকে না। দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্পর্কে নিজেই বলেছেন : "এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সব মহানাটকে আছেই আছে। প্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তির সংঘাতে তরঙ্গ না উঠাইতে পারিলে, বিপরীত বায়ুর সংঘাতে ঘূর্ণী ঝটিকা না উঠাইতে পারিলে কবি জমকালো রকম নাটক সৃষ্টি করিতে পারেন না।"[১৭] আত্মিক দ্বন্দ্বের ফলে চরিত্রের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়, অথচ সেই বিনষ্টপ্রায় ভারসাম্য সংরক্ষণের জন্যও চরিত্রের মধ্যে প্রবল ক্রিয়াশীলতা দেখা যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকরচনায় শেক্সপীয়রীয় পদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন। দ্বন্দ্বসংঘাতের অন্তর্মুখিতা ও মানব মনস্তত্ত্বের জটিল রূপায়ণে দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা নাটকের ইতিহাসে এই নূতন সুর সংযোগ করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রধানত চরিত্রের দিকে লক্ষ্য রেখেই

১৬। কালিদাস ও ভবভূতি (বসুমতী সং), পৃঃ ৩০৬।
১৭। ঐ পৃঃ ৩০৮।

নাটক লিখেছেন।[১৮] যেখানে চরিত্রের চেয়ে ঘটনা বা বিশেষ কোনো ভাবাদর্শের দিকেই তিনি অতিরিক্ত ঝুঁকে পড়েছেন, সেখানে নাটক খুব সার্থক হয় নি।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের উপর পাশ্চাত্ত্য নাট্যসাহিত্যের প্রভাব অপরিসীম। মধুসূদনের সময় থেকেই অধিকতর প্রযত্ন ও সার্থকতার সঙ্গে বাংলা নাটকে পাশ্চাত্ত্য নাটকের গঠনশৈলী, আঙ্গিকবৈচিত্র্য ও ট্রাজেডি-চেতনার রূপায়ণ-প্রচেষ্টা চলে এসেছে। মধুসূদনের মতো পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্যরসিকও প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যপদ্ধতি একেবারে অতিক্রম করতে পারেন নি। দীনবন্ধুও পাশ্চাত্ত্য নাটকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, কিন্তু তিনিও যথার্থ শেক্সপীয়রীয় ট্রাজেডি-চেতনাকে রূপ দিতে পারেন নি।[১৯] গিরিশচন্দ্রের নাট্যরীতিও পাশ্চাত্ত্য নাটকের পূর্ণসত্য উদ্‌ঘাটিত করতে পারে নি। গিরিশচন্দ্রের নাট্যসাধনায় বাংলার দেশীয় যাত্রারীতির সঙ্গে শেক্সপীয়রীয় নাট্যরীতির একটি নিপুণ সমন্বয় প্রয়াসই পরিস্ফুট হয়েছে।[২০] দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যপ্রতিভার অনেক অপূর্ণতা ও দুর্বলতা আছে, কিন্তু তিনিই বাংলা নাটকে সর্বপ্রথম শেক্সপীয়রীয় নাট্যরীতিকে সার্থকতর ভাবে রূপায়িত করার চেষ্টা করেন। অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি ও ট্রাজেডি পরিকল্পনা তার মধ্যে অন্যতম।

ট্রাজেডি-পরিকল্পনার দিক থেকে অন্তত দুখানি নাটক—'নূরজাহান' ও 'সাজাহান' উচ্চাসন দাবি করতে পারে। 'নূরজাহান' নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল

১৮। "তিনি প্রথমে নাটকের চরিত্রগুলি স্থির করিয়া কোন চরিত্র কিরূপভাবে অঙ্কিত তাহা 'ছকিয়া' লইতেন। পরে যখন যে দৃশ্য মনে উদিত হইত তখন তাহা লিখিয়া সেই চরিত্রগুলির বিকাশ করিতেন।"—দ্বিজেন্দ্রলাল : নবকৃষ্ণ ঘোষ, পৃঃ ২৩১।

১৯। এই প্রসঙ্গে ডাঃ সুশীলকুমার দের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য :

—"বাহিরের বৃহত্তর নির্মম শক্তির সহিত মানুষের অসহায় জীবনের নিষ্ফল সংগ্রাম,—ক্ষুদ্র মানুষ যেন দুর্লঙ্ঘ্য দৈবের ক্রীড়নক মাত্র,—এই গ্রীক ভাবটি বোধ হয় দীনবন্ধুর বিস্তীর্ণ ও বাস্তব-সচেতন সহানুভূতির উপযোগী ছিল। তথাপি ট্রাজেডি হউক বা না হউক, নীলদর্পণের করুণ রস অলীক বা অসত্য হয় নাই।"—দীনবন্ধু মিত্র, পৃঃ ৪৫।

২০। "গিরিশচন্দ্রই শেষ খাঁটি বাঙালী প্রতিভা, বাঙালীর জাতীয় নাটক ও নাট্যাভিনয়ের আদর্শ, এমন কি একটা নাটকীয় ছন্দও সেই প্রতিভার সৃষ্টি, বাঙ্গালী-যাত্রা ও বিলাতী নাটকের এমন সমন্বয় আর কেহ করিতে পারেন নাই,—ঠিক ঐ বস্তুই বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করিয়াছিল।"
—বাংলা প্রবন্ধ ও রচনারীতি : মোহিতলাল মজুমদার, পৃঃ ৩৫৮।

একটি চরিত্র অবলম্বন করে ট্রাজেডির মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্গূঢ় রহস্য চিত্রিত করেছেন। বাংলার কোনো ঐতিহাসিক নাটকে এই ধরনের মনস্তত্ত্বসম্মত ট্রাজেডি নেই—একাধিক সত্তার ক্রমক্ষয়িষ্ণুতা ও তার পরিণামরিক্ততার এমন ভীষণ-রমণীয় নাট্যরূপ সমগ্র বাংলা নাটকেও বিরল। 'সাজাহান' নাটকে আবার ট্রাজেডির আর একদিকে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। আপাত-নিষ্ক্রিয় চরিত্রের মধ্যে নাট্যকার ট্রাজেডির নিবিড় রহস্য সঞ্চারিত করেছেন। বাংলা নাটকের ইতিহাসে 'নূরজাহান' ও 'সাজাহান' নাটক যথাক্রমে 'Tragedy of Character' ও 'Tragedy of Suffering'-এর উচ্চতর আদর্শ হিসাবে বিরাজ করবে। বাংলা নাটকের সমালোচকেরা সকলেই একবাক্যে বলেছেন যে, আমাদের জাতীয় জীবন ঠিক উচ্চতর ট্রাজেডি সৃষ্টির অনুকূল নয়। পেরিক্লিসের যুগে, কিংবা এলিজাবেথীয় যুগে, এমন কি চতুর্দশ লুই এর আমলে যে নাট্যসৃষ্টির অনুকূল আবহাওয়া ছিল, বাংলা নাটকের পটভূমিকা তার চেয়ে ভিন্নতর। কিন্তু এই ভাবপ্রবণতা অশ্রুসিক্ত জলাভূমির মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের সার্থক ট্রাজেডি সৃষ্টির যে দুটি পূর্ণতর প্রচেষ্টা আছে, তাকে শেক্সপীয়রের উচ্চতম সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করে বাতিল করার চেষ্টাও কোনোক্রমে যুক্তিযুক্ত হবে না।

কারণ ট্রাজেডি যে জাতীয় জীবনবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, তার ত্রুটিহীন শিল্পোৎকর্ষপূর্ণ রূপায়ণ ও নির্দোষ অবয়বসংস্থান খুব কম নাটকেই আছে। শেক্সপীয়রের আদর্শ ও সমুন্নতির আলোকে যে কোনো নাটকই খর্ব মনে হবে, এবং এ কথাও ঠিক যে ইংরেজি সাহিত্যে শেক্সপীয়র একজনই ছিলেন। বেশী দূর না গিয়ে যদি এলিজাথের যুগের আর একজন খ্যাতনামা নাট্যকার মার্‌লোর নাটক আলোচনা করা যায়, তা হলে বোধ হয় বক্তব্যটি পরিস্ফুট হবে। মার্‌লোর চারখানি নাটকে ('ট্যোম্বারলেন', 'জু অব্ মাল্টা', 'ডক্টর ফাউস্টাস', 'এডোয়ার্ড দি সেকেণ্ড') নাটকীয় দ্বন্দ্বসংঘাতের তীব্রতা, স্পর্ধিত কবিকল্পনা ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের তীব্রোজ্জ্বল মূর্ছনা প্রভৃতি রোমান্টিক নাটকের কতকগুলি শক্তিশালী অভিব্যক্তি লক্ষণীয়। কিন্তু পরবর্তী নাট্যকার শেক্সপীয়রের তুলনায় মার্‌লোর প্রতিভা নিতান্ত প্রাথমিক ধরনের মনে হয়। অতিনাটকীয় আতিশয্য, ভাষা ও চরিত্র পরিকল্পনায় বৈচিত্র্যহীনতা, নারী-চরিত্র অঙ্কনের ব্যর্থতা, উন্নত হাস্যরস সৃষ্টির অক্ষমতা,—প্রভৃতি মার্‌লোর

নাটকের কয়েকটি সর্বজনস্বীকৃত ত্রুটি। প্লটরচনায় মধ্যেও তাঁর দুর্বলতা ছিল।[২১] দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক, বিশেষত ট্রাজেডি-বিচার সম্পর্কে এই প্রসঙ্গটি স্মর্তব্য।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে ইংরেজি সাহিত্যের যে ভাবাদর্শ সঞ্চারিত হয়েছিল, শেক্সপীয়রের নাটক ছিল তার কেন্দ্রমূলে। শেক্সপীয়রের রচনাবলীর রসে বাংলা সাহিত্য নানাভাবে সঞ্জীবিত হয়েছিল। সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হয়েছিলেন বাঙালী নাট্যকারেরা। দ্বিজেন্দ্রলাল পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে সুরসিক ছিলেন, ইংরেজি নাটক ও কাব্যের সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয় ছিল। তাই তিনি নানাভাবে ইংরেজি কাব্য ও নাটকের রস আহরণ করার চেষ্টা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যবিচার করলে দেখা যায় শেক্সপীয়রের 'কিং লীয়র' নাটকটিকে, বিশেষত লীয়র চরিত্রটিকে তিনি সবচেয়ে বেশী অনুসরণ করেছেন। গোবিন্দসিংহ (মেবারপতন), সাজাহান (সাজাহান), সিংহবাহু (সিংহল-বিজয়), বিশ্বেশ্বর (পরপারে) প্রভৃতি চরিত্রে কিং লীয়র চরিত্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিদ্যমান। 'সাজাহান' নাটকে 'কিং লীয়র' নাটকের অত্যধিক অনুসরণ করা হয়েছে—অনেক সময় সাজাহানের সংলাপগুলি রাজা লীয়রের সংলাপের অনুবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়, যদিও এই দুটি চরিত্রের প্রকৃতি ঠিক এক নয়। 'কিং লীয়র' নাটকের পরেই দ্বিজেন্দ্রলাল 'হ্যামলেট' নাটকের ভাবানুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। লায়লা (নূরজাহান) ও রুবেণী (সিংহলবিজয়) চরিত্র দুটির সঙ্গে হ্যামলেট চরিত্রের কিছু অবস্থাগত সাদৃশ্য আছে—কিন্তু ঐ পর্যন্তই! 'হ্যামলেট' নাটকের ট্রাজিক-রস ও ভাবগভীরতা অননুকরণীয়। নূরজাহান চরিত্রের কোনো কোনো সংলাপ ম্যাকবেথের সংলাপের ভাবানুসরণে রচিত হয়েছে, 'তারাবাই' নাটকের তমসা চরিত্রে লেডি ম্যাকবেথের প্রভাব আছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে উচ্চাঙ্গের হাস্যরস নেই বললেই হয়, অথচ তিনি 'হাসির গানের কবি' হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এই আপাত

২১। "To the prob'em how to build a plot and to present an action in a genuinely dramatic manner, his contribution had been less impressive
A Short History of English Literature : Ifor Evans, Page 65.

অসঙ্গতির কারণ কি ? দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনগুলির হাস্যরস বিশ্লেষণ করলে এই প্রশ্নের মীমাংসা করা যায়। হাসির গানগুলিই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনের প্রাণ—এই গানগুলি বাদ দিলে এক 'পুনর্জন্ম' ছাড়া সমস্ত প্রহসনই অর্থহীন হয়ে পড়ে। এর থেকেই সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত নয় যে দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরস যতক্ষণ সঙ্গীত ও গীতিকবিতার আধারে পরিবেশিত হয়েছে ততক্ষণই সার্থক। নাটকীয় চরিত্রের সংলাপরচনায় ও হাস্যোদ্রেককারী উদ্ভট ঘটনাসংস্থানে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। পরিণত বয়সের গম্ভীর রসের নাটকেও এই কারণেই উচ্চাঙ্গের হাস্যরসের সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। গানের হাস্যরস ও নাটকীয় হাস্যরস এক নয়। দ্বিজেন্দ্রলাল ঠিক বিদূষক জাতীয় চরিত্র সৃষ্টি না করলেও গম্ভীররসের নাটকে মাঝে মাঝে লঘুতরল হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাজা-বাদশাদের সভাগৃহের আমোদপ্রমোদের মধ্যে বয়স্যদের নিম্নশ্রেণীর স্থূল ভাঁড়ামির অনেকগুলি বিশেষত্ববর্জিত মৌলিকতাহীন ছবি এঁকেছেন। চিত্রগুলি হয়তো . ..কদের স্থূল মনোরঞ্জন বৃত্তি চরিতার্থ করেছে, কিন্তু শিল্পের দিক থেকে এই ধরনের হাস্যরসের কোনো সার্থকতাই নেই। একমাত্র মাধব চরিত্রটির (ভীষ্ম) পরিকল্পনায় খানিকটা সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের প্রভাব আছে। মাধব শান্তনু রাজার বয়স্য হিসাবেই উপস্থিত হয়েছে। এই অংশটি বিদূষক চরিত্রের মতো। কিন্তু পরবর্তীকালে মাধব ভীষ্মের পিতৃবন্ধু ও তাঁর কল্যাণকামী। দিলদার শেক্সপীয়রের Court Jester জাতীয় চরিত্র হলেও শেষদিকে তাঁর হাস্যরসিকের মুখোস খুলে গিয়েছে। নিছক হাস্যরসের দৃশ্যগুলির মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের কোনো বৈশিষ্ট্যের ছাপ নেই।

দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা নাটককে আধুনিক নাট্যরীতির বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করতে চেয়েছিলেন। বর্তমানকালের ইউরোপের খ্যাতনামা নাট্যকারেরা বিস্তৃত মঞ্চনির্দেশিকা (stage direction) দিয়ে থাকেন। বার্নার্ড শ, গলসওয়ার্দি প্রমুখ নাট্যকারের নাটকের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল মঞ্চসজ্জার বিস্তৃত বর্ণনা করা। দ্বিজেন্দ্রলাল পাশ্চাত্ত্য নাটকের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিস্তৃত মঞ্চনির্দেশ দিয়েছেন।[২২] বিস্তৃত মঞ্চনির্দেশের ফলে স্থান-কাল-পরিবেশ

২২। The detailed stage direction so characteristic to him as to be a mannerism points also to a foreign model, and the example of Shaw and Galsworthy might have supplied him with the hint."

—Western Influence in Bengali Literature : P. R. Sen, Page 274

আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দ্বিজেন্দ্রলাল বিস্তৃত মঞ্চনির্দেশ দিতে গিয়ে নাটকের মধ্যে উপন্যাসের টেকনিক নিয়ে এসেছেন। 'প্রতাপসিংহ' নাটকে সর্বপ্রথম তিনি এই রীতির ব্যবহার করেছেন। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক :

"নূরজাহান দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন, "কখনও না। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান এ সমুদ্রে হয় ডুববে, না হয় তার বক্ষ পদতলে দলিত করে চলে যাবে।... মহাবৎ খাঁকে বন্দী কর্বার সাধ্য কারো না থাকে, আমি স্বয়ং তাকে বন্দী কর্ব। দেখি ভারত-সম্রাজ্ঞী নূরজাহানকে বাধা দেয়, সে সাধ্য কার।" এই বলিয়া সিংহাসন হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। ততক্ষণাৎ নেপথ্য হইতে লায়লা দরবার কক্ষে ঝম্প দিয়া প্রবেশ করিয়া কহিলেন—"সে সাধ্য আমার।" সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।"—[নূরজাহান : ৩য় অঙ্ক, ৮ম দৃশ্য]

নাটকের মধ্যে ঔপন্যাসিক রীতির ব্যবহার যেমন বিস্তৃত মঞ্চনির্দেশের সহায়ক হয়েছে, তেমনি নাটকীয় বৈচিত্র্যবৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। ঔপন্যাসিক পদ্ধতি অবলম্বন করার ফলে পাঠ্য-নাটক হিসাবেও অধিকতর সুখপাঠ্য হয়েছে।

বাংলা নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান সম্পর্কে মতভেদ আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের দুজন জীবনীকারের লেখায় ও মৃত্যুর পরে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে দ্বিজেন্দ্রলালের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই করা হয়েছে। কিন্তু তারপরেই হাওয়া পরিবর্তিত হয়েছে—তাঁর নাটকগুলি সমালোচকদের বিরূপ সমালোচনা ও কঠোর মন্তব্যের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল। নিতান্ত সাম্প্রতিককালে দু-একজন সমালোচক অধিকতর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সঙ্গে দোষ-গুণের ভিতর থেকে তাঁর নাটকের একটি স্বরূপ আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের অনেক আতিশয্যদোষ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, কিন্তু সেই দোষ-গুলির জন্য বাংলা নাটকে তাঁর দানকে অস্বীকার করা যায় না। অন্তর্দ্বন্দ্ব-বহুল চরিত্রসৃষ্টি, উজ্জ্বল-বলিষ্ঠ সংলাপ রচনা, নাটকীয় সংস্থান ও চমৎকারিত্বের সৃষ্টি, নাটকীয় টেকনিকের অভিনব প্রয়োগ, শেক্সপীয়রীয় নাট্যকলার অনুসরণ, নাটকে আধুনিক চিন্তা-চেতনার প্রবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক বাংলা নাটকের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক বাংলা রঙ্গমঞ্চের মধ্যে এক উন্নত রসের ধারা প্রবাহিত করেছিল—

নাট্যশালাগুলি 'বেল্লিকবাজার' থেকে 'আনন্দবাজারে' পরিণত হয়েছিল। কবি-সমালোচক মোহিতলাল বলেছেন :

"দ্বিজেন্দ্রলাল ভাবকে কেবল রসচর্চার বিষয় না করিয়া—ভাবের জীবনোদ্যমসুলভ রূপ দেখাইবার জন্য, অতঃপর নাটক রচনায় মনোনিবেশ করিলেন এবং তাহার দ্বারা বাংলা রঙ্গ-মঞ্চের নাট্যাদর্শ—তাহার একদিকের দুর্নীতি-মধুর লঘু-লাস্যের স্রোত এবং অপর দিকে সেই জীবনাবেগবর্জিত মধ্যযুগীয় ভক্তিবিহ্বলতা ও পাপপুণ্য-সংস্কারের তামসিক আদর্শ—সংশোধন করিতে অগ্রসর হইলেন। নাট্যশিল্পের আদর্শ উন্নত ও রুচি মার্জিত করিয়া এবং নাটক রচনায় কাব্যসঙ্গত কারুকলার দ্বারা শিক্ষিত সমাজকে নাট্যানুরাগী করিয়া, তিনি সেই যুগের অবোধ ভাবাতিরেককে পৌরুষ ও মনুষ্যত্বসাধনার পথে প্রেরিত করিবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন—জাতির প্রাণে যে উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহার কথা আমরা জানি।"[২৩]

২৩। সাহিত্য-বিতান (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃঃ ৯০।

দ্বিজেন্দ্রসঙ্গীত

দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে হলে দ্বিজেন্দ্রসঙ্গীতের আলোচনা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তার কারণ তাঁর কাব্য অথবা নাটক, যে দিকেই আলোচনা করা যাক না, সঙ্গীত-প্রসঙ্গ ছাড়া সে বিচার পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। 'আর্যগাথা' দু খণ্ড, 'হাসির গান' সম্পূর্ণরূপেই সঙ্গীতসঙ্কলন, অন্যান্য কাব্য-গ্রন্থের মধ্যেও একাধিক গান আছে। তা ছাড়াও দ্বিজেন্দ্রলালের অনেকগুলি অপ্রকাশিত গান ও "নাটকাদিতে প্রকাশিত গানগুলি" কবিপুত্র দিলীপকুমার 'গান' নাম দিয়ে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রসঙ্গীতের মূল্য ত্রিবিধ—প্রথমত, সাঙ্গীতিক মূল্য; এ অংশে প্রধানত বিচার্য এই যে বাংলা সঙ্গীতে দ্বিজেন্দ্রলালের দান কতখানি এবং তার স্বরূপই বা কি। দ্বিতীয়ত, দ্বিজেন্দ্রসঙ্গীতের কাব্যমূল্য—কারণ কাব্যসঙ্গীতের সঙ্গীতমূল্য ছাড়া একটি কাব্যমূল্যও থাকে। সুরকার দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে সেখানে কবি দ্বিজেন্দ্রলালও আছেন। তৃতীয়ত, দ্বিজেন্দ্রলালের অনেকগুলি সঙ্গীত পরবর্তীকালে তাঁর নাটকেও সন্নিবেশিত হয়েছে—যেমন 'আর্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগের 'আয়রে বসন্ত ও তোর কিরণমাখা পাখা তুলে', 'আর একবার ভালবাসো বাসতে যেমন আগের দিনে', 'এ জীবনে পূরিল না সাধ ভালবাসি'—গান তিনটি যথাক্রমে 'চন্দ্রগুপ্ত', 'পাষাণী' ও 'সাজাহান' নাটকে সন্নিবেশিত হয়েছে। নাটকে সঙ্গীতসন্নিবেশের কতকগুলি বিশেষ নাটকীয় তাৎপর্য থাকে। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতগুলি এই নাটকীয় তাৎপর্যকে কতখানি পরিতৃপ্ত করেছে, তাও এই প্রসঙ্গে বিচার্য।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে দ্বিজেন্দ্রলাল নিতান্ত বাল্যকাল থেকেই সঙ্গীত-সরস্বতীর বরপুত্র—সেকালের সুবিখ্যাত গায়ক দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের পুত্রের পক্ষে এ ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক উত্তরাধিকার। সঙ্গীত রচনা ও সেই সঙ্গীতে সুর সংযোগ করেছেন নিতান্ত বাল্যকাল থেকেই অর্থাৎ ঐ বয়স থেকেই তিনি কবি ও সুরকার। 'আর্যগাথা' প্রথম ভাগই তার বড় প্রমাণ—গানগুলি লেখা হয়েছে তাঁর বারো থেকে সতেরো বছর বয়সের মধ্যে। এই পর্যন্ত হল তাঁর সাঙ্গীতিক প্রতিভার প্রথম স্তর। বিলাত-প্রবাসকালে তিনি অর্থব্যয়

করে বিলাতি সঙ্গীত চর্চা করেন। দেশে ফিরে এসে তিনি পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত-রীতির সঙ্গে মিলিয়ে বাংলা গান রচনা শুরু করেন। 'আর্যগাথা' দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি অনেকগুলি স্কচ, আইরিশ ও ইংরেজি গানের অনুবাদ করেন। আর্যগাথা দ্বিতীয় খণ্ডের সঙ্গীতগুলির কাল পর্যন্ত দ্বিজেন্দ্রসঙ্গীতের দ্বিতীয় স্তর বলা যায়।

সরকারী কার্যোপলক্ষে তিনি যখন মুঙ্গেরে ছিলেন সেই সময় আবার ভারতীয় সঙ্গীতচর্চা শুরু করেন। প্রতিভাধর গায়ক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার তখন ছিলেন মুঙ্গেরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। দ্বিজেন্দ্রলালের রাঙাবৌদি মোহিনী দেবী ছিলেন সুরেন্দ্রনাথের বোন। সুরেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রসঙ্গীতকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। তিনিই প্রকৃতপক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালকে ভারতীয় সঙ্গীতের স্বক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনেন। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন "টপ-খেয়ালের" অদ্বিতীয় স্রষ্টা। সুরেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের মনে শুধু নূতন প্রেরণারই সৃষ্টি করেন নি, কবির কয়েকটি বিশিষ্ট এই জাতীয় গানের মূলে আছে সুরেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব। দ্বিজেন্দ্রলালের সাঙ্গীতিক জীবনের উপর তাই সুরেন্দ্রনাথের প্রভাব অপরিসীম।[১]

এই সময়ে সুবিখ্যাত 'হাসির গান'ও রচিত হয়েছিল। তখন দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের উজ্জ্বল মুহূর্ত। তখন থেকে আরম্ভ করে স্ত্রী-বিয়োগ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গীত রচনার তৃতীয় স্তর বলা যায়। এই স্তরেই প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সুরসরস্বতীর এক অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। স্ত্রী-বিয়োগের পরবর্তী কাল থেকে আরম্ভ করে মৃত্যু পর্যন্ত কালকে কবির সঙ্গীতসাধনার চতুর্থ স্তর বলা যায়। এই পর্যায়ের কাব্যে ও নাটকে যে জাতীয় ভাবগভীরতা লক্ষ্য করা যায় সঙ্গীতের মধ্যেও তার পূর্ণ স্বাক্ষর বিদ্যমান। প্রকৃতি ও প্রেমের উচ্ছ্বসিত গীতিরস ও হাসির গানের ঔজ্জ্বল্য এখানে আর এক নূতন রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। (দেশপ্রেমমূলক ঐতিহাসিক নাটক রচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বদেশপ্রেম-সম্পর্কিত সঙ্গীতগুলি রচনা করেছেন প্রধানত এই পর্বেই। দ্বিজেন্দ্রলালের গয়া-প্রবাস তাঁর সাঙ্গীতিক জীবনের একটি উজ্জ্বল লগ্ন। গয়ার

১। "কবি হিন্দুস্থানী গানের মর্মে প্রবেশ করেন, কৈশোরে তাঁর পিতৃদেবের খেয়াল শুনে শুনে। কিন্তু তারপর তিনি খুব ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন বিলিতি গানের। সুরেন্দ্রনাথই তাঁকে ঘরের ছেলে করে ঘরে ফিরিয়ে আনেন—অর্থাৎ ভারতীয় গানের নিজস্ব ক্ষেত্রে।"—উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল : পৃঃ ৩১।

জেলা-জজ তখন ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত মনীষী লোকেন্দ্রনাথ পালিত। আচার্য জগদীশচন্দ্র, 'সাহিত্যের সাতসমুদ্রের নাবিক' প্রিয়নাথ সেন প্রভৃতি জ্ঞানী-গুণীর সাহচর্যে দ্বিজেন্দ্রলালের গয়া-প্রবাস সঙ্গীত-নাটকের সোনার ফসলে পূর্ণ হয়ে ওঠে। 'আমার দেশ' 'মেবার পাহাড়', 'ভেঙে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর' প্রভৃতি গান দ্বিজেন্দ্রলাল গয়া-প্রবাসকালেই রচনা করেন। এই সময়ের কয়েক বৎসর পরে লিখিত আচার্য জগদীশচন্দ্রের একটি চিঠি থেকে জানা যায় :

"কয়েক বৎসর পূর্বে একবার গয়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে দ্বিজেন্দ্রলাল আমাকে তাঁহার কয়েকটি গান শুনাইয়াছিলেন। সেদিনের কথা কখনও ভুলিব না। নিপুণ শিল্পীর হস্তে, আমাদের মাতৃভাষার কি যে অসীম ক্ষমতা, সেদিন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সে ভাষায় করুণ ধ্বনি মানবের অক্ষমতা, প্রেমের অতৃপ্ত বাসনা ও নৈরাশ্যের শোক গাহিয়াছিলেন, সেই ভাষারই অন্য রাগিণীতে অদৃষ্টের প্রতিকূল আচরণে উপেক্ষা, মানবের শৌর্য ও মরণের আলিঙ্গন-ভিক্ষা ভৈরব নিনাদে ধ্বনিত হইল।"[২]

জগদীশচন্দ্র এখানে দ্বিজেন্দ্রসঙ্গীতের বিষয়বৈচিত্র্যের ও সুরবৈচিত্র্যের কথাই প্রকারান্তরে উল্লেখ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতপ্রতিভার ক্রমবিকাশ আছে—জীবনের বাইরের বৈচিত্র্য ও বন্ধনহীন ভাবোচ্ছ্বাস থেকে তিনি ক্রমশই গভীরের দিকে গিয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যে 'মন্দ্র' থেকে একটি সুরপরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, শেষ জীবনের নাটকেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। কিন্তু গানের মধ্যে এই ক্রমোত্তরণের সুরটি আরও স্পষ্ট। দেশপ্রেমের গান এই অন্তর্গূঢ় ভাব ও সুরলীলার পথকে দেখিয়ে দিয়েছে বটে, কিন্তু দেশপ্রেমকেও কবি নূতন অর্থে মণ্ডিত করে তুলেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের পরিণত-প্রতিভার দেশপ্রেমের সঙ্গীতগুলি এক অভিনব উৎকণ্ঠায় বিধুর। দেশকে অবলম্বন করে নূতন এক ভাবসত্যকে তিনি আবিষ্কার করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ থেকে অনেক অখ্যাতনামা গ্রাম্য-কবিরাও স্বদেশী গান রচনা করেছেন। কিন্তু দেশকে অবলম্বন করে এক উচ্চতর ভাব-লোক সৃষ্টি করা রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল ছাড়া আর কোনো কবির রচনায়

২। দেবকুমার রায়চৌধুরীর কাছে লিখিত পত্র : দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৪৭৫।

তেমনভাবে পরিস্ফুট হয় নি। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গান শুধু বীররসের উদ্দীপক নয়, শুধু চিত্ত-আলোড়নকারী উল্লাসমাত্র নয়—উদ্দাম ভাবাবেগ থেকে গভীর ভাবসত্যের এক অবিচলিত উপলব্ধি :

জননি, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয়-উক্তি
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি ;
জননি, তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা কত না হর্ষ ;
জগৎপালিনি! জগদ্ধারিণি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!

এখানে জননী শুধু 'পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা'-পরিবেষ্টিতা একটি ভৌগোলিক চিত্রই নয়—কবির ভাবস্থির উপলব্ধির স্বচ্ছ দর্পণে ফুটে উঠেছে জগজ্জননীর এক বরমূর্তি, যা শুধু দেশপ্রেমের উন্মাদনা ও সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাসের মধ্যে পাওয়া যায় না।

দ্বিজেন্দ্রসঙ্গীতের ক্রমবিকাশের স্তরপরম্পরা কবির সঙ্গীতবিশারদ ও সঙ্গীতসমালোচক পুত্র দিলীকুমার রায় সংক্ষেপে অথচ খুব সুন্দর করে বলেছেন : "প্রথম কথা এই যে, গানে তিনি ধীরে ধীরে গভীরের দিকে ঝুঁকছিলেন। প্রথম জীবনে নিসর্গচিত্রে, তারপর প্রণয়োচ্ছ্বাসে, তারপর স্বদেশসঙ্গীতে, তারপর প্রেমের তর্পণে, সবশেষে ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদনে। প্রণয় তাঁর প্রেমে পরিণত হয় তাঁর স্ত্রীবিয়োগের পর থেকেই, যখন চাইলেন তিনি তাঁর প্রেমকে ঊর্ধ্বমুখী করতে, ব্যাপ্তি দিতে—যে আধারে তাঁর প্রেম নিবেদিত হত সেই মানুষটি অবর্তমানে প্রেম তাঁর খুঁজতে লাগল এক নব বিগ্রহ। দেশই হয়ে উঠল সে বিগ্রহ—প্রথম দিকে।...জীবনের মত কাব্যের বা গানেরও ক্রমপরিণতি বাইরে থেকে গভীরের দিকে, নিচের থেকে ঊর্ধ্বের দিকে।"[৩] দ্বিজেন্দ্রসঙ্গীতের এই ক্রমোন্নয়নের স্তরপরম্পরা আলোচনা করলে এই মন্তব্যটির যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হবে।

॥ ২ ॥

দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা সঙ্গীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরস্রষ্টা। তাঁর সঙ্গীতকে বাদ দিলে বাংলা সঙ্গীতের ইতিহাস অসম্পূর্ণই থাকে। দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার যে

৩। উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল : পৃঃ ১৪৭-১৪৮।

স্বকীয়তা ও মৌলিকত্ব তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, তা তাঁর সুরসৃষ্টির মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই নয়, সুরসৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার মৌলিকতা আরও সহজ হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। তিনি সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ছিলেন মুক্তিপন্থী। তাই তিনি ছিলেন সুরবিস্তারের পক্ষপাতী—সুরবিহারের উন্মুক্ত অবকাশ তাঁর গানকে সহজ, স্বচ্ছন্দ ও লীলায়িত করে তুলেছে। বাংলা কাব্যসঙ্গীতকে তিনি মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। কাব্যসঙ্গীত কেবল কণ্ঠবাদন মাত্রই নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কাব্যসৌন্দর্য ও কথারস সৃষ্টির লাবণ্য। 'নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো', 'ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হতে কী সঙ্গীত আজ ভেসে আসে' প্রভৃতি গানে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যসঙ্গীতের সুরবিহারলীলার অসাধারণ পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্যসঙ্গীত রচনায় কাব্য ও সঙ্গীতের যুগ্ম দাবিকে তিনি একই সঙ্গে মিটিয়েছেন—সুরবিহঙ্গ অসীম ভাবের বিস্তীর্ণ আকাশে তার সপ্তপক্ষ বিস্তার করেছে।

'আর্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগের প্রেমসঙ্গীতগুলি এক সময়ে বাংলা দেশে খুব জনপ্রিয় সঙ্গীত হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম দিকের কাব্যসঙ্গীতগুলির সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্কলন হল এই গ্রন্থটি। কাব্য ও সঙ্গীতের অপূর্ব মাল্যবন্ধন হয়েছে এই গানগুলিতে। 'কী দিয়ে সাজাব মধুর মূরতি কী সাজ মিলিবে উহারি' সাথ রে,' 'মোর হৃদয়ের আলো তুইরে সতত থাকিস হৃদয়ে ভাসি,' 'তোর কী মোহ কুহক এ খেলাস পলকে নয়নে বিজলি হাসি,' 'আয়রে বসন্ত ও তোর কিরণমাখা পাখা তুলে,' 'এ জীবনে পূরিল না সাধ ভালবাসি' প্রভৃতি সঙ্গীতগুলি থেকে তাঁর তরুণ বয়সেই সুরকারপ্রতিভার অপূর্ব বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই পর্যায়ের গানগুলির মধ্যে একটি ঘুমপাড়ানি গান সুর-রসিক ও কাব্যরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। গানটি হল 'আয়রে আমার সুধার কণা আয়রে ননীর ছবি।' এই ধরনের ঘুমপাড়ানি গান বাংলা কাব্য-সঙ্গীতের ইতিহাসে একরূপ নূতন সৃষ্টি বললেও অত্যুক্তি হয় না।

বিলাত থেকে ফিরে আসার পর দ্বিজেন্দ্রলাল বিজাতি সুরের রূপ ও রীতিকে বাংলা গানের ক্ষেত্রে নিপুণভাবে প্রয়োগ করেন। কিন্তু সঙ্গীতের পাশ্চাত্ত্য রীতির প্রয়োগকে অনেকেই সুনজরে দেখতে পারেন নি। তখনকার দিনে অভ্যস্ত রীতি ভেঙে, চিরাচরিত পথ ত্যাগ করে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে

অভিনবত্ব সঞ্চার করা সহজ ব্যাপার ছিল না। তাই দ্বিজেন্দ্রলালকেও বাংলা গানের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য রীতির আমদানি করতে গিয়ে বিরুদ্ধ সমালোচনা ও অনেক কটূক্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু কোনো বিরুদ্ধ বিতর্ক তাঁকে বিচলিত করতে পারে নি। রাগমিশ্রণে ছিল তার অসাধারণ অধিকার—তাই তিনি এ বিষয়ে তৎকালীন বহু গুণিজনের সানন্দ সমর্থন পেয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের বাংলা গানের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনার আগে তাঁর এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে কি জাতীয় আপত্তি উঠেছিল তা আলোচনার প্রয়োজন।

মনীষী অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মতো বিদগ্ধজনও দ্বিজেন্দ্রলালের সুরের বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি তুলেছিলেন। তিনি 'সাহিত্য-সম্মিলনে টাউন-হলের বিরাট অধিবেশনে' বলেছিলেন:

"......আমার বর্তমান দুঃখ,—নব্যযুবকদলের মধ্যে ইংরাজি সুরে সঙ্গীতচর্চা দেখিয়া। যে সুরের কথা আমি বলিতেছিলাম, সেটি প্রধানতঃ দ্বিজেন্দ্রলাল কর্তৃকই নব্যসমাজে প্রচলিত হইয়াছে।...আমি ভাবি এইভাবে যদি আমাদের উন্নতি হইতে থাকে, তবে আমাদের অবনতি আবার কিরূপে হইবে? দ্বিজেন্দ্রলাল কর্তৃক সুরের বিকৃতি সাধনের কথা আমি বৈঠকী-সভায় চট্টগ্রামে তুলিয়াছিলাম, কাহারও মনে ছাপ লাগাইতে পারি নাই, এবারে একেবারে সম্মিলনে উপস্থাপিত করিলাম। আমার কথা দ্বিজেন্দ্রলাল প্রকৃত ও প্রগাঢ় স্বদেশ-প্রেমিক হইলে, তিনি খাড়া সুর বাংলায় চালাইতে চেষ্টা করিতেন না। তাঁহার পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় অতি সুমিষ্ট গায়ক ছিলেন; খেয়াল, ধ্রুপদ, ব্রহ্মসঙ্গীত, টপ্পা তিনি অতি নিপুণভাবে গাহিতেন; জানি না, কার কিরূপ দুর্ভাগ্য কিরূপে হয়, এ হেন পিতৃসমীপে বসিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল কি দশদিনও সঙ্গীতচর্চা করেন নাই?" [৪]

উদ্ধৃত অংশ থেকেই উপলব্ধি করা যায় যে দ্বিজেন্দ্রলালের নূতন ধরনের সাঙ্গীতিক রীতি তখনকার একশ্রেণীর সমালোচকদের মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। সমালোচকের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও এ কথা অনায়াসে বলা যায় যে, দ্বিজেন্দ্রলালের বিলাতি সুরের প্রয়োগবিন্যাসকৌশলটি তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাঁর প্রধান আপত্তি হল এই যে দ্বিজেন্দ্রলাল

৪। নবকৃষ্ণ ঘোষের 'দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থের ২৪৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

বিলাতি সুর আমদানি করে ভারতীয় সঙ্গীতকে বিকৃত করেছেন—অর্থাৎ স্বদেশী জিনিসকে সম্পূর্ণ বর্জন করে, কখনও কখনও বিকৃত করে তিনি বাংলা সঙ্গীতে বিদেশী সুর নিয়ে এসেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতশিক্ষা সম্পর্কে তিনি কটাক্ষ করতেও ছাড়েন নি। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে মধুসূদনের বিরুদ্ধেও তৎকালে এই জাতীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের অসাধারণ দক্ষতা ছিল বলেই তিনি বিলাতি সুরকে অনায়াসে তার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন। যথার্থ সুরস্রষ্টার পক্ষেই এই জাতীয় সমন্বয় সাধন সম্ভব। আর একজন সকলকলাবিদগ্ধ 'কৃষ্ণনাগরিক' যা মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখযোগ্য—তিনি অক্ষয়চন্দ্রের কঠোর সমালোচনার প্রত্যুত্তর দিয়েছেন :

"কাউকে সা রি গ ম (খাড়া সুর) সাধতে শুনলে, সরকার মহাশয়ের ধৈর্যচ্যুতি হয়, অথচ অধৈর্যে সা রি গ ম অভ্যাস না করলে কি করে ও-বিদ্যা আয়ত্ত করা চায় সে কথা তিনি বলে দেন নি। ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হিন্দুসঙ্গীতের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় ছিল এবং তাঁর যে এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান ও অধিকার ছিল তা সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট সুপরিচিত। সঙ্গীত তাঁর কুলবিদ্যা এবং সে বিদ্যা তাঁকে কায়ক্লেশে আয়ত্ত করতে হয় নি, কেন না, ভগবান তাঁকে গানের গলা এবং সুরের কান দিয়েছিলেন।"[৫]

দ্বিজেন্দ্রলালের নূতন সাঙ্গীতিক পদ্ধতিই অক্ষয়চন্দ্রের কাছে বিসদৃশ বোধ হয়েছিল। হিন্দুসঙ্গীতের বিশুদ্ধিসম্পর্কিত একটি সংস্কারই সম্ভবত তাঁর এই ধরনের মতবাদের কারণ। কিন্তু হিন্দুসঙ্গীতের একটি সুদূরপ্রসারী ঐতিহ্য ও দীর্ঘকালসঞ্চিত প্রাণরস আছে—তা এত ঠুনকো নয়,—তাই যথার্থ গুণীর কণ্ঠের নানা সুরবৈচিত্র্য সঙ্গীতকে সমৃদ্ধই করে, বিকৃত করে না। দ্বিজেন্দ্রলাল অবলীলাক্রমে বিলাতি সুরকে আমাদের রাগরাগিণীর সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। ঐতিহাসিক দিক থেকে আলোচনা করলে, দ্বিজেন্দ্রলালই যে সর্বপ্রথম আমাদের গানে বিলাতি সুর প্রয়োগ করেছেন, এ কথা বলা যায় না। দু দেশের সাঙ্গীতিক সাধনাকে সমন্বিত করার সর্বপ্রথম দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। এই সময় থেকেই বিলাতি সঙ্গীত ও বাদ্যচর্চার একটি প্রবল জোয়ার এসেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকের দুটি

৫। দ্বিজেন্দ্রলাল স্মৃতি-সভায় কথিত : প্রমথ চৌধুরী : সবুজপত্র, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২।

গানে বিলাতি- সুর ছিল। প্রথমবার বিলাত থেকে ফিরে আসার পর রবীন্দ্রনাথও বিশেষভাবে বিলাতি সুরের চর্চা করেছিলেন—'বাল্মীকি-প্রতিভা,' 'কালমৃগয়া' ও 'মায়ার খেলা', এই দেশী-বিদেশী সাঙ্গীতিক আবহাওয়ার মধ্যে জন্ম হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের আগেই রবীন্দ্রনাথ মূরের 'আইরিশ মেলোডিজ' থেকে অনুবাদ করেছেন।

কিন্তু বাংলা কাব্যসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কেউ দ্বিজেন্দ্রলালের মতো এত সার্থকভাবে বিলাতি সুর প্রয়োগ করতে পারেন নি। 'আর্যগাথা' দ্বিতীয় খণ্ডের গানের চেয়ে, 'হাসির গান' অনেক বেশী জনপ্রিয় হয়েছিল। এইজন্য এই দেশের অনেকের কাছেই তাঁর প্রধান পরিচয় 'হাসির গান'-এর কবি হিসাবেই—যদিও 'হাসির গান'-ই সুরকার দ্বিজেন্দ্রলালের একমাত্র পরিচয় নয়, কারণ সঙ্গীতসাধনায় তিনি অনেক গভীরে প্রবেশ করেছিলেন। তবু সুরস্রষ্টা দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যতম কৃতিত্ব যে তাঁর 'হাসির গান' গুলিতে এ কথাও অস্বীকার করা যায় না। 'হাসির গান'-এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করলে দ্বিজেন্দ্রলালের শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাবে। তাঁর 'হাসির গান'-এ কাব্য ও সঙ্গীত—দুদিকেরই একটি সমন্বয় ঘটেছে। 'হাসির গান'-এও পাশ্চাত্ত্য সুরের মিশ্রণ ঘটেছে—কিন্তু বিলাতি চাল সহজে বাংলাগানের সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে। 'হাসির গান'-এ দ্বিজেন্দ্রলালের সুরবৈচিত্র্যের লীলা লক্ষণীয়। হাস্যরসের মূলে আছে অসঙ্গতি, —সেই অসঙ্গতি সুরের ব্যাপারেও পরিস্ফুট হয়। কথার সঙ্গে সুরের অসঙ্গতি সৃষ্টি করে তিনি এই জাতীয় গান রচনা করেছেন। দু-একটি উদাহরণ গ্রহণ করা চলতে পারে। যেমন "বৃষ্টি পড়িতেছে টুপটাপ"—এর সুর হল মেঘমল্লার অথচ কথার মধ্যে আছে লঘু সুরের আমেজ, আর রচনারীতি হল হালকা ছড়ার মতো—

বৃষ্টি নামিল তোড়ে ;
রাস্তা কর্দমে পোরে
ছত্র মস্তকে রাস্তার মোড়ে
পিছলে পড়ে সবে দুপদাপ।

হালকা কথার সঙ্গে গভীর সুরবিন্যাস ঘটার জন্যই প্রধানত এ ক্ষেত্রে হাস্যরস সৃষ্ট হয়েছে। 'দুর্বাসা'-গানটির কথায় ও ভাবে একটি প্রচণ্ড অসঙ্গতি আছে।

কবি প্রাচীনকালের এই ত্রিকালদর্শী ঋষিকে নিয়ে নিতান্ত হালকা সুরে যখন গান রচনা করেন, তখন হাস্যাবেগ অসংবরণীয় হয়ে ওঠে :

পুরাকালে ছিল শুনি,
দুর্বাসা নামেতে মুনি—
আজানুলম্বিত জটা, মেজাজ বেজায় চটা,
দাড়িগুলো ভারি কটা ;—ইত্যাদি।

কাব্যবিচারে যেমন বিষয় ও রসের মধ্যে অসঙ্গতিজনিত হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি সঙ্গীতবিচারেও সুরগাম্ভীর্যের সঙ্গে হালকা কথার অসঙ্গতি ঘটেছে। এর সুর হল দরবারি কানাড়া, অথচ এর কথা-বাহন কত লঘু ও চটুল। সুতরাং 'হাসির গান'-এর মতো রচনা থেকেও প্রমাণ করা যায় যে হিন্দুস্থানী রাগরাগিণীতে দ্বিজেন্দ্রলালের কতখানি অধিকার ছিল।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেমমূলক কোরাস-সঙ্গীতগুলি তাঁর সাঙ্গীতিক প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান। এই জাতীয় সঙ্গীতরচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল আজ পর্যন্তও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এখানেও প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সুরবৈচিত্র্যের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। এই গানগুলিতেও দ্বিজেন্দ্রলাল ভারতীয় রাগরাগিণীকেই আশ্রয় করেছেন, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তা উপলব্ধি করা কঠিন হয়ে ওঠে—ইউরোপীয় সুরের ভঙ্গিটিও সেখানে অনুপস্থিত নয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাঙ্গীতিক পদ্ধতিকে যেমন-তেমন ভাবে একসঙ্গে জুড়ে দিয়েই দেশী-বিলাতি সঙ্গীতরীতির ঐক্যবন্ধন রচনা করা সম্ভব নয়। কারণ তা হলে নিতান্ত যান্ত্রিক উপায়েই এ দুয়ের মধ্যে জোর করে মিলন সৃষ্টির আয়োজন হবে, কিন্তু রসের দিক ফুটবে না। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সুরসরস্বতীকে এমনভাবে সমন্বিত করেছেন যে, তার মধ্যে একটি সামগ্রিক (synthetic) শিল্পরূপ ফুটে উঠেছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য : "দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুরের মধ্যে ইংরেজি সুরের স্পর্শ লেগেছে বলে কেউ কেউ তাকে হিন্দুসঙ্গীত থেকে বহিষ্কৃত করতে চান। যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দুসঙ্গীতে বিদেশী সোনার কাঠি ছুঁইয়ে থাকেন, তবে সরস্বতী নিশ্চয়ই তাঁকে আশীর্বাদ করবেন।"[৬]

৬। সোনার কাঠি : সবুজপত্র, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২।

দ্বিজেন্দ্রলালের রণ-সঙ্গীত "ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে", "সেথা গিয়াছেন তিনি সমরে আনিতে" প্রভৃতি গান সুবিখ্যাত। উচ্ছ্বসিত আবেগ ও বলিষ্ঠ উদ্দীপনা এই জাতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য। 'ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে' জাতীয় ভূপালীভঙ্গিম গানটি বাংলা গানের ইতিহাসে একটি অদ্বিতীয় সঙ্গীত। দ্বিজেন্দ্রলালের এই শ্রেণীর গানে একটি ওজস্বিতা ও পৌরুষদৃপ্ত ভঙ্গি ফুটে উঠেছে। তবু এই পৌরুষবলিষ্ঠতা কিংবা হাস্যরসই দ্বিজেন্দ্রসঙ্গীতের চরম ফলশ্রুতি নয়। কবি ক্রমশ ভাবগভীরতার মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। শেষ জীবনের ভক্তিমূলক গানগুলির মধ্যে কবির সুরসাধনায় এই ভাবগভীরতা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর তর্কপ্রবণ মন এক নূতন বিশ্বাস ও আলোয় পরিমার্জিত হয়ে উঠেছিল— প্রেম উর্ধ্বমুখী আত্মনিবেদনে পরিণত হয়েছে। "তুমি যে হে প্রাণের বঁধু আমরা তোমায় ভালবাসি"—গানটিই তার একটি বড় প্রমাণ। ভাবের মুক্ত আকাশে সুরবিহঙ্গের লীলাবিহার অহেতুক বৈষ্ণবভক্তিকে রূপায়িত করেছে :

> ভালোবাসো নাহি বাসো নইকো আর অভিলাষী,
> আমরা শুধু ভালোবাসি—ভালোবাসি—ভালোবাসি ॥

॥ ৩ ॥

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যসঙ্গীত আলোচনা করতে হলে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে এখানে কথা ও সুর—উভয়ে মিলেই সৃষ্টি। বাংলার কাব্যসঙ্গীত-রচয়িতারা এই যুগলরসেরই সাধক। সুর ও কথার এই সম্পর্ক নিয়ে রবীন্দ্রনাথ একবার চমৎকার একটি মন্তব্য করেছিলেন· "হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে আমরা সুরের তান শুনে মুগ্ধ হই ; সঙ্গীতের সুর-বৈচিত্র্য তানালাপে কেমন মূর্ত হয়ে উঠতে পারে সেইটেই উপভোগ করি, নয় কি ? কিন্তু কীর্তনে আমরা পদাবলীর মর্মগত ভাবরসটিকেই নানা আঁখরের মধ্য দিয়ে বিশেষ করে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করি। এই আঁখর অর্থাৎ বাক্যের তান অগ্নিচক্র থেকে স্ফুলিঙ্গের মত কাব্যের নির্দিষ্ট পরিধি অতিক্রম করে বর্ষিত হতে থাকে।"[৭] তাই বাংলা কাব্যসঙ্গীতকে শুধু কাব্য হিসাবে বিচার করলে বিভ্রান্তি ঘটার

৭। সাঙ্গীতিকী : দিলীপকুমার রায়, পৃঃ ১৫০।

সম্ভাবনা, আবার তার সঙ্গে এ কথাও স্মর্তব্য যে কাব্যসঙ্গীতের সঙ্গে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের একটি প্রভেদ আছে—প্রথমোক্তটি সম্পর্কে এর কথা-অংশের দিকেও নজর দিতে হবে। শ্রেষ্ঠ কাব্যসঙ্গীত-রচয়িতারা তাদের সহজ অধিকারেই কথা ও সুরকে সামগ্রিক ঐক্যে বিধৃত করেন—এতদুভয়ের জন্য কোনো পৃথক যত্ন নিতে হয় না—কাব্যবিচারের মতো সঙ্গীতবিচারেও মম্মট ভট্টের এই সিদ্ধান্তটি অভ্রান্ত।

'আর্যগাথা' প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের গানগুলির বিশুদ্ধ কাব্যবিচার করতে গেলে অনেক সময় তার পূর্ণ রসাস্বাদন সম্ভব নয়—কারণ এর অনেকগুলি গান কাব্য হিসাবে সুমসৃণ ও সুখপাঠ্য নয় ('আর্যগাথা'র বিশুদ্ধ কাব্যবিচার সম্পর্কে 'দ্বিজেন্দ্র কাব্যপ্রবাহ' অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য)। রবীন্দ্রনাথ তাই 'আর্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগের সমালোচনা-প্রসঙ্গে এই গ্রন্থটির মধ্যে দুজাতীয় রচনা লক্ষ্য করেছিলেন—এক জাতীয় রচনা যা কাব্যের দাবিকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করেছে, এই শ্রেণীর রচনা সুরসংযোগে পূর্ণাঙ্গ হওয়ার অপেক্ষা রাখে —কাব্য হিসাবে সেগুলি যেমন শ্রুতিসুখকর নয়, তেমনি প্রকাশরীতির নানা বিষমতার জন্য সুখপাঠ্যও নয়। আর এমন কতকগুলি গান আছে যা গান হয়েও কাব্যের দাবি মিটিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই মূল্যবান আলোচনাটিতে গান ও কবিতার প্রভেদও আলোচনা করেছেন। কিন্তু কবিতা ও গানের মধ্যে যে পার্থক্যই থাকুক না কেন, 'আর্যগাথা' দ্বিতীয় খণ্ডের কয়েকটি কাব্য-সঙ্গীতের গীতিলাবণ্য অপূর্ব। যেমন একটি প্রসিদ্ধ গানের কথা উল্লেখ করা যায় :

> আর একবার ভালবাস বাসতে যেমন আগের দিনে ;
> ঘুমন্ত প্রাণের ব্যথা আবার জাগিছে প্রাণে।

সুর ও বাণীর যুগল রসে গানকে কতখানি সমৃদ্ধ করে তোলা যায় তার আর একটি উদাহরণ 'এ জনমে পূরিল না সাধ ভালবাসি' গানটি। ভৈরবীর সঙ্গে মিলিত হয়ে কবিতাটির নিপুণ কথাবিন্যাস ও ভাবগভীরতা একটি রসরূপ লাভ করেছে। ভৈরবীর এমন উন্নত মহিমা দ্বিজেন্দ্রসঙ্গীতে খুব বেশী নেই। ভাবৈশ্বর্যেও সঙ্গীতটি মূল্যবান।

'আর্যগাথা'র পরেও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেমসঙ্গীত আরও বিকাশ লাভ করেছিল। পরবর্তীকালের প্রেমসঙ্গীতগুলিতে তারুণ্যের স্বপ্নাবেশ ও

উচ্ছলতা নীরব আত্মনিবেদন ও আত্মবিলোপকারী ব্যাকুলতার মধ্যে অনেক বেশী ভাবগভীর হয়ে উঠেছে। ইমন কল্যাণে রচিত একটি বিখ্যাত প্রেম-সঙ্গীতের উল্লেখ করা যেতে পারে :

যাও হে সুখ পাও যেখানে সেই ঠাঁই, আমার এ দুখ আমি
দিতে ত পারি না ;
(তুমি) রহিলে সুখে নাথ পুরিবে সব সাধ, নিরাশা কভু যদি
ললাট ঘিরে—
তখনই এই বুকে আসিও ফিরে।

এখানকার প্রেমে আনন্দোচ্ছলতার চেয়ে দুঃখের ভাগই বেশী। বিশেষত, স্ত্রী-বিয়োগের পরবর্তীকালের প্রেমসঙ্গীতগুলি বেদনার দীর্ঘশ্বাসে নূতন রূপলাভ করেছে—প্রেমের আত্মবিলোপকারী মহিমা বেদনার মন্ত্রে এবং পুণ্যোজ্জ্বল ভাবলোকের অভিমুখী হয়ে উঠেছে। কবি যখন গান করেন :

তুমি হে আমার হৃদয়েশ্বর তুমি হে আমার প্রাণ!
কি দিব তোমায়, যা আছে আমার, সকলই তোমারই দান।

তখন বৈষ্ণব কবিতার সুবিখ্যাত চরণটি দুটির কথা মনে পড়ে—'কি দিব কি দিব বলি মনে ভাবি আমি। তোমারে যে ধন দিব সেই ধন তুমি।' ভাবের এই ক্রমোত্তরণ দ্বিজেন্দ্রলালের শেষ দিকের প্রেমসঙ্গীতের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

দ্বিজেন্দ্রসঙ্গীত চিত্ররসসমৃদ্ধ। প্রকৃতির কোমল মধুর স্বপ্নাবেশের মধ্যেও তিনি যুক্তাক্ষরবহুল শব্দসংযোগে চিত্ররসকে যেমন ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনি শব্দবলিষ্ঠ ভাষায় একটি দৃঢ়তার সৃষ্টি করেছেন। এও দ্বিজেন্দ্রলালের আর এক নিজস্ব ভঙ্গি :

এ কি জ্যোৎস্না-গর্বিত শর্বরী
এ কি পাণ্ডুর তারাপুঞ্জ ;
এ কি সুন্দর নীরব মেদিনী
এ কি নীরব নিভৃত নিকুঞ্জ ;

গানটি যেন সুর, চিত্র ও ভাস্কর্যরীতির এক বিচিত্র সমন্বয়—জ্যোৎস্নারাত্রির 'গর্বিত সৌন্দর্য' যেন মনের মধ্যে আগ্নেয় বর্ণে ছবি আঁকে। আবার শব্দচাতুর্যের দ্বারা, অনুপ্রাসের গুঞ্জন দ্বারাও প্রকৃতির উল্লাসময় ছবি আঁকা হয়েছে :

এ কি মধুর ছন্দ, মধুর গন্ধ, পবন মন্দ-মন্থর—
এ কি মধুর মুঞ্জরিত নিকুঞ্জ-পত্রপুঞ্জ মর্মর।

বঙ্গভঙ্গের প্রচণ্ড উন্মাদনা দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতে প্রাণরসসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। কাব্য হিসাবেও তাঁর এই শ্রেণীর সঙ্গীতগুলির একটি মূল্য আছে। বর্তমান অবস্থার কথা মনে করে আত্মধিক্কার, অতীত গৌরব-কাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদ দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী সঙ্গীতগুলির কেন্দ্রীয় ভাববস্তু। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গানে ভাব ও রূপের যোগ্য সমন্বয় ঘটেছে। দৃপ্তবলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গি, মর্মস্পর্শী আবেগ দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেমের গানকে সহজেই জনচিত্তগ্রাহ্য করে তুলেছিল। 'আমার দেশ', 'ভারত আমার ভারত আমার', 'মেবার পাহাড়' প্রভৃতি গানে একটি ইতিহাস রস সঞ্চারিত হয়ে জীবন্ত করে তুলেছে—কীর্তিমুখরিত বিলুপ্ত দিনের কাহিনী তিনি সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে রূপ দিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন স্পষ্ট কাব্যের পক্ষপাতী—স্বদেশপ্রেমের গানগুলির মধ্যে কোনো দেশ-কাল-অতিক্রমকারী ভাবস্বপ্নের চেয়ে দেশের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক চিত্রই উজ্জ্বল বর্ণে ফুটে উঠেছে। কিন্তু তাই বলে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক রস পরিবেশন করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না—তিনি দেশজননীর বরমূর্তিরও ভাষা-চিত্র এঁকেছেন

এখনো তোমার গগন সুনীল, উজল তপন তারকা চন্দ্রে,
এখনো তোমার চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদ-মন্দ্রে।

শব্দের মেঘমন্দ্র এখানে মহিমময়ী একটি মাতৃমূর্তি রূপান্বিত করে তুলেছে। নিজের দেশের ভৌগোলিক সত্তার মধ্যেই তিনি এমন এক ব্যাকুলতার সৃষ্টি করেছেন যেখানে এই মাতৃমূর্তির এক সার্বজনীন মহিমা আত্মপ্রকাশ করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'ভারতবর্ষ' সঙ্গীতটিই সম্ভবত তাঁর এই শ্রেণীর সঙ্গীতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই গানে কবি রূপ থেকে ভাবের নিগূঢ় অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছেন। উদ্দীপনা থেকে একটি শান্ত উপলব্ধিতে এসেছেন

দ্বিজেন্দ্রলালের শেষ-জীবনের ভক্তিসঙ্গীতগুলিরও মূল্য কম নয়। শাক্ত ও বৈষ্ণব দু ধরনের কবিতাই তিনি লিখেছিলেন। সংশয়বাদ ও বুদ্ধিবাদ থেকে জীবনের শেষ দিকে তিনি খানিকটা বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। "ও কে গান গেয়ে চলে যায়" গানটির মধ্যে নদীয়ার প্রেমবিহ্বল তরুণ-সন্ন্যাসীর একটি

সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের শ্যামাসঙ্গীতগুলির মধ্যেও এক ভক্তিব্যাকুল নির্ভরতার সুর লীলায়িত হয়েছে :

চরণ ধরে আছি পড়ে একবার চেয়ে দেখিস না মা,
মত্ত আছিস আপন খেলায় আপনভাবে বিভোর বামা।

আদর-আবদার-অনুযোগ-অভিমান প্রভৃতির ভিতর দিয়ে ভক্ত মনের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা কোনো কোনো গানের প্রাণ—রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতের ভাবানুসরণও অস্পষ্ট নয় :

এবার তোরে চিনেছি মা, আর কি শ্যামা তোরে ছাড়ি।
ভবের দুঃখ ভবের জ্বালা (এবার) পাঠিয়ে দিছি যমের বাড়ী।
ফেলেছিলি গোলোক-ধাঁধায়—মা হয়ে কি এমন কাঁদায়।
(শেষে) ছেলের কান্না শুনে অমনি (ও তোর) কেঁদে উঠল
মায়ের নাড়ী।

॥ ৪ ॥

দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সাঙ্গীতিক মূল্য ও কাব্যমূল্য ছাড়া আর একটি দিকও বিচার্য। তাঁর অনেকগুলি গান নাটকে সন্নিবেশিত হয়েছে,—নাটকীয়-সঙ্গীত হিসাবে এই সঙ্গীতগুলি আর একটি স্বতন্ত্র মূল্যের অধিকারী। কিন্তু সুর বা কাব্যশিল্পের দিক থেকে প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীত হলেই যে নাটকীয় সঙ্গীত হিসাবে সার্থক হতে হবে, এমন কথা বলা যায় না। নাটকে সঙ্গীতসন্নিবেশের একাধিক কারণ থাকতে পারে। নাটকের একটানা ঘটনার মধ্যে খানিকটা আনন্দময় বিরতি (Dramatic relief) সৃষ্টি করার জন্য সঙ্গীত সন্নিবেশিত হতে পারে। কিন্তু এই ধরনের সঙ্গীতের মধ্যে সুলভ মনোরঞ্জনী বৃত্তি ছাড়া অন্য কোনো নাটকীয় অভিপ্রায় পরিস্ফুট হয় না। যাত্রার মধ্যে এই জাতীয় সঙ্গীতেরই প্রাচুর্য লক্ষণীয়। কিন্তু সার্থক নাটকে সঙ্গীত, নাটকীয় তাৎপর্যকেই প্রকাশ করে। নাটকীয় সঙ্গীত নাটকীয় চরিত্র বিকাশের সহায়তা করে। অনেক সময় সংলাপের মধ্য দিয়েও যা প্রকাশ করা সম্পূর্ণ সম্ভব হয়ে ওঠে না, তা নাটকীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। সঙ্গীতের সাহায্যে নাটকীয় ঘটনা বা পরিস্থিতিকেও ফুটিয়ে তোলা যায়। অনেক সময় অতি

সাধারণ বিবৃতিসর্বস্ব ঘটনা একটি সঙ্গীতের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নাটকীয় ঘটনায় পরিণত হতে পারে। শুধু ভালো গান হলেই হবে না, নাটকীয় পরিস্থিতি ও চরিত্রসৃষ্টির সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেওয়া চাই।

গিরিশচন্দ্রের পূর্বে বাংলা সাহিত্যের কোনো নাট্যকারই সঙ্গীতকে নাটকীয় তাৎপর্যের সঙ্গে তেমন করে মিলিয়ে দিতে পারেন নি। গিরিশচন্দ্র নানা ধরনের নাটকীয় সঙ্গীত রচনা করেন। তার মধ্যে তাঁর শ্যামাসঙ্গীত ও ভক্তিমূলক সঙ্গীতগুলিই সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল। 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের সঙ্গীতসন্নিবেশ সর্বাধিক নাটকীয় গুণসম্পন্ন। গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালের মতো সুরকার ছিলেন না—সঙ্গীতাচার্য দেবকণ্ঠ বাগচী তাঁর বেশীর ভাগ গানেরই সুর-সংযোজন করেছেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের একটি পূর্ণাঙ্গ নাট্যদৃষ্টি ছিল, যার ফলে তাঁর নাটকীয় সঙ্গীত অনেক ক্ষেত্রেই নাটকীয় তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠত। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের চেয়ে একটি বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের সুবিধা ছিল। তিনি শুধু কবি ও নাট্যকারই ছিলেন না, উপরন্তু তিনি ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুরকার। তাই তাঁর নাটকগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর সঙ্গীত।

দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতগুলি নাটকে সন্নিবিষ্ট হয়ে অধিকাংশ স্থলে নাটকীয় চমৎকারিত্ব বৃদ্ধিই করেছে। প্রহসনগুলির প্রাণকেন্দ্রই হল 'হাসির গান'—কবি যেন গানগুলিকেই সন্নিবিষ্ট করার জন্য তদনুযায়ী চরিত্র ও ঘটনা সৃষ্টি করেছেন (এ সম্পর্কে "প্রহসন ও হাস্যরস" অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য)। নাট্যকাব্যগুলিতে অনেক প্রসিদ্ধ গান সন্নিবেশিত হয়েছে বটে, কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই তা প্রথম শ্রেণীর নাটকীয় বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। 'তারাবাই' নাটকে কোনো গানেরই তেমন গভীর নাট্যমূল্য নেই। 'সীতা' নাটকটি সঙ্গীতবর্জিত। 'ভীষ্ম' নাটকে অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গীতগুলি নাটকের গুরুগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে কিছু বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। সঙ্গীতগুলি এই যুগল রাজকন্যার চপল স্বভাব, লঘুচিত্ততা ও সহজ আনন্দরসকে ফুটিয়েছে। "আমরা মলয় বাতাসে ভেসে যাব শুধু" গানটি তরুণী রাজকন্যাদ্বয়ের লঘু আনন্দকেই রূপায়িত করেছে। কিন্তু চতুর্থ অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে "নীল আকাশের অসীম ছেয়ে" গানটির মধ্যে একটি সূক্ষ্ম নাটকীয় তাৎপর্য আছে। বিচিত্রবীর্য অসুস্থ, ক্ষয়রোগগ্রস্ত—কিন্তু এই দুর্বল মানুষটির মনে

কবিকল্পনা আছে—তাঁর ইচ্ছা এই যে 'জ্যোৎস্নালোকে ঐ নীল আকাশের নীচে, যেন গান শুনতে শুনতে' তাঁর মৃত্যু হয়। অম্বা-অম্বিকার গান শেষ হওয়ার পূর্বেই তাঁদের রোগদুর্বল স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। অম্বিকা অম্বালিকা হাসিঠাট্টা ও লঘু আনন্দ নিয়েই জীবন যাপন করেন—তাঁরা নিজেদের গানে মত্ত, কিন্তু সেই অবকাশে যে তাঁদের দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে এসেছে—এ কথা তাঁরা বুঝতেই পারেন নি; তাঁদের আনন্দময় মেঘশূন্য আকাশে আকস্মিকভাবে মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। এই বৈপরীত্যের মধ্যে একটি নাট্যরস আছে। দ্বিতীয়ত, ঐ গানটির মধ্যে বিচিত্রবীর্যের কাব্যমণ্ডিত মৃত্যুবাসনাটিও সুন্দর ভাবে রূপায়িত হয়েছে। 'সোরাব-রুস্তম' সঙ্গীতপ্রধান অপেরাধর্মী নাটক—এখানে সঙ্গীতকে সংলাপ হিসাবেও ব্যবহার করা হয়েছে—যেমন প্রথমাঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যের হামিদা ও সারিয়ার দ্বৈত-সঙ্গীতটি।

পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর সঙ্গীত-সন্নিবেশে অধিকতম কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অবশ্য রাজসভায় নর্তকীদের গান প্রধানত 'dramatic relief' হিসাবেই এসেছে। 'প্রতাপসিংহ' নাটকে সঙ্গীতের প্রভাব খুবই কম, শুধু মেহের-উন্নিসার প্রেমসঙ্গীতগুলি তাঁর হৃদয়ের গোপন প্রেমের পরিচয় দেয়। 'দুর্গাদাস' নাটকটির মধ্যে রাজিয়া চরিত্রটিকে শুধু তার সঙ্গীতবিলাসের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। তৃতীয়াঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে রাজিয়ার 'হৃদয় আমার গোপন ক'রে' গানটি গুল্‌নেয়ারের উচ্ছ্বসিত আবেগ-প্রবণ মনকে প্রকাশ করেছে। কিন্তু সঙ্গীতসন্নিবেশের দিক থেকে 'মেবার পতন', 'সাজাহান' ও 'চন্দ্রগুপ্ত'—এই তিনটি নাটকই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

'মেবার-পতন' নাটকের সঙ্গীতগুলিতে সর্বপ্রথম নাটকীয় সংঘাতকে সার্থকতরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। প্রথমাঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে বিখ্যাত 'মেবার পাহাড়' গানটি অসাধারণ নাটকীয় তাৎপর্যে মণ্ডিত। পূর্ববর্তী দৃশ্যে মৃত মহারানা প্রতাপসিংহের বিশ্বস্ত সহচর গোবিন্দসিংহের মেবার-গরিমার পূর্বস্মৃতি পর্যালোচনায় ও উৎসাহবাক্যে যে মৃদুগতির সৃষ্টি হযেছে, তাই এ গানটির দ্বারা তীব্রতায় পরিণত হয়েছে। সঙ্গীতটিতে মেবারের অতীত ইতিহাসের গরিমা বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী দৃশ্যে যুদ্ধে অনিচ্ছুক রানা অমরসিংহকে গোবিন্দসিংহ ও সত্যবতী মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্‌বুদ্ধ করেছেন। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ঘটনার সঙ্গে অন্বিত হয়ে গানটির নাটকীয়

মূল্য বর্ধিত হয়েছে। দীর্ঘকাল যুদ্ধবিরতির ফলে মেবার আবার সুখস্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে পেয়েছে বটে—কিন্তু আরামে ও আলস্যে সে যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। এই গানটি মেবারের ত্যাগদুঃখসহনশীল অতীতের গৌরবদীপ্ত অধ্যায় আবার স্মৃতিপটে ফুটিয়ে তুলে মেবারের আসন্ন যুদ্ধের পটভূমি রচনা করেছে। প্রতাপ-সিংহের সংগ্রামশীলতা, পদ্মিনীর আত্মাহুতি, কাগ্গার তীরে সংগ্রামসিংহের মৃত্যুভয়হীন যুদ্ধ, বাপা রাওয়ের বীরত্ব প্রভৃতি অতীত স্মৃতির পর্যালোচনা করে সমস্ত নাটকটির মধ্যে একটি গতি সঞ্চারিত করা হয়েছে। পঞ্চমাঙ্ক ষষ্ঠ দৃশ্যে আর একটি চারণীসঙ্গীতে পরাজিত মেবারের বিষাদময় ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মেবার-পতনের বিষাদঘন পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিত হয়ে সঙ্গীতটি এক বিষণ্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। এই গানটিই যেন মেবার-ভাগ্যের ম্লান সায়াহ্নকে আরও করুণ করে তুলেছে। পতনোন্মুখ মেবারের মেঘ-দুর্যোগময় পরিবেশকে নাট্যকার ইঙ্গিতময় করে তুলেছেন: "ঘন মেঘরাশ, ঘেরিয়া আকাশ, হানিযা তড়িৎ চলিয়া যায়।" এই দুটি গান 'মেবার-পতন' নাটকের কেন্দ্রীয় রসকেই ফুটিযেছে—প্রথম গানটিতে আছে স্মৃতিব উদ্দীপনা, দ্বিতীয় গানটিতে আছে সকরুণ বিষণ্ণতা—এই দুটি গান তাই 'মেবাব-পতন' নাটকের যথার্থ ফলশ্রুতি। নাটকের সর্বশেষ গান 'আবার তোরা মানুষ হ'—'মেবার-পতন'-এর বিশ্বমৈত্রীর আদর্শকেই বড় করে তুলেছে। মানসীব গানগুলির মধ্যেও তাঁর আদর্শবাদ—প্রেমের উর্ধ্বতর ভাবসত্যই প্রকাশিত হয়েছে।

'সাজাহান নাটকে ছটি সঙ্গীত সন্নিবেশিত হয়েছে—মোরাদের নর্তকীদেব গান একটি, পিয়ারার গান তিনটি ও চারণীসঙ্গীত দুটি। "আজি এসেছি আজি এসেছি, এসেছি বঁধু হে" গানটি নর্তকীদের প্রেমসঙ্গীত—সুরাপানোন্মত্ত মোরাদের বিলাসী চরিত্রকে ফুটিযেছে। পিয়ারার গান তাঁর লঘুচপল আনন্দোজ্জ্বল চরিত্রকেই রূপ দিয়েছে। সুজার আসন্ন দুর্ভাগ্য পিযারাব আনন্দপ্রেমোচ্ছল সঙ্গীতগুলির বৈপরীত্যে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'সাজাহান' নাটকের মেঘাচ্ছন্ন ঘনকৃষ্ণ আকাশে পিয়ারার গানগুলি যেন শুভ্রোজ্জ্বল সুরের বলাকা—মেঘের অন্ধকারকেই আরও নিবিড় করে তুলেছে। সঙ্গীতময়ী পরিহাসনিপুণা এই মোগল-কুলবধূর নির্মম পরিণতির সঙ্গে তাঁব উচ্ছলিত প্রেমসঙ্গীতকে যুক্ত করে একটি সমগ্র চিত্রের কথা ভাবলে বেদনাতুর

হতে হয়। দুটি চারণী-সঙ্গীতও 'সাজাহান' নাটকের অন্যতম গৌরব। প্রথমাঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যের চারণী-সঙ্গীতে "সেথা, গিয়াছেন তিনি"—যশোবন্ত-মহিষী মহামায়া তথা রাজপুত নারীচরিত্রের তেজস্বিতা প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি রণসঙ্গীত। যশোবন্ত সিংহ যুদ্ধে গিয়েছেন—জয় অথবা মৃত্যু—কিন্তু পরাজিত স্বামীকে সাদরে গ্রহণ করা রাজপুত রমণীর প্রথা নয়। তাই রাজপুত রমণীকে উদ্বোধিত করার জন্য চারণীরা গান গেয়েছেন—"সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চশির।"—কিন্তু যশোবন্ত সিংহ পরাজিত হয়ে আসছেন শুনে মহামায়া দুর্গদ্বার রুদ্ধ করার আদেশ দিলেন। চারণী-সঙ্গীতটি এই উদ্দীপনাময় মুহূর্তটির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে। তৃতীয়াঙ্ক ষষ্ঠ দৃশ্যের বিখ্যাত গান "ধনধান্যে পুষ্পে ভরা"-ও দেশমাতৃকার বন্দনা। মহামায়া যশোবন্তকে দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বোধিত করেছেন। রাজপুত ইতিহাসকে অবলম্বন করে দেশপ্রেমের উচ্চ আদর্শ ঘোষণা করা দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের একটি প্রধান লক্ষণ। 'সাজাহান' নাটকেও সে লক্ষণটি বিদ্যমান, তার প্রমাণ এই চারণ-সঙ্গীত দুটি। কিন্তু এই সঙ্গে আর একটি বিষয়ও লক্ষণীয় যে, যশোবন্ত-মহামায়ার কাহিনীটি 'সাজাহান নাটকের একটি ক্ষীণ-কলেবর শাখা-কাহিনী মাত্র—তাই নাট্যকাহিনীর মূল ধারার সঙ্গে সঙ্গীত দুটির কোনো অনিবার্য যোগ নেই।)

দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতসংযোজনা 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকেই সর্বোত্তম সিদ্ধি লাভ করেছে। এই নাটকে আটখানি গান আছে—কিন্তু প্রতিটি গান নাটকীয় তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়েছে। ভিক্ষুকবালিকার দুটি গান, ছায়ার তিনটি গান ও সৈন্যদলের একটি কোরাস গান বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছায়ার তিনটি গানের মধ্যে তাঁর চরিত্রটি ফুটে উঠেছে—চরিত্রের বিশেষ তিনটি অবস্থাই রূপায়িত হয়েছে। প্রথমাঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যে "আয়রে বসন্ত ও তোর কিরণ পাখা তুলে" ছায়ার পূর্বরাগসঙ্গীত। চন্দ্রগুপ্তকে দেখে এই তরুণী পার্বত্য-কন্যার হৃদয়রাগ এই উচ্ছ্বাস-উল্লাসময় গানের মাধ্যমে উদ্ভাসিত হয়েছে। তৃতীয়াঙ্ক পঞ্চম দৃশ্যে "আর কেন মিছে আশা, মিছে ভালবাসা" সঙ্গীতটিতে—ছায়ার হৃদয়ের অভিমানই প্রকাশিত হয়েছে। চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে ভালোবাসার মাঝখানে একটি বর্ণসমস্যার আশঙ্কা করে ছায়া অভিমানিনী হয়েছে।

ছায়ার অভিমান তাঁর কুমারী মনের অনুরাগকেই আরও পরিস্ফুট করেছে। পঞ্চমাঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে "সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই"—গানটিতে ছায়া তাঁর অন্তর্বেদনা ও আত্মবিলোপকারী প্রেমকে প্রকাশ করেছেন। দূতের হাতে গ্রীককন্যা হেলেনের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের বিবাহলিপি পাঠ করে তাঁর মনে যে প্রতিক্রিযার সৃষ্টি হয়েছিল, তাই তিনি এই গানটিতে প্রকাশ করেছেন। চন্দ্রগুপ্তের সুখেই ছায়ার সুখ—দুঃখের গরল আকণ্ঠ পান করে চন্দ্রগুপ্তকে সুধা পরিবেশন করার জন্য তিনি উন্মুখ। ছায়ার তিনটি গানের মধ্যে এই অনুরাগিণী পার্বত্যকন্যার হৃদয়াবেগের বৈচিত্র্যই প্রকাশিত হয়েছে।

তৃতীয়াঙ্ক প্রথম দৃশ্যে সৈন্যদলের সমবেত সঙ্গীত "যখন সঘন গগন গরজে বরিষে করকাধারা"—একটি সার্থক নাট্যসঙ্গীতে পরিণত হয়েছে। বিজয়ী গ্রীক সৈন্য দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহে পরিশ্রান্ত হযে অবশেষে দেশে ফিরে যাচ্ছে—দেশে ফিরে গিযে তারা তাদের হৃদয়রানীদের সঙ্গে মিলিত হবে—সেই মধুর প্রত্যাশাটিই সঙ্গীতের মধ্যে ফুটে উঠেছে—সমুদ্রতীরে সন্ধ্যায় এই আত্মীয়পরিজনহীন, অজ্ঞাতপিতৃপরিচয ও প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক অ্যাণ্টিগোনাসের হৃদয়বেদনাকেই তীব্রতর করে তুলেছে। এই সঙ্গীতটি তাই অ্যাণ্টিগোনাসের মর্মতলকেই আলোকিত করেছে। একটি সঙ্গীত ও একটি সংলাপে এই দৃশ্যটি রচিত হযেছে—কিন্তু দৃশ্যটির নাট্যমূল্য উল্লেখযোগ্য।

ভিক্ষুকবালার দুটি গান সবচেযে বেশী নাটকীয় বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের "ঘন তমসাবৃতা অম্বরধরণী" ও পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যের "ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি মহাসঙ্গীত ভেসে আসে"—দুটি গানই নাটকীয় পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করেছে ও চাণক্য চরিত্রটিকে পরিস্ফুট করেছে। চাণক্য তাঁর শূন্য হৃদয়কে প্রতিহিংসাবৃত্তির উন্মাদনা দিযে কোনো রকম করে পূরণ করে রেখেছিলেন, কিন্তু নন্দবংশকে ধ্বংস করে, নন্দকে হত্যা করে যখন তাঁর প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করলেন, তখন তাঁর হৃদয় আবার শূন্যতার অবসাদে পূর্ণ হযেছে। সেই সমযেই ভিক্ষুক-ভিক্ষুকবালার প্রথম সঙ্গীতটি সংযোজিত হযেছে। গানটিতে ঝটিকাময রাত্রিতে এক ব্যক্তির জননীহীনা কন্যা অপহৃত হওয়ার কাহিনী বিবৃত হয়েছে। চাণক্যের হৃদযে একটি শূন্যতার অবসাদ সৃষ্টি হয়েছিল, গানের মধ্য দিয়ে তাঁর নিজের জীবনেরই কন্যা হারানোর বেদনাময় স্মৃতি জেগে উঠেছে। দ্বিতীয়

সঙ্গীতটিও চাণক্য চরিত্রটিকেই ব্যাখ্যা দিয়েছে। চাণক্য নির্যাতিত। তাই প্রতিহিংসাগ্রহণের জন্য ব্রাহ্মণোচিত ক্ষমা-স্নেহ প্রভৃতি বিসর্জন দিয়ে তিনি জিঘাংসাবাদী ও সংশয়পরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন। বিশ্বের সৌন্দর্যতীর্থ থেকে তিনি নির্বাসিত—কিন্তু চাণক্যের হৃদয়ে এক অনুশোচনা জেগেছে। গানটির মধ্যে চাণক্যের অভিশপ্ত চিত্তের মুক্তির সঙ্কেত চমৎকারভাবে দ্যোতিত হয়েছে—'গীতিগন্ধভরা চির-স্নিগ্ধ মধুমাসের' আনন্দালোক সংসার-কারাগারে অবরুদ্ধ মানবাত্মাকে আহ্বান পাঠিয়েছে। গানটির আগে চাণক্যের হৃদয়দ্বন্দ্ব আছে—তারপরে আছে কন্যাপ্রাপ্তির কাহিনী। চাণক্যের অবসাদগ্রস্ত মনের ছবি ফুটিয়ে তুলতে এই জাতীয় সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের অন্যতম আকর্ষণ তাঁর এই নাট্যসঙ্গীতগুলি। এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কেউ তাঁকে এ বিষয়ে অতিক্রম করতে পারেন নি। দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যসঙ্গীতগুলি নাটকীয় প্রয়োজনীয়তাকে অতিক্রম করে ইতর-ভদ্র জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে তাঁর সঙ্গীতের যথার্থ রূপটি থিয়েটারের সংস্পর্শে অনেকখানি বিকৃত হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে অনেকের মনে যে উচ্চ ধারণা নেই, তার আসল কারণই হল রঙ্গালয়ে দ্বিজেন্দ্রসঙ্গীতের যথেচ্ছ-বিকৃতি। এই জাতীয় অশিক্ষিতপটুত্বের হাত থেকে উদ্ধার করতে না পারলে দ্বিজেন্দ্রসঙ্গীতের বিশুদ্ধি রক্ষিত হবে না। সেইদিনই দ্বিজেন্দ্রসঙ্গীতের যথার্থস্বরূপ আত্মপ্রকাশ করবে। দ্বিজেন্দ্রসঙ্গীতকে বাদ দিলে বাংলা গানের ইতিহাস অসম্পূর্ণই থাকে।

দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্যরচনা

সুরকার, কবি ও নাট্যকার হিসাবেই দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। কিন্তু কবিতা, গান ও নাটক ছাড়াও তিনি পত্রসাহিত্য, লঘু-গুরু ও সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধাদি রচনা করেছিলেন। তাঁর কবিতা, গান ও নাটকের তুলনায় বিচিত্র শ্রেণীর গদ্যরচনা পরিধিতে ও সাহিত্যিক মূল্যবিচারে অকিঞ্চিৎকর সন্দেহ নেই। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রমানস ও দ্বিজেন্দ্রসাহিত্য বিচারের পক্ষে তাঁর এই জাতীয় রচনাগুলির মূল্য নিতান্ত কম নয়। তাঁর সাহিত্যসম্পর্কিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়—বিশেষত তাঁর "কালিদাস ও ভবভূতি" গ্রন্থটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া তাঁর কিছু কিছু গদ্যরচনা তাঁর ব্যক্তিজীবন ও শিল্পীজীবনের উপরও আলোকপাত করে। গুরু-গম্ভীর প্রবন্ধ ছাড়া কয়েকটি লঘুরসাত্মক 'নকশা' শ্রেণীর রচনাও আছে। সংখ্যায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হলেও হাস্যরসাত্মক লঘু রচনাতেও যে তাঁর হাত ছিল, তা বেশ বোঝা যায়।

বিলাতযাত্রার বিবরণ তিনি "বিলাত-প্রবাসী" নাম দিয়ে 'পতাকা' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। ঐ সাপ্তাহিক পত্রিকাটি পরিচালনা করেন দ্বিজেন্দ্রলালের সেজদা জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় ও রাঙাদা হরেন্দ্রলাল রায়। 'এই পত্রগুলি 'পতাকা' পত্রিকায় কার্তিক ১২৯১ থেকে আশ্বিন ১২৯২ পর্যন্ত—প্রায় একবছর কালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। 'বিলাত-প্রবাসী' লেখা হয়েছিল প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে। সুতরাং তখনকার যুগ জীবনের ভাবাদর্শ ও বিলাতের সামাজিক, রাজনৈতিক, দৈনন্দিন ও সাংস্কৃতিক জীবনের একটি চিত্তাকর্ষক ছবি ফুটে উঠেছে। ইংরেজের অন্তঃপুর, শয়নপ্রথা, সামাজিক ব্যবহার, বিলাতের দোকানপাট, ইংরেজদের পোশাকপরিচ্ছদ, বিলাতের তৎকালীন রাজনীতি প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় পত্রগুচ্ছের মধ্যে পাওয়া যায়। লেখক কৌতূহলী হয়ে নূতন দেশকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। বহু জ্ঞাতব্য বিষয় থাকা সত্ত্বেও বর্ণনাগুলি নীরস ও তথ্যভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে নি।—একটি তরুণ মনের জাগ্রত কৌতূহল বর্ণনীয় বিষয়কে সরস করে তুলেছে। লেখকের নিজস্ব মন্তব্য ও পরিহাসরসিকতা ভ্রমণকাহিনীটিকে ঠিক বিবৃতি-

সর্বস্ব করে তোলে নি। অতি তুচ্ছ বিষয়ও বর্ণনার গুণে সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। বাঙালীর আহার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লেখক বলেছেন :

"জন-সাধারণ চাউল, ডাইল, ব্যঞ্জন ও আণুবীক্ষণিক মৎ-কণা খাইয়াই জীবন-ধারণ করে। ইহাতে অবশ্য সকলেরই পরিপুষ্টি—আহার হয় : এমন কি, অনেক সময়ে অনেকের উদর আহারের পর বিস্ময়কর রূপে প্রলম্বিত হইতে দেখা যায়, এবং বাত্যান্দোলিত সাগরের ন্যায় ধীরে ধীরে তরঙ্গায়িতও হইতে থাকে। কিন্তু সে তরঙ্গে গর্জন নাই, তাহাতে কোন হতভাগ্য পোত জলমগ্ন হয় না। তাহাতে জোয়ার-ভাটা আছে, সে তরঙ্গ ধীর প্রশান্ত ও নয়নরঞ্জন। এমন কি, মধ্যে মধ্যে তাহাতে মৎস্যের ক্রীড়াও হইতে শুনা যায়। কারণ, স্নান-কালে কাহারো কাহারো বলীত্রয়ের মধ্যে মৎস্যের অভদ্রোচিত প্রবেশ ও গুপ্ত অবস্থিতি প্রমুখ ঘটনা, কখন কখন যে শ্রুতিগোচর হয় নাই, তাহা বলিতে পারি না।"

ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে ভ্রমণের স্থান ও বৈচিত্র্য বড় কথা নয়, ভ্রমণকারীর দৃষ্টিভঙ্গিই সবচেয়ে বড়। ভ্রমণকারীর দৃষ্টিভঙ্গি ভ্রমণকারীর স্বরূপ নির্ণয় করে।[১] বিলাতের আহারপ্রথা ও আহার্যের সঙ্গে আমাদের দেশের আহার-প্রথার তুলনা করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল সামাজিক প্রশ্ন তুলেছেন। ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার ফলে তিনি যুক্তিপন্থী ও সংস্কারমুক্ত দৃষ্টির অধিকারী হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি কবিতায় ও নাটকে নানা সামাজিক প্রশ্ন তুলেছেন :

"সমাজ সর্বদাই সংস্কারের উপর খড়্গহস্ত।...কিন্তু আমার বোধ হয় কুশাসন ও মেঝের পরিবর্তে অধিকতর সুবিধাজনক, চেয়ার-টেবিল ব্যবহারে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধৃত হয় না।...প্রত্যেকেই বুঝিবেন—সভ্যতা পাপ নহে, সুবিধানুসরণ ধর্মের পথে কন্টক দেয় না। কোন পার্থিব সুবিধায় যদি জীবনের সুখ বর্ধিত হয়, তাহাতে ঈশ্বরের সন্তোষ বই অসন্তোষ হইতে পারে না।"

দ্বিজেন্দ্রলালের পত্রগুচ্ছের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ব্যবহারিক উন্নতি সম্পর্কে একটি সপ্রশংস মনোভাব আছে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে দেশের দুরবস্থা

১। "A first rate travel book depends comparatively little upon strangeness or remoteness of locality, and much upon th character and vision of the traveller."

—Twentieth Century Literature (1956) : A. C. Ward. Page 219.

ও পরাধীনতার জন্য তিনি মর্মে মর্মে বেদনা অনুভব করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গান ও ঐতিহাসিক নাটকে দেশপ্রেমের যে উজ্জ্বল প্রকাশ আছে, তাঁর পত্রগুচ্ছেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। নানা জ্ঞাতব্য তথ্যের মধ্যেও তাঁর স্বদেশচিন্তা ও স্বদেশের কল্যাণ কামনার সুরটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেশের উন্নতি কামনায় তিনি যে দু-একটি মন্তব্য করেছেন, তার মননশীলতাকে অস্বীকার করা যায় না। দ্বিজেন্দ্রলাল অসন্তোষকে সর্ববিধ উন্নতির মূল হিসাবে নির্দেশ করেছেন—শব্দঝঙ্কারে ও হৃদয়াবেগে বক্তব্যটি তাঁর ব্যক্তিমনের গভীর প্রত্যয়ের পরিচয় বহন করে

"মনুষ্য বর্তমানে সন্তুষ্ট থাকিলে সভ্য হইত না, তাহা হইলে সুরম্য হর্ম্যরাজি ধরণী পৃষ্ঠ সুশোভিত করিত না, বাণিজ্যপোত নির্মিত হইত না, রেলগাড়ী, বৈদ্যুতিক তার উদ্ভাবিত হইত না, ব্যোমযান আকাশে উড়িত না, তাহা হইতে সঙ্গীতের প্রাণালোড়ী ঝঙ্কার, চিত্রের হৃদযোন্মাদী মাধুর্য, ভাস্কর-নির্মিত প্রস্তর-প্রতিমূর্তির কবিত্ব, কবিতার তাবাময়ী ভাষা সৃষ্ট হইত না ও মানব জীবন-পথে কুসুম-বৃষ্টি করিত না। অসন্তোষই ইহাদিগের উৎপত্তির স্থান, অসন্তোষই সভ্যতাস্রোতস্বিনীর নির্ঝর।"

দ্বিজেন্দ্রলালের এই শ্রেণীর মন্তব্যের বিরুদ্ধেও হয়তো অনেক কথা বলা যায়। তবু নিতান্ত তরুণ বয়সে দ্বিজেন্দ্রলালের যে একটি ব্যক্তিত্ব ও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি জন্মলাভ করেছিল সে বিষয় কোনো সন্দেহ নেই। বিচারবুদ্ধি, বিশ্লেষণক্ষমতা, সংতর্ক মনোভাব, তেজস্বিতা তাঁর অনেকগুলি চিঠিরই প্রাণকেন্দ্র। চিঠিগুলি তাই ভ্রমণকাহিনীর বৈচিত্র্যহীন বিবৃতি মাত্র নয়, তাঁর চিন্তাশীলতা, বিচারবুদ্ধি ও যুক্তিবাদী মনের অনেকখানি প্রক্ষেপও বটে।

সার্থক পত্রসাহিত্য ও ডায়েরি সম্পর্কে আর একটি প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। রচয়িতার ব্যক্তিত্বের রস সেখানে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। নিছক তথ্যবিবৃতি ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের অজস্র উপাদান-সঙ্কলনই সার্থক পত্রসাহিত্যের আদর্শ নয়। যে কোনো চিঠিই তাই সাহিত্যপদবাচ্য নয়। যে চিঠি শুধু প্রয়োজনের সীমায় আবদ্ধ, "অপ্রয়োজনের আনন্দ" পরিবেশন করে না, সে চিঠির লেখক যদি অসাধারণ ব্যক্তিও হন, তা হলেও তাকে সাহিত্যিক চিঠি বলা যাবে না। পত্রসাহিত্য রচয়িতার ব্যক্তিত্বের রসে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। তাই অনেক সময় দেখা যায় যে রচয়িতা অসাধারণ ব্যক্তি বা সাহিত্যিক নন, তবু তাঁর

চিঠি রসসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। চিঠির মধ্যে পত্ররচয়িতার ব্যক্তিত্বকে বিগলিত করে ছড়িয়ে দেওয়া চাই, পুঞ্জীভূত তথ্যের ভার থেকে মুক্ত করা চাই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "ভারহীন সহজের রসই হচ্ছে চিঠির রস। ⋯ এই অতিমাত্র অর্থভারহীন ধ্বনিতে মন খুশী হয়—গাছের মর্মর-ধ্বনির মত প্রাণ-আন্দোলনের এই সহজ কলরব।"[২] তথ্য যেখানে ভার হয়ে ওঠে, সেখানে পত্রাবলীও তার সহজ স্বর হারিয়ে ফেলে।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'বিলাত-প্রবাস' পত্রগুচ্ছে রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত পত্রসাহিত্যের চূড়ান্ত রসাদর্শ প্রত্যাশা করা সম্ভব নয়। তবু এই পত্রাবলীতে রচয়িতার ব্যক্তিত্ব একেবারে অনুপস্থিত নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের সৌন্দযমুগ্ধ সংবেদনশীল কবিচিত্ত, তাঁর আনন্দবেদনার বিচিত্র আন্দোলন মাঝে মাঝে বস্তুকে অতিক্রম করে প্রকাশিত হয়েছে। ইংলণ্ড যাত্রার পথে লোহিত-সাগরে উপরে চন্দ্রোদয় দেখে দ্বিজেন্দ্রলালের সৌন্দর্যমুগ্ধ কবিমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে:

"⋯তখন চাঁদ উঠিতেছে—সমুদ্রের কিনারায় লহরীময়ী নীলিমা-প্রান্তে, স্নিগ্ধ লোহিত গরিমায়, প্রশান্তভাবে চাঁদখানি দেখা দিল। মধুর-স্নিগ্ধজ্যোতি, প্রেমময় চন্দ্রমার উদয়ে, সমুদ্রের শান্ত-হৃদয় মৃদুল সমীর সন্তাড়নে দোলায়িত হইতে লাগিল। প্রেমিকের মধুর আগমনে, প্রণয়ীর মধুরতর সম্ভাষণ-চুম্বনে স্নিগ্ধ চঞ্চল-হৃদয়ে প্রেমপূর্ণ অন্তরে চুম্বনের প্রতিদান করিল। এ চুম্বন কি সুন্দর! এ চুম্বন কি সুন্দর! অপ্সরা-কণ্ঠ গীতবৎ "ইয়োলিয়" বীণাঝঙ্কারবৎ স্নিগ্ধ ও মধুর! সুন্দর জিনিস সুন্দর, কিন্তু সুন্দর জিনিসের সম্মিলন শত গুণ মধুর!"

আবেগের আতিশয্য ও ফেনস্ফীত ভাষা সত্ত্বেও লেখকের ব্যাকুলহৃদয়ের উদ্বেলিত প্রকাশটিকে অস্বীকার করা যায় না। লেখকের চিত্রবহুল ভাষা ও বর্ণনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানগুলির বর্ণনায় দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতিরঞ্জিত রোমান্টিক কল্পনা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। আভন-তীরবর্তী শেক্সপীয়রের জন্মভূমি স্ট্রাটফোর্ড নগরী, স্কট-বর্ণিত প্রাচীন কেনিলওয়ার্থ দুর্গ, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 'গাইয়ের গিরিকক্ষ' প্রভৃতি অতীত কীর্তির লীলাভূমিগুলি লেখকের কল্পনাশক্তিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রাচীন ইতিহাসকে চিত্রময়ী বর্ণনার সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গান ও ঐতিহাসিক নাটকগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইতিহাস-রসের প্রতি একটি

২। পথে ও পথের প্রান্তে—৩৭ নং।

আকর্ষণ তিনি তরুণ বয়স থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল শেক্সপীয়রীয় সাহিত্যের একজন অনুরাগী পাঠক ছিলেন। শেক্সপীয়রের সমাধিমন্দিরে উপস্থিত হয়ে এই শেক্সপীয়র-ভক্ত বাঙালী তরুণ নিজেকে তাঁর আত্মার আত্মীয় বলে মনে করে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেছেন :

"আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পার হইতে তোমার নাম গীত হইবে, দক্ষিণ মহাসাগরে তোমাব নাম প্রতিধ্বনিত হইবে, সমগ্র ইউরোপ জাতি-বিদ্বেষ ভুলিযা তোমার গুণগান করিবে। আব দূরে গঙ্গাতীরবাসী আর্যাবর্তের শ্যামল সন্তান তোমাকে ভারতীর বরপুত্র কালিদাসের প্রিয় ভ্রাতা, জগতেব প্রিয কবি বলিয়া আলিঙ্গন ও আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিবে।"

'বিলাত-প্রবাস' দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বপ্রথম গদ্যবচনা, তৎপূর্বে তিনি 'আর্যগাথা' প্রথম ভাগের কবিতা ও গানগুলি রচনা করেন। সুতরাং তাঁর সর্বপ্রথম গদ্যরচনার মধ্যে অপরিণতির চিহ্নও আছে। উচ্ছ্বাসের আতিশয্য, অপরিণত মনের অসতর্ক মন্তব্য তাঁর চিন্তাগুলির কোনো কোনো অংশে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু চিঠিগুলির মধ্যে ব্যক্তি দ্বিজেন্দ্রলালেব কতকগুলি মানস-প্রবণতা ও স্বাতন্ত্র্যসমুজ্জ্বল মনের যে ছবি পাওয়া যায, তার মূল্য অস্বীকাব করা যায না। দ্বিজেন্দ্রলাল যখন 'বিলাত-প্রবাসী' লেখেন তখন বাংলা সাহিত্যে সার্থক পত্রসাহিত্য খুব বেশী লেখা হয নি। প্রকৃতপক্ষে প্রাক্-রবীন্দ্রযুগে সাহিত্যিক পত্র বিরলদর্শন। ববীন্দ্রনাথের 'যুরোপ-প্রবাসীর পত্র' (১২৮৮) দ্বিজেন্দ্রলালের পত্রগুচ্ছেব তিন বছব আগে লেখা হযেছিল। রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম পত্রগুচ্ছেও ব্যক্তিগত মতবাদের উগ্রতা ছিল। ইঙ্গবঙ্গ সমাজ সম্পর্কে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য, বিলেতের ধনিসমাজের বিলাসিনীদের সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সামাজিক বীতিনীতি সম্পর্কে বিরূপ উক্তি—রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিঠিতে অতিরিক্ত উগ্রভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। কবি নিজেই পরবর্তীকালে এই অল্পবয়সের ঔদ্ধত্যের কথা স্মরণ করে লজ্জিত হয়েছেন।[৩] তবু 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' বিলাতপ্রবাসীর

৩। "বাঙালীর ছেলে বিলেত গেলে তার ভালো লাগার অনেক কারণ ঘটে। সেটা স্বাভাবিক, সেটা ভালোই। কিন্তু কোমর বেঁধে বাহাদুরী করবার প্রবৃত্তিতে পেয়ে বসলে উল্‌টো মূর্তি ধরতে হয়। সেটা যে চিত্তদৈন্যের লজ্জাকর লক্ষণ এবং অর্বাচীন মূঢ়তার শোচনীয় প্রমাণ সেটা বোঝবার বয়স তখনো হয় নি।"

—য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রের ভূমিকা : রবীন্দ্র-রচনাবলী (১ম খণ্ড)

চেয়ে অনেক বেশী সাহিত্যিক গুণে সমৃদ্ধ, প্রকাশরীতিও অধিকতর কলা-কৌশলমণ্ডিত।

॥ ২ ॥

কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' ও ভবভূতির 'উত্তরচরিত' অবলম্বন করে দ্বিজেন্দ্রলাল ১৩১৭-১৩১৮ সালের 'সাহিত্য' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে সমালোচনা লিখেছিলেন। এই সমালোচনাগুলিকে স্বতন্ত্র পুস্তকের আকারে প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু লেখকের জীবিতকালে তাঁর অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নি, মৃত্যুর পরে কবিপুত্র দিলীপকুমার রায় 'কালিদাস ও ভবভূতি' নাম দিয়ে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন (১০ই আগস্ট, ১৯১৫)। 'কালিদাস ও ভবভূতি' দ্বিজেন্দ্রলালের পরিণত মানসের সৃষ্টি। কালিদাস ও ভবভূতির কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। তাঁর এই প্রাসঙ্গিক আলোচনাগুলিও মনস্বিতার পরিচয় দেয়। সাহিত্য-সমালোচনা উপলক্ষে তিনি নাট্যসাহিত্য সম্পর্কে যে সমস্ত মূল্যবান মন্তব্য করেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানকালে সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনা কদাচিৎ চোখে পড়ে। সংস্কৃত সাহিত্যের পঠন-পাঠনের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে, সংস্কৃত সাহিত্য-সমালোচনাও আজ একটি অতীত অধ্যায়ে পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে এমন কি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে অনেক মূল্যবান আলোচনা করা হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা-পদ্ধতির সাহায্যে সমালোচকেরা সংস্কৃত সাহিত্যকে নূতন করে বিচার করতে শুরু করেন। প্রাচীন পদ্ধতির বিচারে তাঁরা পরিতৃপ্ত না হয়ে নূতন রীতির প্রবর্তন করলেন। এ বিষয়ে তাঁরা যে শুধু পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতির প্রবর্তন করলেন তাই নয়, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারের দ্বারা সংস্কৃত সাহিত্যের মূল্যনির্ণয় করার চেষ্টা করলেন। বেশী লেখা হয়েছে কালিদাসের শকুন্তলা সম্পর্কে। প্রথম যুগের সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নামই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিবিধ প্রবন্ধ সঙ্কলনটিতে 'উত্তরচরিত',

'শকুন্তলা ও মিরাণ্ডা', 'শকুন্তলা ও দেসদিমোনা' প্রভৃতি প্রবন্ধে কালিদাস ও ভবভূতির প্রতিভার উপর নূতন আলোকপাত করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের তুলনামূলক বিচারপদ্ধতিকেও তিনিই প্রথম সার্থকভাবে প্রয়োগ করেন। ভূদেবও 'উত্তরচরিত', 'মৃচ্ছকটিক' ও 'রত্নাবলী' সম্পর্কে আলোচনা করেন। বঙ্গদর্শন-পর্বে ও রবীন্দ্র-প্রভাবের পূর্ববর্তী যুগে অনেক কৃতকর্মা প্রবন্ধকার সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেন। রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থটি সংস্কৃত সাহিত্য বিচারকে কবিধর্মের ইন্দ্রজালস্পর্শে নূতন সৃষ্টি করে তুলেছে। বলেন্দ্রনাথ প্রধানত রবীন্দ্রনাথের পথকেই অনুসরণ করেছেন। প্রমথ চৌধুরী বিশেষ কতকগুলি দিক থেকে সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করেছেন। সংস্কৃত কবিদের রূপজ্ঞানই প্রধানত তাঁকে আকৃষ্ট করেছে।

কালিদাস ও ভবভূতি সংস্কৃত সাহিত্যের যুগল রত্ন। স্বভাবতই এই দুজনের প্রতিভা সমালোচকদের বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বে অনেকেই নানাদিক থেকে এই দুজন প্রতিভাবান কবি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের সমালোচনা পূর্ববর্তী সমালোচকদের চেয়ে অনেক বেশী বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ। এই গ্রন্থটিতে তিনি কালিদাসের শকুন্তলা ও ভবভূতির উত্তরচরিত অবলম্বন করে প্রধানত এই দুজনের প্রতিভার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। আলোচনাটিকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য তিনি বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করেছেন। আখ্যায়িকাবিন্যাস, চরিত্রচিত্রণ, নাটকত্ব, কাব্যসৌন্দর্য, রসবৈচিত্র্য, ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কার, অতি-প্রাকৃত সন্নিবেশ প্রভৃতি নানাদিক থেকে তিনি নাটক দুটির বিচার করেছেন। সমালোচনার মূলসূত্রগুলিও আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই নির্দেশ করেছেন। কালিদাস ও ভবভূতির প্রতিভার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনাও করেছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদে লেখক আখ্যায়িকা বিশ্লেষণ করেছেন। 'শকুন্তলা' নাটকের গান্ধর্ব-বিবাহ, অভিজ্ঞান ও দুর্বাশার অভিশাপের নাটকীয় তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লেখকের মতে গান্ধর্ব-বিবাহ এবং অভিজ্ঞান ও দুর্বাশার অভিশাপ বৃত্তান্তের দ্বারা কালিদাস দুষ্মন্তকে কলঙ্কের স্পর্শ থেকে রক্ষা করেছেন। এই দুক্ষেত্রেই দ্বিজেন্দ্রলাল আলোকপাত করেছেন। গান্ধর্ব-বিবাহ

সম্পর্কে লেখক বলেছেন : "তিনি পিপাসুনেত্রে শকুন্তলাকে দেখিতেছেন সত্য, তিনি এই তাপসী বালিকাকে দেখিয়াই আপনার উপভোগ্যা বিবেচনা করিতেছেন সত্য, তথাপি তিনি মনে মনে শকুন্তলার সহিত নিজের বিবাহের কথাই ভাবিতেছেন। তখন বুঝি তিনি বালিকাকে ভ্রষ্টা করিয়া পলায়ন করিতে চাহেন না, তাঁহার সঙ্কল্প সাধু।" অভিজ্ঞান ও অভিশাপ সম্পর্কেও তাঁর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য : "ক ব অভিজ্ঞান ও অভিশাপ দিয়া দুষ্মন্তকে বাঁচাইয়া লইলেন। তিনি (দুষ্মন্ত) যাইবার সময় শকুন্তলাকে যে স্বীয়নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দিলেন, তাহাতে দেখা যায় যে, দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে তখনই ধর্মদার বলিয়া স্বীকার করিলেন। আর এই অভিশাপে দেখা যায় যে, রাজার বিস্মৃতি লম্পটের বিস্মৃতি নয়, ইহা দৈব, তাহাতে রাজার হাত ছিল না।"

ভবভূতিও সীতানির্বাসন ও শূদ্রকহত্যা ব্যাপারে রামচন্দ্রকে যতদূর সম্ভব দোষমুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। সীতানির্বাসন-ব্যাপারে প্রজানুরঞ্জনরূপ কর্তব্যকেই দায়ী করা হয়েছে। ভবভূতির রামচন্দ্র কৃপা করে তরবারির দ্বারা শূদ্রককে শাপমুক্ত করেছেন। লেখকের মতে এর প্রধান কারণ হল অলঙ্কার-শাস্ত্রের নির্দেশ মেনে চলা। তিনি এখানে শেক্সপীয়রের নায়কচরিত্রগুলির কথা উল্লেখ করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাট্যকারদের নায়কচরিত্রের পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল মন্তব্য করেছেন :

"তথাপি Shakespeare কেন এরূপ করিলেন? তাহার কারণ বিবেচনা করি এই যে, তিনি ধন ও ক্ষমতায় গর্বিত ইংরাজ। পার্থিব ক্ষমতাই তাঁহার কাছে সর্বাধিক লোভনীয়। তিনি মহৎ চরিত্রের অপেক্ষা বিরাট চরিত্রে সমধিক মুগ্ধ হইতেন।... প্রাচ্য কবিগণ একটা ধর্মের মহিমায় মহীয়ান ছিলেন। তাঁহারা ক্ষমতার মোহে একেবারে ভুলিতেন না, তাহা নহে; কিন্তু চরিত্রের মাহাত্ম্য তাঁহাদের কাছে অধিক প্রীতিপ্রদ ছিল।... তাঁহারা তাই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, নায়ক যে কেবল রাজা হইবে তাহা নহে। নাটকের নায়কগণকে মহৎ করিতে হইলে, সেই রাজার সর্বগুণান্বিত হইবার প্রয়োজন আছে।"

দ্বিজেন্দ্রলালের এই মীমাংসাটি উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু সমস্যার একটি দিকের উপরেই তিনি প্রধানত আলোকপাত করেছেন। আরও গভীরে যাওয়া উচিত ছিল। শেক্সপীয়রীয় জীবনদৃষ্টির সঙ্গে সংস্কৃত নাটকারদের

দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আছে। শেক্সপীয়রের মধ্যে এক উদার অপক্ষপাত মনোভাব ও নৈর্ব্যক্তিকতা তাঁর চরিত্রগুলির মধ্যে এক সুগভীর জীবনরহস্য ফুটিয়ে তুলেছে। এর তুলনায় সংস্কৃত নাট্যকারেরা প্রধানত ভাবাদর্শের উপরেই বেশী জোর দিয়েছেন। তা ছাড়া ইংরেজি নাটক ও সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যও ঠিক এক বস্তু নয়। কালিদাস ও ভবভূতির যুগের ভারতবর্ষের ও রেনেসাঁ-দীক্ষিত ইংলণ্ডের জীবনাচরণের মধ্যেও পার্থক্যের অন্ত ছিল না।

দ্বিজেন্দ্রলাল শকুন্তলা নাটকের মিলনান্ত পরিণতি সমর্থন করলেও উত্তর-চরিতের রাম ও সীতার মিলনকে সমর্থন করতে পারেন নি। তিনি বলেছেন: "অভিনয়ে প্রদর্শিত এই গভীর করুণ দৃশ্যের পরে এই কল্পিত মিলন মৃত্যুর পরে উন্মাদের হাস্যের ন্যায় মনে হয়, পরিত্যক্ত নগরীর উপরে প্রভাতের সূর্যরশ্মির ন্যায় প্রতিভাত হয়, ক্রন্দনের পর ব্যঙ্গের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ভবভূতি কি করিবেন? মিলন করিতেই হইবে। তিনি কাব্যকলাকে বধ করিয়া অলঙ্কারশাস্ত্রকে বাঁচাইলেন।"—এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বাল্মীকির পদ্ধতিকে সমর্থন করেছেন। তিনি তাঁর 'সীতা' নাটকের পরিকল্পনায় তাই অনেক ক্ষেত্রেই ভবভূতিকে অনুসরণ করলেও পরিণতি সম্পর্কে বাল্মীকির পদ্ধতিকেই অনুসরণ করেছেন। 'সীতা' নাটক রচনার সময় যে সমাজজিজ্ঞাসা ও নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্পর্কিত প্রশ্ন তাঁর মনে উদিত হয়েছিল, ('সীতা' নাটকের ভূমিকা দ্রষ্টব্য) 'উত্তরচরিত' সমালোচনা-প্রসঙ্গে সেই প্রশ্নটিকেই তিনি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন।

নায়কচরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল দুষ্মন্ত চরিত্রের উপর আলোকপাত করেছেন। দুষ্মন্ত চরিত্র সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের বক্তব্য এই যে কালিদাস এই সাধারণ চরিত্রকে নূতনভাবে সৃষ্টি করেছেন—তিনি চরিত্রটির বিচিত্র বিকাশ দেখিয়েছেন: "যে রাজা নাটকের প্রারম্ভে সামান্য কামুকমাত্ররূপে প্রতীয়মান হইয়াছিলেন, নাটকের শেষ পর্যন্ত পড়িয়া উঠিয়া তাঁহার চরিত্রের বিচিত্র বিকাশ দেখিয়া তাঁহাকে সম্মান করিতে শিখি।" দ্বিজেন্দ্রলাল রাম চরিত্র সম্পর্কে দু-একটি সাধারণ মন্তব্য করেছেন মাত্র, কিন্তু কোনো বিস্তৃত আলোচনা করেন নি। শকুন্তলাকেও সমালোচক দোষে-গুণে মিশ্র চরিত্র বলেছেন। তাঁর মতে মহাভারতের শকুন্তলা 'কামুকী', কিন্তু কালিদাস তাঁকে প্রেমিকা ও দেবীতে পরিণত করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে

তিনি মিরাণ্ডার কথা তুলেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল মিরাণ্ডার সঙ্গে তুলনা করে শকুন্তলার প্রতি কঠোর মন্তব্য করেছেন :

"এই তৃতীয় অঙ্কে শকুন্তলার নির্লজ্জ আচরণ দেখিয়া আমরা ব্যথিত হই! হাজার হউক তিনি তাপসী! মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ না করিলে তাঁহার আচরণ আরও সংযত হইত নিশ্চয়। কেহ কেহ বলেন যে তৃতীয়াঙ্কের শেষভাগ কালিদাসের রচিত নয়; তাহা হইলেও এ অঙ্কের প্রথম অংশেও নারীর পক্ষে পুরুষের প্রেমভিক্ষা করা কুলটারই শোভা পায়।...যেখানে প্রেমালাপের পর বিবাহ প্রচলিত আছে, সেখানেও পুরুষই নারীর প্রেম যাচ্ঞা করে। আমরা Shakespeare-এ দেখি বটে যে মিরাণ্ডা ফার্ডিনাণ্ডের প্রেমভিক্ষা করিতেছেন।... কিন্তু সে ভিক্ষার মধ্যে এমন একটি সারল্য, গাম্ভীর্য ও আত্মমর্যাদা জ্ঞান আছে, যেন বোধ হয় সে ভিক্ষাই দান। এ ভিক্ষা ভিক্ষা নহে—এ একটা প্রতিজ্ঞা।"

দ্বিজেন্দ্রলালের এই মন্তব্যটি অত্যন্ত কঠোর, তিনি এ ক্ষেত্রে শকুন্তলা চরিত্রের প্রতি অবিচারই করছেন। মিরাণ্ডা ও শকুন্তলার বাইরের সাদৃশ্য যতই থাক না কেন, দুজনের মধ্যে পরিবেশগত পার্থক্য ছিল অনেকখানি—মিরাণ্ডা কোনো সামাজিক শিক্ষা পায় নি, অপরপক্ষে তপোবনবাসিনী শকুন্তলা সমাজ-অনভিজ্ঞা ছিলেন না। এই দুজনের পরিবেশগত পার্থক্যই দুটি চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তুলেছে।[৪] কিন্তু ভবভূতির সীতা চরিত্র সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল যা মন্তব্য করেছেন, তা অত্যন্ত যথার্থ। তাঁর মতে ভবভূতির সীতা নাটকের নায়িকা নন, 'কবিতার কল্পনা।' শকুন্তলা ও সীতা চরিত্রের পার্থক্য নির্ণয় বিষয়েও তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় : 'শকুন্তলা একটা চরিত্র, সীতা একটা ধারণা। শকুন্তলা সজীব নারী, সীতা পাষাণপ্রতিম'। শকুন্তলা উচ্ছল নদী, সীতা স্বচ্ছ হ্রদ।" ভবভূতির সীতা চরিত্রের চেয়ে বাল্মীকির সীতা

৪। এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য : "যদি একজন দুইটি চরিত্র প্রণয়ন করিতেন, তাহা হইলে কবি শকুন্তলার প্রণয়-লক্ষণে কি প্রভেদ রাখিতেন? তিনি বুঝিতেন যে, শকুন্তলা সমাজ প্রদত্ত সংস্কার-সম্পন্না, লজ্জাশীলা, অতএব তাঁহার প্রণয় অব্যক্ত থাকিবে, কেবল লক্ষণেই ব্যক্ত হইবে, কিন্তু মিরাণ্ডা সংস্কারশূন্যা লৌকিক লজ্জা কি তা জানে না, অতএব তাঁহার প্রণয়লক্ষণ বাক্যে অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হইবে, পৃথক পৃথক কবি-প্রণীত চিত্রদ্বয়ে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে।"—শকুন্তলা মিরাণ্ডা এবং দেসদিমোনা : বিবিধ প্রবন্ধ (প্রথম ভাগ)

চরিত্র অনেক বেশী পরিস্ফুট হয়েছে—বাল্মীকির সীতা চরিত্রে দৃঢ়তার অভাব নেই।

'কালিদাস ও ভবভূতির "নাটকত্ব" অংশটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই অংশে দ্বিজেন্দ্রলাল সংক্ষেপে নাট্যতত্ত্বের কতকগুলি মূলসূত্র আলোচনা করেছেন। ঘটনার ঐক্য, ঘটনার সার্থকতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, কবিত্ব, চরিত্রচিত্রণ, স্বাভাবিকতা প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। এই সূত্রগুলি লেখক শকুন্তলা ও উত্তরচরিতের উপর প্রয়োগ করেছেন। তাঁর মতে ঘটনার ঐক্য, চরিত্রসৃষ্টি ও অন্তর্বিরোধ চিত্রণে শকুন্তলাই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এখানেও একটি প্রশ্ন জাগে। দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যতত্ত্ব আলোচনায় পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিই অবলম্বন করেছেন। শকুন্তলা ও উত্তরচরিতকে সেই পদ্ধতি অনুযায়ীই বিচার করেছেন। এই বিচার কতদূর যুক্তিযুক্ত তাও এই প্রসঙ্গেই বিচার্য। পাশ্চাত্ত্য নাটকের মতো পাশ্চাত্ত্য নাট্যরীতিও প্রাচ্যপদ্ধতির নাট্য-সমালোচনা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যেমন, দ্বিজেন্দ্রলাল দুষ্মন্ত চরিত্রের যে অন্তর্বিরোধের কথা উল্লেখ করেছেন, তা পাশ্চাত্ত্য নাট্যসূত্রানুযায়ী প্রথম শ্রেণীর অন্তর্দ্বন্দ্ব নয়। সংস্কৃত নাটক বিচারে পাশ্চাত্ত্য নাট্যবিচার পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে আরও সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন আছে।

॥ ৩ ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদে দ্বিজেন্দ্রলাল কবিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কাব্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি পাশ্চাত্ত্য সমালোচকদের অনেকগুলি মতামত উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু এই অংশটি উদ্ধৃতিসর্বস্ব ও অপ্রাসঙ্গিক। নাটকের ক্ষেত্রে কবিত্বের সম্ভাবনা কতখানি—এইটিই প্রবন্ধকারের আলোচ্য হওয়া উচিত ছিল। তা ছাড়া, অতিরিক্ত উদ্ধৃতির ফলে কাব্যের যথার্থ স্বরূপ লক্ষণটিও ফুটে উঠতে পারে নি। কিন্তু কালিদাস ও ভবভূতির নারীসৌন্দর্য বর্ণনার পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল সূক্ষ্মরসবোধ ও পর্যবেক্ষণ-দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন· "কালিদাসের রূপবর্ণনা আলোক বটে, কিন্তু প্রদীপের রক্তবর্ণ আলোক। ভবভূতির রূপবর্ণনা শুভ্র বিদ্যুতের জ্যোতিঃ। কালিদাস যখন মাটিতে চলিয়া যাইতেছেন, ভবভূতি তখন উর্দ্ধে বিচরণ

করিতেছেন। কালিদাসের কাব্যে নারী ভোগ্যা, ভবভূতির কাছে নারী দেবী।” কালিদাসের শকুন্তলার রূপবর্ণনা ‘নাটকত্বে’র দিক থেকেই করা হয়েছে। সমালোচকের এই বিচারটিও তাঁর সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচায়ক। করুণ রসের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়েও লেখক বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন “উত্তরচরিতে করুণ রসেরই প্রাচুর্ভাব বেশী।..... কিন্তু সে কারুণ্য প্রায়ই বিলাপেই পূর্ণ। এরূপ কারুণ্য অতি সস্তাদরের।......ভবভূতির রামবিলাপ অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর। তাহা কেবল চীৎকার, কেবল অনুযোগ।” সম্ভবত, এই অংশের আলোচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।[৫]

হাস্যরসের রীতিনীতি সম্পর্কেও দ্বিজেন্দ্রলাল বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। হাস্যরসের মধ্যে তিনি প্রধানত তিনটি শ্রেণীর কথা বলেছেন—ব্যঙ্গ, পরিহাস ও হিউমার। শেক্সপীয়রের ফলস্টাফ চরিত্রকে তিনি শ্রেষ্ঠ হাস্যরসাত্মক চরিত্রের দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তিনি হাস্যরস সৃষ্টিতে কালিদাসের চেয়ে শেক্সপীয়রের অনেক উচ্চস্থান নির্দেশ করেছেন। কালিদাস ও ভবভূতির বর্ণনাশক্তি ও রসদৃষ্টির পার্থক্য সম্পর্কে লেখক বলেছেন “বস্তুতঃ বিরাট গম্ভীর ভৈরব চিত্রণে ভবভূতি কালিদাসের বহু ঊর্ধ্বে: আদিরসে কালিদাস অদ্বিতীয়।”[৬] দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু নাটকের অন্তরঙ্গ ভাব ও রস সম্পর্কে আলোচনা করেই তৃপ্ত হন নি, তিনি ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার প্রভৃতি বহিরঙ্গেরও বিচার করেছেন। ভাবানুসারী ভাষার কথা তিনি বলেছেন বটে, কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দের চেয়ে তিনি মিল কবিতার প্রতিই পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় স্মর্তব্য যে দ্বিজেন্দ্রলাল অমিত্রাক্ষরে রচিত নাটকের কাব্যসংলাপের চেয়ে গদ্যসংলাপের অধিকতর উপযোগিতার কথা স্বীকার করেছেন। কালিদাসের নাটকে অনুপ্রাসব্যবহারের লালিত্য ও মাধুর্য ভবভূতির নাটকে অনুপস্থিত। কালিদাস ও ভবভূতির ভাষা-বিচারেও

৫। “ইহার অনেকগুলি কথা সকরুণ বটে, কিন্তু আর্যবীর্যপ্রতিম মহারাজ রামচন্দ্রের মুখ হইতে নির্গত না হইয়া, আধুনিক কোন বাঙ্গালীবাবুর মুখ হইতে নির্গত হইলেই উপযুক্ত হইত।” —ঐ

৬। তুলনীয় বঙ্কিমচন্দ্রের “মধুরে কালিদাস অদ্বিতীয়—উৎকটে ভবভূতি।”—ঐ

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর মূল কথাটিকে সংক্ষেপে অথচ সুতীক্ষ্ণভাবে উপস্থাপিত করেছেন :

"ভবভূতির ভাষা সারল্যে ও লালিত্যে কালিদাসের ভাষার অপেক্ষা হীন হইলেও প্রসার সম্বন্ধে কালিদাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার রচনায় তিনি ললিত কোমলকান্ত পদাবলীও শুনাইতে পারেন, আবার জলদ-নির্ঘোষও শুনাইতে পারেন। সংস্কৃত ভাষা যে কত কত গাঢ়, গভীর হইতে পারে, তাহার চরম নিদর্শন ভবভূতির উত্তরচরিতের ভাষা।"

দ্বিজেন্দ্রলালের এই মিতবাক মন্তব্যটি যেমন অর্থগূঢ়, তেমনি মননশীলতার পরিচায়ক। তবে কালিদাস ও ভবভূতির ভাবগত পার্থক্য পূর্ববর্তী সমালোচকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।[৭] ভাষা ও অলঙ্কারের আলোচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল নিপুণ বিশ্লেষণবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন—ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা তাঁর বক্তব্যকে পরিস্ফুট করেছেন। নাটকে অতিপ্রাকৃত উপাদান (Supernatural element) সংস্থান বিষয়েও দ্বিজেন্দ্রলালের আলোচনাটি উল্লেখযোগ্য। দুর্বাসার অভিশাপের উপর প্রধানত দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই তিনি আলোচনাটির বিস্তৃত রূপ দিয়েছেন—শেক্সপীয়রের নাটকের অতিপ্রাকৃত-সংস্থানের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে দুর্বাসার অভিশাপ-বৃত্তান্তটি নাটকীয় আখ্যানবস্তুর সঙ্গে সুসঙ্গত হয় নি। আকস্মিকতার (Chance) স্থান সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য : 'গলায় মাছের কাঁটা বাধিয়াও লোকের মৃত্যু হয়। কিন্তু উচ্চ অঙ্গের নাটকে এরূপ আকস্মিক ঘটনার স্থান নাই।" শেক্সপীয়রের নাটকেও আকস্মিক ঘটনা আছে, যেমন দেসদিমোনার রুমাল হারানোর বৃত্তান্তটি। ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা মানুষের নেই—জীবনের এই ট্রাজিক সত্যকেই আকস্মিক ঘটনা যেন ফুটিয়ে তোলে—কিন্তু এই ধরনের আকস্মিক ঘটনার প্রাচুর্য নাটককে দুর্বলই করে। এ সম্পর্কে সমালোচক ব্রাডলের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য :

৭। এই প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য :

"ভবভূতি যেখানে একটিমাত্র মেঘমন্দ্র-সমাসে বিন্ধ্যপর্বতের অন্ধকার অরণ্য সম্মুখে মূর্তিমান করিয়া তুলেন, কালিদাস সেখানে প্রত্যেক লতার এবং ফুলের স্বতন্ত্র আস্বাদটুকু ছাড়িতে পারেন না।"—কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা : বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী (সাহিত্যপরিষৎ সং) পৃঃ ১৫।

"That men may start a course of events but can neither calculate nor control it, is a tragic fact. The dramatist may use accident so as to make us feel this.... On the other hand any large admission of chance into the tragic sequence would certainly weaken, and might destroy, the sense of the casual connection of character, deed and catastrophe."[৮]

দুর্বাসার অভিশাপবৃত্তান্ত সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্যটি বিচার করার প্রয়োজন। সমালোচকের মতে শকুন্তলা তাঁর পতিচিন্তায় নিমগ্না ছিলেন, এই জাতীয় চিন্তা শকুন্তলার পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক নয়, এই কারণে তাঁকে অভিশপ্ত করা মোটেই উচিত ছিল না। এ সময়ে শকুন্তলা "অনুকম্পার পাত্রী, ক্রোধের পাত্রী" নন। দুর্বাসার অভিশাপ সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন: "দুর্বাসা অভিশাপ দিতেছেন, শকুন্তলা তাঁহাকে—দুর্বাসা সম মুনিকে—অবহেলা করিয়াছেন বলিয়া। দুর্বাসার ক্রোধ পাপের প্রতি ক্রোধ নহে, নিজের লাঞ্ছনার জন্য ক্রোধ। ইহা এই অভিশাপের সহজ সরল অর্থ। অন্য অর্থ কষ্টকর।"—দ্বিজেন্দ্রলালের মতে দুর্বাসার অভিশাপের একমাত্র অর্থ দুষ্মন্তকে কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা করা। কালিদাস এ ক্ষেত্রে দুর্বাসাকে হত্যা করে দুষ্মন্তকে বাঁচিয়েছেন।

দুর্বাসার অভিশাপ সম্পর্কে এই বস্তুধর্মী যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যাটি 'কালিদাস ও ভবভূতি' গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা বিতর্কমূলক অংশ। এই অংশটির নিরপেক্ষ ও সতর্ক বিচারের প্রয়োজন। দ্বিজেন্দ্রলাল দুর্বাসার অভিশাপটিকে কোনোপ্রকার ব্যাখ্যা দেওয়ার পক্ষপাতী নন—তিনি এই ঘটনাটিকে বস্তুধর্মী দৃষ্টির সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করেছেন, কোনো তত্ত্বদৃষ্টি বা ভাবদৃষ্টির দ্বারা প্রভাবিত হন নি। এখানেও দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য ও ঋজুবলিষ্ঠ যুক্তিবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল দুর্বাসার অভিশাপটিকে পাশ্চাত্ত্য নাট্যবিচারের পদ্ধতিতেই বিচার করেছেন। প্রাচ্য নাটক বিচারে পাশ্চাত্ত্য বিচারপদ্ধতি প্রয়োগের ফলে যে জাতীয় অসামঞ্জস্য ঘটার সম্ভাবনা, এখানেও তাই ঘটেছে। অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টিকে পর্যবেক্ষণ করলে তাঁর যুক্তির যাথার্থ্য অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু কালিদাসের

৮। Shakespearean Tragedy : Bradley, Page 15.

যুগের ভারতীয় জীবনচর্যা ও আদর্শবাদের পটভূমিতেই তাঁর নাটক আলোচনা করা উচিত। এ সম্পর্কে রামায়ণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য : "বিদেশী যে সমালোচক বলিয়াছেন যে, রামায়ণে চরিত্র বর্ণনা অতিপ্রাকৃত হইয়াছে, তাঁহাকে এই কথা বলিব যে, প্রকৃতিভেদে একের কাছে যাহা অতিপ্রাকৃত, অন্যের কাছে তাহাই প্রাকৃত। ভারতবর্ষ রামায়ণের মধ্যে অতিপ্রাকৃতের আতিশয্য দেখে নাই।'[৯]

প্রত্যেক দেশের জলহাওয়া ও ভৌগোলিক রূপস্বাতন্ত্র্যের মতো তার সাহিত্যেরও বিশেষ কতকগুলি নিজস্ব লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। প্রাচীন সংস্কৃত নাটক যে পরিবেশে ও পটভূমিকায় রচিত হয়েছিল, ইউরোপীয় নাটক ঠিক সেই আবহাওয়ায় রচিত হয় নি। তাই শকুন্তলা নাটককে পূর্ণাঙ্গ নাট্য-সৃষ্টির প্রয়াস হিসাবে দেখলে 'টেম্পেস্ট'কে অর্ধপরিসমাপ্ত নাটক মনে করাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। আবার ইউরোপীয় ট্রাজেডির আদর্শ বিচার করলে রাজার প্রত্যাখ্যানের পরেই শকুন্তলা নাটকে উপসংহার টানা উচিত ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল কালিদাসের নাটকটিকে তার পরিবেশ ও পটভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে শেক্সপীয়রীয় নাট্যাদর্শ অনুসারেই বিচার করেছেন। তাই কালিদাসের অতিপ্রাকৃত সংস্থানকে তার নিতান্ত অসঙ্গত ও নাট্যবহির্ভূত ব্যাপার বলে মনে হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর পাশ্চাত্য-নাট্যরীতিপ্রভাবিত বস্তুধর্মী দৃষ্টির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাটির যাথার্থ্য উপলব্ধি করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ভাবাদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে কালিদাসের কবিমানস বিচার করেছেন, কালিদাসের প্রতিভার মূলসূত্রটি এক মৌলিক রসদৃষ্টির সাহায্যে উদ্ভাসিত করেছেন "তিনি দেখাইয়াছেন, যে অন্ধ প্রেমসম্ভোগ আমাদিগকে স্বাধিকারপ্রমত্ত করে, তাহা ভর্তৃশাপের দ্বারা খণ্ডিত, ঋষিশাপের দ্বারা প্রতিহত ও দেবরোষের দ্বারা ভস্মসাৎ হইয়া থাকে।"[১০]

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যাটি দ্বিজেন্দ্রলালের মনঃপূত হয় নি—এই জাতীয় "আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা" তাঁর স্বভাবধর্মের অনুকূল ছিল না। 'অপর এক কবি-সমালোচক এই অভিশাপের এক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সে ব্যাখ্যা এই যে, এই জাতীয় কামজনিত গুপ্ত বিবাহকে দুর্বাসা অভিশপ্ত

৯। রামায়ণ : প্রাচীন সাহিত্য।
১০। কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা : প্রাচীন সাহিত্য।

করিয়াছেন। কিন্তু ইহা তাঁহার কবি-কল্পনা। এ অভিশাপে তাহার কোন নিদর্শন নাই।" এই মন্তব্যটি থেকে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য উপলব্ধি করা যায়। দ্বিতীয়ত, মৌলিকতা মননশীলতা সত্ত্বেও সংস্কৃত নাটক বিচারে পাশ্চাত্ত্য নাট্যবিচারপদ্ধতির প্রয়োগ যে সর্বত্র সার্থক হয় না, তারও একটি প্রমাণ পাওয়া যায়। ধীবরের আখ্যায়িকা, দৈত্যবিনাশের জন্য দুষ্মন্তের স্বর্গে গমন প্রভৃতি ব্যাপার দ্বিজেন্দ্রলালের মতে "আরব্য উপন্যাস, নাটকের মজ্জাগত অংশ নহে।" কালিদাসের সঙ্গে ভবভূতির নাট্যপ্রতিভার তুলনামূলক আলোচনা করে লেখক ভবভূতির প্রতিভাকে নাট্যকারের প্রতিভা না বলে কবিপ্রতিভা বলেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের এই সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করা যায় না। ভবভূতির উত্তরচরিতে নির্বাসিতা সীতার গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপ দেওয়ার ব্যাপারটিকে লেখক 'অতিমানুষিক কল্পনা' আখ্যা দিয়েছেন, শম্বুক হত্যার ব্যাপারটিকেও তিনি উচ্চাঙ্গের কবিকল্পনা বলে স্বীকার করতে পারেন নি। তমসা ও মুরলার পরিকল্পনা ও 'ছায়াসীতা' অংশকে দ্বিজেন্দ্রলাল ভবভূতির কাব্যপ্রতিভার সর্বোত্তম সিদ্ধি হিসাবে নির্দেশ করেছেন।

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের ইতিহাসে দ্বিজেন্দ্রলালের 'কালিদাস ও ভবভূতি' একটি মূল্যবান সংযোজন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনার যে নূতন ধারা, নূতন বিচারপদ্ধতি গড়ে উঠেছিল, দ্বিজেন্দ্রলালের এই সমালোচনাগ্রন্থটি তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারী। রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' (প্রথম প্রকাশ ১৩১৪) প্রকাশের পর থেকে অনেকেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কবিকৃত বিচার ও ব্যাখ্যার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করেছেন। তাঁর নিজের উক্তি থেকেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থটির শেষদিকে তিনি চন্দ্রনাথ বসুর 'শকুন্তলাতত্ত্ব' (১২৮৮) ও রবীন্দ্রনাথের শকুন্তলাসম্পর্কিত আলোচনার প্রতি কটাক্ষ করেছেন :

"...আমার শিক্ষা, বুদ্ধি ও ধারণা অনুসারে উভয় নাটকের দোষগুণ বিচার করিয়াছি। কোনও নাটকের আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করি নাই অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও নানা ব্যক্তি করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন যে, দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা আর কেহই নহে, পুরুষ ও প্রকৃতি।

কেহ বা বলিয়াছেন, এ নাটকে দেখান হইয়াছে প্রেমে কাম মিলন সম্পাদন করিতে পারে না, তপস্যা তাহা সাধন করে। যে কেহ ইচ্ছা করিলে এই দুইখানি নাটকের শতপৃষ্ঠাব্যাপিনী আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা লিখিতে পারেন। আমি এরূপ কষ্টকল্পিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার পক্ষপাতী নহি, এবং আংশিক সাদৃশ্যকে আধ্যাত্মিক বা আধিভৌতিক কোন ব্যাখ্যাই বিবেচনা করি না।"

দ্বিজেন্দ্রলালের শিল্পীমানসের মধ্যে একটি প্রোজ্জ্বলবুদ্ধি যুক্তিনিষ্ঠ মন ছিল, সেই মনের আলোকেই আলোচ্য বস্তু উদ্ভাসিত হয়েছে—তিনি কোনো আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আরোপ করতে চান নি। তাই তাঁর সমালোচনার মধ্যেও বিচারের দিকটাই বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় বস্তুর রসব্যাখ্যাই প্রধান স্থান অধিকার করেছে। একে শুধু "কষ্টকল্পিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা" নাম দিয়ে উড়িয়ে দেওয়াও চলে না। কারণ সাহিত্য-সমালোচনায় বিচারের মতো ব্যাখ্যারও একটি স্থান আছে।[১১] রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় কবিহৃদয়ের রসস্পন্দন লীলায়িত হয়ে উঠেছে। সমালোচনার বিষয় কবির হৃদয়রাগে রঞ্জিত হয়ে এক নূতন সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করতে গিয়ে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে বসেন নি, সমগ্রভাবে রসাস্বাদন করেছেন। কালিদাসের কবিকৃতিকে তিনি কবিমন দিয়েই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কালিদাসের কাব্যজগৎ তাঁর রসিকচিত্তকে স্পন্দিত করেছে—সেই স্পন্দনের লীলামাধুরীই তাঁর সমালোচনায় এক অপরিসীম লাবণ্যের সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত সাহিত্য-সমালোচনায় তাই সংস্কৃত সাহিত্য অবলম্বন করে তাঁরই রোমাণ্টিক কবিচিত্তের দীপ্তি উদ্ভাসিত হয়েছে।[১২] দ্বিজেন্দ্রলালের সমালোচনাপদ্ধতি বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণ-

---

১১। "As already implied, criticism may be regarded as having two different functions—that of interpretation and that of judgement."

—An Introduction to the Study of Literature . Hudson, Page 267.

১২। "প্রাচীন সাহিত্যের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ কেবলই যে প্রাচীন সাহিত্যকে নূতন নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন, তাহার একটা প্রধান কারণ এই যে, রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ রোম্যাণ্টিক কবি, রোম্যাণ্টিক মনের কাছে দূরত্বের অস্পষ্ট আবরণে রহস্যময় অতীত সর্বদাই মহিমান্বিত। অতীতের এই মহিমা কিছুটা থাকে হয়ত বস্তুর ভিতরে, কিছুটা সৃষ্টি করিয়া লয় বর্তমান-বিমুখ কবির ভাবুক চিত্ত।"

—বাংলা সাহিত্যের একদিক (দ্বিতীয় সং) : শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পৃঃ ১৮-৩১৮৪।

প্রধান, সেখানে বস্তুবিশ্লেষণই প্রাধান্য লাভ করেছে, লেখকের অন্তর্গূঢ় মানস-লীলার রস সেখানে প্রধান হয়ে ওঠে নি। কিন্তু যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণে ও মৌলিক চিন্তার সুস্পষ্টতায় দ্বিজেন্দ্রলালের এই সমালোচনা-গ্রন্থটির মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

॥ ৪ ॥

সাময়িক পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত গদ্যরচনাগুলিকে দ্বিজেন্দ্রলাল একত্রিত করে 'চিন্তা ও কল্পনা' নাম দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। মুদ্রণকার্য অনেকখানি অগ্রসরও হয়েছিল, কিন্তু গ্রন্থটি প্রকাশের পূর্বেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। পরবর্তীকালে বসুমতী-সাহিত্যমন্দির থেকে প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্র-গ্রন্থাবলীতে দ্বিজেন্দ্রলালের এই বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধগুলির মধ্যে অধিকাংশই সঙ্কলিত হয়েছিল। আলোচ্য গ্রন্থটিতে ১২৯০ সাল থেকে ১৩২০ সাল পর্যন্ত এই ত্রিশ বৎসর কালের বিচ্ছিন্ন গদ্যরচনাগুলিই একত্রিত করা হয়েছিল। নব্যভারত, ভারতী, সাহিত্য, বঙ্গদর্শন, প্রবাসী, নাট্যমন্দির, বাণী, জন্মভূমি, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর এই রচনাগুলি প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের বিচ্ছিন্ন গদ্যরচনাবলীকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: (ক) সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ, (খ) সাহিত্য-সংস্কৃতিবিষয়ক প্রবন্ধ, (গ) বিবিধ হাস্যরসাত্মক গদ্যরচনা।

বিলাত-যাত্রার পূর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল 'নব্যভারত' পত্রিকায় দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। যতদূর জানা যায়, 'বাগ্মী ও সংবাদপত্র' (চৈত্র ১২৮৯, আর্যদর্শন) প্রবন্ধটিই দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বপ্রথম গদ্যরচনা। দ্বিজেন্দ্রলালের দেওঘর-প্রবাস তাঁর সাহিত্যিক জীবনের উন্মেষলগ্নের একটি প্রধান ঘটনা। এই সময়েই তাঁর রচনাবলী সর্বপ্রথম পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই সময়ে লেখা 'প্রেম কি উন্মত্ততা' প্রবন্ধটিতে (নব্যভারত, পৌষ, ১২৯০) দ্বিজেন্দ্রলাল প্রেমের স্বরূপ ও প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রবন্ধকারের মতে প্রেম কর্তব্যের বিরোধী নয়—"অনুরাগ কর্তব্যের শত্রু নহে। বরং অনুরাগই কর্তব্যের প্রাণ।" কর্তব্যের মূলে প্রেম না থাকলে সে কর্তব্যপালন সম্পূর্ণ হয় না। ক্ষমতালিপ্সা ও যশোলিপ্সার সঙ্গে তিনি প্রেমকে তুলনা করেছেন।

তাঁর মতে প্রেমের শক্তি ক্ষমতালিপ্সা ও যশোলিপ্সার চেয়ে অনেক বড়—"...অনুরাগের গতি অপ্রতিহত। ইহার শক্তি অদম্য, অনিবার্য। অনুরাগ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে কুণ্ঠিত নহে। কারণ অনুরাগ ক্ষমতাকাঙ্ক্ষা ও যশোলিপ্সার ন্যায় পরিণামদর্শী নহে।" অনুরাগহীন কর্তব্য শুষ্ক ও নীরস। প্রেম বিবেচনার চেয়েও বড। প্রেম উন্মত্ততা নয়, যদি তা আদৌ উন্মত্ততা হয় তবে সে উন্মত্ততাও অপার্থিব। দ্বিজেন্দ্রলালের এই প্রথম যুগের প্রবন্ধটি অপরিণত মনের ভাবোচ্ছ্বাসে পূর্ণ। মনে হয় যেন তিনি উচ্চমঞ্চে বসে পাঠকসাধারণকে সম্বোধন করে কিছু শিক্ষা দিচ্ছেন—অন্তত, রচনারীতিটি তেমনি। বক্তব্য তেমন কিছুই নয়, শুধু সুলভ ভাবোচ্ছ্বাস ও ফেনস্ফীত ভাষায় তাকে বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে ঐ যুগের প্রবন্ধরচয়িতাদের, বিশেষত কালীপ্রসন্ন ঘোষের (১৮৪৩—১৯১১) রচনারীতির প্রভাব আছে, কিন্তু কালীপ্রসন্নের মননশীলতা এখানে অনুপস্থিত। "হৃদয় ও মন" প্রবন্ধটিও (নব্যভারত : ভাদ্র, ১২৯০) অনেকটা এই জাতীয়। বক্তব্যকে সুমিত ও সুস্পষ্ট না করে সুলভ ভাবোচ্ছ্বাসের দ্বারা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলা হয়েছে।

বিলাত থেকে ফিরে আসার পর প্রথম দিকে প্রধানত 'ভারতী' পত্রিকাতেই তাঁর রচনাবলী প্রকাশ করেন। 'নূতন ও পুরাতন' (ভারতী : পৌষ, ১৩০২) প্রবন্ধের মধ্যে লেখক নানা উদাহরণ দিয়ে পুরাতনের বিদায় ও নূতনের আগমন প্রমাণিত করেছেন। পুরাতন যে 'বিশুদ্ধ মন্দ' এ কথাও তিনি স্বীকার করেন না। পুরাতনের প্রতি লেখকের মোহও কম নয় "পুরাতনের গাম্ভীর্য-মাধুর্য-সৌন্দর্যগুলি যদি ধরিয়া রাখিতে পারা যাইত, ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার এই উদ্দাম বিকাশের সহিত যদি গ্রীসীয় স্থপতিকার, ইটালীর ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্প, জার্মানীর সঙ্গীত ও ইংলণ্ডের কবিত্ব মিলাইতে পারা যাইত।" তবু নূতনই যে জীবনের অগ্রগতি এ কথাও তিনি অস্বীকার করেন নি। প্রবন্ধটির মধ্যে হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। বিলাত থেকে ফিরে আসার পর দ্বিজেন্দ্রলালকে যে সামাজিক নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল, তার একটি তীব্র প্রতিক্রিয়াই এই প্রবন্ধটির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। তিনি সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন "হিন্দুজাতির জাতীয়ত্ব অনেককাল গিয়াছে। হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকলাপ মাত্র অবশিষ্ট আছে। শিক্ষিত হিন্দু হাজার টিকি রাখুন, ফোঁটা কাটুন, ভগবদ্‌গীতার পাতা উল্টান,

সে কেবল ইংরাজ বিদ্বেষিতা বা আপনার জিনিষে মমতার নামান্তর মাত্র।" প্রবন্ধটির আরম্ভ একটু নূতন ধরনের, গল্পচ্ছলে শুরু করা হয়েছে,—কিন্তু ক্রমশ লেখক গম্ভীর হয়ে উঠেছেন। প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশটিতে কিছু পুনরুক্তি-দোষ ঘটেছে। তবে বঙ্কিমযুগের প্রবন্ধরচয়িতাদের রচনারীতি ও ভাষার প্রভাবকে তিনি এখানে কাটিয়ে উঠেছেন।

'ইংরাজি ও বাঙ্গালা পোষাক' প্রবন্ধটিতে (ভারতী . চৈত্র, ১৩০২) লেখক ইংরেজি ও বাংলা পোশাকের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। অবস্থাভেদে ও দেশকালভেদে তিনি পোশাক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে সৌন্দর্যের দিক থেকে বাঙালীর পক্ষে ধুতি-চাদরই শ্রেষ্ঠ পোশাক, তবে সুবিধা ও সভ্যতার জন্য 'পিরাণে'র দরকার। তিনি কোট-প্যাণ্টেরও সুবিধা-অসুবিধার কথা বলেছেন। অবস্থার সঙ্গে অসঙ্গত বেশভূষা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকেও রেহাই দেন নি : "তথাপি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইহা অপেক্ষাও হাস্যকর ব্যাপার 'শান্তি' নাম্নী বীর বঙ্গনারীর সাড়ী পরিয়া অশ্বারোহণ ও মলের গুঁতা দিয়া অশ্বপরিচালনার কিম্ভূতত্ব বঙ্কিমবাবুর ন্যায় একজন সুনিপুণ সৌন্দর্যতত্ত্বজ্ঞ 'আর্টিস্টের' হৃদয়ঙ্গম হইলা না।" এই প্রসঙ্গে 'বিলাত প্রবাস' পত্রগুচ্ছের মধ্যেও দ্বিজেন্দ্রলালের পোশাক সম্পর্কিত আলোচনা উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে অবশ্য 'হাসির গান'-এ তিনি বাঙালীর পোশাক-পরিচ্ছদগত সাহেবীয়ানাকে ব্যঙ্গই করেছেন।

'মানভিক্ষা' প্রবন্ধটির (ভারতী কার্তিক, ১৩০২) মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের সামাজিক চিন্তার সঙ্গে রাজনৈতিক চিন্তারও কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। মৌখিক স্বদেশহিতৈষণা ও বক্তৃতাসর্বস্ব দেশপ্রেমের আদর্শকে তিনি ব্যঙ্গই করেছেন। পূর্বপুরুষের দোহাই দিয়েই নিজেদের লুপ্ত সম্ভ্রম ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়—লজ্জাজনক শূন্যগর্ভ আত্মপ্রচার আত্মাবমাননার নামান্তর মাত্র। এই প্রসঙ্গে লেখকের একটি মন্তব্য লক্ষণীয় . "প্রতাপসিংহের স্বদেশানুরাগ টাউন হলে বক্তৃতা করিয়া বা খবরের কাগজে লিখিয়া প্রমাণ করিতে হয় নাই ; তাঁহার স্বার্থত্যাগই তাহার জীবন্ত জাগ্রত অকাট্য প্রমাণ।"

'জাতিভেদ' প্রবন্ধে (সাহিত্য : শ্রাবণ, ১৩১৪) দ্বিজেন্দ্রলাল জাতিভেদের স্বপক্ষে তথা বিপক্ষে নানা যুক্তি দেখিয়েছেন। বাদী ও প্রতিবাদীর যুক্তিগুলি

তিনি সূত্রাকারে ও বিশ্লেষণের সঙ্গে সাজিয়েছেন। প্রবন্ধের শেষ দিকে তিনি দুই বিরুদ্ধ মতের মধ্যে একটি সমন্বয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। ইংরেজদের সঙ্গে হিন্দুদের জাতীয় ভাবাদর্শের কোনো মিল নেই, সুতরাং পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার দিকে চেয়ে ও অন্য কোনো বিচার না করে জাতিভেদের শুধু দোষকীর্তন করলেই চলবে না—প্রবন্ধকার এই মত পোষণ করেন। তিনি বলেছেন: "এক জাতির পক্ষে যা হিতকর, আর এক জাতির পক্ষে তা হিতকর নাও হতে পারে।" কিন্তু এ কথাও বলেছেন "তবে জাতিভেদ এখন যেভাবে বর্তমান আছে, সেভাবে সে কখনই থাকতে পারে না।··· আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ধীরে ধীরে জাতিভেদকে সঙ্গততর ভিত্তির উপর খাড়া করা।"

দ্বিজেন্দ্রলাল 'নেতা ও নেতৃত্ব' (শক্তি : ১২৯০) নাম দিয়েও একটি সমাজ ও রাজনীতিসম্পর্কিত প্রবন্ধ লিখেছিলেন।[১৩] 'অবরোধ প্রথা' নামক আর একটি সামাজিক প্রবন্ধের কথাও দ্বিজেন্দ্রজীবনীকার দেবকুমার রায় চৌধুরী উল্লেখ করেছেন।[১৪] তিনি সেই অসম্পূর্ণ প্রবন্ধের যেটুকু উদ্ধার করেছেন, তা থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের সামাজিক মতামতের পরিচয় পাওযা যায়। এই প্রবন্ধে তিনি অবরোধ প্রথাকে সমর্থন করতে পারেন নি—মেয়েদেব হৃদয়-মনের বিকাশের জন্য এই প্রথার যথোচিত পরিবর্তনের কথা বলেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় ও নাটকেও অনেক সামাজিক মতামতের পরিচয় পাওযা যায়। প্রবন্ধগুলিতে তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

দ্বিজেন্দ্রলাল সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বিলাত থেকে ফিরে আসার পর দ্বিজেন্দ্রলাল 'ইংরাজি ও হিন্দু সঙ্গীত' (ভারতী · বৈশাখ, ১৩০৩) নামে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধটি ইংরেজি ও হিন্দু সঙ্গীতের একটি তুলনামূলক সমালোচনা। প্রবন্ধটির প্রথমে লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন—ইংরেজি গানের

১৩। "১৮৮৩ সনের ২৮শে অক্টোবর দ্বিজেন্দ্রলাল দেওঘরে 'সুরভি'-সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ বসুকে লিখিযাছিলেন :—"I have written an article on নেতা and নেতৃত্ব in the শক্তি ...It is in the last no of the শক্তি।"

—সাহিত্য-সাধক চরিতমালা (ষষ্ঠ খণ্ড) গ্রন্থসংখ্যা ৬৯ : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৪। দ্বিজেন্দ্রলাল (দ্বিতীয় সংস্করণ) : দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৫১৭-৬০৩।

উপর তাঁর 'আন্তরিক ঘৃণা' ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে বিরাগ অনুরাগে পরিণত হয়েছিল। প্রবন্ধটিতে সংক্ষেপে অথচ সুন্দর কয়েকটি উপমার সাহায্যে তিনি বক্তব্যটিকে সাজিয়েছেন। ইংরেজি ও হিন্দু সঙ্গীত—দুদিকেই তাঁর অধিকার কতখানি ছিল তার প্রমাণ এই প্রবন্ধটি। দ্বিজেন্দ্রলাল যখন এই প্রবন্ধটি রচনা করেন, তখনও বাংলা সাহিত্যে যথার্থ সঙ্গীতসমালোচনার শৈশবকাল মাত্র। কিন্তু সেই সময়েই তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতসমালোচনায় মনস্বিতার পরিচয় দিয়েছেন। কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ না এনে তিনি উপমা ও উৎপ্রেক্ষার দ্বারা বক্তব্যকে সাহিত্যিক প্রবন্ধের উপযুক্ত করে তুলেছেন।

'বাঙ্গলার রঙ্গভূমি' (ভারতী : মাঘ, ১৩০২), 'অভিনেতাব কর্তব্য' (নাট্যমন্দির : ভাদ্র, ১৩১৭) প্রবন্ধ দুটি প্রধানত দ্বিজেন্দ্রলালের মঞ্চসম্পর্কিত অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এর মধ্যে প্রথম প্রবন্ধটির একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। প্রবন্ধটিতে তৎকালীন রঙ্গালয়ের একটি প্রধান সমস্যার আলোচনা করা হয়েছে। তখনকার দিনে অনেক ভদ্রলোকই থিয়েটার যাওয়ার বিরোধী ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালও তাঁদের মতামতকে একেবারে অস্বীকার করেন নি—তিনি বলেছেন যে এতে যুবকদের নৈতিক বিকৃতির সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। কিন্তু এর জন্য রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষদের দোষ দেওয়া যায় না। স্ত্রী-চরিত্র বর্জন করা সম্ভব নয়, অথচ পুরুষ বা বালকের দ্বারাও স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয় করালে নানা সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়, অভিনয়ও জমে না। অথচ 'শিক্ষিতা, সংযতা, দৃঢ়চরিত্রা কুলনারীরাও রঙ্গালয়ে যোগ দিতে সম্মতা হন না। এর ফলে বাধ্য হয়ে রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষদের বাধ্য হয়ে 'নিষিদ্ধ পল্লী' থেকে অভিনেত্রী সংগ্রহ করতে হয়।[১৫]

১৫। তখনকার দিনে অভিনেত্রী সংগ্রহের ব্যাপারটি যে কেমন মারাত্মক ব্যাপার ছিল, তার বর্ণনা দিয়েছেন একজন নট ও নাট্যকার :

"এই অভিনেত্রী অন্বেষণ ব্যপদেশেই এই সহরের কোন নিষিদ্ধ পল্লীতে প্রথম পাদক্ষেপ করিতে সাহসী হই। এইরূপ ঘৃণিত পল্লীতে প্রবেশ আর পল্লীর রকমারী বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙান, ইহার মধ্যে যে কি সঙ্কোচ, কি ভয় এবং সর্বোপরি কি ঘৃণা সহজেই মনকে মলিন ও মুখকে আরক্তিম করিয়া তুলিত, তাহা—ভগবান করুন—পতিতার উদ্ধারকামী কোন সহৃদয় ভদ্রসন্তানকে যেন ঠকিয়া শিখিতে না হয়!"—রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর : অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১২-১৩।

দ্বিতীয়ত, থিয়েটারের কল্যাণে এই শ্রেণীর নারীদের কিছু স্বাধীন জীবিকার ব্যবস্থাও হয়েছে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল বালকদের থিয়েটারে যাওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন নি। যুবকদের মধ্যে যদি কারো থিয়েটার দেখে চিত্তবিকৃতি ঘটে তা হলে দোষ যুবকেরই। দ্বিজেন্দ্রলাল মনে করেন যে "থিয়েটার বঙ্গীয় যুবকের morality-র একরকম safety value স্বরূপ কার্য করে।" প্রবন্ধটিতে তিনি 'অভিনেত্রীকুল'কে লোপ না করে, যুবকদের মধ্যেও নৈতিক শিক্ষার প্রবর্তন করতে বলেছেন। প্রবন্ধটি মূলত রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষদের স্বপক্ষে বলা হলেও তৎকালীন রঙ্গমঞ্চের একটি যথার্থ চিত্র পাওয়া যায়—একটি প্রধান সমস্যার উপরেই তিনি আলোকপাত করেছেন।

কবি নবীনচন্দ্রের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল, এই শ্রদ্ধার ফলেই 'তারাবাই' নাটকের পাণ্ডুলিপি নবীনচন্দ্রকে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি তাঁর মতামত চেয়েছিলেন। নবীনচন্দ্রের মৃত্যুর পর রামমোহন লাইব্রেরিতে যে স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়, দ্বিজেন্দ্রলাল তার সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির লিখিত ভাষণটি 'নবীনচন্দ্র' নাম দিয়ে মুদ্রিত হয় (সাহিত্য মাঘ, ১৩১৫)। প্রবন্ধটিকে নবীনচন্দ্রের প্রতিভার সামগ্রিক আলোচনা বলা যায় না। তিনি হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্যপ্রতিভাকে বিস্তৃতভাবে তুলনা করেন নি, কিন্তু সামান্য একটি মন্তব্য থেকেই দুজনের প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করা যায় : "...আমার যতদূর স্মরণ হয়, তখনকার পদ্য রচয়িতারা হেমবাবুর তূরী-নিনাদের অপেক্ষা নবীনচন্দ্রের এস্রাজের ঝঙ্কারই সমধিক ভালবাসিতেন এবং তাহার অনুকরণ করিতেই সমধিক প্রয়াসী হইতেন।" দ্বিজেন্দ্রলাল প্রসঙ্গক্রমে নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের কথা উল্লেখ করেছেন। নবীনচন্দ্রের কাব্যের ঐতিহাসিকত্ব সম্পর্কে বিরোধী সমালোচকদের কথার জবাব দিয়েছেন : "নবীনবাবু কবি ছিলেন, তিনি ঐতিহাসিক তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে বসেন নাই।" 'নবীনচন্দ্র' প্রবন্ধটিতে দ্বিজেন্দ্রলাল নবীনচন্দ্রের কাব্যপ্রতিভার আলোচনা না করে তাঁর সঙ্গে নবীনচন্দ্রের ব্যক্তিগত সম্পর্ককেই সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত উপন্যাস 'গোরা' প্রকাশিত হওয়ার পর দ্বিজেন্দ্রলাল তার একটি সমালোচনা লেখেন (বাণী : আশ্বিন-কার্তিক, ১৩১৭)। প্রবন্ধটি 'গোরা' উপন্যাসের একটি প্রশংসামূলক আলোচনা। প্রবন্ধকার

প্রধানত 'গোরা' উপন্যাসের চরিত্রগুলির উপরেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। জন্মবৃত্তান্ত জানার পর 'গোরা' চরিত্রের পরিবর্তনটিকে সমালোচক বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করেছেন—"কবি অসামান্য কৌশলে দেখাইয়াছেন যে, এরূপ স্বার্থসেবা কি জীর্ণভিত্তি!" দ্বিজেন্দ্রলাল প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথের মূল লক্ষ্যটির কথাও আলোচনা করেছেন। কিন্তু গোরা উপন্যাসে সামাজিক ও ধর্মনৈতিক যত বিতর্কই থাক না কেন, এ সবকে ছাপিয়ে তা অনন্যসাধারণ শিল্পকর্মেই পরিণত হয়েছে।

'খুকুমণির ছড়া' (প্রদীপ : অগ্রহায়ণ, ১৩০৬) প্রকৃতপক্ষে একটি পুস্তক-সমালোচনা (Book-review)। বইটি বাংলাদেশের সুপ্রচলিত ছেলেভুলানো ছড়ার একটি সঙ্কলন। প্রবন্ধটির রচনারীতির মধ্যে একটি সহজভাব ও কোমলতা আছে, যা বিষয়ের সম্পূর্ণ অনুকূল। সমালোচক ছড়াগুলির কাব্যগুণ বিশ্লেষণ করেন নি—কিন্তু শিশুমনের বিচিত্র আকাঙ্ক্ষার একটি সহজ-সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন। ছড়াগুলিকে তিনি বিষয়ানুসারে নানাভাগে ভাগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'লোকসাহিত্য' (১৩১৪) গ্রন্থে এই জাতীয় রচনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ছড়া বা রূপকথার জগৎটিকে তাঁর সূক্ষ্ম সুকুমার কবিকল্পনার সাহায্যে রূপায়িত করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল বস্তু-বিচার করেছেন বটে, কিন্তু বস্তুকে হৃদয়ের রঙে রঞ্জিত করতে পারেন নি—তাই এই জাতীয় আলোচনা যত সুন্দরই হোক না কেন, 'নূতন সৃষ্টি' হয়ে উঠতে পারে নি।

'উপমা' প্রবন্ধটিতে (সাহিত্য: বৈশাখ, ১৩১৪) দ্বিজেন্দ্রলাল উপমা সম্পর্কেই আলোচনা শুরু করে, রূপক এবং দুর্বোধ্য কাব্য প্রসঙ্গে প্রবন্ধটি শেষ করেছেন। শ্রেষ্ঠ কবিদের কাব্যে অনেক সার্থক উপমা আছে, কিন্তু "যদি এই কবিগণ কেবল উপমা-সর্বস্বই হতেন, তাহলে তাঁরা কবি হতেন না।" লেখক উপমার প্রয়োজনীয়তাকে তিনভাগে ভাগ করেছেন—প্রথমত, উপমার দ্বারা ভাবকে স্পষ্ট করা যায়; দ্বিতীয়ত, উপমার দ্বারা প্রাকৃতিক নিয়মের একটি সামঞ্জস্য দেখানো হয়; তৃতীয়ত 'শুদ্ধ সৌন্দর্য' হিসাবেও উপমার ব্যবহার করা হয়। তৃতীয় শ্রেণীর উপমার উদাহরণ হিসাবে লেখক শেলীর 'স্কাইলার্ক' ও শিবনাথ শাস্ত্রীর 'পুষ্প'-এর কথা উল্লেখ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল গদ্যপ্রবন্ধে উপমা ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন না—তাঁর মতে প্রবন্ধের ভাষা হবে

উপমাবিরল ও যুক্তিপ্রধান : ···"যাঁরা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখক (যেমন এমার্সন স্পেন্সার, মিল, রস্কিন ইত্যাদি ; কার্লাইল গদ্যে কবি ছিলেন।) তাঁরা মোটেই উপমাপ্রিয় নন। আমাদের দেশের দুএকজন প্রবন্ধ রচয়িতা বড়ই অধিক উপমা ব্যবহার করেন।" প্রবন্ধের ভাষা যুক্তির ভাষা হওয়ার প্রয়োজন, অলঙ্কারের আতিশয্য বক্তব্যকে অনেক সময় আচ্ছন্ন করে। কিন্তু গদ্য যেখানে কবিতার সমভূমিতে আরোহণ করে সেখানে গদ্যের চলার ছন্দেও স্বাভাবিকভাবে অলঙ্কারে নূপুর বেজে ওঠে—রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রবন্ধেই গদ্যের এই বাজরাজেশ্বর মূর্তি চোখে পড়ে। প্রবন্ধটির শেষ দিকে দ্বিজেন্দ্রলাল রূপক আলোচনা প্রসঙ্গে দুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট কাব্যের কথা উল্লেখ করেছেন : "অনেক ব্রাউনিং শিষ্য এই রূপক লিখবার জন্য বড়ই ব্যস্ত। ইচ্ছা করলে সোজা কথায় বক্তব্যটি প্রকাশ করতে পারতেন। কিন্তু করবেন না। তাঁরা কবিতাকে দুরূহ করে একটি আমোদ উপভোগ করেন।"—এ হল দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যাদর্শের কথা, এবং 'ব্রাউনিং শিষ্য"টি যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ নন, তাও বেশ বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যাদর্শের পার্থক্য ও মতবিরোধ তখনকার বাংলাদেশের এক ঐতিহাসিক ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই সাহিত্যিক মতবিরোধ সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি থেকে ('কাব্যের অভিব্যক্তি' প্রবাসী, কার্তিক, ১৩১৩, 'কাব্যের উপভোগ' : বঙ্গদর্শন, মাঘ, ১৩১৪ ; 'কাব্যে নীতি' সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬) দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যাদর্শের পরিচয় পাওয়া যায় [এ সম্পর্কে 'রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল' নামক অধ্যায়টিতে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে]।

॥ ৫ ॥

দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকটি হাস্যরসাত্মক গদ্যরচনা আছে। তাঁর সর্বপ্রথম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক গদ্যরচনা 'একঘরে'। 'একঘরে' নির্মম স্যাটায়ার। এই পুস্তিকাটিতে দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা সময় সময় সংযমের মাত্রা অতিক্রম করেছে। একঘরে' পুস্তিকার কোনো সাহিত্যিক মূল্য নেই—কিন্তু বিদ্রূপাত্মক রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের যে প্রবণতা ছিল, তা অস্বীকার করা যায় না। তখনকার কোনো কোনো পত্রিকা দ্বিজেন্দ্রলালের বিদ্রূপরসসৃষ্টির ক্ষমতার কথাও উল্লেখ

করেছেন।[১৬] 'চিন্তা ও কল্পনা'র মধ্যে 'বক্তৃতার সমালোচনা' ও 'বক্তৃতার নমুনা' নামক দুটি ছোট ছোট রসরচনা সঙ্কলিত হয়েছে। রচনা দুটির মধ্যে গম্ভীর সুরে উদ্ভট তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। আমাদের উৎকট গবেষণা-বৃত্তি ও উদ্ভট পাণ্ডিত্যকে শ্লেষাত্মক মন্তব্যের সাহায্যে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। অসমাঞ্জস্যকর তথ্যের বিচিত্র সংমিশ্রণে লেখক হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। লেখক ইচ্ছা করেই রচনারীতিকে অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য করে তুলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্য' গ্রন্থের প্রভাব আছে, কিন্তু 'লোকরহস্যে'র ঔজ্জ্বল্য, তীক্ষ্ণ রসবোধ ও শিল্পধর্ম এখানে অনুপস্থিত।

'গল্পের নমুনা' (সাহিত্য · চৈত্র, ১৩০৬) ও হরিপদর ধ্রুপদ শিক্ষা (ভারতবর্ষ : ভাদ্র, ১৩২০)—এই দুটি রচনা ছোটগল্পের ঢঙে লেখা, কিন্তু ঠিক ছোটগল্পও নয়। ছোটগল্পের মতো আখ্যায়িকা আছে বটে, কিন্তু পুরোপুরি গল্পরসের আস্বাদন নেই—একটি সতর্ক সমালোচনাত্মক দৃষ্টি গল্প দুটিকে জমিয়ে তুলতে দেয় নি। 'গল্পের নমুনা' রচনাটিতে সম্ভবত তৎকালীন সুলভ মিলনবিরহপূর্ণ রোমান্টিক আখ্যায়িকাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে—নীলমণি ও পাচির কাহিনী উপলক্ষ মাত্র। গল্পের শেষে লেখক বলেছেন, "পাচির সম্বন্ধে এই বক্তব্য যে, নভেলে হইলে যেরূপ বিচ্ছেদান্তে হয়—নীলমণির সহিত তাহার বিবাহ হইত, অথবা সে যোগিনী হইয়া হিমালয়ের প্রান্তদেশে একাকিনী যোগাভ্যাস করিত, সেরূপ কবিল না। তাহার যথাসময়ে অসগোত্রে বিবাহ হইয়া গেল এবং সে পরিশেষে পঞ্চ পুত্রকন্যার মাতা হইয়া পতিব্রতা হইয়া, সংসারধর্ম প্রতিপালন করিতে লাগিল।"—লেখকের এই শ্লেষাত্মক উপসংহারটি তাঁর বক্তব্য ও মনোভাবকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে।

'হরিপদর ধ্রুপদ শিক্ষা'ও একটি পূর্ণাঙ্গ গল্প নয়,—হাস্যরসাত্মক নকশা। হরিপদর ধ্রুপদ শিক্ষাকে কেন্দ্র করে তার সম্ভব অসম্ভব সমস্ত অসঙ্গতির রন্ধ্রপথ আবিষ্কার করা হয়েছে। ঘটনাগুলিকে কিছু অতিরঞ্জিত করে পরিহাসরসকে ঘনীভূত করে তোলা হয়েছে। হরিপদব ধ্রুপদের খ্যাতি সম্পর্কে লেখক বলেছেন : "হরিপদর ধ্রুপদের খ্যাতি ক্রমে ক্রমে দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া

১৬। "'আর্যাবর্ত' ঐ পুস্তকের ভাষায় দোষ দেখাইয়াছেন—মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন, কিন্তু স্বীকার করিয়াছেন—ঐ পুস্তকে 'দ্বিজেন্দ্রলালের পরিহাস-ক্ষমতার—বিদ্রূপপ্রিয়তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।"—দ্বিজেন্দ্রলাল : নবকৃষ্ণ ঘোষ, পৃঃ ৪৯-৫০।

পড়িল। মাতারা ছেলে কাঁদিলে বলিত, "ঐ আসছে হরিপদ।" অমনই সে আসিয়া মাতৃবক্ষে মুখ লুকাইত। এক প্রৌঢ়া স্ত্রীলোককে ভূতে পাইয়াছিল। হরিপদর গান শুনিয়া সে আশ্রয় পরিত্যাগ করিল; দূরে—আম্রকাননে এক বেলবৃক্ষে নিজের বাসস্থান স্থির করিল।" সম্ভব-অসম্ভব যে কোনো অবস্থা সৃষ্টি করতে লেখকের বাধে না। গল্প বলা লেখকের উদ্দেশ্য নয়, আসল লক্ষ্য হল ঘটনাকে চূড়ান্তরূপে অসঙ্গত ও উদ্ভট করে তোলা। গল্পটির শেষাংশে তাই অযথা জটিলতার সৃষ্টি করা হয়েছে—'বিশুদ্ধ গল্প' হিসাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে এই অংশটিই গল্পরসকে ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু লেখক চেয়েছেন কতকগুলি হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে। তবু শেষদিকটা যেন মাত্রা ছাড়িয়ে হাস্যরসের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহকে বাধা দিয়েছে—উদ্ভাবনগুলিও কিছু কষ্টকল্পিত বলে মনে হয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের লঘু-গুরু গদ্যরচনাবলীর মধ্যে 'ছত্র-মহিমা' (ভারতবর্ষ: শ্রাবণ ১৩২০) ও 'টাকের জয়' (নব্যভারত শ্রাবণ, ১৩১৮) রচনা দুটি হাস্যরসিক কবির বিশিষ্ট সৃষ্টি। রচনা দুটিকে বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ বলা যায় না—বিষয়গৌরবও কিছুই নেই। সামান্য একটি ছাতা ও টাক অবলম্বন ক'রে লেখক নানাভাবে তাঁর বক্তব্যকে পরিবেশন করেছেন। এখানে বক্তব্যও এমন কিছু নয়, নিতান্ত গৌণ বললেও হয়, মুখ্য হল লেখকের বলার বিশেষ ভঙ্গিটি। রচনার ভঙ্গিটি 'ফ্যামিলিয়ার এসে' ধরনের। রচনাটির মধ্যে লেখক ছত্রমহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন—প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে ছুটে চলাই এই জাতীয় রচনার বৈশিষ্ট্য, সহজ আলাপের ঢঙেই লেখক তাঁর বক্তব্যকে উপস্থিত করেছেন। প্রথম রচনাটির শেষ দুই অনুচ্ছেদে লঘু সুরটি আর নেই—লেখকের পরিহাসনিপুণ কণ্ঠ ভাবগভীর হয়ে উঠেছে। রচনা দুটি পড়ে মনে হয়, এই জাতীয় লেখায় দ্বিজেন্দ্রলালের হাত ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি এ দিকটিতে তেমন নজর দেন নি।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রবন্ধাবলী সম্পর্কে কোনো আলোচনাই হয় নি। অবশ্য প্রবন্ধাবলী তাঁর অন্যান্য সাহিত্যকৃতির তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রমানসের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে হলে তাঁর প্রবন্ধগুলিকে বাদ দেওয়া যায় না। প্রবন্ধকে তিনি বস্তুনিষ্ঠ এবং যুক্তিনির্ভর করে তুলতে চেয়েছেন। বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করে তোলার দিকেই তিনি প্রধানত তাঁর

দৃষ্টি সজাগ রেখেছেন, বক্তব্যকে সুন্দর করার দিকে তাঁর তেমন লক্ষ্য ছিল না। এমন কি তিনি প্রবন্ধের ভাষাকে আটপৌরে ও নিভূর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সম্পর্কেও কটাক্ষ করেছেন ('উপমা' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য)। প্রবন্ধের ভাষার মধ্যে স্পষ্টতা ও যুক্তিনিষ্ঠা থাকার প্রয়োজন, এ বিষয় কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রবন্ধকে উচ্চতর সাহিত্যে পরিণত করতে হলে তাকেও রমণীয় করে তুলতে হবে। কবি-কল্পনা, মণ্ডনকর্ম প্রভৃতির সঙ্গে প্রবন্ধকারের কোনো বিরোধ নেই—কারণ শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধও এক জাতীয় উচ্চতর সাহিত্যিক রচনা।[১৭] বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর প্রভৃতি খ্যাতনামা প্রবন্ধকারদের গদ্যপ্রবন্ধগুলি সৃষ্টিমূলক সাহিত্যেরই পর্যায়ভুক্ত। আবেগ, কবিকল্পনা, অলঙ্কৃত বিদগ্ধভাষণ, ব্যক্তিগত ভাবনা—সমস্ত কিছুই তাঁদের প্রবন্ধে অবিরোধে আত্মপ্রকাশ করেছে। শুধু তাই নয়, প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধকারদের রচনার মধ্যে তাঁদের ব্যক্তিত্ব-দ্যোতক 'স্টাইলটি' চমৎকার ভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের কোনো প্রবন্ধই এ জাতীয় নয়—প্রবন্ধকে তিনি 'রচনা' (creation) করে তুলতে পারেন নি। কিন্তু 'কালিদাস ও ভবভূতি' গ্রন্থটিতে প্রবন্ধকার ও সাহিত্য-সমালোচক দ্বিজেন্দ্রলালের চূড়ান্ত সিদ্ধির পরিচয় আছে। যুক্তিনিষ্ঠায়, বুদ্ধিদীপ্তিতে, বস্তুবিশ্লেষণের নৈপুণ্যে ও সর্বোপরি মৌলিক চিন্তাশীলতায় এই গ্রন্থটি দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্যরচনার সর্বোত্তম পরিচয় বহন করে।

১৭। 'It is strange that the essay, which at first sight looks the easiest and most natural thing in the world to write, has so seldom achieved excellence Yet it is an indisputable fact that the greatest essayist like the greatest letter-writer, rare even than the great poet"—এলিজাবেথ ড'রলি সঙ্কলিত 'English Essays' গ্রন্থের রবার্ট লিণ্ড লিখিত ভূমিকা।

রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল

দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের শেষ অধ্যায়টির মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যমূলক ঘটনা হল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ সাহিত্যজীবনের মধ্যে বহুবার তাঁকে মসীযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে তাঁর মতান্তর তৎকালীন বাংলা সাহিত্যকে যেভাবে আলোড়িত করেছিল, তেমন আর কোনোদিনই হয় নি। এই আট-দশ বছরের ইতিহাস বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি তাৎপযমূলক অধ্যায়। রবীন্দ্রদ্বিজেন্দ্রবিরোধেব পটভূমিকা পূর্বাপর আলোচনার প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, এই দীর্ঘবিস্তৃত সাহিত্যিক বিরোধের যথার্থ স্বরূপ কি তাও উপলব্ধি করাব প্রয়োজন আছে। কারণ সে বিরোধ হল অর্ধশতাব্দী পূর্বের ঘটনা—আজ রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলাল কেউই আমাদের মধ্যে নেই। সেদিনের উত্তাপ, উত্তেজনা ও ব্যক্তিগত আক্রমণ আজ দূরকালের ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। সুতরাং এ কালের সমালোচক ও সাহিত্যের ইতিহাস লেখকদের কাছে এ ঘটনা সাহিত্যের ইতিহাসের অঙ্গীভূত হয়েছে। এ ঘটনা থেকে দুটি সত্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথমত, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের রবীন্দ্র-বরণ ও রবীন্দ্রবিরোধের ইতিহাস; দ্বিতীয়ত, দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যাদর্শ। দ্বিজেন্দ্রসাহিত্য আলোচনার পক্ষে এই দুটি প্রসঙ্গই উল্লেখযোগ্য।

দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের মাত্র দু বছরের ছোট হলেও, সাহিত্যিক খ্যাতিলাভ করেছিলেন অনেক পরে। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম দ্বিজেন্দ্রলালের কবিপ্রতিভার মৌলিকতা ও বিস্ময়কর স্বকীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেন। 'আর্যগাথা' (দ্বিতীয় ভাগ), 'আষাঢ়ে' ও 'মন্দ্র' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা আজ পযন্ত দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ দিগদর্শন। রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের 'অবলীলাকৃত ক্ষমতা', 'প্রবল আত্মবিশ্বাস' ও 'অবাধ সাহস'এর কথা সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালও তাঁর 'বিরহ' প্রহসনটি (১৩০৪) রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন। প্রহসনটি জোড়াসাঁকোর

ঠাকুরবাড়িতেও অভিনীত হয়েছিল।[১] 'পূর্ণিমা-মিলন', 'ডাকাত ক্লাব' প্রভৃতি অবলম্বন করেও রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় হয়ে উঠেছিল। 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বলেছেন "সে সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথ—উভয়েই পরস্পরের একান্ত গুণমুগ্ধ হয়ে পড়ছিলেন। দুই বন্ধুর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এই অবস্থায় খুবই প্রগাঢ় হয়ে উঠেছিল।"[২] সুতরাং এ পর্যন্তও দুই কবির মধ্যে অসদ্ভাবের কোনো কারণ ঘটে নি, বরং পরস্পরের প্রতি একটা গুণমুগ্ধতার ভাবই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তেজিত পটভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রেমমূলক ঐতিহাসিক নাটকগুলি যখন অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ এই সমস্ত নাটকের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনো মতামত প্রকাশ করেন নি। হয়তো রবীন্দ্রনাথের এই নীরবতা দ্বিজেন্দ্রলালের মনঃপূত হয় নি।[৩]

বরিশালের প্রাদেশিক সম্মিলনীতে (১৯০৬) সাহিত্যসম্মিলনীর যে অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছিল, তার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই সাহিত্যসম্মিলনীর ব্যবস্থা করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রজীবনীকার লাখুটিয়ার জমিদার সাহিত্যিক দেবকুমার রায়চৌধুরী। 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিক পত্রিকা শুধু রবীন্দ্রনাথকে কেন, সাহিত্যসম্মিলনীর ব্যবস্থাপক দেবকুমারকেও নির্মমভাবে আক্রমণ করেছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল তখন কাঁদিতে ছিলেন। কাঁদি থেকে এ সম্পর্কে তিনি দেবকুমারকে যে চিঠি লিখেছিলেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য "রবিবাবুকে সাহিত্যিক সম্মিলনের সভাপতি করায় "বঙ্গবাসী" তোমার উপরে এত নারাজ হইয়া চটিয়া উঠিলেন কেন, জানি না। আমি যদিও রবিবাবুর ঐ সব লালসামূলক রচনাবলীর নিতান্ত বিরোধী তবু এ কথা

১। "'বিরহ' প্রহসনটি থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল, এমন কি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেও উহার অভিনয় হয়।"

—রবীন্দ্র-জীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫৫ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২৮০।

২। দ্বিজেন্দ্রলাল (দ্বিতীয় খণ্ড). দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ২৬২।

৩। —"এই নীরবতার কঠোরতা দ্বিজেন্দ্রলালের মনে আঘাত দিল। এতদিন পরে দুই বন্ধুর মধ্যে বিচ্ছেদের সূত্রপাত হইল।"—রবীন্দ্র-জীবনী (দ্বিতীয় খণ্ড) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২৮২।

আমি মুক্তকণ্ঠেই মানি যে, বর্তমান সাহিত্যক্ষেত্রে তিনিই সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি এবং তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার সঙ্গে এখন আর কাহারও তুলনাই হইতে পারে না।"[৪] মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করলে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে : রবীন্দ্রনাথের যোগ্যতা সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের কোনো সংশয় ছিল না। "বর্তমান সাহিত্যক্ষেত্রে তিনিই সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি"—দ্বিজেন্দ্রলাল 'মুক্তকণ্ঠেই' তা স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে রবীন্দ্রনাথের "লালসা-মূলক রচনাবলীর নিতান্ত বিরোধী", তাও তিনি স্পষ্টভাবেই বলেছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটলেও এ পর্যন্ত প্রকাশ্যভাবে দ্বিজেন্দ্রলাল কোনো বিরোধিতা করেন নি। হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও 'বঙ্গবাসী' কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থটির (১৯০৪) অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকাশ্য বিরোধের সূত্রপাত ঘটে। এই গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের অনেক জীবিত ও মৃত লেখকের জীবনী সঙ্কলিত হয়। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদকের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে তাঁর কাব্যানুভূতির ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই আলোচনার মধ্যে মানুষরবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কোন কথাই ছিল না, কবি তাঁর কবিসত্তারই ক্রমাভিব্যক্তির কাহিনী সেখানে বর্ণনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই আত্মপরিচয়টি দ্বিজেন্দ্রলালকে উত্তেজিত করেছিল। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের পত্রালাপও হয়েছিল।[৫] ১৩১১ সালের শেষ দিকে এই দুই কবির সাহিত্যিক মনোমালিন্য যে কতদূর গড়িয়েছিল তা রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি থেকে জানা যায়।[৬] এর পরে বরিশালের সম্মিলনীতে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্ব সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল যে মন্তব্য করেছিলেন, তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

৪। ১৩ই মে, ১৯০৬ তারিখে কাঁদি থেকে লিখিত চিঠি : দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৪৪৯।

৫। "...'বঙ্গভাষার লেখক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ যে আত্ম-জীবনীটি প্রকাশিত করেন তদবিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে তাঁহার গোপনেই বাদানুবাদ চলিয়াছিল; সে ব্যক্তিগত ব্যাপারটা গোপনীয় বলিয়াই, তাহা লইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল আর সাহিত্যসমাজে কোনরূপ 'উচ্চবাচ্য' করেন নাই।"
—ঐ পৃঃ ৪৯৭।

৬। দ্বিজেন্দ্রলালকে লিখিত একখানি চিঠি (২৩শে বৈশাখ, ১৩১২) : রবীন্দ্রজীবনী (২য় খণ্ড ১৩৫৫) : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২৮৩-২৮৫।

১৩১৩ সালের আষাঢ় মাসে দ্বিজেন্দ্রলাল গয়ায় বদলি হন। গয়ায় অবস্থানকালে তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিলেন জেলা জজ লোকেন্দ্রনাথ পালিত। লোকেন পালিত ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত ও সাহিত্যরসিক। লোকেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ও রবীন্দ্রসাহিত্যের যথার্থ মর্মরসজ্ঞ। লোকেন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের রবীন্দ্র-সাহিত্য নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্ক হত। দ্বিজেন্দ্র-জীবনীকার এমনও জানিয়েছেন যে এই তর্ক নাকি একবার তিন দিন ধরে চলেছিল। বলা বাহুল্য, দ্বিজেন্দ্রলাল যে সমস্ত কবিতায় রবীন্দ্রনাথের 'অস্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন রীতি' আবিষ্কার করেছিলেন, পালিত সাহেব সে সব কবিতাকে 'বিশেষ প্রীতির চক্ষে' দেখতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল পালিত সাহেবকে স্বমতে দীক্ষিত করতে অসমর্থ হয়ে, প্রকাশ্যভাবে রবীন্দ্রনাথের 'অস্পষ্ট রচনা-রীতি'র বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলেন। সেই সময় দ্বিজেন্দ্রলালের এই আক্রমণাত্মক মনোভাবটি দেবকুমার রায়চৌধুরীর কাছে লিখিত একখানি চিঠিতে সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে :

"এতদিন চুপ করেই ছিলাম, স্পষ্টতঃ হাতে কলমে রবিবাবুর বিপক্ষে কোন কথাই বলি নি। কিন্তু ক্রমে যেরূপ দেখা যাচ্ছে, রবিবাবুর এইসব অন্ধ স্তাবক ও অনুকারকদের মধ্যে তাঁর এই দোষগুলির বড় বেশি প্রতিপত্তি বেড়ে চল্‌ল এবং রবিবাবুর প্রতিভার যেরকম দুর্দম্য প্রতাপ তাতে নিশ্চয়ই পরিণামে এ সব দোষ আমাদের সাহিত্যে অধিকাংশ নবীন লেখকদের মধ্যেই অল্পাধিক সংক্রামিত হয়ে পড়বে।...আজ তিনদিন ধরে পালিতের সঙ্গে ক্রমাগত তর্ক করলাম, তা রবিবাবুর personality এম্‌নি dangerously strong যে, তিনি আমার যুক্তি খণ্ডন করতে অক্ষম হয়েও আমার points সব avoid করে কেবল সেই-সব অস্পষ্ট দুর্নীতিপূর্ণ লেখার art আর গুণই দেখতে লাগলেন। এখন স্বয়ং পালিতের মত বিজ্ঞ ও বিদ্বান লোকেরই যখন এই দশা তখন আর অন্যের কথা কি?—নব্য সাহিত্যিক ও কবির দল রবিবাবুর গুণের তো নাগাল পাবেন না, কেবল এই সব নিকৃষ্ট style ও ideaরই অনুকরণ করে ক্রমে আমাদের আরাধ্যা মাতৃভাষার templeএ আঁস্তাকুড়ের আবর্জনা জমিয়ে তুলবেন।"[৭]

৭। দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৪১৮-৪১৯।

এরপরেই দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের 'সোনারতরী' কবিতার একটি প্যারডি রচনা করে তার একটি কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা জুড়ে দিয়ে 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশ করেন।[৮] 'সোনার তরী' কবিতাটির যাঁরা নানা প্রকার রূপক ব্যাখ্যা করেছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রধানত তাঁদের এই সমস্ত কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যাকে বিদ্রূপ করেই তার এই রচনাটি প্রকাশ করেন। দ্বিজেন্দ্রজীবনীকার একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিককে 'সোনার তরী'র অদ্ভুত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়ার অভিযোগ করেছেন এবং বলেছেন যে এই সমস্ত ব্যাখ্যার জন্যই নাকি 'অবিচলিত চিত্তে' দ্বিজেন্দ্রলাল 'সাহিত্য' পত্রে তাঁদের প্রতি অব্যর্থ ব্যঙ্গের বাণ নিক্ষেপ করেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্র-জীবনীকারের এই প্রসঙ্গটির মধ্যে কালগত অসঙ্গতি আছে।[৯] কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের এই ব্যঙ্গাত্মক অনুকৃতিতে সন্তুষ্ট না হয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রবন্ধের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্যকে প্রকাশ করলেন। এখান থেকেই মতবিরোধটি তীব্রতর আকার ধারণ করল।

॥ ২ ॥

অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'কাব্যের প্রকাশ' (বঙ্গদর্শন : শ্রাবণ, ১৩১৩) প্রবন্ধটি উপলক্ষ্য করে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর ধূমায়িত বিক্ষোভকে 'কাব্যের অভিব্যক্তি'[১০] নামক প্রবন্ধে রূপায়িত করেন। অজিতকুমার রবীন্দ্রশিষ্য, রবীন্দ্রমানসের স্নেহলালনে তাঁর মন পরিপুষ্ট। কাব্যসমালোচক হিসাবে তিনি কাব্যের অন্তর্গূঢ় বোধসত্যের উপরেই অধিকতর নির্ভরশীল ছিলেন। কবিতার সঙ্কেতধর্ম, অর্থদ্যোতনা, ইঙ্গিতময়তা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তিনি পরবর্তীকালেও প্রবন্ধ রচনা করেন (দ্রষ্টব্য অজিতকুমারের 'বাতায়ন' গ্রন্থের 'শিল্প', 'কবিতা', 'সৌন্দর্যমহিমা' প্রভৃতি প্রবন্ধ)। সাহিত্যদর্শনের দিক থেকে তিনি ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের বিপরীতপন্থী। সুতরাং 'কাব্যের অভিব্যক্তি' প্রবন্ধে

৮। একটি পুরাতন মাঝির গান (আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা) : সাহিত্য, আশ্বিন, ১৩১৩।

৯। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের 'সোনার তরী' ব্যাখ্যাটি ১৩১৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসী পত্রিকায় (৪৬৭ পৃঃ) প্রকাশিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের সোনার তরীর প্যারডি তার দুমাস আগে প্রকাশিত হয়।

১০। কাব্যের অভিব্যক্তি : প্রবাসী, কার্তিক, ১৩১৩।

দ্বিজেন্দ্রলাল অজিতকুমারের বক্তব্যকে উপলক্ষ করে রবীন্দ্রকাব্যের বিরুদ্ধে অস্পষ্টতার অভিযোগ আনেন :

"গত শ্রাবণের বঙ্গদর্শনে 'কাব্যের প্রকাশ' নামক একটি প্রবন্ধ পড়িলাম। তাহা অস্পষ্ট কাব্যের সমর্থন। শুদ্ধ তাহা নহে, যাঁহারা স্পষ্ট কবি, লেখক তাঁহাদিগকে একটু ব্যঙ্গ করিতে ছাড়েন নাই। যদি এটি রবীন্দ্রবাবুর মতের প্রতিধ্বনি মাত্র না হইত, তাহা হইলে ইহার এই প্রতিবাদ করিতাম না।"

দ্বিজেন্দ্রলাল অস্পষ্ট কাব্যের উদাহরণ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতাটির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন : "পরের ভাষার পরের দেশের সর্বাপেক্ষা দুর্বোধ কবির প্রায় সর্বাপেক্ষা দুর্বোধ্য কবিতা (Wordsworth-এর Ode on the Immortality of the Soul) বুঝিতে পারি, কিন্তু আমার মাতৃভাষায় আমার বাঙালী ভ্রাতার কবিতা বুঝিতে গলদ্‌ঘর্ম হইতে হয়। এই যদি ইহাদের বৃহৎ ভাবের ফল হয় ত বলিতে হইবে যে, সে ভাব বড়ই বৃহৎ। কারণ এ কবিতাটি দুর্বোধ্য নয়, অবোধ্যও নয়—একেবারে অর্থশূন্য স্ববিরোধী।... অস্পষ্ট হইলেই গভীর হয় না। কারণ ডোবার পঙ্কিল জলও অস্পষ্ট ; স্বচ্ছ হইলেও shallow বা অগভীর হয় না কারণ সমুদ্রের জলও স্বচ্ছ, অস্পষ্টতা লইয়া বাহাদুরি করিয়া 'miraculous' দাবী করিয়া, ব্যঙ্গ করিবার কারণ নাই। অস্পষ্টতা একটা দোষ, গুণ নহে।"

'কাব্যের অভিব্যক্তি' প্রবন্ধটি নিয়ে তৎকালীন সাহিত্যক্ষেত্রে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রবন্ধটি প্রকাশের প্রায় একবছর পরে দ্বিজেন্দ্রলাল 'কাব্যের উপভোগ'[১১] নামে আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটিতে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের পূর্বপ্রকাশিত আত্মজীবনী লক্ষ্য করে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন। প্রবন্ধটির প্রথমে রবীন্দ্রনাথের 'চেলা'-দের রসবোধ সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে. "আমার 'কাব্যের অভিব্যক্তি' নামক প্রবন্ধ-পাঠে অনেক ব্যক্তি অনেক রকম অদ্ভুত ওকালতি করেছিলেন। কবি স্বয়ং যে সব কবিতার ভাব গ্রহণ করতে অসমর্থ, সে সব কবিতা দেখলাম যে, কবির চেলাগণ বেশ বোঝেন। আমি সেই চেলাদিগকে এইখানে বলে রাখি যে রবীন্দ্রবাবুর কাব্য আমি যেরূপ উপভোগ করি. সেই চেলাগণ তাহার

১১। বঙ্গদর্শন : মাঘ, ১৩১৪।

দশমাংশও করেন কিনা সন্দেহ।" রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন : "রবীন্দ্রবাবু তাঁর আত্মজীবনীতে inspiration দাবী করে যখন নিজের কবিতাবলী সমালোচনা করতে বসেছিলেন, তখন তাঁর দম্ভ ও অহমিকায় আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম।"

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার প্রবন্ধটি প্রকাশের পূর্বেই তা রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথের জবাবটি উক্ত পত্রিকায় ঐ সংখ্যাতেই ছাপা হয় : "আমার আত্মজীবনী প্রবন্ধে আমি অলৌকিক শক্তির প্রেরণা দাবী করিয়া দম্ভ প্রকাশ করিয়াছি, দ্বিজেন্দ্রবাবুর এইরূপ ধারণা হইয়াছে। আমি মনে জানি অহঙ্কার প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় আমার ছিল না। কিন্তু অহঙ্কার করিব বলিয়া কোমর বাঁধিয়া বসি নাই—তবু অহঙ্কার আপনি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, ইহা কিছুই অসম্ভব নহে। ...আমার সেইরূপ বিকৃতি যদি লক্ষিত হইয়া থাকে, তবে দ্বিজেন্দ্রবাবু তার শাস্তি দিতে কিছুমাত্র আলস্যবোধ করেন নাই, ইহা নিশ্চিত। তিনি প্রবন্ধে ও গানে, সভাস্থলে ও মাসিকপত্রে এবং যে ব্যঙ্গ কদাচ ব্যক্তিবিশেষের মর্মভেদ করিবার জন্য নিক্ষিপ্ত হয় নাই, সেই ব্যঙ্গ ও ভৎসনায় অশ্রান্তভাবে আমার লাঞ্ছনা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই।" রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের তিনটি কাব্যের আলোচনা করেছিলেন, প্রবন্ধটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সে প্রসঙ্গও উল্লেখ করেছেন। প্রবন্ধটির শেষে তিনি তাঁর 'চেলা' দের প্রসঙ্গে বলেছেন "দ্বিজেন্দ্রবাবু কেন অযথা কল্পনা করিতেছেন যে, আমি একদল চেলা আমার চারপাশে তৈরী করিয়া তুলিয়াছি। · আমার যে কবিতা দ্বিজেন্দ্রবাবুর কোনমতেও ভাল লাগে নাই তাহা যে আর কাহারও ভাল লাগিতে পারে, আমার এ অপরাধ তিনি কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেছেন না।"

দ্বিজেন্দ্রজীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরী এই ঘটনার জন্য 'চেলা-চামুণ্ডা' ও 'অনুরক্ত বন্ধুবর্গ'-কে দায়ী করেছেন।[১২] 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় নিজের বক্তব্য

১২। "আসল কথা—উভয়ের সেই বহুদিন সঞ্চিত মনোমালিন্যের উপরে, ইঁহাদের অনুগ্রহপ্রার্থী ও পার্শ্বচর এই সব 'চেলা চামুণ্ডা' বা 'অনুরক্ত বন্ধুবর্গ' এই সময়ে সুযোগ পাইয়া, একজনের কাছে অন্যের সম্বন্ধে যত-রাজ্যের অমূলক ও মিথ্যা অপবাদ ও নিন্দা ক্রমাগত পুঞ্জীভূত করিয়া তুলিয়া নানাপ্রকারেই বিবিধ জঘন্য চক্রান্ত চালাইতেছিলেন।"

—দ্বিজেন্দ্রলাল (দ্বিতীয় সং), পৃঃ ৫০৮।

প্রকাশ করার পর প্রকাশ্যভাবে রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের কোনো প্রতিবাদ করেন নি। প্রবন্ধটি লেখার কয়েকদিন পর তিনি শিলাইদহ থেকে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন: "দ্বিজেন্দ্রবাবু আমাকে কিছু বলে নিয়েছেন আমিও তাঁকে কিছু বলে নিয়েছি। তারপর এইখানেই খেলাটা শেষ হয়ে গেলেই চুকে যায়, অন্তত আমিও এই বলে চুকিয়ে দিলুম। এতে বৃথা অনেক সময় যায়—আমার আর সে সময়ের বাহুল্য নেই। আগুনের উপর কেবলি ইন্ধন চাপিয়ে আর কতদিন বৃথা অগ্নিকাণ্ড করে মরব? দূর হোক গে অন্তত নিঃশেষে মিটিয়ে দিয়ে প্রাণটাকে জুড়োতে পারলেই বাঁচি। ঈশ্বর করুন তাঁর কথা ছাড়া আর কারো কথা যেন এ বয়সে আমাকে টানাটানি করে না মারে—সব পাপ শান্ত হোক্।"[১৩]

কাব্যে অস্পষ্টতার অভিযোগের প্রায় বৎসরাধিককাল পরে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রকাব্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনলেন।[১৪] রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি প্রেমসঙ্গীত থেকে উদাহরণ নিয়ে তিনি দেখালেন যে "সেগুলি সবই ইংরাজী কোর্টশিপের গান, আর কতকগুলি লম্পটের বা অভিসারিকার গান।" দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন: "দুর্নীতি কাব্যে সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইতেছে। তাহার উচ্ছেদ করিতে হইবে। যাঁহারা ধর্ম ও নীতির দিকে তাঁহারা আমার সহায় হউন।···উদাহরণ দিতে হইবে? রবীন্দ্রবাবুর প্রেমের গানগুলি নিন। "সে আসে ধীরে," "সে কেন চুরি করে চায়," "দুজনে দেখা হলে পথেরি মাঝে" ইত্যাদি বহুতর খ্যাত গান সবই ইংরাজী কোর্টশিপের গান। তাঁহার "তুমি যেও না এখনই", "কেন যামিনী না যেতে জাগালে না" ইত্যাদি গান লম্পটের বা অভিসারিকার। আশ্চর্যের বিষয় এই এরূপ গানে কোন মৌলিকতাও নাই। শয্যা-রচনা করা, মালা-গাঁথা, দীপজ্বালা—এ সকল ব্যাপার বৈষ্ণব কবিতা হইতে অপহরণ।" প্রবন্ধটির মূল আক্রমণস্থল ছিল 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্য—তর্কের খাতিরে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রায় আঠারো বছর আগে লেখা কাব্যখানির দুর্নীতি উদ্‌ঘাটনের জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছেন:

"রবীন্দ্রবাবুর 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যটি লউন। এ কোর্টশিপে একজন সামান্যা ইংরাজ-নারী সম্মত হইত না; কিন্তু একজন হিন্দু রাজকন্যা তাহা

১৩। রবীন্দ্র-জীবনী (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫৫); প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২৮৭।
১৪। কাব্যে নীতি: সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬।

যাচিয়া লইলেন। রবীন্দ্রবাবু অর্জুনকে জঘন্য পশু করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। …রবীন্দ্রবাবুর গ্রহ-উপগ্রহগণ ভারতচন্দ্রকে নিশ্চয়ই অত্যন্ত অশ্লীল কবি বলেন। অশ্লীলতা ঘৃণার্হ বটে; কিন্তু অধর্ম ভয়ানক। ঘরে ঘরে বিদ্যা হইলে সংসার 'আঁস্তাকুড়' হয়, কিন্তু ঘরে ঘরে এ চিত্রাঙ্গদা হইলে সংসার একেবারে উচ্ছন্নে যায়। সুরুচি বাঞ্ছনীয়, কিন্তু সুনীতি অপরিহার্য। আর রবীন্দ্রবাবু এই পাপকে যেমন উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন তেমন বঙ্গদেশে কোনও কবি অদ্যাবধি করিতে পারেন নাই। সে জন্য এ কুনীতি আরও ভয়ানক।"

রবীন্দ্রনাথ নিজে 'কাব্যে নীতি' প্রবন্ধের কোনো প্রতিবাদ করেন নি। কিন্তু এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার প্রায় পাঁচ মাস পরে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট বন্ধু সুপণ্ডিত প্রিয়নাথ সেন মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালের প্রবন্ধটির জবাব দিয়েছিলেন।[১৪] "প্রকাশ হইবার কালেই আমরা "চিত্রাঙ্গদা" পাঠ করি। সেই প্রথম পাঠে এবং তাহার পরও কয়েকবার পাঠকালে ইহা আমাদের একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর প্রথম শ্রেণীর খণ্ডকাব্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল। …কিন্তু গত জ্যৈষ্ঠ মাসের "সাহিত্য" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় লিখিত "কাব্যে নীতি" নামক প্রবন্ধে "চিত্রাঙ্গদা" সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য পাঠ করিয়া আমাদের উক্ত ধারণার পুনর্বিচার আবশ্যক হইয়াছে।"—প্রবন্ধকার প্রবন্ধটির প্রথমে 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যের বিষয়বিশ্লেষণ করেছেন, তারপর দ্বিজেন্দ্রলালের অভিযোগগুলির একে একে উত্তর দিয়েছেন : " ..দ্বিজেন্দ্রবাবু ধরিয়া লইয়াছেন যে, অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার প্রথম মিলন বিনা বিবাহে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। …আমরা দেখাইব যে, কাব্যপাঠে স্পষ্ট বুঝা যায়, এবং বুঝিতে হইবে, তাঁহাদের বিবাহ হইয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রবাবুর আর এক অভিযোগ চিত্রাঙ্গদা উপযাচিকা হইয়া অর্জুনের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। আমরা দেখাইয়াছি যে চিত্রাঙ্গদার এবংবিধ আচরণ স্বাভাবিক এবং অনিবার্য। অন্তঃপুরবাসিনীর লজ্জা-সঙ্কোচ-শিক্ষা চিত্রাঙ্গদা কখনও পায় নাই।…আমরা ত কাব্যের কোথাও দ্বিজেন্দ্রবাবুর কথিত এই নির্লজ্জ উপভোগ বা তাহার অধিকতর নির্লজ্জ বর্ণনা দেখিলাম না। · দ্বিজেন্দ্রবাবু নীতির দোহাই দিয়া রবিবাবুর যে সকল নির্দোষ ও পবিত্র গানের নিন্দাবাদ করিয়াছেন, তাহার

১৪। চিত্রাঙ্গদা : সাহিত্য, কার্তিক, ১৩১৬।

মধ্যে অনেকগুলি এই পূর্বরাগের মাধুরীতে পূর্ণ।…দ্বিজেন্দ্রবাবুর নিন্দা সত্ত্বেও রবিবাবুর এই গানগুলি যতদিন বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালী জাতি থাকিবে, ততদিন তাহারা আদরের সহিত গীত হইবে।"

কাব্যে নীতির প্রসঙ্গ নিয়ে তখনকার কালে বাংলা সাহিত্যে তীব্র বাদ-প্রতিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রিয়নাথবাবুর সমালোচনার প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছিল 'হিতবাদী' পত্রিকায়।[১৬] সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'কাব্যে সমালোচনা'[১৭] ও ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিত্রাঙ্গদার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা'[১৮] এই বাদ-প্রতিবাদকে মুখরোচক করে তুলেছিল। ললিতকুমারের প্রবন্ধটি তৎকালীন বাদপ্রতিবাদমুখরিত বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকার উপরে সকৌতুক টীকা-টিপ্পনি করেছে। এই সময়ে বাংলা সাহিত্যে এই বাদপ্রতিবাদ অবলম্বন করে দুই কবির ভক্তবৃন্দ যেন মুখর হয়ে উঠেছিলেন—পরস্পরের প্রতি বিদ্রূপবাণও প্রচুর পরিমাণে বর্ষিত হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের বিরুদ্ধবাদীরা "কাব্যে নীতি" ও "কাব্যে অপহরণ" প্রবন্ধদ্বয়ে (প্রবন্ধ দুটি 'মানসী' পত্রিকার ভাদ্র ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়) তাঁকে মারাত্মকভাবে আক্রমণ করেছিলেন। পরস্পরের মতমন্থনের ফলে যে গরলের সৃষ্টি হয়েছিল, সে সম্পর্কে দুইজন কবির মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, তা তাঁদের তৎকালীন চিঠি থেকে জানা যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল দেবকুমারকে লিখেছেন: "ব্যাপারটা যে শেষে এতখানি গড়াবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। অশ্রান্তবেগে, মাসের পর মাস নানারকমে এই যে অকথ্য গালি চলিয়াছে, তাতে কৈ আমার তো একটুও এল গেল না!…উঃ! কি কাণ্ডটাই না চল্‌ছে! এরা শেষকালে কি বাস্তবিক পাগলই হ'যে গেল নাকি?"

১৬। "কিন্তু নিজে (দ্বিজেন্দ্রলাল) নীরব থাকিলেও, প্রিয়বাবুর প্রতিবাদ-প্রবন্ধে এক অতীব তীব্র ও দীর্ঘ, প্রতিকূল সমালোচনা কোন-একজন সর্বজন পরিচিত প্রবীন কবি ও ঐতিহাসিক (নিজ নাম গোপন করিয়া) 'হিতবাদী' পত্রে মুদ্রিত করেন।"

—দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৫১৫।

১৭। কাব্যে সমালোচনা : সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, সাহিত্য, শ্রাবণ, ১৩১৬।

১৮। 'চিত্রাঙ্গদা'র আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা : ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য, অগ্রহায়ণ, ১৩১৬।

এই ঘাতপ্রতিঘাতে রবীন্দ্রনাথের মনেও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই সময় একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: "আমার লেখা সম্বন্ধে কিছু না লিখলেই ভাল করতে। 'প্রবাসীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, এই কারণে প্রবাসীতে আমার কাব্যের গুণাগুণ ঠিক সুশ্রাব্য হবে না। তোমরা আমার লেখার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে যদি চেষ্টা কর, তবে একদল লোককে আঘাত দেবে—অথচ সে আঘাত দেবার কোন দরকার নেই, কেন না আমার কবিতা ত রয়েইছে—যদি ভালো হয় ত ভালোই, যদি ভাল না হয় ত' ও আবর্জনা দূর করবার জন্য ঢোলাই খরচা লাগবে না—আপনি নিঃশব্দে সরে যাবে। যতদিন বেঁচে আছি নিজের নাম নিয়ে ধূলো ওড়াতে ইচ্ছে করি'নে.. চতুর্দিকে বিদ্বেষের বিষ মথিত করে তুলো না।"[১৯]

এই সময় দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের এক সপ্রশংস সমালোচনা লেখেন (বাণী, কার্তিক, ১৩১৭)। এই সমালোচনা পড়ে অনেকেই মনে করেছিলেন যে বোধহয় এই বিরোধের অবসান হল। কার্যতঃ তা হয় নি। কিন্তু 'আনন্দ-বিদায়'-এর অভিনয়ই (১৩১৯ সালের ১লা পৌষে 'স্টার' এ অভিনীত হয়) এই বিরোধের চূড়ান্তশীর্ষ। নাট্যকার যদিও এই প্যারডির ভূমিকায় কৈফিয়ত দিয়েছেন যে কারও প্রতি এখানে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হয় নি, কিন্তু যে কোনো পাঠক এই প্যারডির যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবেন। 'আনন্দ বিদায়'-এ দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথকে সর্বজনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেদিনের দর্শক এই বীভৎস ব্যক্তিগত আক্রমণ মেনে নিতে পারে নি, সেদিনের রঙ্গমঞ্চ রণভূমিতে পরিণত হয়েছিল এবং নাট্যকারও রঙ্গালয় ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। 'আনন্দ-বিদায়'-এর দক্ষযজ্ঞ পরিণতি নিয়ে প্রমথ চৌধুরী 'সাহিত্যে চাবুক'[২০] প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'আনন্দ-বিদায়'-এর সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটিকে লক্ষ্য করেই তিনি প্রবন্ধটি রচনা করেন। তাঁর মতে দ্বিজেন্দ্রলাল প্যারডির মাধ্যমে যথার্থ হাস্যরস সৃষ্টি না করে স্থূলতার দ্বারা দর্শকদের রসচেতনাকে পীড়িত করেছেন, দ্বিতীয়ত দ্বিজেন্দ্রলাল প্যারডির মাধ্যমে লোকশিক্ষা দিতে

১৯। রবীন্দ্র-জীবনী (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫৫) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২৮৯।
২০। সাহিত্য মাঘ, ১৩১৯।

চেয়েছেন। চৌধুরী মহাশয় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বাক্‌চাতুর্যের সাহায্যে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যবিচারের নীতিবাদী দৃষ্টিকে সমালোচনা করেছেন: "যাঁরা রবীন্দ্রবাবুর সরস্বতীর গাত্রে কোথায় কি তিল আছে তাই খুঁজে বেড়ান, তাঁরা যে ভারতবর্ষের পূর্ব-কবিদের সরস্বতীকে কি করে তুষারগৌরীরূপে দেখেন, তা আমার পক্ষে একেবারেই দুর্বোধ্য।" পরের মাসের 'সাহিত্য' পত্রিকায় চৌধুরী মহাশয়ের সমালোচনাটির একটি দুর্বল প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়।[২১]

॥ ৩ ॥

'আনন্দ-বিদায়' অভিনয়ের পর দ্বিজেন্দ্রলাল মাত্র পাঁচমাসকাল জীবিত ছিলেন। 'আনন্দ-বিদায়'-এর এই দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার তাঁর মনের উপরেও একটি তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল—দ্বিজেন্দ্রজীবনীকার তার দীর্ঘ বিবরণী দিয়েছেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার জন্য যে প্রবন্ধটি রচনা করেন, তার মধ্যে তাঁর বাংলা সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ সূচিত হয়েছে। প্রবন্ধটির প্রথমদিকে তাঁর একটি মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য: "আমাদের শাসনকর্তারা যদি বঙ্গ-সাহিত্যের আদর জানিতেন, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল peerage পাইতেন ও রবীন্দ্রনাথ knight উপাধিতে ভূষিত হইতেন।" উদ্ধৃত অংশ থেকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের শেষ মন্তব্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

দেবকুমার রায়চৌধুরীর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থের[২২] ভূমিকাস্বরূপ যে অংশটুকু লিখেছিলেন তাতে সংক্ষেপে অথচ সুস্পষ্ট ভাষায় দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথাটি বলা হয়েছে: —"দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ সত্য, অর্থাৎ আমি যে তাঁর গুণ-পক্ষপাতী এইটেই আসল কথা এবং এইটেই মনে রাখিবার যোগ্য। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে এখনকার অনেক পাঠক দ্বিজেন্দ্রলালকে আমার প্রতিপক্ষ শ্রেণীতে

২১। প্রতিবাদটির লেখক নিজের নাম প্রকাশ না করে 'মেঘনাদ' ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন (সাহিত্য, ফাল্গুন, ১৩১৯)।

২২। দেবকুমার রায়চৌধুরীর 'দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকাল ১৩২৪ সালের ভাদ্র মাস।

ভুক্ত করিযা কলহের অবতারণা করিয়াছেন। অথচ আমি স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারি, এ কলহ আমার নহে, এবং আমার হইতেই পারে না। পশ্চিম দেশের আঁধি হঠাৎ একটা উড়ো হাওয়ার কাঁধে চড়িয়া শয়ন বসন আসনের উপর এক পুরু ধূলা রাখিযা চলিযা যায়। আমাদের জীবনে অনেক সমযে সেই ভুল-বোঝার আঁধি কোথা হইতে আসিযা পড়ে তাহা বলিতেই পারি না। কিন্তু উপস্থিতমত সেটা যত বড় উৎপাতই হোক সেটা নিত্য নহে এবং বাঙালী পাঠকদের কাছে আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা এই ধূলা জমাইযা রাখিবার চেষ্টা যেন না করেন, করিলেও কৃতকার্য হইতে পারিবেন না। দ্বিজেন্দ্রলালের সম্বন্ধে আমার যে পরিচয় স্মরণ করিয়া রাখিবার যোগ্য তাহা এই যে আমি অন্তরের সহিত তাঁহার প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করিয়াছি এবং আমার লেখায় বা আচরণে কখনও তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি নাই।—আর যাহা কিছু অঘটন ঘটিযাছে তাহা মাযা মাত্র, তাহার সম্পূর্ণ কারণ নির্ণয় করিতে আমি ত পারিই না, আর কেহ পারেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না।" প্রায দশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র দিলীপকুমার রাযকে লিখেছিলেন "তোমার পিতাকে আমি শেষ পর্যন্ত শ্রদ্ধা করেছি। সেকথা জানিযে তাঁকে ইংলণ্ড থেকে আমি পত্র লিখেছিলাম, শুনেছি সে পত্র তিনি মৃত্যুশয্যায় পেযেছিলেন এবং তার উত্তর লিখেছিলেন। সে-উত্তর আমার হাতে পৌঁছয়নি।"[২৩]

রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলালের মতবিরোধটিকে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা মনান্তর হিসাবে গ্রহণ করলে উত্তরকালের সাহিত্যসমালোচকেরা তার বৃহত্তর তাৎপর্য থেকে বঞ্চিত হবেন। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রপর্বের প্রথমার্ধে যে বিচিত্র রবীন্দ্রবরণ ও রবীন্দ্রবিরোধের ধারা চলেছিল, রবীন্দ্রদ্বিজেন্দ্র মতান্তর প্রকৃতপক্ষে তাকেই সূচিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের সমকালীন কবিদের উপরে অল্পবিস্তর রবীন্দ্রপ্রভাব পড়েছে। অবশ্য রবীন্দ্রপ্রভাবের রূপ ও রীতি সব কবির কাব্যে যে একই রকমের তা বলা যায না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে উত্তরকালে দ্বিজেন্দ্রলালের মতবিরোধ ঘটেছিল, কিন্তু তবুও রবীন্দ্রনাথের কোনো প্রভাব দ্বিজেন্দ্রলালের উপর পড়ে নি, এ কথা বলা চলে না। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম যুগের [illegible]

২৩। তীর্থঙ্কর (পরিবর্ধিত তৃতীয় [illegible]

আছে। কিন্তু সে প্রভাব যেন উত্তরমেরুর উপর দক্ষিণমেরুর প্রভাব! দ্বিজেন্দ্রলালের 'কেরাণী' কবিতাটি ১৩০১ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'সাধনা'-য় প্রথম প্রকাশিত হয়। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের সপ্রশংস অনুমোদন লাভ করেছিল। 'চিত্রা'-য় সঙ্কলিত 'প্রেমের অভিষেক' কবিতাটি যখন 'সাধনা'-য় প্রথম প্রকাশিত হয় (১৩০০ ফাল্গুন) তখন তার রূপ ছিল স্বতন্ত্র। কবি লোকেন্দ্রনাথ পালিতের 'ধিক্কারে'র জন্য সেই সমস্ত অংশ পরবর্তীকালে বর্জন করেছিলেন।[২৪] 'সাধনা'-য় প্রকাশিত কবিতাটির একটি অংশ ছিল :

ক্ষুদ্র আমি
কর্মচারী, বিদেশী ইংরাজ মোর স্বামী,
কঠোর কটাক্ষপাতে উচ্চে বসি হানে
সংক্ষেপ আদেশ, মোর ভাষা নাহি জানে,
মোর দুঃখ মানি মানে ;

কেরাণীর বিড়ম্বিত জীবনে মধ্যেও কবি প্রেমের নভঃস্পর্শী গৌরব আবিষ্কার করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের কেরাণী' কবিতার মধ্যে শেষোক্ত সুরটি অনুপস্থিত। তিনি এই কবিতায় কেরানী জীবনের বিড়ম্বনা ও দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবনে বিবাহ ও প্রেমজীবনের ব্যর্থতাই দেখিয়েছেন। কবিতাটি বলেছেন নিতান্ত হালকা সুরে, 'প্রেমের অভিষেক' কবিতাটি গুরুগম্ভীর ভাবের— প্রেমের সুউন্নত মহিমা ধ্রুপদী সুরে বিন্যস্ত হয়েছে। সুতরাং দ্বিজেন্দ্রলালের 'কেরাণী' কবিতায় 'প্রেমের অভিষেক' কবিতার কোনো প্রেরণা থাকলেও, এ ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল যে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, এ কথা বলা যায় না।—বরং দুই কবির দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোভাবের স্বাতন্ত্র্যই এখানে প্রমাণিত হয়েছে।

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসের স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে দুজনেরই প্রহসনের কথা উল্লেখ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'কল্কি-অবতার' প্রহসনের বিষয়-নির্বাচনে

২৪। "'প্রেমের অভিষেক'. কবিতার যে পাঠ সাধনায় প্রকাশিত হইয়াছিলে, কবি সে সম্বন্ধে সূচনায় লিখিয়াছেন, "তাতে কেরানী-জীবনের বাস্তবতার ধূলিমাখা ছবি ছিল অকুণ্ঠিত কলমে আঁকা, [লোকেন্দ্রনাথ] পালিত অত্যন্ত ধিক্কার দেওয়াতে সেটা তুলে দিয়েছিলুম।"

রবীন্দ্র-রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড)—গ্রন্থপরিচয়।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি 'বিদ্রূপাত্মক ব্যঙ্গকৌতুকে'র প্রভাব আছে বলে তিনি মনে করেন।[২৫] কিন্তু হাস্যরসের স্বরূপধর্মের দিক থেকে দুজন কবির প্রকৃতিগত পার্থক্য এখানেও ছিল। সামাজিক ব্যঙ্গবিদ্রূপ রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বটে, কিন্তু সে প্রভাব মূলত উপাদানসম্পর্কিত। তীব্রতম বিদ্রূপ-ভাষণের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর সূক্ষ্ম কলাকৌশল ও শিল্পদৃষ্টি হারান নি, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় ও ভঙ্গিতে একটি উদ্দাম বেপরোয়া ভাব আছে, যা রবীন্দ্ররীতির ঠিক অন্তগত নয়। ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রকাব্যের ভাবসাদৃশ্য আবিষ্কার করেছেন: "মন্দ্র কাব্যের 'জাতীয় সঙ্গীত' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের 'শিশু'-র ক্ষীণ প্রভাব আছে।[২৬] 'জাতীয়সঙ্গীত' কবিতায় শুধু 'দুরন্ত আশা' কবিতারই ভাবগত প্রভাব পড়ে নি, রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের দেশসম্পর্কিত কয়েকটি কবিতার সঙ্গেও দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতাটির ভাবগত সাদৃশ্য আছে। কিন্তু 'আলেখ্য' কাব্যের শিশুসম্পর্কিত কবিতাগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যের ক্ষীণতম সাদৃশ্যও আবিষ্কার করা কঠিন। স্ত্রী-বিয়োগ ও মাতৃহারা শিশু-সন্তান—এই অবস্থাগত সাদৃশ্য ছাড়া দুই কবির শিশু সম্পর্কিত কবিতার আর কোনো সাদৃশ্য নেই। রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যের বক্তা শিশু স্বয়ং—তাই তার মনের বিচিত্র লীলাই অভিব্যক্ত হয়েছে, দ্বিজেন্দ্রলালের শিশু কবিতাগুলিতে শিশুর চেয়ে শিশুর পিতার মনোভাবটিই অনেক বেশী সূচিত হয়েছে। 'আলেখ্য' কাব্যে স্ত্রী-বিয়োগ ও শূন্য গৃহের বাস্তব বেদনাই রূপায়িত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যে

২৫। "গোড়ায় গলদ" রচনার পর রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল আর কোনো প্রহসন লেখেন নাই; প্রায় দুই বৎসর পরে কয়েকটি ছোট ছোট satire বা বিদ্রূপাত্মক ব্যঙ্গ কৌতুক লিখিলেন। ...সেগুলি হইতেছে 'অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি' (সাধনা ১৩০১ ভাদ্র), 'স্বর্গীয় প্রহসন' (১৩০১ আশ্বিন-কার্তিক), 'নূতন অবতার' (১৩০১ পৌষ)। সকলগুলিই দেবতাদের লইয়া এবং প্রচলিত লৌকিক ধর্ম লইয়া বিদ্রূপ; উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট,—নব্য হিন্দুদের উদ্ভট ধর্মমতবাদকে ব্যঙ্গ। ইন্দ্র, চন্দ্র, বৃহস্পতি, কার্তিক ছাড়া শীতলা, মনসা, ঘেঁটু, ওলাবিবি প্রভৃতি অনেককেই নাটকের মধ্যে লেখক আনিয়াছেন।...এই প্রহসন কয়টি পাঠের পর পাঠক যদি দ্বিজেন্দ্রলালের 'কল্কি অবতার' (১৩০২) পড়েন তো দেখিবেন দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে রবীন্দ্রনাথের এইসব satire-র প্রেরণা আছে কিনা।"—রবীন্দ্রজীবনী (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫৫), পৃঃ ২৭৯।

২৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫০), পৃঃ ৫৫৫।

গার্হস্থ্য জীবন বা বাস্তব সংসারের সুস্পষ্ট ছবি নেই, শিশু মনের আশা-আকাঙ্ক্ষায় সে জগৎ একটি লীলার জগৎ। অপর পক্ষে দ্বিজেন্দ্রলাল কাব্যটির ভূমিকায় বলেছেন যে তাঁর 'বর্ণিত বিষয়গুলি পার্থিব।'

'মন্দ্র' কাব্যের 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'সমুদ্রের প্রতি' (সোনার তরী) কবিতাটির তুলনামূলক আলোচনা করলেও দুই কবির মনোভঙ্গির পার্থক্য উপলব্ধি করা যায়। রবীন্দ্রনাথের সমুন্নত ভাব-গৌরব ও ধ্রুপদী উদাত্ততার তুলনায় দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতাটি মহৎ ও তুচ্ছ ভাবের বিচিত্র সংমিশ্রণজাত গদ্যধর্মী বিতর্কমূলক সংলাপ বলে মনে হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকাব্যগুলির উপরে রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যগুলির কিছু প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়। ১৮৯২-১৯০০ পর্যন্ত কালকে প্রধানত রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য রচনার যুগ বলা যায়। এই যুগের প্রথমেই "চিত্রাঙ্গদা" (১৮৯২) রচিত হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের 'পাষাণী' নাটকের উপরে 'চিত্রাঙ্গদা'র প্রভাব পরিস্ফুট। কিন্তু এই 'চিত্রাঙ্গদা'র বিরুদ্ধেই দ্বিজেন্দ্রলাল দুর্নীতির অভিযোগ আনেন। নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুকরণ-প্রচেষ্টা লক্ষণীয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষর ছন্দের সহজ সৌন্দর্য ও সুকোমল মাধুর্য সেখানে অনুপস্থিত। তাই তিনি পরবর্তীকালে নাটকে গদ্য-সংলাপই ব্যবহার করেছিলেন।

॥ ৪ ॥

দ্বিজেন্দ্রলালের উপর রবীন্দ্রনাথের যে কোনো প্রভাবই পড়ে নি, এ কথা বলা মোটেই সঙ্গত নয়। কিন্তু তাকে প্রভাব না বলে প্রেরণা বলাই সঙ্গত। কারণ রবীন্দ্রকাব্যের ভাব ও ভাবনা দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে অন্যরূপ হয়ে উঠেছে। তাঁর মানসিক গঠনই ছিল এত স্বতন্ত্র। ওজস্বিনী, শব্দঝঙ্কৃত ও সুস্পষ্ট কবিতাই ছিল তাঁর অধিকতর প্রিয় কাব্য। উনবিংশ শতাব্দীর দেশ-প্রেমের কবিতা বা বীররসাশ্রিত আখ্যায়িকা কাব্য তাঁর প্রিয় ছিল। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র উত্তাল ধ্বনিগৌরব তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, হেমচন্দ্রের দেশপ্রেমের কবিতা ও নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ'ও তাঁর প্রিয় কাব্য ছিল। রবীন্দ্রনাথেরও যে সমস্ত কবিতায় বাচ্যার্থের অতিরিক্ত কোনো সঙ্কেতব্যঞ্জনা নেই, দূরাভিসারী অর্থদ্যোতনা নেই, সেই সমস্ত কবিতা দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য-

রুচির সপ্রশংস অনুমোদন লাভ করেছিল। কবিপুত্র দিলীপকুমার রায় এ সম্পর্কে যা বলেছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য . "কবি ভালবাসতেন মধুসূদনের মেঘনাদবধ, হেমচন্দ্রের বাজরে শিঙা, নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধ... অর্থাৎ ওজস্বী কবিতাই বেশির ভাগ। বেশ মনে আছে শ্রীলোকেন্দ্রনাথ পালিতই তাঁকে তর্ক করে বোঝান যে রবীন্দ্রনাথ মস্ত কবি। কবি তর্কে হেরে স্বীকার করেছিলেন একথা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মাত্র কয়েকটি কবিতার উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতি করতেন যেতে নাহি দিব, দুই বিঘা জমি, পুরাতন ভৃত্য। নিরুদ্দেশ যাত্রা নিয়ে লোকেন কাকার সঙ্গে কবির তর্ক মনে পড়ে। কবির বক্তব্য ছিল : "যাতে বোঝা যায় না তাতে আমি নেই।"—এই মত তাঁর শেষ পর্যন্ত ছিল।"[২৭]

উদ্ধৃত মন্তব্যটি থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। 'দুই বিঘা জমি' কবিতার সবটুকুই স্পষ্ট—কবিতাটির ব্যাচার্থ বা অর্থমূল্যই এর সর্বস্ব বললেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ কবিতা হিসাবে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিমানসের গভীরার্থবাহী, বর্ণময় পটভূমিকায় আলোছায়াসঙ্কেতে এক বাচ্যাতিরিক্ত রসধ্বনির সৃষ্টি করেছে। এর তুলনায় 'দুই বিঘা জমি'কে শিশুপাঠ্য কবিতা বললেও অত্যুক্তি হয় না। তবুও প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের বিদগ্ধ পাঠক ও নিজে কবি হয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল কি কাব্যবিচারের এই সাধারণ সূত্রটি বিস্মৃত হয়েছিলেন? আসল কথা, দ্বিজেন্দ্রলালের রবীন্দ্রকাব্য-বিরোধিতা মূলে ছিল তাঁর কাব্যবিচারের বিশেষ মাপকাঠি—তিনি মনে করতেন যে কাব্য হবে স্পষ্টভাষী, পেশীবহুল,—অর্থমূল্যই হবে তার সবটুকু। কিন্তু ভিন্নপন্থীরা বলবেন কাব্য শুধু অর্থভারবাহী নয়, বাচ্যার্থের সীমাকে অতিক্রম করতে না পারলে কাব্য, কাব্য না হয়ে হয় অর্থসমুচ্চয় মাত্র। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সুন্দর একটি উপমার সাহায্য গ্রহণ করেছেন · "পুরুষদের যথাযথ হওয়া আবশ্যক—কিন্তু মেয়েদের সুন্দর হওয়া চাই। পুরুষের ব্যবহার মোটের উপর সুস্পষ্ট হইলেই ভালো—কিন্তু মেয়েদের ব্যবহারে অনেক আবরণ আভাস ইঙ্গিত থাকা চাই। সাহিত্যও আপন চেষ্টাকে সফল করিবার জন্য অলংকারের রূপকের

২৭। উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ৪০

আভাসের-ইঙ্গিতের আশ্রয় গ্রহণ করে। দর্শন-বিজ্ঞানের মতো নিরলংকার হইলে তাহার চলে না।[২৮]

শব্দার্থের অতিরিক্ত কবিতার একটি গূঢ় সত্য থাকে—শব্দের মধ্যেও অর্থাতিরিক্ত রং, সুর ও সঙ্কেতভাষণ থাকে। প্রতীক, রূপকল্পনা, মনোময় ভাবনার বাহক হিসাবে আর একদল কবি কাব্য রচনা করেছেন—তাঁরা ঠিক কবিতার শব্দার্থমূল্যে বিশ্বাসী নন, তাঁরা কবিতার বোধসত্যকেই চরম মূল্য দিয়ে থাকেন। তাঁদের কবিতাকে সুস্পষ্ট অর্থমূল্যের দিক থেকে বিচার করতে গেলে 'অর্থহীন' 'স্ববিরোধী' মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বলা বাহুল্য, কবিতার অর্থমূল্যকে চরম করে দেখতে গিয়েই দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের অনেক সার্থক কবিতার কাব্যমূল্য উপলব্ধি করতে পারেন নি। সাহিত্যবিচারে দ্বিজেন্দ্রলাল অনেক স্থলে তার এই মতবাদকে সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছেন। রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র মত-বিরোধকালে দ্বিজেন্দ্রলাল একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন :

"অনেক ব্রাউনিং-শিষ্য এই রূপক লিখবার জন্য ব্যস্ত। ইচ্ছা করলে বেশ সোজা কথায় বক্তব্যটি প্রকাশ করতে পারতেন। কিন্তু করবেন না। তাঁরা কবিতাকে দুরূহ করে একটি আমোদ উপভোগ করেন। এমন কি, কবিতার নামটিও তার আসল নাম দিবেন না, পাছে টক করে পাঠক তার অর্থ ধরে ফেলে। তার নামও দেবেন এমনি যে, নামের সঙ্গে তার পংক্তি-গুলো মিলিয়ে নেওয়া পাঠকের পক্ষে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা যে রূপক (যা নারকেলের ছোবড়ার মত শাঁসটিকে সযত্নে ঢেকে রাখে) লিখতে বেশী চাইবেন, তার আর আশ্চর্য কি ?"[২৯]

এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আলেখ্য' কাব্যটিও প্রকাশিত হয়। এই কাব্যের 'ভূমিকা'তেও তিনি 'প্রহেলিকা'-কাব্য সম্পর্কে শ্লেষাত্মক মন্তব্য করেছেন (২১শে বৈশাখ, ১৩১৪)। 'কালিদাস ও ভবভূতি' গ্রন্থেও তিনি কাব্যের কষ্টকল্পিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকে সমর্থন করতে পারেন নি। দ্বিজেন্দ্রলালের রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে অস্পষ্টতার অভিযোগকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে বিচার করলে এই পর্বের সমগ্র মর্মবাণী উদ্‌ঘাটিত হবে না। নানাদিক থেকেই এই যুগে রবীন্দ্রকাব্যবিরোধী একটি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। সুরেশচন্দ্র

২৮। সাহিত্যের তাৎপর্য (১৩১০) : সাহিত্য।

২৯। উপমা : সাহিত্য, বৈশাখ, ১৩১৪।

সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকা দীর্ঘকাল ধরে রবীন্দ্রসাহিত্যের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আক্রমণ চালিয়ে আসছিল। এমন কি যে সব তরুণ সাহিত্যিক ভাব ও ভাষার দিক থেকে রবীন্দ্র-বরণ করেছিলেন, সমাজপতির ক্ষুরধার সমালোচনা তাঁদের উপরেও নির্মমভাবে বর্ষিত হয়েছে। এই পর্বে বিপিনচন্দ্র পালের মতো মনীষীও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, ধর্মবোধ, আদর্শবাদ, স্বদেশপ্রেমিকতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে 'বস্তুতন্ত্রহীনতা'-র অভিযোগ এনেছিলেন। তাঁর 'চরিত্রচিত্র' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রদ্বিজেন্দ্রবিরোধলগ্নেই রচিত হয়।[৩০] তিনি লিখেছিলেন. "ঊর্ণনাভ যেমন আপনার ভিতর হইতে তন্তু বাহির করিয়া অদ্ভুত জাল বিস্তার করে রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ আপনার অন্তর হইতে অনেক সময় ভাবের ও রসের তন্তুসকল বাহির করিয়া, আপনার অদ্ভুত কাব্যসকল রচনা করিয়াছেন। তাঁহার কাব্য যেমন কচিৎ বস্তুতন্ত্র হইয়াছে, তাঁহার চিত্রিত লোকচরিত্রেও অনেক সময় এই বস্তুতন্ত্রতার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়।"

বিপিনচন্দ্রের এই প্রবন্ধটি রবীন্দ্রবিরোধী সাহিত্যিকদলের মধ্যে একটি আনন্দময় উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। বিরোধীদলের মুখপত্র 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় তিক্ত ভাষায় রবীন্দ্রনাথের "মোসাহেব"-দের এই প্রবন্ধটি পড়ে উপকৃত হতে বলেন।[৩১] 'আনন্দ-বিদায়' অভিনয়টি এর ছ মাস পরের ঘটনা। রবীন্দ্রসাহিত্যের বিরুদ্ধে বস্তুতন্ত্রতার অভিযোগ নিয়ে পরবর্তীকালে যে ঘোরতর আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল, তার সূত্রপাত এই সময় থেকেই। প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র, (১৩২১) ও চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকা (১৩২১) এই সময়ের সাহিত্যিক আন্দোলনের দুই বিরোধী শিবিরে পরিণত হয়েছিল। অবশ্য এই আন্দোলন যখন চরম হয়ে উঠেছিল দ্বিজেন্দ্রলাল তখন পরলোকে। কিন্তু আন্দোলনের সূত্রপাতকালে তিনি জীবিত ছিলেন। তা ছাড়া রবীন্দ্রসাহিত্যের বিরুদ্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের অভিযোগ তৎকালীন রবীন্দ্রবিরোধী আন্দোলনেরই সবচেয়ে বলিষ্ঠ বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রকাব্যের বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগ এনেছিলেন। অস্পষ্টতা ও দুর্নীতির অভিযোগ। দ্বিতীয় অভিযোগটি মোটেই দ্বিজেন্দ্র-

৩০। চরিত্রচিত্র : বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১৩১৮।
৩১। সাহিত্য আষাঢ়, ১৩১৯, পৃঃ ২৭০।

মানসের অনুকূল ছিল না। কারণ দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর বহু রচনায় বুদ্ধিদীপ্ত সংস্কারমুক্ত দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। 'পাষাণী' রচয়িতার পক্ষে 'চিত্রাঙ্গদা'-র দুর্নীতি আলোচনা করা নিতান্তই অসঙ্গত বলে মনে হয়। দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যের শ্রদ্ধাবান পাঠক অন্তত এ কথা বিনা দ্বিধায় স্বীকার করবেন যে, দ্বিজেন্দ্রলাল সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে নীতিপ্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করতে চান নি। কিন্তু তিনি হঠাৎ কেন 'চিত্রাঙ্গদা'-র মতো একটি সার্থক কাব্যের মধ্যে দুর্নীতি আবিষ্কার করতে বসলেন, এই হল প্রশ্ন। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথমে যখন রবীন্দ্রকাব্যের বিরুদ্ধে অস্পষ্টতার অভিযোগ আনলেন, তখন তার মধ্যে একটি সত্য ছিল যে, এ বিরোধ প্রধানত নীতিগত—কাব্যবিচারের অর্থমূল্য ও বোধমূল্য নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের ভাষা, ভাব ও প্রকাশরীতি দ্বিজেন্দ্রলালের ভালো লাগে নি। কিন্তু উত্তেজনার ঝোঁকে তিনি তাঁর স্বপক্ষের যুক্তিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, এই সময়েই তিনি রবীন্দ্রকাব্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনলেন—এর মধ্যে যুক্তির চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথকে আঘাত করার উত্তেজনা। এরই নগ্ন আত্মপ্রকাশ ঘটেছে 'আনন্দ-বিদায়' প্যারডিতে। 'প্রস্তাবনা' অংশ থেকেই ব্যক্তিগত আক্রমণের তীব্রতা উপলব্ধি করা যায়:

> নাহি যাঁর কৃষ্ণে ভক্তি
> বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে দেখি যাঁর
> লালসায় শুধু অনুরক্তি
> এটা তাঁরও মস্তকে চাঁটিকা

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম বিশ বছর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল ও সক্রিয় ছিল। রবীন্দ্রকাব্যের প্রতি এই আনুগত্যের আতিশয্য দ্বিজেন্দ্রলালের ভালো লাগে নি। রবীন্দ্রপ্রবর্তিত কাব্যরীতি অক্ষম অনুকরণকারীর হাতে কতকগুলি অর্থশূন্য শব্দসমষ্টিতে পরিণত হতে পারে—দ্বিজেন্দ্রলালের মনে এ জাতীয় আশঙ্কাও ছিল। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যা সম্ভব, তাঁর অনুসরণকারীদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। ঋজুতা, স্পষ্টতা ও বলিষ্ঠতাকে তিনি সাহিত্যসৃষ্টির মূল উপাদান হিসাবে বরণ করেছিলেন। এ কথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত আক্রমণ মাত্রা ছাড়িয়েছিল—কিন্তু কাব্যবিচারে আর একটি দিকও যে আছে তাও দ্বিজেন্দ্রলাল সুস্পষ্ট ভাষায় ও বিনা দ্বিধায় ঘোষণা করেছিলেন। কবি-

সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেন এ সম্পর্কে একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন : "দ্বিজেন্দ্রলাল সাহস করিয়া বলিয়াছেন, কাব্যে ন্যায়শাস্ত্রটাকে মানিয়া চলা একান্ত আবশ্যক—এবং রবীন্দ্রনাথ সময় সময় ন্যায়শাস্ত্রকে পদদলিত করেন। রবীন্দ্রনাথও ততোধিক সাহসের সহিত বলিয়াছেন, ন্যায়শাস্ত্রকে মানিয়া চলিতে গেলে সকল সময় ভাল কবিতা হয় না। উভয় সাহসিকতার মধ্য হইতে আমরা লাভ উদ্বৃত্ত করিয়াছি।"[৩২]

রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র মতবিরোধ এখন ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। অর্ধ-শতাব্দী পূর্বের এই কাহিনীর মধ্যে দুটি সত্য একালের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে: প্রথমত, রবীন্দ্রজীবনের প্রথমার্ধে রবীন্দ্রবরণ ও রবীন্দ্রবিরোধের বিচিত্র ইতিহাস, দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের প্রবল একাধিপত্যের যুগেও দ্বিজেন্দ্রলালের অপরিসীম আত্মপ্রত্যয় ও মানসিক স্বাতন্ত্র্য। রবীন্দ্রনাথকে লাঞ্ছিত করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালও কম লাঞ্ছিত হন নি। মৃত্যুর পরেও এজন্য তাঁর মূল্য দিতে হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল এ বিষয়ে সচেতনও ছিল। তাই 'কাব্যের অভিব্যক্তি' লেখার আগে দেবকুমারকে লিখেছেন "পালিতের এ পরামর্শ একটু risky হলেও fair যে, তাতে আর সন্দেহ নেই। বেশ, তবে তাই হোক। আমি তা হলে লিখেই প্রতিবাদ করব। Honest Controversyকে আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি, কিন্তু কেউ যদি আমাকে এজন্য বিদ্বিষ্ট ভাবে,—সে কিন্তু বড় অন্যায় ও আক্ষেপের কথা হবে।"[৩৩] তবে অর্ধশতাব্দী পরে সাময়িকতার ধূলিজালের ঊর্ধ্বে বিচারবুদ্ধির উদারক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালকে নূতন করে আবিষ্কার করা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের ললিত-মধুর সুবিকীর্তির মোহ তাঁর ভাবস্বাতন্ত্র্যকে আবিষ্ট করতে পারে নি—বস্তুসত্যের প্রতি বিশ্বাস বুদ্ধি-বিচারের অতন্দ্র শাসন তাকে কাব্যমূল্যের আর একটি প্রত্যয়ে অচল-প্রতিষ্ঠ করেছিল। কোনো কোনো সময় বিভ্রান্তি ঘটলেও তিনি মনের অনন্যতা হারান নি। রবীন্দ্র-প্রভাবিত বাংলাসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল তাই অপঠিত ও অনাদৃত। অবশ্য বাঙালী পাঠকও তাতে লাভবান হয় নি।[৩৪]

৩২। 'সোনার শিকলি' কবিতা (গোলাপগুচ্ছ) প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন : "বলা বাহুল্য আমার এ সনেটটি রবিবাবুর 'সোনার বাঁধন' কবিতার অনুসরণে লিখিত। প্রভেদ এই যে, তাঁহার খাঁটি সোণা, আর আমার Chemical Gold ··

৩৩। বঙ্গবাণী : পৃঃ ১৫৮ ৩৪। দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ২৯৯।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে বিংশ শতকের প্রথম ত্রিশ বছর কালের বাংলা কাব্যের ইতিহাস রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক প্রভাবের ইতিহাস। এই যুগের কোনো কোনো কবির রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যপ্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। দ্বিজেন্দ্রকাব্যের সহজ স্বতঃস্ফূর্ত কৌতুকরস ও ভাষা ছন্দের প্রথাবদ্ধ রীতি-নীতির অস্বীকৃতি তৎকালীন অনেক কবিযশঃপ্রার্থীদের উৎসাহিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁদের সশ্রদ্ধ আনুগত্য সত্ত্বেও তারা দ্বিজেন্দ্রলালকেও অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে শব্দার্থবাদী, তাই রবীন্দ্রকাব্যের রহস্যময় সৌন্দর্য-নিকেতনের আলোছায়াসংকেত তাকে মোহগ্রস্ত করে নি। অথচ রবীন্দ্রভক্তদের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। হাস্যরস, সঙ্গীত ও প্রকাশরীতি —তিন দিক থেকেই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল —দুজন কবির প্রভাবকে যুগপৎ আত্মসাৎ করে একালের কোনো কোনো কবি বিচিত্র মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২) ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের চেয়ে দু বছরের বড়। সমসাময়িক কবিদের মধ্যে যাঁরা দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন বিজয়চন্দ্র ছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বর্ষীয়ান। বিজয়চন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও অক্ষয়কুমার বড়াল—তিনজন সমসাময়িক কবির দ্বারাই অল্পবিস্তর প্রভাবিত হয়েছেন। তবে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যপ্রভাবই সবচেয়ে সক্রিয় হয়েছিল। বিজয়চন্দ্রের বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও হাস্যরস সৃষ্টি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। তাঁর কবিতার হালকা ছন্দের চটুল বিন্যাস 'আষাঢে' কাব্যের দ্বিজেন্দ্রলালকে স্মরণ করিয়ে দেয়:

নামটি শুনেই শাশুড়ী হলেন হতভম্বা,
শ্বশুর বলেন মন্দ কি, তবে একটু লম্বা।

কথাটা এই বাগচী-পাড়ায় পরাণ বাগচী বড় লোক,
লোমে ভরা বুকের পাটা, কটা কটা দুটো চোখ।'[1]

'যজ্ঞভস্ম' (১৩১১) ও 'ফুলশর' (১৩১১) কাব্যের হাস্যরসাত্মক কবিতাগুলি পরবর্তীকালে 'হেঁয়ালি' (১৩২২) কাব্যগ্রন্থে সঙ্কলিত হয়। কেরানী-জীবনের বিড়ম্বনা, দাম্পত্যপ্রেমের গদ্যাত্মক পরিণতি, ছেলেমেয়ের সংখ্যাধিক্য প্রভৃতি বিষয়গুলি দ্বিজেন্দ্রলালের পরিহাস ও বিদ্রূপরসের প্রত্যক্ষ প্রেরণা থেকেই রচিত হয়েছে। বিজয়চন্দ্রও এ বিষয়ে তাঁর কবিবন্ধুর পথই অনুসরণ করেছেন—এ জাতীয় কবিতার বাকচাতুর্য ও উপকরণ দুইই দ্বিজেন্দ্রকাব্যসুলভ :

রোদন বেদন জানাই কিছু আপীসে আর বালিসে,
জানেন কিছু ডাক্তার পাঁচু, পৃষ্ঠদেশের মালিশে!
(কেননা) দাম্পত্য প্রেমের পথ্যে সকল রোগ তো সারে না?
(অহো) বেড়ে যাচ্ছে ছেলেমেয়ে ধন-দৌলত বাড়ে না।'[2]

বলা বাহুল্য কবিতাটির সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের 'কেরানী' (আষাঢ়ে) কবিতাটির একটি নিকট সাদৃশ্য আছে। ইংরেজি-বাংলা-মিশ্রিত বাগ্‌বিধিকেও দ্বিজেন্দ্রলালের মতো তিনি কোনো কোনো ব্যঙ্গকবিতার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছেন—এই মিশ্রভাষা ব্যবহারে ও স্বরবৃত্তাশ্রয়ী লঘু ছন্দ প্রয়োগে তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'যজ্ঞভস্ম' কাব্যগ্রন্থের 'পরিহাস' অংশের 'পঞ্চদেবস্তুতি', 'গণেশবন্দনা' প্রভৃতি কবিতায় 'হাসির গান'-এর কোনো কোনো কবিতার প্রভাব আছে। 'হাসির গান'-এর কতকগুলি গানে দেব-দেবী নিয়ে রঙ্গ-রহস্য করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'কল্কি অবতার' প্রহসনটিও উল্লেখযোগ্য। 'গণেশবন্দনা' কবিতায় কবি বলেছেন :

"একবার কৃপা কর শ্রীদন্তে ইঁদুর মার,
ঘোড়া দিব, হাতী দিব, যাহে ওঠে মন;
অথবা মোটর কার, নূতন বাহন।"

দ্বিজেন্দ্রলাল সমসাময়িক রাজনৈতিক জীবনের অসঙ্গতি নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছেন। বিজয়চন্দ্র 'বাঙ্গালার পলিটিক্‌স' কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলালের ঐ

১। শাকপ্রেম : 'যজ্ঞভস্ম'

২। বেড়ে যাচ্ছে ছেলেমেয়ে : ঐ

জাতীয় কাব্যরীতি অনুসরণ করেছেন। বাক্‌সর্বস্ব বাঙালীর 'আর্ম-চেয়ার পলিটিক্‌স'-কে এখানে ব্যঙ্গ করা হয়েছে :

"আরাম চেয়ারে শুয়ে ভেবে কূল পাইনে,
কিম্বিধ শাসন নীতি হবে ফিলিপাইনে।"

কবিতাটি দ্বিজেন্দ্রলালের 'নন্দলাল', 'কলিযজ্ঞ' প্রভৃতি কবিতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। দ্বিজেন্দ্রলাল উৎকট রোমান্সগ্রস্তা নায়িকাকে ব্যঙ্গ করেছেন। 'নব-হিরোইন' কবিতাটির উপাদানসংগ্রহে বিজয়চন্দ্র তাঁর কবিবন্ধুর পথই অনুসরণ করেছেন। 'ফুলশর' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'বঙ্গমঙ্গল' কাব্যটিকে একটি Mock-heroic খণ্ডকাব্য বলা যায়—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন অবলম্বন করে তিনি এই ব্যঙ্গকাব্যটি রচনা করেছেন। এই খণ্ডকাব্যটির মূলেও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রত্যক্ষ প্রেরণা আছে। বিজয়চন্দ্রের প্রকৃতিসম্পর্কিত বিদ্রূপমূলক কবিতা 'নবঋতুসংহার'-এ ঋতুসম্পর্কিত রোমান্টিক মনোভাবের প্রতি একটি সমালোচনামূলক শ্লেষাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে :

"বৃষ্টি পড়ে ঝুপ ঝাপ
জলে কাদা, পথে পাঁক
পাঁকে পোকা, জলে সাপ
মরি তরাসে।

*   *   *

ভিজে চুল নাহি বাঁধে
ধুঁয়ার জলনে কাঁদে,
তবু ডালভাত রাঁধে
যত বিরহিণী।"

কবিতাটির প্রকাশরীতি ও মনোভাব দ্বিজেন্দ্রলালের 'বর্ষা' কবিতার (হাসির গান) প্রভাবজাত। বিজয়চন্দ্র সংস্কৃত ছন্দকেও বাংলায় ব্যবহার করেছেন। বিজয়চন্দ্রের 'যজ্ঞভস্ম' কাব্যগ্রন্থের কিছু কিছু কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ছন্দোরীতিরও অনুকরণপ্রয়াস লক্ষণীয়। এ যুগের কবিরা যেমন লঘুচপল কাব্যরীতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা'-কে (শ্রাবণ, ১৩০৭) অনুসরণ করেছেন, তেমনি দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গান'-ও তাঁদের লঘুকবিতা রচনায় প্রেরণা সঞ্চার করেছে। বিজয়চন্দ্রের 'হেঁয়ালি' (১৩২২) কাব্য প্রধানত

দ্বিজেন্দ্রশিষ্যেরই রচনা।[৩] কাব্যটি দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর দু বছর পরে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই কাব্যে দ্বিজেন্দ্রলালের পন্থানুসরণ করেই তাঁকে তাঁর কবিবন্ধু ও বর্ষীয়ান শিষ্য শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছেন।

কান্তকবি রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০) রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র মিশ্র-মানসের উত্তরাধিকারী। তিনি রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল উভয়েরই কাব্যকলার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা ও দ্বিজেন্দ্রলালের কৌতুকপ্রবণতা—দুই-ই তাঁকে সমানভাবে আকর্ষণ করেছিল। মৃত্যুর দু বছর আগে (১৯০৮) রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রজনীকান্তের সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। রবীন্দ্রনাথও রজনীকান্তের কবিতার ও গানের অনুরাগী ছিলেন। রজনীকান্ত দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে থাকার সময় রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।[৪] রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'-র আদর্শে তিনি তার 'অমৃত' কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেন। কিন্তু তবুও রজনীকান্তের উপরে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাবই অধিকতর পরিস্ফুট হয়েছে। কান্তকবির প্রতিভা ছিল প্রধানত গীতিকারের। স্বদেশী গান ও হাসির গানগুলিতে কান্তকবি প্রত্যক্ষভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের এই শ্রেণীর গানের শুধু ভাবই নয়, ভাষাও তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। কান্তকবির ইংরেজি-বাংলা মিশ্রিত কাব্যরীতিও দ্বিজেন্দ্রকাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল। "কল্যাণী' কাব্যের অন্তর্গত 'পুরোহিত', 'দেওয়ানী হাকিম,' 'ডেপুটি', 'উকিল,'—এই চারটি গানে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমরা বিলেত ফেরতা ক'ভাই' গানের ভাবভঙ্গি, এমনকি সুর পর্যন্ত অনুকরণ করা হয়েছে।[৫] তরুণ-ডেপুটিচরিত বর্ণনায় কান্তকবি তাঁর অগ্রজ কবির পথই অনুসরণ করেছেন :

৩। 'হেঁয়ালি' কাব্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিজয়চন্দ্র নির্দেশ দিয়েছেন "যাদর্শী স্মৃতি' যাঁহার আলাপ্য মধুর স্মৃতিতে রচিত, তিনি হাস্যরসের কবিতায় এবং স্বদেশ-প্রেম-উদ্দীপক সঙ্গীত রচনায় বঙ্গসাহিত্যে উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং তাঁহার নাট্যরচনা, এদেশে নবযুগের অবতারণা করিয়াছে।"

৪। কান্তকবি রজনীকান্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, পৃঃ ৯৩ ৯৪।

৫। চারটি গানেরই পাদটিকায় কান্তকবি নির্দেশ দিয়েছেন "সুর—'আমরা বিলেত ফেরতা ক'ভাই।'—D. L. Roy."

আমরা, 'Dey' কি 'Ray' কি 'Sanyal',
আমরা, Criminal Bench এর Daniel',
আমরা, আসামী-শশক তেড়ে ধরি, যেন
Bloodhound কি Spaniel.
আমরা, দেখতে ছোকরা বটে,
কিন্তু কাজে ভারি চটপটে,'
যাঁহা, এজলাসে বসি, মেজাজ রুক্ষ,
চট্ করি উঠি চটে।

দ্বিজেন্দ্রলালের মতোই কান্তকবি ইংরেজি-বাংলা-মিশ্রিত কাব্যরীতি প্রয়োগের দ্বারা বক্তব্যকে সরস ও উপভোগ্য করে তুলেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সামাজিক ব্যঙ্গবিদ্রূপের উপকরণকেই কান্তকবি স্বতন্ত্র ভাষায় রূপ দিয়েছেন। কান্তকবির 'পুরাতত্ত্ববিদ' (কল্যাণী) কবিতাটির প্রেরণামূলে আছে দ্বিজেন্দ্রলালের 'তানসেন-বিক্রমাদিত্য-সংবাদ', 'ইরাণ দেশের কাজী' জাতীয় কবিতার প্রভাব। পুরাতত্ত্বের মধ্যে নানা উৎকট অসঙ্গতির সৃষ্টি করে কান্ত-কবি হাস্যরস সৃষ্টি করেছিলেন:

রাজা অশোকের কটা ছিল হাতী
টোডরমল্লের কটা ছিল নাতি
কালাপাহাড়ের কটা ছিল ছাতি
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে করেছি জাহির।

পুরাতত্ত্ববিদদের উৎকট গবেষণা নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য (বক্তৃতার নমুনা (প্রত্নতত্ত্ব): চিন্তা ও কল্পনা)।

কান্তকবির 'তামাক' কবিতাটিতে (কল্যাণী) লঘুভঙ্গিতে তামাকের প্রশস্তি রচনা করা হয়েছে। নেশার মৌতাত নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল একাধিক হাসির গান লিখেছেন। 'হাসির গান'-এর 'চা', 'ভাঙ', 'সুরা' প্রভৃতি গানে তিনি নেশা নিয়ে নানা রসিকতা করেছেন। কান্তকবি দ্বিজেন্দ্রলালের বিষয়বৈচিত্র্যের অধিকারী না হলেও অগ্রজ কবির মনোভঙ্গি ও সুরকে যথার্থ অনুসরণ করেছেন। কান্তকবির সুবিখ্যাত ভোজনবিলাসসম্পর্কিত 'ঔদরিক' কবিতাটি (কল্যাণী) প্রকৃতপক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সন্দেশ বুঁদে গজা

মতিচূর' গানটির পূর্ণতর ও পরিবর্ধিত সংস্করণ মাত্র—দ্বিজেন্দ্রলাল যা স্বল্প-ভাষণে ইঙ্গিত দিয়েছেন, কান্তকবি তাই বিচিত্র 'আখর' সহযোগে পল্লবিত করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন :

আহা, ক্ষীর হত যদি ভারত-জলধি, ছানা হত যদি হিমালয়,
আহা, পারিতাম পিছু করে নিতে কিছু সুবিধা হয়ত মহাশয় ;
অথবা দেখিয়া শুনিয়া
বেড়াতাম গুনগুনিয়া,
আহা, ময়রা-দোকানে মাছি হয়ে যদি—কি মজাবি হত দুনিয়া ;
আহা, বেজায় বেদম বেমালুম তাহা খাইতাম হয়ে মরিয়া।"

কান্তকবি লিখেছেন :

যেমন, সরোবর মাঝে কমলের বনে
কতশত পদ্ম-পাতা,
তেমনি, ক্ষীর-সরসীতে, শত শত লুচি
যদি বেখে দিত ধাতা।
(আমি নেমে যে যেতাম), (ক্ষীর-সরোবর-ঘন-জলে আমি
নেমে যে যেতাম), (গামছা পরে নেমে যে যেতাম),
(একটু চিনি যে নিতাম), (সেই চিনি ফেলে দিয়ে
ক্ষীর লুচি আমি মেখে যে খেতাম), (আহা মেখে যে খেতাম)।

এখানে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে দ্বিজেন্দ্রলালের ক্ষীররূপী 'ভারত-জলধি'ই কান্তকবির কবিতায় 'ক্ষীর-সরসী'তে পরিণত হয়েছে। তবে দ্বিজেন্দ্রলাল 'ময়রা-দোকানে মাছি' হতে চেয়েছেন মাত্র, কিন্তু তার ভাবশিষ্যটি তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে 'ক্ষীর-সরোবর-ঘন-জলে' গামছা পরে নেমে যেতে চেয়েছেন ! গুরু-শিষ্যে[৬] এইটুকুই যা পার্থক্য।

রজনীকান্তের হাসির গানগুলিতে যেমন অবিমিশ্রভাবে দ্বিজেন্দ্রপ্রভাব পড়েছে, স্বদেশী সঙ্গীতগুলিতে তেমন পড়ে নি—কারণ এখানে দ্বিজেন্দ্রলালের

৬। দ্বিজেন্দ্রজীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরী জানিয়েছেন যে কান্তকবি রজনীকান্ত দ্বিজেন্দ্রলালকে 'গুরুদেব' বলে ডাকতেন। (৪১৩ পৃষ্ঠায় পাদটিকা দ্রষ্টব্য : দ্বিজেন্দ্রলাল) ১৩১২ সালের ভাদ্র-পূর্ণিমায় সারদাচরণ মিত্রের বাড়িতে যে পূর্ণিমা-মিলনের অধিবেশন হয়, তাতে রজনীকান্ত ও দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁদের স্বরচিত গান গেয়ে সকলকে পরিতুষ্ট করেন।

সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও আছেন। কিন্তু কাব্যরীতি সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক বেশী। 'শেষদিন' (বাণী) কবিতায় কান্তকবির কণ্ঠ দ্বিজেন্দ্রলালের মতোই শোনায় :

যেদিন উপজিবে শ্বাসকষ্ট
বায়ু-পিত্ত-কফের নাড়ী হয়ে ক্ষীণ
হবে নিজ নিজ স্থান-ভ্রষ্ট।

যুক্তাক্ষরবহুল এই গদ্যাত্মক কাব্যরীতিটি দ্বিজেন্দ্রলালের অনেক কবিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 'তব চরণ-নিম্নে উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা'—গানটি সম্পর্কেও ঠিক এই কথাই বলা যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার বলিষ্ঠতা ও পৌরুষদীপ্তি কান্তকবির মধ্যে নেই—কিন্তু কান্তকবির নির্ভরতা ও স্নিগ্ধোজ্জ্বল ভক্তিমাধুর্য দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় অনুপস্থিত। কান্তকবির গীতিপ্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল—দুজনেরই স্নেহলালনে পরিপুষ্ট হয়েছে।

॥ ২ ॥

'পূর্ণিমা-মিলন', 'ইভনিং ক্লাব', 'ডাকাত ক্লাব' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ও সভা-সমিতি অবলম্বন করে এক দ্বিজেন্দ্রভক্ত সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। তার মধ্যে ললিতচন্দ্র মিত্র (নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র) দ্বিজেন্দ্রজীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরী, হাস্যরসিক কবি রসময় লাহা, কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। দেবকুমার দ্বিজেন্দ্রজীবনী ছাড়া 'অরুণ', 'প্রভাতী', 'মাধুরী', 'ধারা' প্রভৃতি কাব্য ও 'দেব-দূত' নামক একখানি কাব্যনাট্য রচনা করেন। 'দেবকুমারের রচনায়ও রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রের যুগপৎ প্রভাব আছে। দেবকুমারের 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধের বই পড়ে দ্বিজেন্দ্রলাল উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালও তাঁর 'আলেখ্য' কাব্যখানি 'অনুজোপম' দেবকুমারকে উৎসর্গ করেছিলেন। দেবকুমার দ্বিজেন্দ্রলালের সুবৃহৎ জীবনী লিখে তাঁর গুরুঋণ শোধ করেছেন।

কবি রসময় লাহাও (১২৭৬-১৩৩৫) দ্বিজেন্দ্রলালের একজন বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তাঁর বাড়িতেও পূর্ণিমা-মিলনের অধিবেশন হত। তিনি তৎকালে

প্রধানত হাস্যরসিক কবি হিসাবেই খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁর 'মণিমুক্তা', 'ছাইভস্ম' ও 'আরাম' কাব্যগ্রন্থত্রয়ে সুস্পষ্টভাবেই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব পড়েছে। ১৩১২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রারম্ভে দ্বিজেন্দ্রলাল কলকাতা থেকে খুলনায় বদলি হন। রসময় সেই সময় তাঁকে একটি দীর্ঘ আয়না উপহার দিয়ে লিখেছিলেন :

(আমি) সারাদিন রাত তোমারে দেখিতে রহিব হেলিয়া দেয়ালে।
(তুমি) ঘুমভাঙা চোখ মুছিতে মুছিতে মুখ দেখে যেও খেয়ালে।

'আরাম' কাব্যগ্রন্থটিতে দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসসৃষ্টির ভঙ্গিটিকে পর্যন্ত অনুসরণ করা হয়েছে। কবিপুত্র দিলীপকুমার রায় লিখেছেন : "রসময় লাহার নাম হয়ত শুনে থাকবেন। কবির তিনি এক প্রিয়বন্ধু ও ভক্ত ছিলেন। তিনি কবির অনুকরণে কয়েকটি হাসির কবিতা লিখেছিলেন, 'আরাম' হল বইটির নাম।"[৭] অ্যান্টিক্লাইম্যাক্সের আঘাতে তিনি হাস্যরস সৃষ্টি করতে পারতেন—তাঁর অনেক কবিতা গম্ভীরভাবে শুরু হয়ে প্রবল হাস্যবেগে পরিসমাপ্ত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসের কৌশল তিনি আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছেন। 'আরাম' থেকে একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। একবার কবির বুক জ্বলে যাচ্ছে—কবি তার কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না। "পরিজন যত সদা অনুগত, সুখী অতি মোর সুখে।" সুতরাং বুকজ্বলার কারণ পরিজনেরাও নয়। প্রেমিকাও নয়,—কারণ "শত উপাসক ছেড়ে সে আমারে করেছে হৃদয়দান।" এমন কি "অপরের সুখে করি না ঈর্ষা—তথাপি বুক যে জ্বলে। শেষের দুটি চরণে বুকজ্বলার সম্ভাব্য কারণ আবিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে :

কেন পাইতেছি আজি এ-যাতনা প্রভু, কী বলিব আহা।
খেয়েছিনু কাল আস্ত কাঁঠাল হজম হয় নি তাহা।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ "ত্রিবেণী" "অনুজোপম কবিবর শ্রীরসময় লাহার করকমলে" উৎসর্গ করেছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের বয়ঃকনিষ্ঠ ভক্তদের মধ্যে কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর (১৮৭২-১৯৪৯) নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। প্রমথনাথও রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র মিশ্র অনুকরণের মায়ায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্রমথনাথের আখ্যায়িকামূলক

৭। উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ৩৭।

কবিতাগুলি অধিকাংশ স্থলেই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছন্দোমাধুর্য সেখানে নেই। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যনাট্যের ছন্দের সঙ্গেই প্রমথনাথের এই জাতীয় ছন্দের অপেক্ষাকৃত নিকট সম্পর্ক আছে। দুটি সর্গে রচিত 'গৌরাঙ্গ' আখ্যায়িকা-কাব্য, গল্প ও গাথা-কবিতাগুলিতে[৮] দ্বিজেন্দ্রলালের অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রভাব অধিকতর পরিস্ফুট। কিন্তু প্রমথ-নাথের 'গল্প', 'গাথা' ও আখ্যায়িকাগুলির মূলে রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'র প্রেরণাও পরিস্ফুট হয়েছে। তাঁর হালকা সুরের কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল—দুজনের সুরই অনুসরণ করার চেষ্টা আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনোটিই তাঁর পক্ষে অনুসরণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। কবিশক্তির মৌলিকতার অভাবে প্রমথনাথের কবিচিত্ত রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র-কাব্যাচরণের দোটানায় পড়ে ক্লিষ্ট হয়েছে। প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 'পূর্ণিমা-মিলন'-এর একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালকে তিনি তাঁর "গান" বইটি উৎসর্গ করেন: দ্বিজেন্দ্রলালও প্রমথনাথকে তার 'মন্দ্র' কাব্যখানি উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রটি থেকে জানা যায় যে, প্রমথনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার একজন অনুরাগী পাঠক ছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য এই যে প্রমথনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রেমমূলক রচনাবলীর দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৩১২ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল যখন খুলনায় বদলি হন, তখন কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাড়িতে যে বিদায়সভা অনুষ্ঠিত হয়, (৯ই কার্তিক, ১৩১২) তাতে প্রমথনাথ একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছিলেন। সেই কবিতায় দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভা ও দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে রচয়িতার ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়েছে:

"বিদায় চাও যে ওহে কবি, তোমায় বিদায় দেয় কে আর!
তোমার উদার হৃদয়পুরে, মোদের অবাধ অধিকার।
নও ত শুধু হাসির কবি
তোমার হাতের গভীর ছবি
দীনা বঙ্গভাষার অঙ্গে অবিনাশী অলঙ্কার!"[৯]

৮। জলধর সেন সম্পাদিত প্রমথনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলী দ্বিতীয় খণ্ডে কবিতাগুলি সঙ্কলিত হয়েছে।

৯। দ্বিজেন্দ্রলাল: নবকৃষ্ণ ঘোষ, পৃঃ ১২৭।

ললিতচন্দ্র মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র (নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের দুই পুত্র), মন্মথনাথ সেন (রবীন্দ্রনাথের 'যৌবনবন্ধু' সমালোচক প্রিয়নাথ সেনের পুত্র) প্রভৃতি তখনকার কালের কবিযশঃপ্রার্থীরা দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তরঙ্গ ছিলেন। তাঁদের কোনো কোনো রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব পড়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর টাউনহলে যে স্মৃতিসভার আযোজন করা হয়েছিল তাতে ললিতচন্দ্র মিত্রের রচিত একটি গান গাওয়া হযেছিল—গানটি দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশ'-এর অনুকরণে রচিত হয়েছিল :

"বঙ্গ তোমার, জননী তোমার, ধাত্রী তোমার, তোমার দেশ,
হেরিয়া তোমার মুদিত নয়ন, হেরিয়া তোমার স্থির কেশ,
হেরিয়া তোমার ধূলায় শযন, হেরিযা তোমার অন্তিমবেশ,
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে কাঁদে উচ্চে—নাহিক শেষ।
কিসের দুঃখ কিসের দৈন্য, কিসের কান্না, কিসের ক্লেশ,
"ধন্য কীর্তি দ্বিজ-ইন্দ্র।" গাবে যখন কালের শেষ।"[১০]

আলোচ্য পর্বের বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রভক্তদের মধ্যেও দ্বিজেন্দ্র-প্রীতি, এমন কি দ্বিজেন্দ্র-বরণের বিচিত্র আকাঙ্ক্ষা নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই প্রসঙ্গে আর একজন প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্বাতন্ত্র্যনিষ্ঠ লেখকের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি হলেন প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)। ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে চৌধুরী-পরিবারের যোগাযোগ আত্মীয়তা-কুটুম্বিতার ভিতর দিয়ে আরও গভীর হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা আশুতোষ চৌধুরীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। আশুতোষ চৌধুরীর মট্‌স লেনের বাসায় তরুণ রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কড়ি ও কোমল' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পড়তেন —শ্রোতা ছিলেন আশুতোষ চৌধুরী। সেই বিদগ্ধ পরিবেশে দু বন্ধুর কাব্যালোচনা হত। সেই আলোচনার কিশোর শ্রোতা প্রমথ চৌধুরী পরবর্তীকালে লিখেছেন : "কবিতা বস্তুটি কি, সে বিষয়ে তাঁদের আলোচনা শুনতুম।...এই আলোচনার ফলে কবিতা সম্বন্ধে আমার মন যেন জেগে উঠল। তিনি কবে কি বলেছিলেন তা আমার মনে নেই। তবে যেমন তিনি আমাদের পরিবারে সঙ্গীতের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনি তিনি

১০। দ্বিজেন্দ্র-বন্দনা ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২০।

আমাদের মধ্যে কাব্যচর্চারও আবহাওয়া সৃষ্টি করেন, এই পর্যন্ত বলতে পারি। খুব সম্ভবত আমি তাঁর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছি।"[১১]

পরবর্তীকালে 'সবুজপত্র' পত্রিকার সম্পাদনাকালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বাংলা সাহিত্যের একটি বহুশ্রুত ঘটনা।[১২] 'আনন্দ-বিদায়'-এর দুর্ঘটনার পর প্রমথ চৌধুরী শ্লেষচতুর কণ্ঠে দ্বিজেন্দ্রলালকে জবাব দিয়েছিলেন।[১৩] তার চেয়েও মূল্যবান হল চৌধুরী মহাশয়ের 'চিত্রাঙ্গদা'-বিষয়ক আলোচনাটি[১৪] প্রবন্ধটি দ্বিজেন্দ্রলালের 'কাব্যে নীতি' প্রবন্ধের আঠারো বছর পরে লেখা হলেও, 'চিত্রাঙ্গদা'র বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগেরই তিনি সদুত্তর দিয়েছেন। রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রতি এই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সত্ত্বেও চৌধুরী মহাশয়ের বুদ্ধি-মার্জিত মনের এক অদ্ভুত স্বকীয়তা ছিল। তাই তিনি কোনোদিনই রবীন্দ্রনাথের ছায়া হতে পারেন নি।

অপর পক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিও তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ছিল। 'কৃষ্ণনাগরিক' হিসাবে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে একটি একাত্মতা অনুভব করেছেন: "সেকালে যারা ছোকরা ছিল, তাদের মধ্যে দুজন লেখক বলে স্বীকৃত হয়েছেন—৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও আমি। আমরা দুজনেই কৃষ্ণনাগরিক। আমাদের দুজনের লেখায় আর যে গুণের অভাব থাক—রসিকতার অভাব নেই। দ্বিজেন্দ্রলালের বিশিষ্ট রচনার নাম হাসির গান আর বীরবলের কথা কান্নার বস্তু নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান শুধু লোককে হাসাবার জন্য লেখা হয় নি। এর মধ্যে অনেকগুলি গান মারাত্মক বিদ্রূপে পরিপূর্ণ। চিনির মোড়কে যেমন কুইনিনের বড়ি খাওয়ান হয়, দ্বিজেন্দ্রলাল তেমনি হাসির মোড়কে মেকি পেটিয়টিজম, ঝুঁটো ধর্ম ও নানাপ্রকার সামাজিক মিথ্যাচারের উপর তাঁর তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করেছেন। বীরবলও তেমনি লোকের অন্তরে মিছরির ছুরি ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন।"[১৫]

১১। আত্ম-কথা। পৃঃ ৮৫-৮৬।

১২। বর্তমান লেখকের "বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী" গ্রন্থের 'সবুজপত্র ও তার দেশ-কাল' অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য।

১৩। সাহিত্যে চাবুক: সাহিত্য, মাঘ, ১৩১৯।

১৪। চিত্রাঙ্গদা: বিচিত্রা, চৈত্র, ১৩৩৪।

১৫। আত্ম-কথা, পৃঃ ১৮-১৯।

চৌধুরী মহাশয় একাধিক স্থানে দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার সপ্রশংস আলোচনা করেছেন। তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের উপর দুটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন।[১৬] এই দুটি প্রবন্ধে চৌধুরী মহাশয় প্রধানত দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গান'-এর উপরেই আলোকপাত করেছেন। 'পদচারণ'-এর (১৯১৯) 'দ্বিজেন্দ্রলাল' কবিতায় (সাহিত্য : ভাদ্র, ১৩২০) তিনি হাস্যরসিক দ্বিজেন্দ্রলালের প্রশস্তি রচনা করেছেন :

"যে আলো দিয়েছ তুমি সহাস্যে বিলিয়ে,
যে সুরে দিয়েছ তুমি ছায়াময়ী কায়া,
মনের আকাশে কভু যাবে না মিলিয়ে—
রহিয়ে সেথায় চির তার ধূপছায়া।"

প্রমথ চৌধুরী প্রধানত গদ্য-লেখক, কবিতা তাঁর স্বক্ষেত্র নয়। তবু 'সনেট-পঞ্চাশৎ' (১৯১৩) ও 'পদ-চারণ' (১৯১৯) গ্রন্থদ্বয় থেকে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত মনোজীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রকৃতপক্ষে কবিতা ও গদ্যের 'ভাশুর-ভাদ্রবউ সম্পর্ক' স্বীকার করেন নি। তাঁর কবিতাগুলি যেন গদ্যেরই ছন্দোবদ্ধ প্রকাশ। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে 'পদ-চারণ' উৎসর্গ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন : "গদ্যের কলমে লেখা এই পদ্যগুলি যে আপনাকে উপহার দিতে সাহসী হয়েছি, তার কারণ আমার বিশ্বাস, এগুলির ভিতর আর কিছু থাক না থাক, আছে rhyme এবং সঙ্গে কিঞ্চিৎ reason." এই মন্তব্যটি থেকেই তাঁর কবিতার যুক্তিনিষ্ঠ গদ্যাত্মক প্রকৃতি উপলব্ধি করা যায়। তাই তিনি সনেট রচনার রোমান্টিক পদ্ধতি বর্জন করে ফরাসী সনেটের বাকচাতুর্য, তর্কবিতর্ক, অম্লমধুর মন্তব্য, বুদ্ধিদীপ্তি প্রভৃতিকেই উপজীব্য করেছেন। ভাবালুতা, হৃদয়াবেগ ও দূরাভিসারী রোমান্টিক কল্পবৃত্তি তাঁর কাছে বিদ্রূপের বিষয় হয়েছে :

"হৃদয়ে জন্মিলে মোর ভাবের অঙ্কুর,
ওঠে না তাহার ফুল শূন্যেতে দুলিয়ে।
প্রিয়া মোর নারী শুধু, থাকে না ঝুলিয়ে,
স্বর্গ-মর্ত্য মাঝখানে, মত ত্রিশঙ্কুর।"[১৭]

১৬। 'দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতিসভায় কথিত' : সবুজপত্র, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২ এবং 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'হাসির গান' : সবুজপত্র, আষাঢ়, ১৩২৩।

১৭। আত্মকথা : সনেট-পঞ্চাশৎ।

এমন কি ঐ কবিতায় তিনি এ কথাও জানিয়েছেন যে—'মনঘুড়ি বুঁদ হলে ছাড়িনে লাটাই।' তাঁর মন যে আসলে কল্পচারী নয়, বস্তুচেতনাকে যে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে অক্ষম এই কথাই তিনি কথার কৌশলে বলেছেন। 'আলেখ্য' কাব্যের ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে যা বলেছেন, তাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : "…'বৃহৎ ভাব' দাবী করব না। পরিশেষে এও বলে রাখি যে, আমার বর্ণিত বিষয়গুলি পার্থিব,…" প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে যে দ্বিজেন্দ্রলালের মন্তব্যটির একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে, তা বেশ বোঝা যায়। বাস্তবের প্রতি আনুগত্য, রোমান্টিক ভাববৃত্তির বিরোধিতা, বিচারপ্রবণ সতর্ক মনোভাব—দুজন খ্যাতনামা কৃষ্ণনাগরিকেরই মনোজীবনের বৈশিষ্ট্য।

প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করেছেন, তাঁর অসাধারণ প্রতিভাকে সর্বতোভাবে স্বীকার করেছেন, কিন্তু মনোধর্মের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কোনো মিলই ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলালের মতো তিনিও ছিলেন স্পষ্টতার পক্ষপাতী। তিনি বলেছেন : "ফরাসী সাহিত্য এই অর্থে স্পষ্টভাষী যে, সে সাহিত্যের ভাষায় জড়তা কিংবা অস্পষ্টতার লেশমাত্রও নেই। যে বিষয়ে লেখকের পরিষ্কার ধারণা আছে, সেই কথা অতি পরিষ্কার করে বলাই হচ্ছে ফরাসী সাহিত্যের ধর্ম।"[১৮] প্রমথ চৌধুরী স্পষ্টতা, পরিচ্ছন্নতা ও ভাবাবেগনির্মুক্ত দৃষ্টিকেই বাংলা সাহিত্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন। ভাষা সম্পর্কেও তিনি সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দের পাশে নিতান্ত চলতি ঘরোয়া শব্দ ব্যবহার করেছেন। শব্দগত বৈষম্যের জন্যই তাঁর লেখায় শ্লেষাত্মক ধ্বনি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'আষাঢ়ে' ও 'হাসির গান'-এর মধ্যেও এই জাতীয় শব্দগত বিরূপতা অনেক সময় হাস্যরস সৃষ্টি করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গান' সম্পর্কিত প্রবন্ধে চৌধুরী মহাশয় নিজেই এ বিষয়টি আলোচনা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও হাস্যরস সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী একাধিক বার সপ্রশংস মন্তব্য করলেও তাঁর হাস্যরস ও দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরস যে ঠিক এক জাতীয় নয়, এ কথাও সত্য। [দ্বিজেন্দ্রলাল ও প্রমথ চৌধুরীর হাস্যরসের তুলনামূলক আলোচনা সম্পর্কে 'প্রহসন ও হাস্যরস' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য] এমন কি চৌধুরী মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বারা যে

১৮। ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচয় : নানাকথা।

প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন এমন কথাও বলা যায় না, কিন্তু ভাবে-ভঙ্গিতে, কাব্যাদর্শের আলোচনায় তিনি যে রবীন্দ্রপ্রভাবিত সাহিত্যের প্রতি সশ্লেষ কটাক্ষ ও চতুর প্রতিবাদ করেছেন, এ কথাও অস্বীকার করা যায় না —রবীন্দ্রকাব্যমণ্ডলীর চেয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যজগতেরই তিনি নিকটতর প্রতিবেশী।

॥ ৩ ॥

পরবর্তীকালের অপেক্ষাকৃত খ্যাতনামা কবিদের মধ্যে[১৯] রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র মিশ্র-মানসের রূপ খুব বেশী পরিস্ফুট হয় নি। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তখন অধিকতর শক্তিশালী ও নিঃসংশয় হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রকাব্যের ভাব, ভাষা ও প্রকাশরীতি পর্যন্ত এই পর্বে নানাভাবে আয়ত্ত করার চেষ্টা চলেছে। এই পর্বের কবিদের উপর দ্বিজেন্দ্রপ্রভাব ক্ষীণতর হলেও হাস্যরসাত্মক কবিতা রচনায়, শ্লেষাশ্রয়ী বাক্‌চাতুর্যে ও কোনো কোনো কবির দেশপ্রেমমূলক কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যাচরণের রূপ ও রীতির আভাস পাওয়া যায়। রবীন্দ্রপ্রভাবের একচ্ছত্র আধিপত্য সত্ত্বেও যে দ্বিজেন্দ্রকাব্যের মেজাজ বাংলা কাব্য থেকে অন্তর্হিত হয় নি, তারও বহু প্রমাণ আছে। রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র বিরোধলগ্নে এই তরুণতর কবিদের অনেকেরই কাব্যজীবনের প্রথম প্রত্যূষ। তাই জ্ঞাতসারে ও (অধিকাংশ স্থলেই) অজ্ঞাতসারে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার প্রভাব কারো কারো উপরে যে পড়ে নি, এমন নয়।

এ বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮২-১৯২২) প্রসঙ্গ। এই যুগের কবিদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথই সবচেয়ে বেশী রবীন্দ্রনাথের স্নেহানুকূল্য লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রভক্ত অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর মধ্যে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান নির্দিষ্ট ছিল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ যখন পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে কাশ্মীর যাত্রা করেন, তখন সত্যেন্দ্রনাথও তাঁদের সহযাত্রী হয়েছিলেন। তিনি 'ভারতী'-গোষ্ঠীর মধ্যেও অন্যতম ছিলেন। পরবর্তীকালে

১৯। করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫), যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮); কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২-); সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২); যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪); মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২); কালিদাস রায় (১৮৮৯-); কাজি নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-) প্রমুখ কবি।

যখন (১৯২১) প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় ও রবীন্দ্রনাথের স্নেহলালনে 'সবুজপত্র' পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তখন সত্যেন্দ্রনাথও ছিলেন এর নিয়মিত লেখক। 'ভারতী' পত্রিকার সম্পর্কে এসে তিনি মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র রায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি রবীন্দ্রভক্ত সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, সত্যেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুর পর লিখিত রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত শোকমূলক কবিতাটিতে (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : পূরবী) সত্যেন্দ্রনাথের কবিকীর্তির প্রশংসা করে তাঁর সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা এক গভীর অন্তর্বেদনার সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

তবু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের মনোজীবনের পার্থক্য কম নয়। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্মুখিতা ও মগ্নময়তা সত্যেন্দ্রমানসে অনুপস্থিত। সত্যেন্দ্রনাথের জ্ঞানার্জনস্পৃহা ও অধীত বিদ্যার ছাপ অনেক সময় তাঁর কবিতাকে তথ্যভারে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। তাঁর কাব্যজগৎ স্পষ্টতার জগৎ, ঔজ্জ্বল্যের জগৎ—ইন্দ্রিয়াতীতের দুনিরীক্ষ্য সীমায় তাঁর মন কদাচিৎই উধাও হয়েছে।[২০] দেশপ্রেম ও ঐতিহ্যচেতনার কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ মুখ্যত দ্বিজেন্দ্রলালের পথই অনুসরণ করেছেন। 'বেণু ও বীণা' (১৯০৬) কাব্যের কয়েকটি কবিতায় সর্বপ্রথম এই শ্রেণীর কবিতা লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তাপ তরুণ সত্যেন্দ্রনাথের মনোজীবনকেও স্পর্শ করেছিল। তিনি সেদিনের বাংলা দেশকে অতীত গৌরবের কাহিনী শুনিয়েছিলেন :

ধনপতি সে শ্রীমন্ত
সিংহল-জয়ী বিজয় সিংহ,—
কীর্তি-কথা অনন্ত
* *
হেন সন্তান, আজ
আইল কি পুনঃ আলয়ে তোমার,—
ঘুচাইতে দুখ, লাজ ?[২১]

২০। "সত্যেন্দ্রনাথের কল্পনা অন্ধকারে পক্ষ বিস্তার করিত না—অপ্রকাশ বা অপ্রত্যক্ষের সাধনা তিনি পছন্দ করিতেন না।"—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : আধুনিক বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ২৩০ : মোহিতলাল মজুমদার।

২১। আশার কথা : বেণু ও বীণা।

'কুহু ও কেকা' (১৯১২) কাব্যগ্রন্থের 'আমরা', 'বারাণসী', 'শোণনদের প্রতি', 'সিংহল', 'অভ্র-আবির'-এর (১৯১৬) 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি' প্রভৃতি কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রেমমূলক কবিতা ও গানের সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাস থেকে দেশের অতীত গৌরব-কাহিনী শুনিয়েছেন। এর মূলে ছিল এক প্রবল-গভীর আদর্শনিষ্ঠা ও নূতন ভারতবর্ষ রচনার স্বপ্ন :

চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা আদর্শ,
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে, রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ।

বর্তমানের 'আঁধার ঘোরের' ঊর্ধ্বে তিনি ভবিষ্যতের 'নবীন গরিমার' স্বপ্ন দেখেছেন। তাই দ্বিজেন্দ্রলাল আবেগভরে বলেছেন :

যদিও মা তোর দিব্য-আলোকে ঘেরে আছে আজ আঁধার ঘোর
কেটে যাবে মেঘ নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর,

সত্যেন্দ্রনাথও দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী, তিনি বলেছেন :

মণি অতুলন ছিল যে গোপন সৃজনের শতদলে,—
ভবিষ্যতের অমর সে বীজ আমাদেরি করতলে,
অতীতে যাহার হয়েছে সূচনা সে ঘটনা হবে হবে,
বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন বাঙালীর গৌরবে।[২২]

এই জাতীয় কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের পন্থানুসরণ করলেও, অগ্রজ কবির হৃদয়াবেগ ও আন্তরিকতা নিবিড়তর। তা ছাড়া সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণাপ্রবণ মন তথ্যপ্রাচুর্যে কবিতাকে ভারাক্রান্ত করেছে।

সত্যেন্দ্রনাথের হাস্যরসাত্মক কবিতাগুলির উপরে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। সবুজপত্রপর্বে ভাষাসমস্যা নিয়ে যখন সাহিত্যিক বাদানুবাদ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়েছিল, তখন 'ভারতী'-পত্রিকায় সত্যেন্দ্রনাথ নবকুমার কবিরত্ন ছদ্মনাম নিয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধগুলির মধ্যে ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনার সুর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই যুগে নবকুমার কবিরত্নের লেখনী ব্যঙ্গকবিতা ও ব্যঙ্গাত্মক প্রবন্ধে মুখর হয়ে উঠেছিল। কবিতাগুলি একত্রিত হয়ে 'হসন্তিকা' (১৯১৭) নামে প্রকাশিত হল। 'হসন্তিকা' উৎসর্গ করা হয়েছিল প্রমথ চৌধুরীকে। কবিতাগুলিতে দ্বিজেন্দ্রলাল ও দ্বিজেন্দ্রলাল-

২২। আমরা কুহু ও কেকা।

অনুরাগী প্রমথ চৌধুরী দুজনেরই প্রভাব আছে। রবীন্দ্রভক্ত হলেও সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যাচরণের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের একটি আত্মিক সম্পর্ক ছিল। বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, স্পষ্টতা, সরলতা ও সবলতা প্রভৃতি গুণ 'নবকুমার কবিরত্নে'র লেখায়ও অনুপস্থিত নয়। সমকালীন সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের নানা অসঙ্গতি নিয়ে তিনি অব্যর্থলক্ষ্য বিদ্রূপের শরাঘাত করেছেন। 'হসন্তিকা'র 'ছুঁচো-বাজীর দর্শক' কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলালের 'ইরাণ দেশের কাজী' গানটির কিছু সুরগত মিল আছে, যদিও বিষয়বস্তুর দিক থেকে কবিতা দুটির উৎস স্বতন্ত্র। দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন :

আমরা ইরাণদেশের কাজী।
আমরা, এসেছি নূতন আইন প্রচার করতে আজি।
যে যা বলবে সবই ইমামকুল, হউক মিথ্যা হউক ভুল ,—
তোমাদের হবে বলিতে তাতেই "বাহবা, বাহবা, বা জী!"

'ছুঁচো-বাজীর দর্শক' কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের শব্দ ও শব্দধ্বনির ভাবাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন :

…নইলে মোরা কেবল করব তারিফ
(মিলে) হাকিম-হুকিম-কোটাল-কাজী
ফোড়ে চাষা ঘাটের মাঝি
বলব সবাই "বাঃ বা! বা! জী!"
পণ্ডিত-পিয়ন সমান রাজী!

অনেক সময় সত্যেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের ভঙ্গি অনুকরণ করেই অগ্রজ কবির বিরোধী ভাবাদর্শের কথা বলেছেন। মনোধর্মের দিক থেকে সত্যেন্দ্রনাথ যাই হোন না কেন, কাব্যাদর্শ সম্পর্কে বিতর্কের সময় তিনি রবীন্দ্রনাথেরই পক্ষ সমর্থন করেছেন। পরবর্তীকালে বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি যখন রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বিরুদ্ধে বস্তুতন্ত্রহীনতার অভিযোগ আনেন, তখন নবকুমার কবিরত্ন 'শ্রীশ্রীবস্তুতন্ত্রসার' কবিতায় তাঁর সশ্লেষ প্রতিবাদ জানান। কবিতাটির আঙ্গিক দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের সামাজিক ব্যঙ্গবিদ্রূপের উপকরণ ও ভঙ্গিও নবকুমার কবিরত্ন অনুসরণ করেছেন। মধ্যবিত্ত পারিবারিক জীবনের নানা বিড়ম্বনা দ্বিজেন্দ্রলালের রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুক-পরিহাসের বিষয়ীভূত হয়েছে। পূর্বসূরীর

এই নির্দিষ্ট পথকে সত্যেন্দ্রনাথও গ্রহণ করেছেন। 'আদর্শ বিয়ের কবিতা'-টি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। দ্বিজেন্দ্রলালের 'দশ অবতার' (হাসির গান) কবিতাটি সত্যেন্দ্রনাথের 'দশা-বেতর স্তোত্র' কবিতাটির প্রেরণামূলে, এ কথা মনে করা অসঙ্গত হবে না। অবশ্য শিল্প হিসাবে অগ্রজ কবির রচনাটি সার্থকতর। পরানুকরণপ্রিয়তা, ধর্মের মুখোস পরে ভণ্ডামি, ধর্ম সম্পর্কে আচারসর্বস্ব অন্নদার মনোভাবকে ব্যঙ্গ করে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর 'আষাঢে', 'হাসির গান'-এর অনেকগুলি কবিতা রচনা করেন। 'বঙ্গনারী' নাটকের উপেন্দ্র চরিত্র সৃষ্টি করে তিনি ভণ্ডামিকে ব্যঙ্গ করেছেন। উপেন্দ্রের ভণ্ডশিষ্যদের গানে গোপনে মুরগিভক্ষণ ও চতুর্বর্গফলরূপী টিকির মাহাত্ম্য ফলাও করে বর্ণনা করা হয়েছে। 'শ্রীহরিগোস্বামী' কবিতায় (আষাঢে) মুরগি-ভক্ষণ ও টিকিতত্ত্বের বিস্তৃত ভাষ্য করা হয়েছে। 'শ্রীশ্রীটিকিমঙ্গল' কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথও বলেছেন :

ভো ভোঃ কারণ-সলিলে কুঁকড়ি-স্থ কড়ি
ডিম্বে যেমন হংস,
আহা ছিল চইতন-চট্‌কি আদিতে
টিকি হয় যার বংশ।

কবিতাটির ভাষা ও ছন্দ 'বঙ্গনারী'র বিখ্যাত হাস্যসঙ্গীতটিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। 'হসন্তিকা'র 'মদিরামঙ্গল' কবিতাটি দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশ' গানটির প্যারডি—ইংরেজি-বাংলা-মিশ্রিত বাগভঙ্গিও লক্ষণীয় :

মদ্য আমার! পানীয় আমার। সরাব আমার। আমার Peg!
কেন কোম্পানী নজর দিল গো! কেন হল এই Duty Plague.

'হসন্তিকা' দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর চার বছর পর প্রকাশিত হয়। তারও একবছর পূর্বে প্রকাশিত 'অভ্র-আবীর' গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর তিনি যে 'তানকা সপ্তক' লিখেছিলেন, তাতে কবি দ্বিজেন্দ্রলালের বৈশিষ্ট্যের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। 'মন্দ্র' কাব্যের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছেন সত্যেন্দ্রনাথ যেন তাকেই একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে জাপানী ছন্দে প্রকাশ করেছেন :

ফেনিল হাস্য
সাগরের মতো তার ;
বিলাস লাস্য,

হুঙ্কার, হাহাকার
মিলে মিশে একাকার।

সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রশিষ্য হয়েও জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে নানাভাবেই দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে তাঁর মানসিক সমধর্মিতা প্রকাশ করেছেন।

॥ ৪ ॥

সত্যেন্দ্রনাথের বয়ঃকনিষ্ঠ কবিদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের (১৮৮৭-১৯৫৪) কবিমানস ও প্রকাশরীতির মধ্যে এমন একটি স্বাতন্ত্র্য ছিল, যা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অপেক্ষাকৃত বর্ষীয়ান দুজন কবি—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫) ও যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮) রবিরশ্মিকেই রূপ ও রীতির দিক থেকে বরণ করে নিয়েছেন। তাঁদের রূপানুভূতির মধ্যে কোনো সংশয়ই জাগে নি। কুমুদরঞ্জনের (১৮৮২) শান্ত-মধুর-সহজ-রসাবেশের মধ্যেও কোনো প্রশ্নচঞ্চল সংশয় বা 'বিদ্রোহী ভাব' থাকা সম্ভব ছিল না। কিন্তু এই পর্বের কবিদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথই প্রচলিত পথ থেকে একটু দূরে সরে দাঁড়িয়েছেন।

যতীন্দ্রনাথকে হয়তো তথাকথিত রবীন্দ্রবিরোধী কবি বলা সঙ্গত হবে না, কিন্তু রোমান্টিক ভাবের প্রতি বিরোধী মনোভাব ও শ্লেষতির্যক দৃষ্টি তার কাব্যের প্রথম থেকেই লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রপ্রভাবিত বাংলা কাব্যের যে অতিলালিত্য-সংস্কার একসময় দ্বিজেন্দ্রলালকে প্রতিবাদপ্রবণ করে তুলেছিল, যতীন্দ্রনাথ তাকেই নানাভাবে বিদ্রূপ করেছেন:

অভাবের লাখো ফুটো বাক্যের ফাঁস বুনে
মামুলিপ্রেমের নেট মশারিটা টাঙিয়ে নে।
তার মাঝে শুয়ে বল মশারির নেই আদি—
অনন্ত, অমধ্য, অভেদ্য ইত্যাদি।[২৩]

কবিকল্পনার আতিশয্য ও তুরীয়ধর্মিতাকে তিনি বহুবার সশ্লেষ কটাক্ষ করেছেন:

কল্পনা, তুমি শ্রান্ত হয়েছে, ঘন বহে দেখি শ্বাস,
বারোমাস খেটে লক্ষ কবির একঘেয়ে ফরমাস!

২৩। মন-কবি: মরীচিকা।

সেই উপবন, মলয়পবন, সেই ফুলে ফুলে অলি,
প্রণয়ের বাঁশি বিরহের ফাঁসি, হাসা কাঁদা গলাগলি !
নব ফরমাস দেই তোমা, সাজো কলকের পর কলকে,
বুকের রক্ত ছল্‌কে উঠুক, হাড়গুলো যাক পলকে ।'[২৪]

উদ্ধৃত অংশটি থেকে যতীন্দ্রনাথের কাব্যাচরণের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তার সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিধর্মের একটি আত্মিক সংযোগ আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'কবি' কবিতাটি (হাসির গান) এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য—তিনি কথাকথিত 'উচ্চ ভাবপূর্ণ' কাব্যকে ব্যঙ্গ করেছেন। কবিতার তুরীয়ধর্মিতাকে তিনিও স্বীকার করতে পারেন নি।

দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার মতো যতীন্দ্রনাথের কবিতায়ও একটি আধ্যাত্মিকতাবিরোধী মনোভাব লক্ষণীয়। বস্তুসত্যে বিশ্বাসী দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের ঊর্ধ্বে আর কোনো সত্য ছিল না, তাই তার কাছে "বস্তু হতে সেই মায়া তো সত্যতর"—নিছক কবিকল্পনা বলেই মনে হয়েছে। কিন্তু এই আধ্যাত্মিকতার শূন্যস্থান পূরণ করেছে তাঁর দৃপ্ত আদর্শবাদ ও মানবসমাজের সমুন্নতি সম্পর্কে বলিষ্ঠ বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই 'আলেখ্য' কাব্যের 'সত্যযুগ' কবিতায় এক নবীন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়েছে। যতীন্দ্রনাথও ছিলেন 'অবিশ্বাসী কবি', মনের সংশয় ও আধ্যাত্মিক ভাববিরোধিতাকে তিনি শোষণবিরোধী মনোভাব ও মানবিক সহানুভূতির দ্বারা অনেকটা পূরণ করে নিয়েছেন। অবশ্য শেষোক্ত মনোভাবটি দ্বিজেন্দ্রলালের চেয়ে যতীন্দ্রনাথের মধ্যে আরও প্রবল ও প্রত্যক্ষ। দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যেও একসময় নাস্তিকতা প্রবল হয়ে উঠেছিল, কেউ কেউ আবার তাঁকে অজ্ঞেয়বাদীও (Agnostic) বলেছেন।[২৫] যতীন্দ্রনাথের 'দুঃখবাদ'ও দ্বিজেন্দ্রলালের এই ধরনের মনোভাবের নিকটগোত্রীয়। এ ধরনের সমস্ত মনোভাবের পিছনেই আছে একটি জড়বাদ। দ্বিজেন্দ্রলালের মতো যতীন্দ্রনাথও একসময় এই 'অসীম জড়ের কাছে' আত্মসমর্পণ করেছিলেন।[২৬] 'সায়ং'

২৪। ঘুমের ঘোরে, ষষ্ঠ ঝোঁকে　মরীচিকা

২৫। "তবে এক সময় তিনি হয়ত অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন।"—দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রসঙ্গ : কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত · মানসী ও মর্মবাণী, ভাদ্র, ১৩২৩।

২৬। ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'কবি যতীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের (১৩৬২) ৬৫-৭০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

কাব্য থেকেই যতীন্দ্রনাথের কাব্যের একটি সুরপরিবর্তন ঘটেছে—জীবনের অপরাহ্নিক বেদনার আলোকে কবি বিশ্বাস ও নির্ভবতা খুঁজে পেয়েছেন। যুক্তিবাদী ও সংশয়বাদী দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যজীবনের উত্তরপর্বের মধ্যেও ভক্তি ও বিশ্বাসের সুর ফুটে উঠেছে। তাঁর শেষজীবনের কবিতায়, গানে ও নাটকে তার প্রমাণ আছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল প্যারডি রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গানেরও প্যারডি রচনা করেছিলেন। 'আনন্দ-বিদায়'-এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গানের প্যারডি আছে। রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত গানের প্যারডি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি
তুমি leisure মাফিক বাসিও।
আমি নিশিদিন বেঁধে বসে আছি,
তুমি যখন হয় খেতে আসিও।

যতীন্দ্রনাথও প্যারডি রচনায় সিদ্ধহস্ত, তিনি রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতার প্যারডি করেছেন, তা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধার করেও তিনি তাতে শ্লেষাত্মক টীকা সংযোজন করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সুবিখ্যাত গঙ্গাস্তোত্র কবিতাটিতে পৌরাণিকস্মৃতিরঞ্জিত গঙ্গার পতিতোদ্ধারিণী মূর্তিরই বন্দনা করা হয়েছে :

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে
শ্যাম-বিটপি-ঘন-তট-বিপ্লাবিনি, ধূসর তরঙ্গ ভঙ্গে।

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যরীতি অনুসরণ করে যতীন্দ্রনাথ গঙ্গার আর একটি মূর্তি কল্পনা করেছেন :

"চিরক্রন্দনময়ী গঙ্গে।
কুলুকুলু কলকল প্রবাহিত আঁখিজল
দেব-মানবের একসঙ্গে।"[২৭]

দ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গার উৎপত্তি সম্পর্কে প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনীর কথাই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের যুক্তিবাদী তির্যকদৃষ্টি প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনীর অন্তরালে একটি বাস্তব সত্যকেই আবিষ্কার করেছে :

২৭। গঙ্গাস্তোত্র. মরুশিখা।

হিমগিরি-নির্ঝরে তোমার জীবন গড়ে,—
মিথ্যা মা মিথ্যা এ কাহিনী,
যুগে যুগে নরনারী-অশ্রুরাশ-আঁখিবারি
পুষ্ট করিছে তব বাহিনী।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গান'-এর 'নূতন চাই' কবিতার তিনটি চরণে আছে :

ক্রমাপত টপ্পাখেয়াল
ডাকে যেন কুকুর শেয়াল ;
প্রত্যহ অপ্সরা দেখলেও তাতে আর মন টলে না।

যতীন্দ্রনাথের 'শরৎ' কবিতাটি সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে লেখা। কবি এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্গে শরৎ' কবিতার প্যারডি করেছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের বাচনভঙ্গিটিও আয়ত্ত করেছেন :

দিবসে শেয়াল গাহিছে খেয়াল
বিজন পল্লী-সভাতে।
একপাশে তুমি কাঁদিছ জননী
শরৎকালের প্রভাতে॥[২৮]

কাব্যরীতির দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যরীতি ও প্রকাশভঙ্গির মতো যতীন্দ্রনাথেরও কাব্যরীতির মধ্যে একটি পৌরুষ আছে। কবিতার অতিনমনীয়তা ও অতিলালিত্যের মোহে তাঁদের দুজনের কেউই মুগ্ধ হন নি। তাই রবীন্দ্র-প্রভাবের ব্যাপকতা সত্ত্বেও তাঁদের কবিতার স্বাতন্ত্র্য ব্যাহত হয় নি। দ্বিজেন্দ্রলালের বিশিষ্ট কবিতাগুলির প্রকাশ যুক্তিবুদ্ধিবিতর্কের বিদ্যুৎশিখায় প্রদীপ্ত। তাঁর পরিণত বয়সের অনেকগুলি কবিতা সংলাপাত্মক—এই সংলাপাত্মক কাব্যরীতিই তাঁর যুক্তিতর্কবিচারবিশ্লেষণকে আরও প্রখর করে তুলেছে। যতীন্দ্রনাথের কাব্যরীতির মধ্যেও তর্কসঙ্কুলতা, বিচারবুদ্ধিপ্রবণতা ও সংলাপাত্মক ভঙ্গি লক্ষণীয়। তিনি তাঁর 'বন্ধু'কে সম্বোধন করেই নাটকীয় রীতিতে তাঁর বক্তব্য সন্নিবেশ করেছেন। যতীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের কাব্যগুলিতে ছন্দের কিছু নূতনত্ব আছে। কাটা-কাটা সমাসবহুল দীর্ঘছন্দ

২৮। শরৎ : মরুশিখা।

বাক্যাংশগুলি দিয়ে তিনি কবিতা রচনা করেছেন—কবিতা হয়েও তারা অনেক সময় যেন শব্দসুগম্ভীর গদ্যের সঙ্গে মিতালি করেছে :

ঘুমের অর্গলবদ্ধ বাদুড়ের লৌহপক্ষপুটে
বদ্ধদ্বার অনিদ্র মধ্যাহ্ন-কারাগার ;
দিক্‌পারে মাথা কুটে রুদ্ধকণ্ঠ বিশ্বের জিজ্ঞাসা :—[২৯]

বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও ভাষা-ছন্দের স্বাতন্ত্র্য দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মহৎ ও তুচ্ছ ভাবের বিচিত্র সংমিশ্রণে যেমন কবিতার মধ্যে একটি নূতন ধরনের আস্বাদন সঞ্চারিত হয়েছে, তেমনি ছন্দ ও ভাষার বেপরোয়া ও অবলীলাকৃত গতিভঙ্গি চমকের সৃষ্টি করে। 'আলেখ্য' কাব্যের ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর কবিতা ও কাব্যরীতি সম্বন্ধে যা বলেছেন, তার সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের 'অনুপূর্বা' সঙ্কলনটির (প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ, ১৩৫৩) 'আমার কথা' অংশটি মিলিয়ে পড়লেই উভয় কবির দৃষ্টিভঙ্গির সমধর্মিতা উপলব্ধি করা যাবে : "আমার ঘরে জন্মে সেই কল্পলোকবাসিনীর যা-দুর্গতি হয়েছে তাও আমি সব জানি।…কেবল একান্ত কৌলীন্য-অভিমান নিয়ে বারবার তাকে শাসন করেছি—'অর্থগৌরবহীন অল্পবিত্তের ঘর, না জুটে রত্নালঙ্কার, না মানায় ফুলের সাজ, নিত্যদুঃখের সংসারে জলভরা চোখে কাজলেরই বা ঠাঁই কোথা? সুতরাং আর যাই হও পাড়াপড়শী সুভাগিনীদের মতো তুমি ব্যাপিকা হবার প্রয়াস করো না। রূপগুণ যদি নাই থাকে বংশের সম্ভ্রমবোধ হারিও না।"—দীর্ঘ কবিজীবনের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ তার এই প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হন নি। আবেগপ্রবণ কাব্যধারার পাশাপাশি যে নৈয়ায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচারবিশ্লেষণের ধারা চলেছিল, দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন সেই ধারার কবি—চিন্তায়, শ্লেষচতুর বাগবৈদগ্ধ্যে ও কাব্যরীতির বিশিষ্টতায় যতীন্দ্রনাথও ঐ ধারারই গতিপথকে আরও এগিয়ে দিয়েছেন। তাই কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকরাও তাঁর কবিতায় নূতন যুগের অভিজ্ঞতার স্বাদ পেয়েছিলেন।[৩০]

২৯। কতদূর : ত্রিযামা।

৩০। "মোহিতলালের মত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তও আমাদের আরাধনীয় ছিলেন—তাঁদের আধুনিকতার দিক থেকে যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ বাংলা সাহিত্যে এক অভিজ্ঞতা।"—
কল্লোল যুগ (১৩৫৭) : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পৃঃ ১০৯।

আলোচ্য পর্বের অন্যান্য রবীন্দ্রভক্ত কবিরা কখনো কখনো দ্বিজেন্দ্রলালের অনুসরণে হাস্যরস সৃষ্টি করার চেষ্টা করলেও, তাঁরা কেউই তাঁর কাব্যাচরণকে অনুসরণ করেন নি। কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও কালিদাস রায় যথাক্রমে 'কপিঞ্জল' ও 'বেতালভট্ট' ছদ্মনামে হাসির কবিতাও লিখেছেন—কিন্তু তাতে মৃদুপরিহাস ও রসোজ্জ্বল কৌতুকের দিকটিই ফুটেছে, দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসের প্রগল্‌ভ বৈচিত্র্য ও প্রবল প্রাণশক্তি সেখানে অনুপস্থিত। দ্বিজেন্দ্রলাল ছন্দের যে অভিনবত্ব নিয়ে এলেন, পরবর্তী কালে সে ছন্দের বিশেষ অনুশীলন হয় নি। দিলীপকুমার রায় কবি নিশিকান্তর কবিতা থেকে উদাহরণ দিয়েছেন :

সৌন্দর্যের | আরক্তিম | কপোলতলে |
শুধু প্রখর | চমক তোলা | সর্বনাশের | আভা
প্রস্ফুটিত | গোলাপ ফুলের | দলে দলে |
গোপন করা | কীটের তীক্ষ্ণ | দশনগুলি কাঁপা[৩১]

উদ্ধৃত অংশটিতে নূতন ধরনের ছন্দ অনুশীলনের একটি প্রচেষ্টা আছে বটে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার মতো এই ছন্দের চূড়ান্ত রূপ উদ্‌ঘাটিত হয় নি। নিশিকান্তের কবিতাটি স্বরবৃত্তেরই অপেক্ষাকৃত নিকটজ্ঞাতি—যদিও অক্ষরবৃত্তের ধ্বনিগাম্ভীর্য ও পৌরুষশক্তিরও কোনো অভাব ঘটে নি। দিলীপকুমার রায়ও (জন্ম ১৮৯৭) এই ছন্দে কতকগুলি কবিতা লিখেছেন। 'সূর্যমুখী' কাব্যগ্রন্থের কোনো কোনো কবিতায় তিনি এই ছন্দের অনুশীলন করেছেন, পিতার এই নবোদ্ভাবিত ছন্দটিকে তিনি প্রচলন করার চেষ্টা করেছেন। এই জাতীয় দু-একটি বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ছাড়া দ্বিজেন্দ্রলালের বিশিষ্ট রীতির ছন্দ নিয়ে পরবর্তীকালের কবিরা তেমন অনুশীলন করেন নি।

রবীন্দ্রবরণের চূড়ান্ত লগ্নেও যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ, মোহিতলালের ভোগবাদ ও নজরুলের (জন্ম ১৮৯৯) সমাজসচেতন বিদ্রোহী মনোভাব নূতনত্বের সৃষ্টি করেছিল। মোহিতলাল সচেতনভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বারা কোনোদিনই প্রভাবিত হন নি—কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের কবিপ্রতিভার পৌরুষ ও প্রাণশক্তি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তাই তিনি পরিণত বয়সে দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরস ও দেশপ্রেম—দুয়ের কথাই শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।[৩২] তিনি

৩১। ছান্দসিকী দিলীপকুমার রায়, পৃঃ ১৫৮-১৫৯।

৩২। মোহিতলালের 'সাহিত্য বিতান'-এর 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায়' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

বাংলা ছন্দে দ্বিজেন্দ্রলালের দানের কথাও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। মোহিতলালের কবিতায়ও ভাব ও রূপকর্মের নূতনত্ব লক্ষণীয়। মোহিতলালের কবিতায় অলঙ্করণ ও স্থাপত্যধর্মিতার সঙ্গে ওজস্বিতার সমন্বয় ঘটেছে। মৃদুতা ও নমনীয়তার বিরুদ্ধে এও আর এক ধরনের বিদ্রোহ। মোহিতলালের কবিমানস ও কাব্যরীতি রবীন্দ্রপ্রভাবের সর্বগ্রাসী ব্যাপকতাকে অনেকখানি অস্বীকার করেছে। কেউ কেউ আবার মধুসূদনীয় ওজস্বিতার উত্তরাধিকার দেখতে পেয়েছেন দ্বিজেন্দ্রলাল ও মোহিতলালের কাব্যাচরণের মধ্যে।[৩৩] নজরুলের উপরেও সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলালের প্রভাব পড়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল ও মোহিতলালের মতো তিনিও ছিলেন চড়া গলার কবি, তাঁর প্রাণশক্তিও ছিল অফুরন্ত। দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রেমমূলক কবিতার প্রকৃত উত্তরাধিকারী সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল। ষন্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন একটি পৌরুষ ও বলিষ্ঠতা সঞ্চারিত করেছিলেন, তেমনি মোহিতলাল ও নজরুলও এই ছন্দকে উদ্দীপক ভাবপ্রকাশের বাহন করে তুলেছিলেন। এই প্রসঙ্গে নজরুলের 'দুর্গমগিরি কান্তারমরু' গানটি উল্লেখযোগ্য।

বাংলা কাব্যে একসময় হাস্যরসের যে নানামুখী বিকাশ ঘটেছিল, তার ধারাটিও এই পর্বে যেন অনেকখানি স্তিমিত হয়ে এসেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গান'-এর অনুকরণ ও অনুসরণ একালের কাব্যে খুব বেশী সক্রিয় নয়। কিন্তু করুণানিধান থেকে নজরুল পর্যন্ত বাংলা কাব্যের এই পর্বটিতে হাস্যরসের ধারা স্তিমিত হলেও শুকিয়ে যায় নি। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল সজনীকান্ত দাসের (জন্ম ১৯০১) ব্যঙ্গকবিতাগুলি। 'কেড্‌স ও স্যাণ্ডাল' (ভাদ্র ১৩৪৭), 'অঙ্গুষ্ঠ,' 'মনোদর্পণ' 'বঙ্গ-রণভূমে' প্রভৃতি কাব্যে হাস্যরসিক সজনীকান্তের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় আছে। ব্যঙ্গবিদ্রূপ, কৌতুকপরিহাস, বাক্‌চাতুর্য প্রভৃতি হাস্যরসের বিবিধ রূপান্তরগুলি তাঁর কবিতায় সার্থকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'আষাঢ়ে' কাব্যগ্রন্থের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল কতকগুলি হাস্যরসাত্মক

৩৩। "ইংরাজি কাব্যে austerity বলতে যা বোঝায় তা বাংলা কাব্যে মধুসূদন ছাড়া আর কেউ আনেন নি। এ ওজস্বিতা আরো বিকাশ হতে পারত, কিন্তু তাঁর পরে এক দ্বিজেন্দ্রলাল ও মোহিতলাল ছাড়া আর কেউ তাঁর ওজস্বিতার উত্তরাধিকারী হবার প্রেরণা বা প্রয়াস পান নি। আর বোধ হয় সেই জন্মেই এই দুজন কবি আজো সে স্বীকৃতি পান নি যে স্বীকৃতি তাঁদের প্রাপ্য।"—উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল : দিলীপকুমার রায়, পৃঃ ১৫৫।

গল্প লিখেছিলেন—এই শ্রেণীর গল্পরচনায় সজনীকান্তও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন—সমসাময়িক সমাজ-জীবনের নানা কৌতুককর অসঙ্গতিকে তিনি উদ্‌ঘাটিত করেছেন। তবে প্রায় চল্লিশ বছর পরে সমাজ-জীবনেরও কিছু পরিবর্তন হয়েছে। সজনীকান্ত আধুনিক নাগরিক জীবনের তরুণ-তরুণী সমাজের বিলাস-ব্যসন-রোমান্স প্রভৃতিকে নিয়ে অম্লমধুর কটাক্ষ করেছেন। প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছিলেন :

সে আসে ধেয়ে এন ডি ঘোষের মেয়ে,
ধিনিক্ ধিনিক্ ধিনিক্ ধিনিক্—চায়ের গন্ধ পেয়ে
কুঞ্চিত ঘন কেশে, বোম্বাই শাড়ী বেশে,
খট্-মট বুট শোভিতপদ শঙ্কিত ম্যাটিনি এ।
বঞ্চিত নহে, সঞ্চিত কেক বিস্কুট তার চেটে ;
অঞ্চল বাঁধা বেঁচে, রুমালেতে মুখ মোছে,
জবাকুসুমের গন্ধ ছুটিয়ে ড্রইং রুমটি ছেয়ে।

প্রায় ত্রিশ বছর পর সজনীকান্ত মঞ্জুলিকা রায়ের চরিত লিখতে গিয়ে বললেন :

বেহালার মঞ্জুলিকা রায়,
চপলা নন্দীর কাছে শিখীনৃত্য শিখিয়াছে
নাচিয়াছে বহু জলসায় ;
নজরুলী গজল সুরে দিলীপী আখর জুড়ে
অতি-আধুনিক গান গায়।[৩৪]

'এন ডি ঘোষের মেয়ে'-র সঙ্গে শিখীনৃত্যপটীয়সী 'বেহালার মঞ্জুলিকা রায়ে'র জ্ঞাতিত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। প্রগতির নামে সমাজ-জীবনের নানা আচারভ্রষ্টতাকে ও আতিশয্যকে ব্যঙ্গ করে তাঁর বিখ্যাত 'Reformed Hindoos' কবিতার শেষদিকে দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছিলেন :

আমরা beautiful muddle, a queer amalgam
of শশধর, Huxley, and goose.

সজনীকান্তও হাল আমলের সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্যে উৎকট বিলাতিয়ানাকে বিদ্রূপ করেছেন :

৩৪। চলতি ছন্দ : কেতন ও শ্যাওলা।

বালিগঞ্জের ড্রইং-রুমে
বুড়ারা বেবাক বেহুঁশ ঘুমে,
এলিয়ট, প্রুস্ত, হাক্সলিরা
দই মেখে যেন খায় চিঁড়া
লরেন্স, শ্রীগল্‌সওয়াদিও
বলে, দু আঁজলা মুড়ি দিও।[৩৫]

সমসাময়িক রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কেও তাঁর পর্যবেক্ষণদক্ষতা ও ব্যঙ্গ-কৌতুক-কটাক্ষ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দ্বিজেন্দ্রলালের প্যারডিরচনার দক্ষতাও সজনীকান্ত আয়ত্ত করেছেন। 'অঙ্গুষ্ঠ' কাব্যের শেষ দিকের অনেকগুলি কবিতাই প্যারডি। বাংলা কবিতায় ইংরেজি শব্দকে মিশিয়ে ব্যঙ্গ কবিতা লেখার রেওয়াজ দীর্ঘকালের। সজনীকান্ত পূর্বসূরীদের সে পথকে বিসর্জন করেন নি। সজনীকান্তের উদ্ভাবনের মৌলিকতা ও অবলীলাকৃত রচনাশক্তি দ্বিজেন্দ্রলালের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। অনেক সময় অনুপ্রাস সৃষ্টির মৌলিকত্বও হাস্যরসের কারণ হয়েছে, যেমন—'মেঘল হইল দীঘল বদন মুঘল-চিত্র সম' (আমি যে প্রথমতম : অঙ্গুষ্ঠ)। তবে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় ছন্দ সম্পর্কে যে নিরঙ্কুশতা ও প্রচণ্ড প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তা সজনীকান্তের ব্যঙ্গকবিতায় নেই। শেষোক্ত কবি ছন্দেব অতিলালিত্য-সংস্কারে বিশ্বাসী না হলেও, ছন্দ সম্পর্কে মোটামুটি রবীন্দ্রপ্রভাবিত নীতিনিয়মকেই মেনে চলেছেন কিন্তু যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে সমর্থন করে বলেছেন "কাব্য সৃষ্টি হয় না-কো ভাই এঁটো কলাপাত চেটে।" দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে লিরিসিজম ও স্যাটায়ারের এক বিচিত্র সংমিশ্রণ ঘটেছিল, ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হলেও সজনীকান্তের কবিমানসেও এই মিশ্র উপাদান বিদ্যমান।

॥ ৫ ॥

সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের উপর দ্বিজেন্দ্রলালের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব শুধু বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রেই বিস্তৃত নয়, পরবর্তীকালের বাংলা নাটকের উপরও তাঁর প্রভাব পড়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের হাতেই বাংলা নাটকের আধুনিক ভাবধারা সচেতনভাবে রূপ পেয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম

৩৫। চেটে দিয়ে গেল আরশোলায় : কেডস ও স্যাণ্ডাল।

দু দশককে প্রধানত ঐতিহাসিক নাটকের গৌরবান্বিত যুগ বলা যায়। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার সম্প্রসারণের সঙ্গে ঐতিহাসিক নাটকের এই সমৃদ্ধি বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলা নাটকের একটি প্রধান লক্ষণ বলা যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা ঐতিহাসিক নাটকে যে নূতনত্বের সঞ্চার করেছিলেন, তার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। পরবর্তীকালের নাট্যকারেরা ঐতিহাসিক নাটক রচনা করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রপ্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হয়েছেন। মোট কথা, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, দ্বিজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক নাটককে যতদূর অগ্রসর করিয়ে দিয়েছেন, তারপরে এই শ্রেণীর নাটকে বিশেষ কোনো নূতনত্ব সঞ্চারিত হয় নি। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনগুলির প্রকৃতপক্ষে কোনো উত্তরসূরী নেই। অবশ্য, পরবর্তীকালের নাটকে প্রহসনের সংখ্যাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তবে তাঁর পৌরাণিক নাটকের ধারাকে পরবর্তীকালে অনেকখানি নূতন মহিমা দেওয়া হয়েছে (মন্মথ রায়ের পৌরাণিক নাটকগুলি দ্রষ্টব্য)। সামাজিক নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল গিরিশচন্দ্রপ্রবর্তিত আদর্শ অতিক্রম করতে পারেন নি। পরবর্তীকালে সামাজিক নাটক সম্পূর্ণ নূতন পথ ধরেছে। সুতরাং বাংলা নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব দেখতে হলে ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যেই তা অনুসন্ধান করতে হবে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই সমকালীন ঐতিহাসিক নাটক রচয়িতাদের আদর্শ হয়ে উঠেছিল দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটক। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের ভাবাদর্শ, দেশপ্রেম, রোমান্সপ্রবণতা এমন কি ভাষাকে পর্যন্ত অনুসরণ করা হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের প্রভাব কতদূর বিস্তৃত হয়েছিল তার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। সমসাময়িক একখানি নাটকের সমালোচনায় বলা হয়েছে : "দ্বিজেন্দ্রলাল ও গিরিশচন্দ্র উভয়েরই অনুকরণ না করিয়া (আমি এমন কথা বলিতেছি না লেখক আর কাহারও নিকট ঋণী নহেন) একজনকে আদর্শ করিলেই যথেষ্ট হইত। লেখক লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রত্যেক দৃশ্যের প্রথমে স্থান ও সময় দেওয়া আছে, লেখক তাহা দেন নাই কেন?"[৩১] দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যাদর্শ যে

৩১। 'সংগ্রাম সিংহ' নাটকের সমালোচনা করেছেন "অন্নাহুর।" [গ্রন্থসমালোচনা মানসী ও মর্মবাণী, শ্রাবণ, ১৩২৩]

তৎকালীন নাটককে কতদূর প্রভাবিত করেছিল, উদ্ধৃত অংশটি থেকে তা উপলব্ধি করা যায়।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৪-১৯২৭) দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক নাট্যকার। সাহিত্যক্ষেত্রে ক্ষীরোদপ্রসাদ দ্বিজেন্দ্রলালের পরে আসেন, কিন্তু নাট্যকার হিসাবে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্ববর্তী। ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রথম নাটক 'ফুলশয্যা' (১৮৯৪) দ্বিজেন্দ্রলালের 'কল্কি অবতার' প্রহসনের (১৮৯৫) এক বছর পূর্বে প্রকাশিত হয়। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' নাটকখানিই (১৯০৩) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উন্মাদনাকে সর্বপ্রথম রূপ দিয়ে বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে একটি নূতন সুর সঞ্চারিত করেছিল[৩৭] কিন্তু দু বছর পর দ্বিজেন্দ্রলালের 'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫) নাটক প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের ইতিহাসে এক নবযৌবনের সৃষ্টি হল। গিরিশচন্দ্র তখন জীবিত, কিন্তু ঐতিহাসিক নাটক রচনায় তিনিও দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটকগুলি দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির সঙ্গেই রচিত হয়। তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকে যে রোমান্স ছিল, তারই আতিশয্য আছে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে। দ্বিজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক নাটক রচনায় কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন, কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে ইতিহাসকে নিতান্তই গৌণ করে রোমান্স প্রাধান্যলাভ করেছে। রোমান্সের আতিশয্যের ফলে ইতিহাসাশ্রয়ী নাটকও কল্পনাসর্বস্ব নাট্যচিত্রে পরিণত হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের বীররসের উন্মাদনা, জাতীয়তাবোধের প্রদীপ্ত রূপ, নাটকীয় চমৎকারিত্ব ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত ওজস্বিনী ভাষা ক্ষীরোদ-প্রসাদের নাটকে নেই বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের নাটকে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তর্দ্বন্দ্ববহুল চরিত্র ও কাব্যধর্মী ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল ক্ষীরোদপ্রসাদের পরিণতশক্তির নাটক 'আলমগীর' (১৯২১)। এই নাটকটি সম্পূর্ণভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের

৩৭। "অবশ্য একথা এখানে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই যে ভিন্নমুখী স্রোত, এই যে প্লাবন, ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্যে'।"

—রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর : অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৯৬।

ঐতিহাসিক নাটকের ভাবাদর্শে রচিত হয়েছে। 'আলমগীর' নাটকে ঔরংজীবের অন্তর্দ্বন্দ্বময় চরিত্র ও আবেগদীপ্ত অলঙ্কৃত গদ্যসংলাপ দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত। এমন কি দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকীয় সংলাপের আতিশয্য ও ত্রুটিবিচ্যুতিগুলিও ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকীয় সংলাপে লক্ষণীয়।[৩৮] বাংলা নাটকের আলোচ্য পর্বে গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল —এই দুজনেরই প্রভাব ছিল সবচেয়ে সক্রিয়। ক্ষীরোদপ্রসাদ ঐতিহাসিক নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বারা প্রভাবিত হলেও, পৌরাণিক নাটক রচনায় প্রভাবত গিরিশচন্দ্রের পন্থানুসরণই করেছিলেন।

কীর্তিমান নট ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গিরিশচন্দ্রের জীবিতকালেই অভিনেতা হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর তিনি নাটকরচনা শুরু করেন (১৯১৪)। অপরেশচন্দ্র প্রধানত গিরিশচন্দ্রের ভাবাদর্শেই নাটক রচনা করেন। কিন্তু ঐতিহাসিক বা ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক রচনায় তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সবচেয়ে বেশী প্রভাব পড়েছে 'অযোধ্যার বেগম' নাটকটিতে (১৯২১)। ইতিহাসের ক্ষীণকলেবরকে কল্পনার দ্বারা স্ফীত করা হয়েছে। সংলাপরচনায় ও ঘটনার চমৎকারিত্বসৃষ্টিতে অপরেশচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবেই দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। অপরেশচন্দ্রের 'ইরাণের রাণী' (১৯২৪) নাটকটিতে ইতিহাসের ক্ষীণতম নির্দেশটিও পাওয়া কঠিন। এই নাটকে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ—দুজন খ্যাতনামা পূর্বসূরীর রোমান্সরস ও অতিনাটকীয় ভাববিন্যাসের মোহকে অতিক্রম করতে পারেন নি।

দ্বিজেন্দ্রলালের পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক নাটকরচয়িতাদের এই শ্রেণীর নাটক রচনার মূলে প্রধানত দুটি কারণ সক্রিয় ছিল—প্রথমত, ইতিহাসকে অবলম্বন করে দেশপ্রেমের উন্মাদনাকে প্রকাশ করা হত, দ্বিতীয়ত, ইতিহাসের জীর্ণকঙ্কালটুকু নিয়ে স্বকপোলকল্পিত রোমান্স রচনা করা হত। প্রকৃত ইতিহাসের মর্যাদা সেখানে প্রায়ই লঙ্ঘিত হত। এই যুগের ঐতিহাসিক নাটক রচয়িতাদের মধ্যে নিশিকান্ত বসুরায়ের কয়েকখানি ঐতিহাসিক

৩৮। "কয়েকটি নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাবে পড়িয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ সংলাপের ঔচিত্য ব্যতিক্রম করিয়াছেন।"—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), ১৩৫০ . সুকুমার সেন, পৃঃ ৩৯৬।

নাটক মঞ্চসাফল্য ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তিনি চারখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন—'বাপ্পারাও' (১৯১৬), 'দেবলাদেবী' (১৯১৮), 'বঙ্গেবর্গী' (১৯২২) ও 'ললিতাদিত্য' (১৯২৪)। নিশিকান্ত দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবেই প্রভাবিত হয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সুদীর্ঘ, উচ্ছ্বাসময় গদ্যসংলাপ তিনি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্যের অলঙ্করণ ও কাব্যধর্মিতা এখানে নেই ; অনেক সময় স্থূল, আড়ষ্ট ও নিছক বক্তৃতাসর্বস্ব হয়ে পড়েছে। চরিত্রগুলির পরিবর্তন ঘাতপ্রতিঘাতনির্ভর নয়। ভাস্কর পণ্ডিতের ভূমিকাই সর্বাধিক পরিস্ফুট হয়েছে। চরিত্রটির উপরে দ্বিজেন্দ্রলালের 'দুর্গাদাস' ও 'চাণক্য' চরিত্রটির ছায়াপাত ঘটেছে। 'দেবলাদেবী' নাটকটি একখানি ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্স—নাট্যকার তাঁর রোমান্সপ্রবণতার আতিশয্যে ইতিহাসকে প্রায় বিসর্জনই দিয়েছেন। কোনো চরিত্রেই সুগভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই। প্লটবিন্যাসের মধ্যেও শিথিলতা আছে। নামকরণ 'দেবলাদেবী'—কিন্তু নাটকে খিজির খাঁ ও মতিয়ার প্রেমকাহিনী অনাবশ্যকভাবে প্রাধান্য লাভ করেছে। একমাত্র কাফুর চরিত্রটি ছাড়া আর কোনো চরিত্র তেমন পরিস্ফুট হয় নি। কমলা চরিত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের কোনো কোনো নায়িকা-চরিত্রের প্রভাব আছে। নিশিকান্ত দ্বিজেন্দ্রনাট্যের বহিরঙ্গকে অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু পূর্বসূরীর নাটকীয় গতিবেগ (action) ও অন্তর্দ্বন্দ্ব তিনি ফোটাতে পারে নি। তবে এ বিষয় বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, তাঁর মূল ভাবাদর্শ ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটক।

বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত অনেকগুলি নাটক লিখেছিলেন। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে 'মিশরকুমারী' (১৯১৯) সর্বাধিক মঞ্চসাফল্য লাভ করেছিল। এই নাটকটির মধ্যেও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব আছে। মিশরের অভিজাত বংশ ও কাফ্রী সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ণ বৈষম্য দেখানোই হয়তো নাটকটির মূল উদ্দেশ্য ছিল—কিন্তু অতিরিক্ত ঘটনার ভিড়ে ও চরিত্রের সংখ্যাধিক্যে নাটকের মূলগতি দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। দীর্ঘ ও ফেনস্ফীত সংলাপ, অতিনাটকীয় চমকসৃষ্টি নাটকটিকে একটি সুলভ রোমান্সে পরিণত করেছে। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলালের ইতিহাসবোধ অনুসরণ করতে পারেন নি—ইতিহাসকে রোমান্সের উপাদান হিসাবেই গ্রহণ করা হয়েছে। এক আবন চরিত্রটি ছাড়া অন্য কোনো চরিত্র তেমনভাবে ফুটে উঠতে পারে নি।

রামেশিস্-নাহরিণ-সায়ার উপকাহিনী দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের চন্দ্রগুপ্ত-হেলেন-ছায়ার কাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর ঐতিহাসিক নাটক রচনায় অনেকেই তাঁর পথ অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর দোষত্রুটিগুলিই অনুসৃত হয়েছে। নাটকগুলি তাই দ্বিজেন্দ্রনাট্যের অক্ষম অনুকরণ মাত্র।

দ্বিজেন্দ্রলালের পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক নাটক রচনায় সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেছেন শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (জন্ম ১৮৯২)। 'গৈরিক পতাকা' (১৩৩০), 'সিরাজদ্দৌলা' (১৩৩৮), 'ধাত্রীপান্না' (১৩৪২), 'রাষ্ট্রবিপ্লব' (১৩৪৪) প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তিনি ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে আধুনিক নাটকের টেকনিক ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তবুও তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি। 'গৈরিক পতাকা' নাটকে শিবাজী চরিত্রের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবোধের উদ্দীপনা ও আদর্শবাদ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস প্রভৃতি চরিত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল যে উন্নতোজ্জ্বল আদর্শ ও দেশপ্রেমের সমুন্নত গৌরব চিত্রিত করেছেন 'গৈরিক পতাকা' নাটকেও সেই সুর অনুপস্থিত নয়। দেশের ক্রমবর্ধিত রাজনৈতিক চেতনা বিদেশী শাসনশৃঙ্খলকে ছিন্ন করতে চেয়েছে। শচীন্দ্রনাথের নাটকে বর্তমান কালের সেই রাজনৈতিক চেতনাই প্রাধান্যলাভ করেছে। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় হল 'সিরাজদ্দৌলা'। এই নাটকটির মধ্যে বাঙালীর স্বাধীনতা হারানোর বেদনাই নূতনভাবে ঝঙ্কৃত হয়েছে। হিন্দু মুসলমানের তৎকালীন সমস্যার উপরে আলোকপাত করা হয়েছে। সিরাজদ্দৌলা যখন মীরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ প্রভৃতির কাছে দেশের স্বাধীনতারক্ষার জন্য আবেদন করেছেন "...বাংলা শুধু হিন্দুর নয়, বাংলা শুধু মুসলমানের নয়—মিলিত হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমি গুলবাগ এই বাংলা। তাই মুসলমান বলে আপনারা আমার প্রতি বিরূপ হবে না।" তখন এ আবেদন সিরাজদ্দৌলার কালের নয়, নাট্যকারের কালের। দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিকায় জাতীয় জীবনের রূপটিকে ইতিহাসের মধ্যে রূপায়িত করেছেন, তেমনি শচীন্দ্রনাথও তার কালের কাহিনীকেই প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যে বাণীমূর্তি দিয়েছেন।

শচীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে 'রাষ্ট্রবিপ্লব' নাটকটিই সর্বাধিক দ্বিজেন্দ্রপ্রভাবিত। 'রাষ্ট্রবিপ্লব' 'সাজাহান' নাটকেরই রকমফের মাত্র —তবে শচীন্দ্রনাথ দারা ও ঔরংজীবের মতবাদ-সংঘর্ষকেই নাটকে প্রাধান্য দিয়েছেন ও রৌশন আরা চরিত্রটিকে অনেকখানি প্রাধান্য দিয়েছেন। অবশ্য নাটক হিসাবে 'সাজাহান'-এর শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। 'ধাত্রীপান্না' নাটকের পান্না ও শীতলসেনী চরিত্রে দ্বিজেন্দ্রনাট্যের নারীচরিত্রের ছায়াপাত ঘটেছে। শচীন্দ্রনাথের গদ্যসংলাপ আবেগকম্পিত, বর্ণময় ও কাব্যধর্মী ; দ্বিজেন্দ্রনাট্যের সংলাপকেই মনে করিয়ে দেয়। তবে নাটকীয় সংলাপ হিসাবে পরবর্তী নাট্যকারের সংলাপসৃষ্টি অধিকতর সার্থক হয়েছে। শচীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের ধারাকে আধুনিককালের সীমান্তে সগৌরবে বহন করে এনেছেন।

অভিনেতা ও নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছেন। ঐতিহাসিক নাটকরচনায় তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের পথই অনুসরণ করেছেন। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে 'পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ' (১৯৪০), 'মহারাজ নন্দকুমার' (১৯৪৩), 'টিপুসুলতান' (১৯৪৭)-ই প্রসিদ্ধ। তিনিও দ্বিজেন্দ্রপ্রবর্তিত ঐতিহাসিক নাটকের ধারাই অনুসরণ করেছেন। দেশাত্মবোধ, হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী প্রভৃতি বিষয়ই তিনি ইতিহাসের মাধ্যমে রূপায়িত করে তুলেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের মতো উচ্ছ্বসিত গদ্যসংলাপ তিনি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতা ও সূক্ষ্ম মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তাঁর নাটকে রূপায়িত হয় নি। স্থুলভ উত্তেজনা, অতিনাটকীয় উন্মাদনা ও আকস্মিকতাই তার নাটকে প্রাধান্যলাভ করেছে। এই স্থুলভ ভাবাবেগই অনেক সময় ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠাকে খর্ব করেছে।

বাংলা পৌরাণিক নাটক গিরিশচন্দ্রের হাতেই চূড়ান্ত সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল পৌরাণিক নাটককে নূতনভাবে রূপায়িত করেছিলেন, তাতে পুরাণের বিশুদ্ধি সম্পূর্ণ রক্ষিত হয় নি। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের পৌরাণিক নাটকগুলি প্রকৃতপক্ষে পুরাণাশ্রয়ী নাট্যরোমান্স, এ কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। গিরিশোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট ও নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'সীতা' (১৯২৪) নাটকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পৌরাণিক বিষয়বস্তুকে যোগেশচন্দ্র মানবীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই নাটকখানির

উপর দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নাটকের প্রভাব আছে। রাম চরিত্রের প্রজানুরঞ্জনবৃত্তি ও শাস্ত্রসংস্কার-আনুগত্য তাঁকে কর্তব্যকঠোর করে তুলেছে, কিন্তু বশিষ্ঠের সঙ্গে কথোপকথনের সময় তাঁর অবরুদ্ধ হৃদয়াবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। নাটকে শাস্ত্রসংস্কারকে সমালোচনা করা হয়েছে। শম্বুক চরিত্রটির যুক্তিনিষ্ঠ ওজস্বিনী ভাষণ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'সীতা' নাটকটির যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বিজেন্দ্রপ্রভাবিত। দ্বিজেন্দ্রলালের পন্থানুসরণ করেই নাট্যকার পুরাণকে নূতন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তবে যোগেশচন্দ্র তাঁর পূর্বসূরীর পথকে গৌরবান্বিত করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' কাব্যগুণে সমৃদ্ধতর, যোগেশচন্দ্রের 'সীতা' নাটকটি দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নাটকের চেয়ে অনেক বেশী নাটকীয়গুণসম্পন্ন ও মঞ্চোপযোগী।

দ্বিজেন্দ্রলাল পৌরাণিক বিষয়বস্তুকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে একটি নূতন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন—পৌরাণিক ভাবাদর্শকে এক যুক্তিনিষ্ঠ মানবীয় দৃষ্টির সাহায্যে ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছিলেন। প্রচলিত ধর্মাদর্শ, ভক্তিভাব ও আধ্যাত্মিকতাকে বর্জন করে মানবহৃদয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব রূপায়িত করাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল পৌরাণিক নাটক রচনায় যে নূতন ভাবাদর্শের সূত্রপাত করেছিলেন, তা পরিণতি লাভ করেছে মন্মথ রায়ের পৌরাণিক নাটকগুলিতে। 'চাঁদসদাগর' (১৯২৭), 'দেবাসুর' (১৯২৮), 'কারাগার' (১৯৩০), 'সাবিত্রী' (১৯৩১) প্রভৃতি নাটক বাংলা পৌরাণিক নাটকের ইতিহাসে এক নবযুগ সৃষ্টি করেছে। প্রচলিত সংস্কার ও ধর্মনীতির গুণকীর্তন করা তার পৌরাণিক নাটকের উদ্দেশ্য নয়। পৌরাণিক ঘটনাগুলিকে তিনি যুগোপযোগী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 'চাঁদসদাগর' নাটকে নাট্যকার প্রকৃতপক্ষে অমিতবীর্য দেবদ্রোহী চাঁদসদাগরের পৌরুষদীপ্ত চরিত্রটিকেই মধ্যযুগের সংস্কার ও দেবতাবাদের ঊর্ধ্বে ও জ্যোতির্ময় করে তুলেছেন। নাট্যকার মনসা চরিত্রটিকেও অযথা মসীরঞ্জিত করে রচনা করেন নি। তাই মঙ্গলকাব্যের মনসা চরিত্রের চেয়ে নাটকের মনসা চরিত্র অনেক বেশী উজ্জ্বল হয়েছে।

'কারাগার' মন্মথ রায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। এই নাটকেও সুপ্রচলিত পৌরাণিক ঘটনাকে আধুনিক দৃষ্টির সাহায্যে আলোকিত করা হয়েছে। কংস চরিত্রটির পরিকল্পনায় ও অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্রণে নাট্যকারের মৌলিকত্বই

জয়যুক্ত হয়েছে। কংসের পিতা দানব, কিন্তু মাতা মানবী—তাই এই চরিত্রে দানবসত্তা ও মানবসত্তা—দুয়ের বিচিত্র সংমিশ্রণ দেখা যায়। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে নাট্যকার তীব্র গতিবেগ সঞ্চারিত করেছেন। ঐতিহাসিক নাটকে বাংলা নাটক দ্বিজেন্দ্রপ্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু পৌরাণিক নাটক সম্বন্ধে ঠিক সে কথা বলা যায় না। দ্বিজেন্দ্রলাল এক সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে পুরাণকে দেখেছিলেন। তাই গিরিশচন্দ্র যেখানে প্রচলিত ধর্মনীতি ও অধ্যাত্মবিশ্বাসকে রূপ দিয়েছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল সেখানে অধ্যাত্মভাববর্জিত মানবজীবনের ঘাতপ্রতিঘাতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল এই শ্রেণীর নাটকের খুব বেশী অনুশীলন করতে পারেন নি। চরিত্রচিত্রণে ও পরিকল্পনায় মন্মথ রায় দ্বিজেন্দ্রলালের পুরাণাশ্রয়ী নাটকগুলির অপূর্ণ সম্ভাবনাকে পূর্ণতর করেছেন। অতি-আধুনিক বাংলা নাটক প্রধানত সমাজসমস্যামূলক ও অধিকতর বাস্তবধর্ণসমৃদ্ধ। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের নূতন কোনো সম্ভাবনার ইঙ্গিত সেখানে নেই। তবে বর্তমানকাল পর্যন্তও যে কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটক রচিত হয়েছে, তাতে দ্বিজেন্দ্রনাট্যের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

॥ ৬ ॥

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব আলোচনা করতে হলে হিন্দী সাহিত্যের প্রসঙ্গও উল্লেখযোগ্য। কারণ হিন্দী সাহিত্যের উপর দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব অপরিসীম। হিন্দী নাটকের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দ্বিজেন্দ্রলাল সেখানে একটি বিশিষ্ট মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত আছেন। অবশ্য হিন্দী নাট্য-সাহিত্য এরও অনেক আগে থেকে বাংলা নাটকের পদ্মানুসরণ করেছিল। হিন্দী নাট্যসাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের (১৮৫০-১৮৮৫) সময় থেকেই হিন্দী নাটকের এই বিশেষ প্রবণতাটি লক্ষ্য করা যায়। ভারতেন্দুর 'ভারতজননী' নাটকটি কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা' (১৮৭৩) নাটকটির একরূপ অনুবাদ বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' (১৮৬৮) নাটকটি যে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাংলা নাটক 'বিদ্যাসুন্দরে'র (১৮৫৮) ছায়ানুসরণ, এ কথা তিনি এই নাটকের দ্বিতীয়

সংস্করণের (১৮৮২) ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।[৩৯] ভারতেন্দুর যুগেই ভারতেন্দু ছাড়া তাঁর সমকালবর্তী অন্যান্য নাট্যকারও বাংলা নাটকের বিষয়বস্তু ও টেকনিকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ভারতেন্দু-পর্বে হিন্দী নাট্য-সাহিত্যের যে বাংলা নাটকের পশ্চাদনুসরণ-প্রবণতা তা পরবর্তী যুগে আরো সুস্পষ্ট ও সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। হিন্দী সাহিত্যের খ্যাততম নাট্যকার জয়শঙ্করপ্রসাদের নাট্যক্ষেত্রে আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্ব থেকেই দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের দিকে হিন্দী নাট্যকারদের দৃষ্টি পড়েছিল। হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতারাও এই প্রসঙ্গ সশ্রদ্ধভাবে স্বীকার করেছেন।[৪০]

এই পর্বের (১৮৯৩-১৯১৮) হিন্দী নাটকে গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের অনুবাদ ও ভাবানুবাদের সাড়া পড়ে যায়। কিন্তু বাঙালী নাট্যকারদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকই এই পর্বের হিন্দী নাট্যকারদের সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করে। এই পর্বে পণ্ডিত রূপনারায়ণ পাণ্ডে অনেকগুলি বাংলা নাটকের অনুবাদ করেন। তার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের সামাজিক নাটক 'পরপারে'-রও অনুবাদ আছে। তিনি 'উসপার' নাম দিয়ে 'পরপারে'র অনুবাদ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বছর কালকে বাংলা নাটকের সমৃদ্ধিপর্ব বলা যায়। এই সময়ের মধ্যে অনেক বাংলা নাটকের অনুবাদ বা ভাবানুবাদ হয়েছিল। এই যুগে দ্বিজেন্দ্রলালের অনেকগুলি নাটক ও প্রহসনের অনুবাদ হয়। এমন কি দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যশৈলী ও সংলাপরচনার বৈশিষ্ট্যের দ্বারাও অনেক মৌলিক হিন্দী নাটক প্রভাবিত হয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যপ্রতিভা হিন্দী নাট্যসাহিত্যকে কতদূর প্রভাবিত

৩৯। "প্রসিদ্ধ কবি ভারতচন্দ্র রায় নে ইস্ উপাখ্যান কো বঙ্গভাষা মেঁ কাব্য স্বরূপ মেঁ নির্মাণ কিয়া হৈ...মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর নে উসী কাব্য কো অবলম্বন করকে জো বিদ্যাসুন্দর নাটক বনায়া থা উসী কে ছায়া লেকর আজ পন্দ্রহ বরস হুএ ভাষা মেঁ নির্মিত হুআ হৈ।"

৪০। "গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ঔর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কী কক্ষা কে নাট্যকার পশ্চিমী ভারত মেঁ পৈদা নহী হুএ।"—(বেদব্যাস' সম্পাদিত 'হিন্দী নাট্যকলা' গ্রন্থের ২৫৬-৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত রামচন্দ্র শুক্লর 'হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস' গ্রন্থের ৪৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ও প্রাণবন্ত করে তুলেছিল, তার সর্বোত্তম পরিচয় পাওয়া যায় খ্যাতনামা হিন্দী কবি ও নাট্যকার জয়শঙ্করপ্রসাদের (১৮৯০-১৯৩৬) রচনা থেকে। প্রসাদজীর প্রতিভার স্পর্শেই আধুনিক হিন্দী নাটকের চরম বিকাশ ঘটে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই নূতনত্ব ছিল। প্রসাদপূর্ববর্তী যুগের হিন্দী নাটকে বৈচিত্র্যহীনতা লক্ষ্য করা যায়। হিন্দী নাটকের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য নাট্যাদর্শ তখনো সচেতনভাবে প্রকাশ করে নি। সংস্কৃত ও বাংলা নাটকের বিশেষত্বহীন অনুবাদের মধ্যেই নাট্যকারদের প্রচেষ্টা নিবদ্ধ ছিল। 'হিন্দুস্থানী প্লে'-র ও কিছু কিছু প্রভাব ছিল। জয়শঙ্করপ্রসাদ এই প্রথাবদ্ধ নাট্যপ্রচেষ্টা থেকে সরে এলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যলগ্ন থেকেই বাংলা নাটকে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব সুস্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্ত্য নাটকের রূপ ও রীতির অনুসরণে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য (এই সম্পর্কে 'দ্বিজেন্দ্রনাট্যের নানা প্রসঙ্গ' অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য) প্রসাদজী দ্বিজেন্দ্রনাট্যের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য নাট্যাদর্শের স্বরূপলক্ষণ দেখতে পান। তিনি বাংলা জানতেন, তাই তাঁকে দ্বিজেন্দ্রনাট্যের হিন্দী অনুবাদের শরণাপন্ন হতে হয় নি। মূল বাংলা নাটকই তিনি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পড়েছিলেন। প্রসাদপূর্ববর্তী হিন্দী নাটকে দ্বিজেন্দ্রনাট্যের কিছু কিছু অনুবাদ হয়েছে বটে, কিন্তু বাংলা নাটকের মূল রস হিন্দী নাটকের প্রাণধর্মের সঙ্গে ঠিক যেন সমন্বিত হয় নি। তাই প্রসাদ-পূর্ববর্তী যুগের হিন্দী নাটকে দ্বিজেন্দ্রনাট্যের বহিরঙ্গ অনুশীলনই যেন প্রাধান্য লাভ করেছিল। জয়শঙ্করপ্রসাদ অন্ধভাবে দ্বিজেন্দ্রলালকে অনুকরণ করেন নি, তিনি দ্বিজেন্দ্রনাট্যের নিগূঢ় মর্মমূলেই প্রবেশ করেছিলেন।

• দ্বিজেন্দ্রলালের মতো প্রসাদজী পৌরাণিক নাট্যকাব্য দিয়ে তাঁর নাট্যকার-জীবন শুরু করেন। 'সজ্জন', 'করুণালয়', 'উর্বশী' নাটকের মধ্যে কাব্য-সংলাপ রচনায় তিনি গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যসংলাপরীতিকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। নাট্যকার প্রসাদের জনপ্রিয়তা প্রধানত তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলির উপরেই নির্ভরশীল। বাংলা ঐতিহাসিক নাটকরচয়িতা হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দী ঐতিহাসিক নাটকের ইতিহাসে জয়শঙ্করপ্রসাদের তেমনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অনন্য ভূমিকা। বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের ইতিহাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের যে সম্পর্ক, ভারতেন্দু যুগের ঐতিহাসিক নাটক-রচয়িতা

রাধাকৃষ্ণ দাসের সঙ্গে জয়শঙ্করপ্রসাদের সম্পর্ক অনেকটা সেই রকম। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রধানত মধ্যযুগের মোগল-রাজপুত ইতিহাস অবলম্বন করে তাঁর ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন, কিন্তু জয়শঙ্করপ্রসাদ ভারত-ইতিহাসের হিন্দু যুগের উপরেই প্রধানত তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন। প্রধানত দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের আদর্শেই তিনি প্রাচীন ইতিহাসকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন। জয়শঙ্করপ্রসাদ যে তাঁর ঐতিহাসিক নাটক রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালকেই অনুসরণ করেছেন হিন্দী নাট্যসাহিত্য-রচয়িতারা তা স্বীকার করেছেন।[৪১]

বিশ্বনাথ মিশ্র তাঁর গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রলাল-জয়শঙ্কর সম্পর্কিত যে মন্তব্য করেছেন, তা নানা কারণে প্রণিধানযোগ্য। প্রসাদজী যে দ্বিজেন্দ্রনাট্যের বহিরঙ্গ অনুসরণ না করে তার নিগূঢ় মর্মমূলে প্রবেশ করে দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যপ্রতিভার স্বরূপধর্মটি উপলব্ধি করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। হিন্দী নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকই বলেছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল "অঙ্গরেজী ঢংগ পর এক নয়া মার্গ প্রস্তুত কিয়া হৈ।" পাশ্চাত্ত্য নাট্যাদর্শ অনুশীলন করে দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা নাটকে যে নূতন আঙ্গিক ও রীতির প্রবর্তন করেছিলেন, প্রসাদজী তাতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। প্রসাদজীর পূর্বে বাংলা নাটকের মর্মরহস্য কোনো হিন্দী নাট্যকার তেমনভাবে উপলব্ধি করেন নি। বিশ্বনাথ মিশ্র তাঁর আলোচনা প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের কথা উল্লেখ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১) প্রকাশের প্রায় দু দশক পর জয়শঙ্করপ্রসাদের 'চন্দ্রগুপ্ত' প্রকাশিত হয় (রচনাকাল ১৯২৮, প্রকাশকাল ১৯৩০) প্রসাদজী দ্বিজেন্দ্রলালের

৪১। "বঙ্গলা মে বাবু দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে ঐতিহাসিক নাটকোঁ কা বিশেষ প্রচলন হৈ। উনহোঁনে অঙ্গরেজী ঢংগ পর এক নয়া মার্গ প্রস্তুত কিয়া হৈ। উনকা "চন্দ্রগুপ্ত" তো বহুত হী প্রসিদ্ধ হৈ। 'প্রসাদ'-জী ইস ওর বঢ়ে ঔর ঐতিহাসিক নাটকোঁ কে প্রস্তুত করণে কা কার্য আরম্ভ কিয়া।'

—[হিন্দী মে নাট্যসাহিত্য কা বিকাস : বিশ্বনাথ মিশ্র, পৃঃ ৩৫]

অর্থাৎ, বাংলায় দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক বিশেষভাবে প্রচলিত আছে। তিনি ইংরেজি রীতির উপর ভিত্তি করে এক নূতন পথ প্রস্তুত করেছেন। তাঁর 'চন্দ্রগুপ্ত' তো রীতিমতো প্রসিদ্ধ নাটক। প্রসাদজী সেই পথে অগ্রসর হয়ে ঐতিহাসিক নাটক রচনার কাজ আরম্ভ করলেন।

নাটকটির দ্বারা প্রভাবিত হলেও তিনি তাঁর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি হারান নি।[৪২] দু-একটি নূতন চরিত্রও তিনি সৃষ্টি করেছেন। তা ছাড়া, দ্বিজেন্দ্রলালের চন্দ্রগুপ্ত চরিত্রটি যেমন ঘটনার অগ্রগতির সঙ্গে ক্রমশ নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে, জয়শঙ্কর প্রসাদের চরিত্রটি তেমন হয় নি—তাঁর চরিত্রটি অনেক বেশী পৌরুষমণ্ডিত।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাট্যরচনার প্রারম্ভিক যুগ থেকেই নান্দী, প্রস্তাবনা, মঙ্গলাচরণ প্রভৃতি প্রাচীন নাট্যরীতির আঙ্গিক বর্জন করে পাশ্চাত্ত্য নাট্যরীতি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু জয়শঙ্করপ্রসাদ তাঁর প্রথম দিকের নাটকে প্রাচীন নাট্যরীতির দ্বারা প্রভাবিত হলেও পরিণত বয়সের ঐতিহাসিক নাটকে তিনি এই পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে পাশ্চাত্ত্য নাট্যরীতি অবলম্বন করেন। এ বিষয়ে বাংলা নাটক, বিশেষত দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। দ্বিতীয়ত, দ্বিজেন্দ্রলালকে অনুসরণ করে তিনি নাটকে স্বগতোক্তি বর্জনের দিকে প্রবণতা দেখেছেন। তৃতীয়ত, নাটকীয় চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল যে সমস্ত পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, প্রসাদজীও এই সব ক্ষেত্রে তাঁর নাট্যগুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে কোনো কোনো পাত্র-পাত্রীর সংলাপ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সংলাপসূত্র ধরে আর একটি চরিত্রের আকস্মিক আবির্ভাব ও পূর্বোক্ত সংলাপের উত্তরদান একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই জাতীয় সংলাপ সৃষ্টতে স্বভাবতই নাটকীয় গতিবেগের উত্তপ্ততা সৃষ্টি হয়েছে। প্রসাদজীও অনুরূপ সংলাপসৃষ্টিতে দ্বিজেন্দ্রলালের পন্থানুসরণ করেছেন। (রামচন্দ্র শুক্লের 'হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস' গ্রন্থের (অষ্টম সং) ৫৫০ পৃষ্ঠায় প্রসাদনাট্যের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আছে)

• চতুর্থত, বিদূষক চরিত্র সৃষ্টিতে দ্বিজেন্দ্রলাল একটু নূতনত্ব দেখানোর চেষ্টা করেছেন। সংস্কৃত নাটকের বিদূষকচরিত্রের সংস্কার দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলা

৪২। দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের চেয়ে প্রসাদের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের ইতিহাসানুগতা বেশী। অনেকগুলি নূতন ভূমিকাও তিনি সৃষ্টি করেছেন। নারীচরিত্রগুলি সমস্তই স্বতন্ত্র। এখানে ছায়া নেই, চন্দ্রগুপ্তের মা 'মৌর্যপত্নী, মুরা নন। সেলুকসকন্যার নাম কার্নেলিয়া। কিন্তু প্রসাদের এই নাটকটির প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলালের চন্দ্রগুপ্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে: "কিন্তু বহ হিন্দী কা অনুবাদ-যুগ থা ঔর সন্ ১৭ মেঁ ডী এল. রায় কা চন্দ্রগুপ্ত অনুবাদিত হোকর হিন্দী মেঁ আ গয়া ;"

নাটকের পথনির্দেশ করেছিল। গিরিশচন্দ্র তাঁর বিদূষক চরিত্রের মধ্যে নূতনত্ব সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল দিলদার চরিত্রের ভিতর দিয়ে পাশ্চাত্ত্যনাট্যসুলভ বিদূষক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। প্রসাদজীর নাটকে সংস্কৃত নাটকের বিদূষক ও পাশ্চাত্ত্য নাটকের বিদূষক দু ধরনের চরিত্রই লক্ষ্য করা যায়। মুদ্গল চরিত্রটি (স্কন্দগুপ্ত) দিলদারের ছায়ায় সৃষ্ট হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম থেকেই পাশ্চাত্ত্য নাটকের প্রতি গভীর আসক্তি ছিল, তাই তিনি নাট্যরচনার শুরু থেকেই পাশ্চাত্ত্য নাটকের বিভিন্ন আদর্শ অনুশীলন করেছিলেন। কিন্তু জয়শঙ্করপ্রসাদ অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালেই পাশ্চাত্ত্য নাট্যাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

পঞ্চমত, জয়শঙ্করপ্রসাদের যে কোনো ঐতিহাসিক নাটকের গদ্যসংলাপ আলোচনা করতে গেলেই দেখা যাবে যে দ্বিজেন্দ্রপ্রবর্তিত সংলাপরীতিই তিনি অনুসরণ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্যসংলাপের হৃদয়াবেগ ও কাব্যোচ্ছ্বাসের প্রাবল্য প্রসাদজীর ভাষাতেও লক্ষ্য করা যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যমণ্ডিত গদ্যরীতির ঝঙ্কার ও চিত্রসৌন্দর্য প্রসাদজীর গদ্যসংলাপেও লক্ষ্য করা যায়। প্রসাদজী তাঁর একটি চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন "কবিত্ব —বর্ণময় চিত্র হৈ।" ('স্কন্দগুপ্ত' নাটকের মাতৃগুপ্তের উক্তি : স্কন্দগুপ্ত, প্রথম অঙ্ক) কবিত্ব যে বর্ণময় চিত্র, এ সত্য তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক পড়ে আরো বেশী উপলব্ধি করেছেন। তা ছাড়া দ্বিজেন্দ্রলালের মতো তিনি তিন-চারটি তুলনামূলক বাক্যাংশ পাশপাশি বসিয়ে ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টি করেছেন। যেমন : দ্বিজেন্দ্রলালের ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টি :

"লায়লা। অভাগিনী পুত্রহারা সম্রাজ্ঞী। পৃথিবী থেকে একটি গরিমা চলে গেলো!—একটা আলোক, একটা সঙ্গীত, একটা প্রার্থনা।"—

[নুরজাহান, ৩।৩]

প্রসাদজীর ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টি :

"মাতৃগুপ্ত। অন্ধকার কা আলোক সে, অসৎ কা সৎ সে, জড় কা চেতন সে, ঔর বাহ্যজগৎ কা অন্তর্জগৎ সে সম্বন্ধ কৌন করাতী হৈ?"

[স্কন্দগুপ্ত, ১ম অঙ্ক]

দ্বিজেন্দ্রলালের স্টাইলকেই শুধু প্রসাদজী অনুসরণ করেন নি, অনেক সময়

ভাষা ও শব্দের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন।[৪৩] তবে দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্যসংলাপের যে ত্রুটি ও আতিশয্য আছে, তা জয়শঙ্করপ্রসাদের ভাষায়ও লক্ষ্য করা যায়। ভাষা সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালকে অতিরিক্ত অনুসরণ করার ফলেই যে প্রসাদজীর ভাষায় এরূপ ঘটেছে, সে বিষয় কোনো সন্দেহ নেই। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকীয় সঙ্গীতের দ্বারাও প্রসাদজী কোথায়ও কোথায়ও প্রভাবিত হয়েছেন। জয়শঙ্কর প্রসাদের দ্বিজেন্দ্রপ্রীতির মূলে আর একটি কারণও আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের মতো জয়শঙ্করের প্রতিভাও ছিল মূলত গীতিধর্মী। তাই দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার প্রতি স্বাভাবিকভাবেই তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাট্যসাহিত্য হিন্দী নাট্যসাহিত্যের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। অন্য কোনো বাঙালী নাট্যকারের এত বেশী প্রভাব সেখানে পড়ে নি। দ্বিজেন্দ্রলালের অধিকাংশ নাটক হিন্দীতে অনূদিত হয়েছে, তা ছাড়া মৌলিক নাটকের উপরেও দ্বিজেন্দ্রনাট্যের প্রভাব পড়েছে। রামচন্দ্র বর্মা অনুবাদ করেছেন 'রাণা প্রতাপ' ও 'মেবার-পতন'। রূপনারায়ণ পাণ্ডেও অনেকগুলি নাটক অনুবাদ করেছেন, যথা—'উসপার' (পরপারে), 'দুর্গাদাস', 'তারাবাঈ,' 'সাজাহান' ও 'চন্দ্রগুপ্ত'। দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকটি প্রহসনও অনূদিত হয়েছে। তবে হিন্দী কাব্যসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ে নি।[৪৪]

৪৩। ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায় দ্বিজেন্দ্রলাল ও প্রসাদের ভাষা পাশাপাশি রেখে এই মিল দেখিয়ে দিয়েছেন :

"সবেরে সূর্য কী কিরণে উসে চুমনে কো লোটতী থী, সন্ধ্যা মেঁ শীতল চাঁদনী উস আপনী চাদর সে ঢঁক দেতী থী" (স্কন্দগুপ্ত : প্রসাদ)

"দিনে প্রচণ্ড সূর্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায় আর রাত্রিকালে শুভ্র চন্দ্রমা এসে তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়।" (চন্দ্রগুপ্ত : দ্বিজেন্দ্রলাল)

—'আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাংলার স্থান' গ্রন্থের ৬২ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত।

৪৪। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের সবচেয়ে বেশী অনুবাদ করেছেন রূপনারায়ণ পাণ্ডে। তিনি 'হিন্দী নাট্যকলা' গ্রন্থে হিন্দীতে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের অনুবাদের যে পরিচয় দিয়েছেন, তা থেকে জানা যায়—'মেবার পতন', 'দুর্গাদাস', 'রাণা প্রতাপ', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'সিংহল বিজয়', 'পরপারে', 'তারাবাঈ', 'সাজাহান', 'নূরজাহান', 'বঙ্গনারী', 'পাষাণী', 'সীতা', 'সোরাব রুস্তম', নাটক ও 'বিরহ', 'পুনর্জন্ম', 'বহুৎ আচ্ছা', 'আনন্দ বিদায়' প্রহসনের হিন্দীতে অনুবাদ হয়। তাঁর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে একমাত্র 'হাসির গান' হিন্দীতে অনূদিত হয়েছে।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কী রচনা : হিন্দী নাট্যকলা, পৃঃ ২০৭-২১৬।

দ্বিজেন্দ্রমানস : বৈচিত্র্য ও ঐক্য

দ্বিজেন্দ্রলালের বত্রিশ বছরের (১৮৮২-১৯১৩) সাহিত্যসাধনার মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। তিনি গীতিকবিতা ও গান রচনা করেছেন, হাস্যরসাত্মক কবিতা রচনা করেছেন, লঘুরসের প্রহসন লিখেছেন, আবার গম্ভীররসাত্মক নাটকও লিখেছেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রমানসের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে তাঁর রচনাগুলির রসরীতির বৈচিত্র্যের মধ্যে যে মৌলিক সমন্বয়সূত্রটি আছে, তা আবিষ্কার করা প্রয়োজন। দ্বিজেন্দ্রলালের মানসজীবনে বৈচিত্র্যের অভাব নেই, কিন্তু সেই বৈচিত্র্যের মূলে একটি সামগ্রিক ঐক্যও আছে। সেই ঐক্যের মধ্যেই দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার স্বরূপধর্মটি নিহিত। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আর্যগাথা' (প্রথম ভাগ) (১৮৮২) তাঁর অপরিণত মানসের রচনা। কবিমানসের অনুকূলক্ষেত্র আবিষ্কৃত না হওয়ার জন্য পূর্ববর্তী কবি হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র ও কদাচিৎ বিহারীলালের কবিতার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। প্রকৃতি ও দেশপ্রেমের কবিতাই কবির প্রধান উপজীব্য। "মনুষ্য-প্রেম-গীতি" সম্পর্কে কিশোর কবি. ভূমিকায় যে কটাক্ষ করেছেন, তাও প্রণিধানযোগ্য। কারণ 'মনুষ্য-প্রেম-গীতি' রচনার পক্ষে যে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, কিশোর কবির পক্ষে তা তখনও এক সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ভূখণ্ড। তাই উনিশ শতকের কবিদের প্রকৃতি ও দেশপ্রেমের প্রথানির্দিষ্ট পথেই তিনি পরিক্রমা করেছেন। 'আর্যগাথা' প্রথম ভাগ প্রকাশের চার বছর পরে তিনি বিলাত থেকে 'দি লিরিকস অব ইণ্ড' (১৮৮৬) নামে যে ইংরেজী কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন, তার সুর অপেক্ষাকৃত পরিণত। পূর্ববর্তী কাব্যের সুর যেমন পরিণতিলাভ করেছে, তেমনি আর একটি নূতন সুর সংযুক্ত হয়েছে—প্রেমানুভূতি ও যৌবনস্বপ্নের সুর। দ্বিজেন্দ্রজীবনীকাররা এই সময়ে একজন বিদেশিনীর অচরিতার্থ প্রেমের কথাও বর্ণনা করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'আর্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে

প্রকাশিত হয়। এই কাব্যের মৌলিক কবিতাগুলি প্রেম ও যৌবনস্বপ্নের—বিবাহপরবর্তী জীবনের প্রেম ও দাম্পত্যরস উচ্ছলিত। এই নূতন অভিজ্ঞতাই কবিজীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। পূর্ববর্তী ইংরেজি কাব্যখানিতে যে প্রেম ও সৌন্দর্যানুভূতি নীহারিকাপুঞ্জের মতো ভাসমান ছিল, এখানে তাই এক বিশেষ নারীমূর্তিকে অবলম্বন করে রূপলাভ করেছে—কবি পূর্ববর্তী জীবনের সঙ্গে বর্তমান অভিজ্ঞতার তুলনা করে বলেছেন: 'তখন সৌন্দর্যে এসেছিলে, 'প্রেমে' আস নাই।' 'আর্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগ অংশটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম দুই শ্রেণীর কবিতা আবিষ্কার করেছেন। এক শ্রেণীর কবিতাকে বিশুদ্ধ লিরিক বলা যায়। প্রেমের সূক্ষ্ম সুরময় লীলাস্পন্দী অনুভবগুলিকে সেখানে এক মসৃণ কাব্যরীতির সাহায্যে গঠিত করা হয়েছে। 'আর্যগাথা'র আর এক শ্রেণীর কবিতা আছে—সেখানে গদ্যাত্মক কাব্যরীতি ও সংলাপ-ভঙ্গিম যুক্তির ভাষা প্রাধান্যলাভ করেছে। মনে হয় অলঙ্কারসমৃদ্ধ গদ্যকেই যেন কবিতার আকারে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। তবু 'আর্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগে প্রধানত দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার গীতিধর্মিতাই প্রকাশিত হয়েছে। তবে মাঝে মাঝে লিরিকের সহজ-মসৃণ ধারা গদ্যের উপলখণ্ডে ব্যাহত হয়েছে।

'আর্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগে দ্বিজেন্দ্রমানসের স্বরূপধর্মটি অর্ধস্ফুট, কিন্তু অভিপ্রায়টি অস্পষ্ট নয়। রোমান্টিক গীতিধর্মিতার সঙ্গে যুক্তিপ্রবণ গদ্যাত্মক রীতির এই মিশ্রণটি আপাতদৃষ্টিতে আকস্মিক মনে হলেও আকস্মিক নয়। 'আর্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগে কবিজায়া সুরবালা দেবীর প্রভাব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ—ভূমিকায় কবি তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের বিবাহকালীন অভিজ্ঞতার মধ্যে মাধুর্যের সঙ্গে তিক্ততারও সম্মিশ্রণ ঘটেছিল। বিলাত-প্রবাস ও বিবাহ—দুটি ঘটনাকেই কেন্দ্র করে দ্বিজেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে সামাজিক চক্রান্ত অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে। তরুণ দ্বিজেন্দ্রলাল এর প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন বিদ্রূপের ভাষায়। দ্বিজেন্দ্রলালের গীতিধর্মিতার আড়ালে একটি বহির্মুখী সামাজিক মন ছিল। সেই মনটি এই আকস্মিক আঘাতে সহসা নিম্নতল থেকে পুরোভাগে জেগে উঠেছে। 'একঘরে' নকশা আপাতদৃষ্টিতে অকিঞ্চিৎকর হলেও দ্বিজেন্দ্রমানসের একটি দিকদর্শন এখানে পাওয়া যায়। রোমান্টিক গীতিধর্মিতার সঙ্গে বিদ্রূপাত্মক মনোভঙ্গিও যে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিমানসের অন্যতম ধর্ম,

তার সর্বপ্রথম নিদর্শন এখানে মিলেছে। কেউ কেউ এর 'খাঁটি হাস্যরস' ও স্পষ্টবাদিতার প্রশংসাই করেছিলেন।[১]

'আর্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগ রচনার পরেই দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যের পটপরিবর্তন ঘটেছে। 'পাষাণী' নাট্যকাব্য রচনার পূর্ব পর্যন্ত তিনি একাদিক্রমে দুখানি প্রহসন ও দুটি হাস্যরসাত্মক কাব্য রচনা করেন—'কল্কি অবতার' (১৮৯৫), 'বিরহ' (১৮৯৭), 'আষাঢে' (১৮৯৯) ও 'হাসির গান' (১৯০০)। বিদ্রূপাত্মক প্রহসন ও কবিতার এই অব্যাহত ধারা দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যের পক্ষে খুব আকস্মিক নয়। সমাজবিধাতাদের লাঞ্ছনা ও পরাধীনতার জন্য গ্লানিবোধ ('বিলাত-প্রবাসী' পত্রগুচ্ছে এর অকুণ্ঠিত আত্মপ্রকাশ ঘটেছে) তাঁর বিদ্রূপাত্মক সাহিত্যের মূলভিত্তি। দ্বিজেন্দ্রলালের 'আর্যগাথা' (দ্বিতীয় ভাগ) কাব্যের 'উৎসর্গ' কবিতার সঙ্গে, 'কল্কি অবতার' প্রহসনটির গদ্যাত্মক কাব্যরীতির তুলনা করলেই এই দুয়েরই মধ্যে একটি আত্মিক সম্পর্ক উপলব্ধি করা যাবে। পত্নী সুরবালাকে কেন্দ্র করে 'উৎসর্গ' কবিতায় কবি তাঁর প্রেম ও সৌন্দর্যানুভূতিকে যে গদ্যাত্মক কাব্যরূপ দিয়েছিলেন, তাই পরবর্তী কালে দ্বিজেন্দ্রকবিকীর্তির সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন হয়ে উঠেছে। দ্বিজেন্দ্রকবিমানসে রোমান্টিক গীতিধর্মিতা ও ব্যঙ্গবিদ্রূপপ্রবণতা—এই দুই ধারা শুধু যুগ্মবেণীর রচনা করে নি, তাদের নিজস্ব কাব্যরীতি ও ভাষাকেও তদনুযায়ী সৃষ্টি করেছিল। 'আর্যগাথা'র কাব্যরীতি প্রধানত সূক্ষ্মসুরময় লিরিসিজিমের বাহন, 'কল্কি অবতার'-এর মমিল গদ্যসংলাপ ও 'আষাঢে'-র রুক্ষবন্ধুর কাব্যরীতি স্যাটায়ারের বাহন। সৌভাগ্যের বিষয় দ্বিজেন্দ্রলাল বিষয়ানুসারী কাব্যরীতিকে সহজেই আবিষ্কার করেছিলেন। 'আর্যগাথা' রচনার প্রায় সমকালেই 'হাসির গান'-এর অনেকগুলি গান রচিত হয়েছিল। তাই লিরিকের তৈলচিক্কণ সুমসৃণ ধারার পাশেই যে বিদ্রূপের উপলখণ্ড ও অমসৃণ কঙ্কর

১। স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত 'ভারতী ও বালক' (ভাদ্র, ১২৯৭) লিখেছিলেন : "পূর্বে শুনিয়াছিলাম, লেখক এই পুস্তকে হিন্দুসমাজকে অযথা আক্রমণ করিয়াছিলেন. বইখানি পড়িয়া আমাদের সে ভুল ভাঙ্গিল। ইহাতে হিন্দু সমাজের প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ আছে সত্য, কিন্তু তাহা অসঙ্গত অমূলক শ্লেষবাক্য নহে। বইখানি পড়িলে মনে হয় হিন্দু সমাজের শোচনীয় অবস্থায় লেখক মর্মপীড়িত হইয়াই এরূপ লিখিয়াছেন. তাঁহার ইচ্ছা গালিদান নহে, সমাজের চক্ষুদান। তবে বইখানিতে বেশ একটু খাঁটি হাস্যরস আছে এবং কলমের জোরও বেশ একটু দেখিতে পাওয়া যায়—ইহার প্রধান কারণ তিনি সত্য কথা বলিয়াছেন।"

ভবিষ্যতের একটি ব্যঙ্গরসিকের অব্যর্থলক্ষ্য হাতিয়ারে পরিণত হওয়ার প্রতীক্ষায় ছিল,—তারই দু-এক খণ্ড তটবিচ্যুত হয়ে লিরিকের ললিতধারাটিকে 'উপল-ব্যথিত' করেছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের এই রঙ্গ-ব্যঙ্গ রচনার শ্রেষ্ঠ পর্বে (১৮৯৫-১৯০২) লিরিসিজিমের ধারাটি ক্ষীণতর হলেও, লুপ্ত হয় নি—তাই 'পাষাণী' নাট্যকাব্য (১৯০০) রোমান্টিক গীতিকবিতার লক্ষণাক্রান্ত। এই নাটকের অনেকগুলি সংলাপই হৃদয়াবেগ ও গীতিধর্মের বাহন। প্রকৃতপক্ষে 'মন্দ্র' কাব্যের (১৯০২) পূর্ববর্তী যুগে দুটি কাব্যরীতির পূর্ণ সমন্বয় ঘটে নি। কারণ 'মন্দ্র'পূর্ববর্তী কাব্য ও প্রহসনগুলির মধ্যে দুটি স্বতন্ত্র রীতি চোখে পড়ে—দুটি রীতিকে যুগলাশ্ববাহিত রথের মতো যেন একই লক্ষ্যের অভিমুখী করা হয় নি। 'মন্দ্র' কাব্যেই সর্বপ্রথম এই দুর্লভ কবিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 'আর্যগাথার' লিরিসিজম ও 'আষাঢ়ে'-র স্যাটায়ার এই কাব্যেই সর্বোচ্চ ও সমন্বিত রূপ পরিগ্রহ করেছে। এর আগে দ্বিজেন্দ্রলাল গদ্যাত্মক কাব্যরীতিকে শুধু হাস্যরসেরই বাহন করেছিলেন, কিন্তু 'মন্দ্র' কাব্যে এই রীতি অপেক্ষাকৃত গভীর বিষয়েরও বাহন হয়ে উঠেছে। এই কাব্যে কবি জীবনের বহির্মুখী হাস্যবিলাস নিয়ে পরিতৃপ্ত থাকতে পারেন নি, তাই জীবনগভীরে প্রবেশ করার জন্য তিনি উৎসুক হয়ে উঠেছেন।

'মন্দ্র' কাব্যটিতে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যরীতি যেমন একটি বিশিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছেছে, তেমনি তাঁর মনোভঙ্গিটিরও সর্বপ্রথম একটি অখণ্ড তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায়। এই কাব্যের বিশিষ্ট কবিতাগুলি দ্বিজেন্দ্রলালের মিশ্র মানসের সৃষ্টি। এই যুগের অন্যান্য কবির সঙ্গে তার দৃষ্টিভঙ্গিরও পার্থক্য আছে। 'হিমালয় দর্শনে' বা 'সমুদ্রের প্রতি'-র মতো গুরুগম্ভীর বিষয়ের বর্ণনাতেও তিনি তাঁর সংলাপাত্মক কাব্যরীতি প্রয়োগ করেছেন। একটি অখণ্ড আত্মময় ভাবদৃষ্টি কোথায়ও আত্মপ্রকাশ করে নি—সর্বদাই একটি বিতর্কবহুল যুক্তিবাদী মন এক-একটি খণ্ড-বিচ্ছিন্ন চিত্রের সৃষ্টি করেছে। বিষয়ের গুরুত্ব সত্ত্বেও তাই কবিতাগুলি ভাবগভীর হতে পারে নি। কারণ, গভীর হতে গেলে যে মগ্নময়তার প্রয়োজন, তা দ্বিজেন্দ্রকবিমানসের স্বরূপধর্ম নয়। দ্বিজেন্দ্রলাল যেখানে অপেক্ষাকৃত গভীর হয়েছেন, সেখানেও উপলব্ধির চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে তাঁর চিন্তা ও বুদ্ধিধর্ম।

'মন্দ্র' কাব্যের পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলাল যে দুখানি কাব্য রচনা করেন, তার মধ্যে কাব্যরীতি ও কবিশক্তির নূতন কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। 'আলেখ্য' (১৯০৭) ও 'ত্রিবেণী' (১৯১২) কাব্যগ্রন্থদ্বয়ে 'মন্দ্র' কাব্যের চেয়ে গীতিধর্মিতা সুস্পষ্ট, কিন্তু প্রতিভার মধ্যাহ্নদীপ্তি এখানে অনেকখানি ম্লান। দাম্পত্যরস ও গার্হস্থ্যজীবনের কবিতাগুলি এই গ্রন্থদ্বয়ের অমূল্য সম্পদ। 'আর্যগাথা' ও 'মন্দ্র' কবিপত্নীর জীবদ্দশায় রচিত, কিন্তু 'আলেখ্য' ও 'ত্রিবেণী' স্ত্রীবিয়োগের পরবর্তী কাব্য। দ্বিজেন্দ্রলালের দাম্পত্যজীবনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব তাঁর সমগ্র কবিজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। স্ত্রী-বিয়োগের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা তার কাব্যজীবনকে পরিচালিত করেছে, কিন্তু কবিজীবনের মধ্যাহ্নলগ্নে যে দুটি মন যুগ্মবেণী রচনা করেছিল—তার স্বরূপটিও শেষ পর্যন্ত অব্যাহতই আছে। সর্বশেষ কাব্য 'ত্রিবেণী'-তে কবি আরও গভীর হয়েছেন—মাঝে মাঝে অন্তর্মুখী মনের সূক্ষ্ম সুরের লীলাও লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু বহির্মুখী সামাজিক মন ও যুক্তিনিষ্ঠাও নিতান্ত বিরল নয়। 'মন্দ্র' কাব্যে কবিমানস ও কাব্যরীতি যে পর্যায়ে পৌঁছেছিল, পরবর্তী কাব্যদুটি তারই রকমফের মাত্র—মধ্যাহ্নদীপ্তিই যেন ক্রমশ সায়াহ্নছায়ায় পরিণত হয়েছে—উপাদানগত প্রভেদ নেই, যা আছে মাত্রাগত।

॥ ২ ॥

স্ত্রী-বিয়োগের পর থেকে (১৯০৩) নিজের মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৯১৩)—দশ বছর প্রধানত দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকরচনার পর্ব। তার নাটকগুলির পটভূমিকায় আছে তৎকালীন রাজনৈতিক জীবনের উত্তেজনা। ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে সমসাময়িক দেশকালের আকাঙ্ক্ষাকে মিশিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাট্যরোমান্সগুলি রচনা করেন। স্ত্রীবিয়োগের পর শূন্যহৃদয়কে দেশকালের তৎসাময়িক উত্তেজনার দ্বারা হয়তো কিছু পূরণ করার চেষ্টাও করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার সঙ্গে নাটকের সম্পর্ক কি, এ ধরনের একটি প্রশ্ন জেগে ওঠা খুব অস্বাভাবিক নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের সঙ্গেও তাঁর কবিমানসের একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে, একে কোনো বিচ্ছিন্ন উপাদান হিসাবে কল্পনা করা যায় না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, দ্বিজেন্দ্রলালের

কবিমানসের মধ্যে মিশ্র উপাদান আছে। রোমান্টিক 'লিরিসিজম' ও ব্যঙ্গবিদ্রূপের ধারা তাঁর মনোজীবনকে বিচিত্র করে তুলেছিল—প্রথম ধারাটি অন্তর্মুখী, দ্বিতীয়ধারাটি বহির্মুখী সামাজিক। দ্বিজেন্দ্রলালের এই বহির্মুখী সামাজিক মনই স্যাটায়ার রচনা করেছিল। দেশপ্রেমের সঙ্গেও তাঁর বিদ্রূপাত্মক রচনাগুলির একটি আন্তরিক সম্পর্ক আছে। তাঁর অনেকগুলি বিদ্রূপাত্মক কবিতার মূলেও দেশাত্মবোধ। 'আর্যগাথা' প্রথম ভাগে ও 'বিলাত-প্রবাস' পত্রগুচ্ছে তাঁর দেশপ্রেমিকতা ও পরাধীনতার জন্য গ্লানিবোধ আত্মপ্রকাশ করেছিল। সমাজবিধাতাদের নির্মম লাঞ্ছনার প্রত্যুত্তর দিতে গিয়েও, নিজের দেশের সঙ্কীর্ণতা ও দুর্বলতার কথা মনে হয়েছে। তাই তাঁর ব্যঙ্গকবিতাগুলির অনেকগুলির মূলেই তাঁর দেশপ্রেমের ভাবসূত্রটি লক্ষ্য করা যায়। ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও দেশপ্রেম একই সামাজিক মনের সৃষ্টি।[২]

দেশপ্রেম, পরহিতব্রত, আদর্শবাদ প্রভৃতি বৃত্তিগুলিকে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করা হয়েছে। ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত, নাটকীয় চমৎকারিত্ব, তীব্র হৃদয়াবেগ ও উচ্ছ্বসিত সংলাপ দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যরোমান্স-গুলির বৈশিষ্ট্য। তার ঐতিহাসিক নাটকগুলির কাব্যোচ্ছ্বাসমণ্ডিত কাটা কাটা সংলাপগুলি তাঁর কাব্যরীতির নিকটতম আত্মীয়। তার কবিতার ক্ষেত্রে যা একটি বিশিষ্ট কাব্যরীতি, গদ্যসংলাপের ক্ষেত্রে তাই অধিকাংশ স্থলে মুদ্রাদোষবহুল অলঙ্কৃত গদ্য। কাব্যের মধ্যে যেমন তিনি গদ্যাত্মক ভঙ্গি আনতে চেয়েছিলেন, তেমনি গদ্যের মধ্যেও তিনি কাব্যোচ্ছ্বাস সঞ্চার করেছিলেন। এই রীতির মধ্যে দোষত্রুটি যতই থাকুক না কেন, তার কাব্যরীতির সঙ্গে যে গদ্যসংলাপের একটি যোগসূত্র আছে তা বোঝা যায়।

২। "দ্বিজেন্দ্রলাল সবল সুস্থ পৌরুষের উপাসক ছিলেন, বিলাতে উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি যখন দেশে ফিরিয়া সমাজপ্রভুদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিলেন, তখন তাঁহার মনে একটি সুগভীর ধিক্কার জন্মিয়াছিল। ইহার সহিত মিলিত হইয়াছিল তাঁহার অকৃত্রিম দেশাত্মবোধ, বিলাতে যাত্রা করিবার দিন হইতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত তিনি মনে মনে পরাধীনতার গ্লানি অনুভব করিয়াছিলেন। আইনের বাধায় উহার সহজ প্রকাশ সম্ভব ছিল না। সুতরাং স্বাভাবিক হাসির সহিত তাঁহার মনের এই ধিক্কার ও গ্লানিসঞ্জাত তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গরসের সংযোগ হইল। এই ত্রিবেণী সঙ্গমের ফলে বাংলা সাহিত্যে যে অমৃতধারা প্রবাহিত হইল, তাহা সম্পূর্ণ নূতন, অভিনব।"—কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : শ্রীসজনীকান্ত দাস, ভৈরব শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫০।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, দ্বিজেন্দ্রলাল যে বিশিষ্ট কাব্যরীতির উদ্ভাবন করেছিলেন, তার রূপটি ছিল সংলাপাত্মক। তাঁর নাটকগুলিও প্রধানত কবিরই সৃষ্টি। তাই অনেক সময় নাটকের বস্তুধর্মিতাকে ক্ষুণ্ণ করে কবি দ্বিজেন্দ্রলালই মুখ্য হয়ে উঠেছেন। 'মেবার-পতন' নাটকে ইতিহাস ও নাটককে অতিক্রম করে কবির বিশ্বমৈত্রীর স্বপ্নই বড় হয়ে উঠেছে। তাঁর নাট্যকাব্যগুলিতে কবির অধিকার অনেকখানি। সূক্ষ্মসুরের লীলার সঙ্গে যে উচ্চকণ্ঠ প্রগল্‌ভ ভাষণ তাঁর রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কটাক্ষের মধ্যে একসময় আত্মপ্রকাশ করেছিল, তাকেই একটি গাম্ভীর্য ও গভীরতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। তাঁর বহির্মুখী সামাজিক মন ঐতিহাসিক নাটকের রোমান্টিক পটভূমিকায় নিজেকে প্রকাশ করেছিল।

এ কথা ঠিক যে, দ্বিজেন্দ্রলাল 'মন্দ্র' কাব্য থেকেই গভীরের দিকে ঝুঁকেছিলেন, পত্নীবিয়োগের বেদনাও তাঁর এই প্রবণতাকে ত্বরান্বিত করেছিল। তিনি প্রথম জীবনের হাস্য-কৌতুক-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রসঙ্গে জীবন-সায়াহ্নে এমন কথাও লিখেছিলেন :

হাস্য শুধু আমার সখা? অশ্রু আমার কেহই নয়?
হাস্য করে অর্ধজীবন করেছি ত অপচয়।

এই স্বীকারোক্তির সঙ্গে এ কথাও তিনি বলেছেন যে—"মহৎ দেখে কাঁদতে জানা তবেই কাঁদা ধন্য হয়।" এই আদর্শবাদের তীব্রতা তাঁর অধিকাংশ নাটকেই লক্ষ্য করা যায়। লঘুতরল হাসির চাপল্য পরিহার করে তিনি জীবনের গভীর অংশের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু বিছুদূরে গিয়েই তাঁর সেই দৃষ্টি প্রতিহত হয়েছে। অতিনাটকীয় উচ্ছ্বাস, ঘোষণাতৎপর সবল উচ্চকণ্ঠ ও সমকালীন দেশ-কালসম্পর্কিত জাগ্রত কৌতূহল তাঁর গভীরতাপ্রত্যাশী মনের সম্মুখে বাধার সৃষ্টি করেছে। তাঁর কাব্যের স্পষ্টতা ও ঋজুতা তাঁর নাটকেও লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'ত্রিবেণীর' ভূমিকায় লিখেছিলেন : "সম্ভবতঃ আমার খণ্ড-কবিতা-রচনার এইখানেই সমাপ্তি!"—এই উক্তিটি তাঁর কাব্য-নিয়তির অদৃশ্য পরিহাসের মতো। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে সর্বস্ব সমর্পণ করে বিদায় গ্রহণ করেছেন। সুতরাং, এ কথা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, আরও কিছুদিন জীবিত থাকলে তিনি

নাটকই লিখতেন। তাঁর নাটকগুলি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার মোহ দ্বিজেন্দ্রলালকে ক্রমশই নাটক রচনার দিকে আকৃষ্ট করেছিল, তিনি ক্রমশই যেন স্বক্ষেত্র থেকে দূরে সরে আসছিলেন। মনীষী সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেন দ্বিজেন্দ্রলালের কবিজীবনের এই পরিণামটিকে লক্ষ্য করে লিখেছেন : "...দ্বিজেন্দ্র আধুনিক বঙ্গরঙ্গে 'অভিনেয় নাটক' লিখিতে বদ্ধপরিকর হইনা (হয়ত উপস্থিত বাহবা কিংবা অর্থসিদ্ধি লক্ষ্য করিয়াই) নিজের হৃদয়যন্ত্রকে প্রাকৃত ও নিম্ন 'গ্রামে' বাঁধিলেন ; যেন ইবসেনের ন্যায়, কেবল প্রাকৃতজীবনের সত্যকে এবং 'গদ্য' সাধা ভাবাবেশকেই লক্ষ্য করিলেন। উহার ফলে, তাঁহার হৃদয় গদ্যনাটকগুলির মধ্যে উন্নত ভাবালোক স্পর্শ করিতেই পারিল না।"[৩]

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর শেষজীবনে ক্রমশই জনচিত্তরঞ্জনসুলভ উত্তেজনার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন, সূক্ষ্ম 'লিরিসিজম' রঙ্গমঞ্চের আবেগদীপ্ত উচ্চকণ্ঠে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু এই হল দ্বিজেন্দ্রকবিচরিতের নিয়তি! যে সূত্রটি অবলম্বন করে তাঁর রোমান্টিক গীতিধর্মের বিকাশ, তা মধ্যপথেই আকস্মিকভাবে ছিন্ন হওয়ার ফলে নূতন করে সেখানে আর কোনো সুর সংযোজিত হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তিনি 'আত্মভাবমুগ্ধ নির্জন মানসরহস্য' রাজ্য সম্পূর্ণভাবেই পরিত্যাগ করে বহুকণ্ঠকল্লোলের সঙ্গে নিজের কণ্ঠ মিলিয়ে দিয়েছেন—পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক নাটকগুলি তারই ফল। কবি এখানে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক নীতির প্রবক্তা হয়ে উঠেছেন। এইখানেই দ্বিজেন্দ্রকবিমানসের ট্রাজেডি! অবশ্য কাব্যনিয়তির অমোঘ নির্দেশ তাঁর পক্ষে অতিক্রম করাও সম্ভব ছিল না। জীবনের প্রথম থেকে তিনি একই সঙ্গে যে যুগলভাবের সাধনা করেছিলেন, তার প্রকৃষ্ট ও সুসম সমন্বয়ই তাঁর কবিজীবনের চূড়ান্ত সিদ্ধি। কিন্তু যেখানে কোনো একটি ধারা মাত্রাতিরিক্ত রূপে বড় হয়ে উঠেছে, সেখানেই তাঁর মনোধর্ম ভারসাম্য হারিয়েছে। দ্বিজেন্দ্রমানসের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী 'মন্দ্র' কাব্য পর্যন্ত তাঁর প্রতিভা নিরন্তর সৃষ্টিসাফল্যের দিকেই অগ্রসর হয়েছে। 'মন্দ্র' কাব্যের পরের যুগের কাব্য ও নাটকগুলি কোনো নূতন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয় না ; শুধু তাই নয় একজন শক্তিশালী কবি রাজনীতি, দর্শন, সমাজ, লোকহিত

৩। বাণীমন্দির, পৃঃ ২৪০।

প্রভৃতি বৃহত্তর সামাজিক বৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। (অবশ্য এ মন্তব্য প্রধানত তাঁর নাটকগুলি সম্পর্কেই প্রযোজ্য)

অবশ্য, দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয় নাটকগুলির কোনো সাহিত্যিক মূল্য নেই, অথবা বাংলা নাটকে তাঁর কোনো দান নেই—এমন কথা বললে সত্যকেই অস্বীকার করা হবে। কিন্তু বাংলা নাটকে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা স্বীকার করেও বলা যায় যে জনপ্রিয় নাটকগুলি দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার সর্বোত্তম সিদ্ধির ক্ষেত্র নয়। বাংলা সাহিত্যের দুজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার দীনবন্ধু ও গিরিশ-চন্দ্রের সঙ্গে তাঁর নাট্যপ্রতিভার তুলনা করলেই এ সত্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। দীনবন্ধু ও গিরিশচন্দ্র ছিলেন মূলত নাট্যকার—ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও নাটকই ছিল তাঁদের স্বক্ষেত্র। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন মূলত কবি। তাই নাট্যাতিরিক্ত কাব্যোচ্ছ্বাস তাঁর নাটককে আতিশয্যমণ্ডিত করেছে। প্রহসন রচনার ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার মূলধর্মটি বিশেষভাবেই পরীক্ষিত হয়েছে। তাঁর প্রহসনগুলির অধিকাংশই (এক 'পুনর্জন্ম' ছাড়া) হাসির গানকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। সুবিখ্যাত হাসির গানগুলি বাদ দিলে প্রহসনের আর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। ঘটনাসংস্থান বা সংলাপের মধ্যে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। সুতরাং প্রহসনগুলির কেন্দ্রেও আছেন হাসির গানের কবি। নাটকীয় ঘটনাসংস্থানের এই দুর্বলতা তার অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের নাটকেও আছে। নাটকীয় গতিবেগের স্বাভাবিক উত্তাপ যে সমস্ত নাটকীয় ঘটনাকে সৃষ্টি করেছে, সেখানে দ্বিজেন্দ্রলালের সৃষ্টিশক্তিকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু শক্তির প্রাচুর্য সত্ত্বেও তার প্রভূত অপচয়ও ঘটেছে। অবান্তর দৃশ্য ও চরিত্র সংযোজন করে নাটকগুলিকে অযথা স্ফীতকায় করে তোলা হয়েছে। 'পাষাণী' ও 'সীতা' নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল মূলত কবি। 'প্রতাপসিংহ' থেকে আর একটি নূতন পথ অবলম্বন করেছেন। লিরিসিজমের সূক্ষ্মতা উচ্চনাদী বহুকণ্ঠের কলধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।

॥ ৩ ॥

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাটক সম্পর্কে বলেছেন : "বাঙ্গালা ভাষায় নাট্যসাহিত্যে স্বাভাবিকতা ও আখ্যানগঠনে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিতাম, কিন্তু তাহাতে কবিত্বের অভাববোধ হইত। আমার কাব্যশক্তি (যাহা কিছু ছিল) আমি

আমার নাটকে প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।"[৪] দ্বিজেন্দ্রলালের এই উক্তিটি তাঁর নাটকের প্রকৃতি নিরূপণের সহায়তা করবে। তিনি নাটকে 'কাব্যশক্তি প্রকটিত' করতে চেয়েছেন। অবশ্য তাঁর মনোজীবনের দিক থেকে এ ধরনের প্রত্যাশা করা খুবই সঙ্গত। একজন রোমান্টিক কবি নাটক লিখতে বসেছেন। মধ্যযুগের মোগল-রাজপুত ইতিহাস সেই রোমান্সের পিপাসা পরিতৃপ্ত করেছে। প্রতাপসিংহের মৃত্যুভয়হীন স্বাধীনতা সংগ্রাম, দুর্গাদাসের চরিত্রবল ও প্রভুভক্তি, মেবারপতনের কাহিনীর নূতন গরিমা, সাজাহানের রাজত্বকালের শেষদিকের অন্তর্বিপ্লব, মৌর্যসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার রোমাঞ্চকর কাহিনী প্রভৃতি বীরযুগের গৌরবমণ্ডিত শৌর্যপ্রদীপ্ত আখ্যায়িকার প্রতি তাঁর একটি আকর্ষণ ছিল। রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র প্রভৃতি ঊনবিংশ শতাব্দীর লেখকেরা অতীত ইতিহাস থেকেই রোমান্সের উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। ঐতিহাসিক নাটক রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালও তাঁর পূর্বসূরীদের পথ অবলম্বন করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক সম্পর্কে মনে হয় যে, বিষয়নির্বাচনে তিনি বর্ণময়, উত্তেজনাবহুল ও বীরোচিত ঘটনাবৃত্তেরই পক্ষপাতী ছিলেন। জীবন যেখানে উঁচু সুরে বাঁধা, তিনি তাকেই কাব্যোচ্ছ্বাসপূর্ণ গদ্যে আরতি করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকা তাঁকে ঐতিহাসিক নাটক রচনার উপযুক্ত অবকাশ দিলেও, এই জাতীয় নাটকই তাঁর মনোধর্মের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অনুকূল ছিল। ইতিহাস ও কল্পনার মিশ্রণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইতিহাসাশ্রয়ী নাট্যরোমান্স রচনার চেষ্টা করেছিলেন—দ্বিজেন্দ্রলাল দ্বন্দ্বসংঘাতের মাধ্যমে সেই রোমান্সকেই একটি পরিণতরূপ দিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক ও ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসে, ইতিহাস ও কল্পনার মধ্যে যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়েছে, দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকে সেই জাতীয় ভাবসাম্য খুব কমই রক্ষিত হয়েছে। আসল কথা, বঙ্কিমচন্দ্র বা রমেশচন্দ্রের মধ্যে একটি 'গবেষকবৃত্তি' ছিল, 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার বঙ্কিমচন্দ্র দেশের পক্ষে জাতির পক্ষে ইতিহাসগবেষণার প্রয়োজনীয়তার কথা একাধিকবার নির্দেশ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের ইতিহাসাশ্রয়ী নাটকগুলি তাঁর আদর্শবাদ ও কল্পনাবৃত্তির তৃষ্ণাকেই মূলত পরিতৃপ্ত করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্রের মধ্যে ইতিহাস-

৪। আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ : নাট্যমন্দির, শ্রাবণ, ১৩১৭।

চিত্রণে যে সংযম ও সতর্কতা আছে, দ্বিজেন্দ্রলাল ভাবাতিশয্যে ও স্বেচ্ছাচারী কল্পনার উদ্দামতায় তা অনেক সময় হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁর প্রিয় কবি নবীনচন্দ্রের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর মিল আছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের পরিণত বয়সের নাটকগুলি জোরালো, স্পষ্ট ও মোটা তুলির রচনা। তাই সাধারণ মানবজীবনের স্বাভাবিক রূপ সেখানে মোটেই ফুটতে পারে নি। তাঁর চরিত্রগুলির কোনো সাধারণ জীবন নেই, সর্বত্রই তারা এক অসাধারণ ও তীব্র বেগবহুল তরঙ্গের দ্বারা তাড়িত। জীবনের নীচু পর্দায় যে নাটক আছে, তাকে রূপ দেওয়ার মতো সূক্ষ্ম তুলি তাঁর ছিল না। তাঁর সামাজিক নাটকে এই সত্যটি আরও বেশী করে ফুটে উঠেছে—বাঙালী পরিবারের শান্তমন্থর ধারার মধ্যে অনাবশ্যকভাবে কতকগুলি রোমহর্ষণ ঘটনার সৃষ্টি তিনি করেছেন। সর্বত্রই একটি শ্বাসরুদ্ধকারী অতিনাটকীয় আবহাওয়া! দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বশেষ নাটক 'সিংহল-বিজয়' তাঁর নাট্যধারার স্বাভাবিক পরিণাম মাত্র। ইতিহাস থেকে কল্পনার দিকেই তিনি ক্রমশ ঝুঁকে পড়ছিলেন। 'চন্দ্রগুপ্তে'-ই সর্বপ্রথম রোমান্সের আতিশয্য দেখা যায়। পরবর্তী নাটক 'সিংহল-বিজয়' চূড়ান্ত রূপেই রোমান্স। সমুদ্র-পর্বত-অরণ্য-পরিবেষ্টিত ভূভাগ, দুঃসাহসিক সামুদ্রিক অভিযান, আদিম প্রেমের উন্মত্ত আলোড়ন দ্বিজেন্দ্রলালের রোমান্সকে এক অবাধ অবকাশ দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে নবযুগের রোমান্টিক চেতনার পথিকৃৎ মধুসূদনকেও সিংহল বিজয়ের কাহিনী প্রলুব্ধ করেছিল। তিনি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে অগস্ট রাজনারায়ণকে একটি চিঠিতে লিখেছেন: "Now I am for your 'সিংহল বিজয়'; but I have forgotten the story and do not know in what work to find it; kindly enlighten me on the subject,··· I like a subject with oceanic and mountain scenery, with sea-voyages, battles and love-adventures. It gives a fellow's invention such a wide scope." মধুসূদনের এই পত্রাংশটুকু নাট্যরোমান্স-রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলালের মনোধর্মের উপর আলোকপাত করবে।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলি সম্পর্কে আর একটি প্রসঙ্গও উল্লেখযোগ্য। তাঁর নাটকগুলির আতিশয্যস্ফীত অবাস্তব অংশগুলির ফাঁকে ফাঁকে নিজস্ব

মতবাদগুলিকে তিনি জোরালোভাবেই বলার চেষ্টা করেছেন। বিপরীতধর্মী চরিত্র সৃষ্টি করে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল যেন নিজের মতকেই বিচারবিতর্কের দ্বারা দৃঢ়মূল করার চেষ্টা করেছেন। 'সীতা' নাটকে বাল্মীকি ও বশিষ্ঠের চরিত্র সৃষ্টি করে প্রেম ও কর্তব্যের দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন। 'প্রতাপসিংহ' নাটকের শাক্তসিংহ চরিত্রটির যুক্তিবাদিতা ও বিচারপ্রবণতার সঙ্গে 'মন্দ্র', 'আলেখ্য', 'ত্রিবেণী' কাব্যের অনেক কবিতার ভাবগত সাদৃশ্য আছে। 'মেবার-পতন' নাটকের মানসী চরিত্র প্রসঙ্গে 'ত্রিবেণী' কাব্যের 'ধর্ম', 'স্বর্গ' জাতীয় কবিতা স্মর্তব্য। 'বঙ্গনারী' নাটকের সামাজিক বিতর্কগুলি নানাভাবে ব্যঙ্গ-রসিকতার সঙ্গে তিনি বিদ্রূপাত্মক কবিতা ও হাসির গানের মধ্যে রূপ দিয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা ও নাটকের মধ্যে একই মনোজীবনের সুর ঝঙ্কৃত হয়েছে। কিন্তু শিল্পোৎকর্ষের দিক থেকে কবিতা যে বিশিষ্ট পর্যায়ে উঠেছিল, প্রচুর সম্ভাবনা সত্ত্বেও নাটক ঠিক সে পর্যায়ে উঠতে পারে নি।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার মধ্যে একটি স্বকীয়তা ও বিশিষ্টতা ছিল। তাই সমকালীন বাংলা সাহিত্যে তাঁর নিজস্ব কলাকৃতির একটি সুস্পষ্ট চিহ্ন আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিজীবনের প্রারম্ভলগ্নে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের প্রভাব ছিল সর্বাধিক। হেমচন্দ্রের শেষ কাব্যগ্রন্থ 'দশমহাবিদ্যা' ও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আর্যগাথা' প্রথম ভাগ প্রকাশের কাল একই—১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ। এর তিন বছর আগে (১৮৭৯) রঙ্গলাল তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'কাঞ্চীকাবেরী' প্রকাশ করেছেন, একই বছরে বিহারীলালেরও কবিজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিজীবনের সমৃদ্ধিপর্বেই নবীনচন্দ্রের বিখ্যাত কাব্যত্রয়ী লেখা হয়েছিল (১৮৮৬-১৮৯৬)। সুতরাং একটি অর্ধক্লাসিক যুগ থেকেই দ্বিজেন্দ্রলালের কবিজীবনের সূত্রপাত। এই যুগের কবিদের প্রতি তাঁর একটি সশ্রদ্ধ মনোভাব ছিল। বিহারীলাল ও তাঁর অনুবর্তীদের আত্মনিষ্ঠ গীতিকাব্যের ধারা বাংলা কাব্যসাহিত্যে ক্রমশ এক নূতন যুগের আবির্ভাব সুনিশ্চিত করে তুলেছিল। রবীন্দ্রনাথ শেষোক্ত ধারাকেই এক অনন্যসাধারণ সৃষ্টিসাফল্যে মণ্ডিত করেছিলেন। কালানুক্রমিকতার দিক থেকে রবীন্দ্রসমকালীন হওয়া সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলাল এই অর্ধক্লাসিক ও রোমান্টিক উভয় ধারার সমন্বয়ের দ্বারাই লালিত হয়েছেন। তাঁর কবিমানসের বিশিষ্টতার মূলেও এই কালের মনোধর্মই

পরিস্ফুট। তবে রবীন্দ্রনাথের মতো আত্মভাবনাময় 'কল্পবৃত্তি'-র উচ্চতম সাধনলীলা তাঁর কাব্যে অনুপস্থিত।

রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল একই যুগের মানস-সন্তান, তবু সমকালীন দুজন কবির দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্যের কারণ কি, এই জাতীয় প্রশ্ন মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নয়। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের আত্মতন্ময় গীতিধারাটিকেই সূক্ষ্মতর ও বিশুদ্ধ ভাবসাধনার দ্বারা পরিমার্জিত করে ও দুর্লভ কল্পস্বপ্নের আলোকে রঞ্জিত করে বাংলা কাব্যে প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছেন। উনিশ শতকের ভাবাদর্শ ও কাব্যরীতিকে অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সহজেই নিজের ভাষা, নিজের কথা ও নিজের সুর আবিষ্কার করেন। রবীন্দ্র-সমকালীন কবিরা প্রধানত সেই ভাবস্রোতেই অবগাহন করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যেও এই যুগের আত্মনিষ্ঠ রোমান্টিক গীতিসাধনার সুর সঞ্চারিত হয়েছে—'আর্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগের কবিতাগুলিই তার সর্বোত্তম প্রমাণ। কিন্তু এর সঙ্গে তিনি মধুসূদন-হেম-নবীনের অর্ধক্লাসিক 'বীরযুগের' (Heroic age) প্রতিও একটি গভীর আকর্ষণ অনুভব করেছেন। মধুসূদন হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র ক্লাসিক কাব্যাদর্শকে সমর্থন করেছেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে রোমান্টিক ভাবাদর্শকেও অঙ্গীকার করেছেন। কিন্তু বিহারীলালের কাব্যে এই রোমান্টিক ভাবধারারই একটি নূতন আদর্শ দেখা গেল। ক্লাসিক পর্বেই কবিদের গীতিকবিতায়ও উঁচু সুর অলক্ষ্যগোচর নয়। মধুসূদনের গীতিকবিতায় তাঁর ব্যক্তিহৃদয়ের স্পন্দন শোনা গেলেও বিহারীলাল ও ভাবশিষ্যদের কবিতার মতো সেখানে শান্ত-নির্জন মগ্নময়তা নেই। মধুসূদন আত্মনিষ্ঠ হলেও বিহারীলালের মতো আত্মবিহ্বল ছিলেন না। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিজীবন প্রসঙ্গে উনিশ-শতকীয় রোমান্টিক গীতিকবিতার এই দুটি আদর্শের কথা মনে রাখা উচিত।

বিহারীলালের শিষ্যরা 'রোমান্টিক কল্পবৃত্তি'কে (Romantic Imagination) একটি বিশেষ ভাবসত্যে মণ্ডিত করেছিলেন। কল্পনাবৃত্তি তাঁদের কাছে একটি অলীক ও অবাস্তব মানসবিলাস মাত্র নয়। তাদের মতে কল্পবৃত্তি সত্যবিরোধী নয়—রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"বস্তু হতে সেই মায়া যে সত্যতর।" রোমান্টিক কবিদের কল্পস্বপ্নের মূল প্রকৃতিটি নির্দেশ করতে গিয়ে সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক বলেছেন: "They believed that the

imagination stands in some essential relation to truth and reality, and they were at pains to make their poetry pay attention to them"[৫] কল্পনার এই সত্যসম্বন্ধ ও গভীর তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথও তাঁর একাধিক সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রপূর্ববর্তী বাংলা কাব্যে কল্পবৃত্তির এই বিশেষ রূপটির উপরে তেমন গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি। বিহারীলালের কাব্যে কল্পলক্ষ্মীর লীলাবিলাসের দু-একটি চকিত আভাস আছে মাত্র। মধুসূদন রোমান্টিক, কিন্তু তার কাব্যাদর্শ ভিন্নতর। নবযুগের জীবনাদর্শের মধ্যে যে বিস্ময়রস ছিল, মধুসূদনের জাগ্রৎচৈতন্য তাকেই এক বীরোচিত উদাত্ততায় বরণ করে নিয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিমানসে রবীন্দ্রপূর্ববর্তী যুগের অধক্লাসিক কবিধর্মের প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রযুগের নূতন ধরনের রোমান্টিক চেতনার আদর্শানুসরণ—প্রায় একই সঙ্গে বিদ্যমান।

তাই রবীন্দ্রানুসারী রোমান্টিক কবিদের সঙ্গে তাঁর মনোধর্মের পার্থক্যগুলি পরিস্ফুট হয়েছে। আধ্যাত্মিকতা ও অধরাসৌন্দর্য তাঁর মনে কোনো আবেদন সৃষ্টি করতে পারে নি। তাই প্রকৃতি ও প্রেমের কবিতায় কোনো নিগূঢ় সত্য আবিষ্কার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। 'রোমান্টিক কল্পবৃত্তি'-কে পরিহার করে তিনি তাকে ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনার বিষয়ীভূত করেছিলেন। তাই ভাবের দিকে তিনি যেমন অপ্রত্যক্ষ কল্পনার মহোৎসবকে এড়িয়ে চলেছেন, কাব্যরীতির দিকেও তেমনি অতিলালিত্যের সংস্কারকে বর্জন করেছেন। তার বদলে তিনি সাদা চোখে ও যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে তাঁর নিজের দেশকালকেই পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর হাসির গান ও দেশপ্রেমমূলক ঐতিহাসিক নাটকগুলি তারই ফসল। তাঁর মন অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সেও রবীন্দ্রসুলভ 'সুদূরের পিয়াসী' হতে পারে নি, কারণ তাঁর কবিচেতনা কল্পনাশ্রয়ী নয়, বুদ্ধিনির্ভর। তাই তিনি রবীন্দ্রকাব্যের সর্বগ্রাসী প্রসারের পাশ কাটিয়ে বুদ্ধিনির্ভর কাব্য ও নূতন ধরনের কাব্যরীতি সৃষ্টি করেছিলেন। তাই কাব্যজীবনের চূড়ান্ত সিদ্ধির লগ্নে বায়রনের প্রশস্তি রচনা করে তিনি তাঁর মানসলোককেই প্রকাশ করেছেন :

৫। The Romantic Imagination C. M. Bowra, Page 5.

তোমার কবিত্বরাজ্য সমুদ্রের মত।—তুমি কভু উপহাস
করিয়াছ ; কভু ব্যঙ্গ ; কভু ঘৃণা ; ফেলিয়াছ বিষাদনিশ্বাস
কভু ; কভু অনুতাপ ; গম্ভীর গর্জ্জন কভু ; কভু তিরস্কার ;
আগ্নেয়গিরির মত দ্রবীভূত জ্বালা কভু করেছ উদ্‌গার ;
কভু প্রকৃতির উপাসনা, যোড়করে, ক্ষুদ্র বালকের প্রায় ;
পরের দেশের জন্য জ্বলিয়াছ কভু তীব্র মর্ম্মবেদনায়।[৬]

যুক্তিবাদ (Reasoning) ও কল্পবৃত্তি (Imagination)—দুই-ই উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের প্রধান সম্পদ। সংস্কার-আন্দোলন, তথ্য ও বিচারবুদ্ধির প্রতি বিশ্বাস, পুরাণকে যুক্তির দ্বারা আবিষ্কার করা যেমন এ যুগের বঙ্গসংস্কৃতির একটি বিশেষ ধর্ম, তেমনি অন্যদিকে কল্পনার আকাশ-বিস্তারী মুক্তিও এই যুগেরই মর্মবাণী। দ্বিজেন্দ্রমানসে উনিশ শতকের এই দ্বিমুখী ভাবধারাই সমন্বিত হয়েছে—রবীন্দ্রানুসারীদের মতো কল্পচারণার কৈবল্যের মধ্যে তাঁর শিল্পজীবনের সার্থকতা তিনি অনুভব করেন নি। তাই বাংলা দেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রকেই তিনি সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধা করতেন।

॥ ৪ ॥

দ্বিজেন্দ্রলালের জীবিতকালে এবং পরবর্তীকালেও সমালোচক ও সাধারণ পাঠকমহলে প্রধানত তিনি হাসির গানের কবি হিসাবেই খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর সমকালের কোনো কোনো লেখক তাঁর আদর্শে হাসির গান রচনা করার চেষ্টা করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর মতো সমালোচকও তাঁকে প্রধানত হাসির গানের কবি হিসাবেই বিচার করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি প্রায় পঁচিশ বছর বাংলা রঙ্গমঞ্চে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের সমকালে তাঁর কাব্যপ্রতিভা ও কাব্যরীতি সম্পর্কে বিশেষ কোনো আলোচনা হয় নি বললেই চলে। তাঁকে সে যুগের বাঙালী পাঠক হাসির গানের কবি ও ঐতিহাসিক নাটক রচয়িতা হিসাবেই জানতেন। অথচ রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিজীবনের প্রথম যুগেই তাঁর প্রতিভার

৬। বাইরণের উদ্দেশে : মন্দ্র

স্বরূপধর্মটি আবিষ্কার করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রকবিপ্রতিভার 'লিরিসিজম' ও 'স্যাটায়ার', এই যুগ্মধারা রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাতেই সর্বপ্রথম উদভাসিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনা সত্ত্বেও পাঠকসাধারণের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয় নি। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবিতকালে কার্যোপলক্ষে তিনি যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই তাঁকে তাঁর হাসির গান গাইতে হয়েছে। রঙ্গ-ব্যঙ্গের লঘুসুর জনসাধারণের মনকে সহজেই আকর্ষণ করেছিল।

বঙ্গভঙ্গের যুগের দেশব্যাপী উত্তেজনার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলি দেশাত্মবোধ ও লোকহিতব্রতের আদর্শকে উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়ে তুলেছিল। ঐতিহাসিক রোমান্সের বর্ণময় পটভূমিকায় সেদিনকার বাঙালী দর্শকেরা জাতীয় জীবনের শৌর্য-বীর্য আত্মত্যাগের আবেগময় বহ্ন্যুৎসবকে হৃদয়ের অকৃত্রিম অভিনন্দনই জানিয়েছিল। সুলভ কাব্যোচ্ছ্বাস, অতি-নাটকীয় ঘটনাসমাবেশ, উঁচু সুরে বাঁধা চরিত্রগুলি ও আতিশয্যমণ্ডিত দীর্ঘ সংলাপাংশ— কোনোটিকেই তাদের অস্বাভাবিক বলে মনে হয় নি। সাময়িক উত্তেজনার হৃদস্পন্দনের তালে তালে তাঁর নাটকগুলি দ্রুতবেগে আবর্তিত হয়েছে। কিন্তু আজ সেদিনের উত্তেজনা অতীত ইতিহাসে পরিণত হয়েছে, দেশকালের অবস্থাও পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান যুগ প্রধানত সামাজিক নাটক রচনার যুগ। তাই দেশকালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাটকেরও সেই পূর্বতন চাহিদা আর নেই—বর্তমানকালে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের খ্যাতিও ম্লান হয়ে এসেছে। হাসির গানের কবি এরও আগে অতীতস্মৃতিতে পর্যবসিত হয়েছেন।

প্রত্যেক কালের এক-একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গে রুচিবোধেরও তারতম্য ঘটে। এককালের সাময়িক উত্তেজনা যাকে খ্যাতিবিত্তের চূড়ান্ত শিখরে তুলে দেয়, পরবর্তীকাল হয়তো তাকেই অনায়াসে বাতিল করে দেয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই রুচিপরিবর্তনের ইতিহাসের বিষয় বলতে গিয়ে একাধিকবার 'টেনিসনের আসনে কিপলিঙের আবির্ভাবে'র কথা উল্লেখ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের যে ঐতিহাসিক নাটক এককালে অজস্র নরনারীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করেছে, কালের হাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার মূল্য কমে এসেছে। সাম্প্রতিক নাটকের গতিপথই স্বতন্ত্র। তাঁর বহুখ্যাত হাসির গানও একালে পরিত্যক্ত ও অপঠিত।

দ্বিজেন্দ্রলালের রবীন্দ্রবিরোধিতাও পরবর্তীকালে তাঁর খ্যাতির অন্তরায় হয়েছিল। রবীন্দ্রবরণের সেই প্রবল উৎসাহের যুগে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যাদর্শের স্বাতন্ত্র্য ও বলিষ্ঠতা বিশেষ কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই রবীন্দ্রনাথ 'নোবেল পুরস্কার' পেয়ে বিশ্ববন্দিত হয়েছেন। রবীন্দ্রজীবনের দ্বিতীয়ার্ধ তাঁর অবিচ্ছিন্ন জয়যাত্রার ইতিহাস। বাংলা কাব্যে নূতন ধরনের কোনো কাব্যাদর্শ তখন আসাও সম্ভব ছিল না।

কাব্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রপ্রভাবকে অতিক্রম করার একটি প্রচেষ্টা দ্বিজেন্দ্রজীবনের শেষ দশক থেকেই অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সে প্রচেষ্টা কতদূর সার্থক হ'য়েছিল তার বিচার বর্তমান আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু কেউই দ্বিজেন্দ্র প্রবর্তিত কাব্যরীতি অনুসরণ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রভাবের যুগেও দ্বিজেন্দ্রলাল যে মিশ্র-মানস ও তদনুযায়ী ভাষা ও ছন্দ ব্যবহার করেছেন তা বিস্ময়কর। রবিরশ্মির বিস্তার তাঁর কবিধর্ম ও কাব্যরীতিকে স্পর্শও করে নি, তাই রবীন্দ্রযুগের অতিললিত কাব্যসংস্কার তার কাব্যাচরণকে একেবারে বর্জনই করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যরীতির অনুগামী নেই, থাকলে হয়তো সে পথে রবীন্দ্রপ্রভাববর্জিত বাংলা কাব্যরীতির আর একটি দিক গড়ে উঠতে পারত। একালের কোনো কোনো কবি কবিতাকে প্রাত্যহিক জগতের ক্ষেত্রে নামিয়ে আনতে চান। অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল পূর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল কবিতাকে গদ্যের ধূসর ধূলির ক্ষেত্রে নামিয়ে এনে এক অভিনব কাব্যরীতি আবিষ্কার করেছিলেন। পরবর্তীকালের কবিরা সেই পথে অগ্রসর হলে নিঃসন্দেহে বাংলা কাব্যের নূতন সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারতেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই পথে সেদিনের মতো আজও দ্বিজেন্দ্রলাল একক।

বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের দান কম নয়। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের অখণ্ড প্রতাপের নীচে এতকাল চাপা পড়ে ছিলেন। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের যথার্থ পরিচয় উদ্ঘাটিত করার সময় আজ এসেছে। মাত্র পঞ্চাশ বছর জীবনকালের মধ্যে তিনি সাহিত্যের যেদিকে যতটুকু দিয়েছেন, তার মধ্যে তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলালের প্রধান দান তিনটি—প্রথমত, আপাত-বিরোধী ভাবের মিশ্রণজাত কাব্য ও অভিনব কাব্যরীতি, দ্বিতীয়ত, হাসির গান, তৃতীয়ত, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব সমন্বিত ঐতিহাসিক নাটক। এর মধ্যে প্রথমটিতেই তাঁর কবিশক্তির সর্বাধিক

পরিচয় পাওয়া যায়। একটি বিশিষ্ট আসনে তিনি চিরকাল প্রতিষ্ঠিত থাকবেন।

দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু সেই বৈচিত্র্যের মূলে একটি সমন্বয়সূত্রও লক্ষ্য করা যায়। সেই সূত্রটি হল দ্বিজেন্দ্রমানসের গীতিধর্মিতা। এমনকি তাঁর নাটকগুলির মধ্যেও কবি দ্বিজেন্দ্রলালের বিচিত্র কবিস্বপ্ন ও উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগই বর্ণময় হয়ে উঠেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের সমস্ত সাহিত্যসাধনার মূলে ছিল গীতিকবির প্রতিভা। এমন কি তাঁর হাসির গানগুলির মধ্যেও গীতিকবির স্বাভাবিক শক্তিই পরিস্ফুট হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার এই অন্তর্নিহিত ঐক্যটিকে প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে একজন কবি-সমালোচক উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন, বিচিত্রস্রষ্টা দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার মৌলিক সত্য নির্ণয়ের পক্ষে আজও তার মূল্য অস্বীকার করা যায় না :

"দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রধানতঃ সঙ্গীতকবি ; এখন বঙ্গসাহিত্যে গীতিকবিতার বা সঙ্গীত-ভাবাত্মক কবিতারই যুগ। বলাবাহুল্য, আমাদের নিরেট গদ্যসাহিত্যে পর্যন্ত, আমাদের জাতীয় হৃদয়ের চিরন্তন লক্ষণ-গত ভাবুকতার 'রং ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। দ্বিজেন্দ্র এইরূপ সঙ্গীতকবির হৃদয়টুকু লইয়াই স্বদেশী জীবন-সাধনার কঠিন মৃত্তিকায় অবতরণ করিয়াছিলেন। তিনি অনেকস্থলেই হয়ত জীবনের শক্তবস্তুটাকে ন্যূনাধিক শক্তভাবে ধরিয়া উহার উপরে ভাবের রং ফলাইয়াছেন ; আমাদের নাট্যসাহিত্যে, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের বস্তু-সাধনার ক্ষেত্রেও, বিশিষ্ট মনস্বিতার পরিচয় মুদ্রিত করিতে পারিয়াছেন! কিন্তু ভিতরে দৃষ্টি করিলেই বুঝিবেন, তাঁহার সমস্তই সঙ্গীত-অধিকারের প্রণালী!... নাটকের বাক্যরীতির মধ্যেও, সর্বত্র এমন একটি তীক্ষ্ণদীপ্তি ও স্বল্প-নিঃশ্বাসযুক্ত স্ফূর্তি আছে যে, সঙ্গীতের আকস্মিকতা দেখাইয়া, মুহূর্তমৃত সঙ্কেত বা ক্ষণভঙ্গুর আভাসমাত্র দিয়াই হয়ত উহা ম্রিয়মাণ হইতে থাকে! কিন্তু এই সমস্ত গুণ বা দোষের কারণেই হয়ত দ্বিজেন্দ্রলাল অপরিহার্যতা লাভ করিয়া সাধারণের হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"[৭]

'সঙ্গীতকবি' দ্বিজেন্দ্রলালের যথার্থ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হলে বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃতপ্রায় একটি মৌলিক শক্তির ক্ষেত্রও নূতনভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

৭। বঙ্গবাণী (১৯১৫), পৃঃ ১৩৮-১৪৯, শশাঙ্কমোহন সেন

কারণ ব্যক্তিজীবন ও কবিজীবনের এমন সামগ্রিক ঐক্য বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী দেখা যায় না। তাঁর ব্যক্তিজীবন ও শিল্পীজীবন যেন একই বিধাতার সৃষ্টি। তাই সাহিত্য তাঁর কাছে শুধু ভাববিলাসের ক্ষেত্র ছিল না, তাঁর ব্যক্তিত্বকেই তিনি কাব্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই জন্য তাঁর সাহিত্যজীবন ব্যক্তিজীবনের মতোই বলিষ্ঠ, বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র! সাহিত্যের বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিনে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিশক্তিকে যথার্থ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে নিজেদেরই লাভবান করার সময় আজ এসেছে।

পরিশিষ্ট

॥ ক ॥ দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা

১৮৬৩—১৯শে জুলাই (১২৭০, ৪ঠা শ্রাবণ) নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরে জন্ম হয়।

১৮৮২—সর্বপ্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আর্যগাথা' (প্রথম ভাগ) প্রকাশ করেন।

১৮৮৩—হুগলী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৮৮৪—প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরেজিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৮৮৪-৮৬—বিলাত প্রবাস। লণ্ডনের সিসিটার কলেজ থেকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা সম্পূর্ণ করে এফ-আর-এ-এস উপাধি পান এবং সেই সঙ্গে রাজকীয় কৃষি কলেজ ও কৃষিসমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়ে যথাক্রমে এম্-আর-এ-সি ও এম্-আর-এস্-এ-ই উপাধি পান।

বিলাত প্রবাসকালেই একমাত্র ইংরেজি কাব্য 'দি লিরিকস অব্ ইণ্ড' প্রকাশিত হয় (১৮৮৬)।

এই বছরেরই ২৫শে ডিসেম্বর জরিপ ও রাজস্ব-নিরূপণ শিক্ষার জন্য মধ্যপ্রদেশে যান। কর্মজীবন শুরু হয়।

১৮৮৭—এপ্রিল মাসে (১২৯৪, বৈশাখ) সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরবালা দেবীকে বিবাহ করেন।

১৮৮৯—'একঘরে' নকশা প্রকাশিত হয়।

১৮৯৩—'আর্যগাথা' (দ্বিতীয় ভাগ) কাব্যের প্রকাশ।

১৮৯৫-১৯০২—ব্যঙ্গকাব্য ও প্রহসন রচনার পর্ব। এই সময় 'কল্কি অবতার', 'বিরহ', 'ত্র্যহস্পর্শ', 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রহসন এবং 'হাসির গান' ও 'আষাঢ়ে' কাব্য রচিত হয়। প্রথম নাট্যকাব্য 'পাষাণী'ও এই সময়েই রচিত হয় (১৯০০)। এই পর্বের শেষ বছরে 'মন্দ্র' কাব্য প্রকাশিত হয়।

১৯০৩—২৯শে নভেম্বর কবিপত্নী সুরবালা দেবীর মৃত্যু হয়। এর দু মাস আগে দ্বিতীয় নাট্যকাব্য 'তারাবাই' প্রকাশিত হয়।

১৯০৫—'পূর্ণিমা-মিলন' প্রতিষ্ঠা। এই বছরের দোলপূর্ণিমার দিন কবির ৫নং সুকিয়া স্ট্রীটের বাসভবনে 'পূর্ণিমা-মিলনে'র প্রথম অধিবেশন হয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রভাব ও 'প্রতাপসিংহ' নাটক রচনা।

১৯০৬-১৯০৭—গয়ায় বদলি হন। এইখানে 'নূরজাহান' ও অংশত. 'মেবার-পতন' রচিত হয়। আচার্য জগদীশচন্দ্রের অনুরোধে 'আমার দেশ' রচনা।

এই সময় জেলা-জজ সুপণ্ডিত লোকেন্দ্রনাথ পালিতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। লোকেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে তাঁর তর্ক-বিতর্ক হয়। রবীন্দ্রকাব্যের অস্পষ্টতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে লেখনী ধারণ করেন। 'কাব্যের অভিব্যক্তি' ও 'কাব্যের উপভোগ' প্রবন্ধদ্বয় প্রকাশিত হয়।

'আলেখ্য' কাব্যের প্রকাশ।

১৯০৮-৯—'নূরজাহান', 'মেবার-পতন', 'সোরাব-রুস্তাম', 'সীতা', 'সাজাহান' গ্রন্থের প্রকাশকাল।

রবীন্দ্রকাব্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনেন—'কাব্যে নীতি' প্রবন্ধের প্রকাশ।

১৯১১—'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক ও 'পুনর্জন্ম' প্রহসনের প্রকাশ।

১৯১২—সন্ন্যাসরোগের সূত্রপাত। 'ত্রিবেণী' কাব্য ও 'আনন্দবিদায়' প্যারডির প্রকাশ।

শারীরিক অপটুতার জন্য এক বছর ছুটি নিতে বাধ্য হন। এই সময়ে 'ভীষ্ম' ও 'সিংহল বিজয়' রচনা করেন। 'চিন্তা ও কল্পনা' ও মুদ্রিত করতে শুরু করেন।

১৯১৩—শারীরিক অসুস্থতার জন্য অবসর গ্রহণের নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সরকারী চাকুরি থেকে ২২শে মার্চ অবসর গ্রহণ করেন।

'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন।

'সিংহল বিজয়' নাটকের পাণ্ডুলিপি সংশোধনকালে সন্ন্যাস রোগে সংজ্ঞাহীন হন, রোগাক্রান্ত হওয়ার সাড়ে চার ঘণ্টা পরে মৃত্যু হয় (১৭ই মে, ৩রা জ্যৈষ্ঠ)

॥ খ ॥ দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাবলী

১। আর্যগাথা (প্রথম ভাগ)। ৫ই মার্চ, ১৮৮২। পৃঃ ৯১।

২। The Lyrics of Ind., London, September, 1886 Pp 79.

৩। একঘরে (নকশা) ২রা জানুআরি ১৮৮৯। পৃঃ ৩৫।

৪। আর্যগাথা (দ্বিতীয় ভাগ) ২০শে ফেব্রুআরি ১৮৯৪। পৃঃ ৬০+৪৬।

৫। সমাজবিভ্রাট ও কল্কি-অবতার। (৯ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৫) পৃঃ ১০৩।

৬। বিরহ। (১৮৯৭) পৃঃ ১০৯।

৭। আষাঢ়ে বা গুটিকতক রহস্যগল্প। (ডিসেম্বর ১৮৯৯) পৃঃ ১৪৮।

৮। হাসির গান। (১৮ই জুলাই ১৯০০) পৃঃ ৫১।

৯। পাষাণী। আশ্বিন ১৩০৭ (২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯০০ , পৃঃ ১২২।

১০। ত্র্যহস্পর্শ বা সুখী পরিবার। (২৩শে ডিসেম্বর ১৯০০) পৃঃ ৯৬।

১১। প্রায়শ্চিত্ত। ৫ই মাঘ ১৩০৮ (১৯শে জানুআরি ১৯০২) পৃঃ ৯৪।
[ক্লাসিক থিয়েটারে 'বহুৎ আচ্ছা' নামে অভিনীত হয়]

১২। মন্দ্র। ১৩০৯ সাল (১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯০২) পৃঃ ১০৪।

১৩। তারাবাই। ১৩১০ সাল (২২শে সেপ্টেম্বর ১৯০৩)। পৃঃ ১৫৬।

১৪। প্রতাপসিংহ।? (৮ই মে ১৯০৫) পৃঃ ১৬২।

১৫। The Crops of Bengal. Cal. 1906
(23 March, Pp 23+184)

১৬। দুর্গাদাস। আশ্বিন ১৩১৩ (৫ই নভেম্বর ১৯০৬)। পৃঃ ১৯৪।

১৭। আলেখ্য। ১৩১৪ সাল (৮ই জুলাই ১৯০৭)। পৃঃ ১১২।

১৮। Lessons in English :
Part I (20 December, 1907) Pp 7+56
Part II (2 May, 1908) Pp 1+68
Part III (20 January, 1909) Pp 1+80

১৯। নূরজাহান।? (১লা মার্চ ১৯০৮) পৃঃ ১৭৬।

২০। সোরাব-রুস্তাম। ১৩১৫ সাল (২৩শে অক্টোবর ১৯০৮) পৃঃ ৯২।

২১। সীতা।? (৬ই নভেম্বর ১৯০৮) পৃঃ ১২৮।

২২। মেবার-পতন।? (২৭শে ডিসেম্বর ১৯০৮) পৃঃ ১৭১।

২৩। সাজাহান। ? (৮ই আগস্ট ১৯০৯) পৃঃ ১৬১।

২৪। চন্দ্রগুপ্ত। ? (২৪শে আগস্ট ১৯১১) পৃঃ ১৬৭।

২৫। পুনর্জন্ম। ? (১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯১১) পৃঃ ৩৭।

২৬। পরপারে। ? (২৮শে আগস্ট ১৯১২) পৃঃ ১৮১।

২৭। ত্রিবেণী। ২৫শে শ্রাবণ ১৩১৯ (৫ই সেপ্টেম্বর ১৯১২) পৃঃ ৮৫+২।

২৮। আনন্দ-বিদায়। ? (১৬ই নভেম্বর ১৯১২) পৃঃ ৬৪।

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

২৯। ভীষ্ম। ? (৮ই জানুআরি ১৯১৪) পৃঃ ২৩৬।

৩০। কালিদাস ও ভবভূতি। (১০ই আগস্ট ১৯১৫) পৃঃ ১৬৯।

৩১। গান। ১লা আশ্বিন ১৩২২ (২রা অক্টোবর ১৯১৫) পৃঃ ১৯৯।

৩২। সিংহল বিজয়। ২৩শে আশ্বিন ১৩২২ (১৩ই অক্টোবর ১৯১৫) পৃঃ ২৩৬।

৩৩। বঙ্গনারী। (১০ই এপ্রিল ১৯১৬) পৃঃ ১৪১।

দ্বিজেন্দ্র-গ্রন্থাবলী। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ :

১ম ভাগ (কবিতা ও গান) আশ্বিন ১৩৫৩ (ইং ১৯৪৬) পৃঃ ৭৩৬।

সূচী : আর্যগাথা, ১ম-২য় ভাগ, আষাঢ়ে, হাসির গান, মন্দ্র, আলেখ্য ; ত্রিবেণী ; গান, The Lyrics of Ind.

[ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাহিত্য-সাধক-চরিত মালা' ষষ্ঠ খণ্ডের ৬৯ নং গ্রন্থের অনুসরণে তালিকাটি প্রস্তুত হয়েছে।]

দ্বিজেন্দ্রলালের কিছু কিছু রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে চার খণ্ডে তাঁর রচনাবলী প্রকাশিত হয়। তাঁর কাব্য ও নাটক ছাড়া পত্র-পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু গদ্যরচনা বসুমতী সংস্করণের দ্বিজেন্দ্র-গ্রন্থাবলীতে সঙ্কলিত হয়েছে। বসুমতী সংস্করণের দ্বিজেন্দ্র-গ্রন্থাবলীতে নিম্নোক্ত রচনাগুলি আছে :

১ম ভাগ : সাজাহান ; সিংহল-বিজয় ; সোরাব রুস্তম ; সীতা ; পরপারে, কালিদাস ও ভবভূতি ; আর্যগাথা (১ম ভাগ) ; হাসির গান।

২য় ভাগ : রানা প্রতাপসিংহ ; চন্দ্রগুপ্ত ; বঙ্গনারী ; কল্কি-অবতার ; বিরহ, চিন্তা ও কল্পনা (প্রেম কি উন্মত্ততা, নূতন ও পুরাতন, ইংরাজী ও

বাঙ্গালা পোষাক, ইংরাজী ও হিন্দু সঙ্গীত, জাতিভেদ, মানভিক্ষা, উপমা, বাঙ্গলার রঙ্গভূমি, গল্পের নমুনা, গোরার সমালোচনা, বক্তৃতার সমালোচনা, নবীনচন্দ্র, বক্তৃতার নমুনা, খুকুমণির ছড়া।); আর্যগাথা (দ্বিতীয় ভাগ); আনন্দ-বিদায়।

৩য় ভাগ : দুর্গাদাস ; তারাবাই ; ত্র্যহস্পর্শ ; পাষাণী ; ত্রিবেণী ; আষাঢ়ে ; একঘরে ; হরিপদর ধ্রুপদ-শিক্ষা ; ছত্র-মহিমা ; ভারতবর্ষের সূচনা ; বিলাতের পত্র।

৪র্থ ভাগ : ভীষ্ম ; নূরজাহান ; পুনর্জন্ম ; মেবার-পতন ; প্রায়শ্চিত্ত ; আলেখ্য ; মন্দ্র ; গান।

স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসাবে বা গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নি এমন কতকগুলি (যতগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে) রচনার একটি তালিকা দেওয়া হল :

১২৮৯, চৈত্র ··· আর্যদর্শন ··· বাগ্মী ও সংবাদপত্র
১২৯০, ভাদ্র ··· নব্যভারত ·· হৃদয় ও মন
১৩০২, কার্তিক ··· ভারতী ··· মানভিক্ষা
১৩০৪, কার্তিক ··· জন্মভূমি (পৃঃ ৩৩৫-৩৮) ··· জীবনী (স্বরচিত)
১৩১০, অগ্রহায়ণ ·· সাহিত্য ··· কীর্তন
১৩১৩, আশ্বিন ··· সাহিত্য ··· একটি পুরাতন মাঝির গান (আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা)
১৩১৩, কার্তিক ··· প্রবাসী ··· কাব্যের অভিব্যক্তি
১৩১৪, মাঘ ··· বঙ্গদর্শন ··· কাব্যের উপভোগ
১৩১৫, আষাঢ় ··· সাহিত্য ··· বিষম সমস্যা
১৩১৬, জ্যৈষ্ঠ ··· সাহিত্য ··· কাব্যে নীতি
১৩১৬, মাঘ ·· বঙ্গদর্শন ··· মোহিনী (গল্প)
১৩১৭, শ্রাবণ ··· নাট্য-মন্দির ··· আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ
১৩১৭, ভাদ্র ··· নাট্য-মন্দির ·· অভিনেতার কর্তব্য
১৩১৭, পৌষ ··· নব্যভারত ··· সাহিত্যে আবর্জনা
১৩১৮, শ্রাবণ ··· নব্যভারত ··· টাকের জয়

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ষষ্ঠ খণ্ড, ৬৯ নং গ্রন্থ) ১২৯০ সালের 'শক্তি' পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্ররচিত 'নেতা ও নেতৃত্ব'

প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রমাণস্বরূপ পাদটীকায় ১৮৮৩ সনের ২৮শে অক্টোবরে দেওঘরের 'সুরভি'-সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ বসুকে লেখা দ্বিজেন্দ্রলালের একটি পত্রাংশ উদ্ধৃত করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের অনেকগুলি পত্র ও পত্রাংশ দেবকুমার রায়চৌধুরীর 'দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও রাজনারায়ণ বসু ও তাঁর পুত্র যোগীন্দ্রনাথ বসুকে লেখা দ্বিজেন্দ্রলালের দুখানি চিঠি প্রকাশ করেন (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, ১৩৫১)। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর 'ভিখারীর গান' (সঙ্কল্প, কার্তিক ১৩২১), 'অপ্রকাশিত কবিতা' (সচিত্র শিশির, ১৯২৪) 'ডিনার লহরী' (মাসিক বসুমতী, ভাদ্র ১৩৪৩) প্রকাশিত হয়।

দেবকুমার রায়চৌধুরীর 'দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থ থেকে (দ্বি-সং ১৩২৮) দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকটি রচনার অনুসন্ধান পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থের ৬০০-৬০৩ পৃষ্ঠায় তিনি 'অবরোধ প্রথা' নামে দ্বিজেন্দ্রলালের একটি অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ উদ্ধার করেছেন। হরেন্দ্রলাল রায় সম্পাদিত 'নবপ্রভা' পত্রিকায় স্বামী উত্তমানন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের জীবনী ও লীলা সম্পর্কে নানা বিরুদ্ধ মন্তব্য করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল পত্রাকারে তার একটি প্রতিবাদ-প্রবন্ধ লিখেছিলেন। (দেবকুমার রায়চৌধুরী 'দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থের ৬১৫-৬১৮ দ্রষ্টব্য।) এগুলি ছাড়া উক্ত গ্রন্থের ২৬৮ ও ২৭১ পৃষ্ঠায় যথাক্রমে গিরিশচন্দ্র শর্মা (দ্বিজেন্দ্রলালের শ্যালিকাপতি) ও রবীন্দ্রনাথকে লেখা দুটি কৌতুককবিতা সঙ্কলিত হয়েছে। কর্মান্বেষী জনৈক আত্মীয়ের কাজের জন্য সুপারিশ করে তিনি রবীন্দ্রনাথকে যে কবিতায় চিঠি লিখেছিলেন তার প্রথম স্তবক থেকেই পত্রটির কৌতুকরস উপলব্ধি করা যায় :

শুনছি নাকি মশায়ের কাছে
অনেক চাকরি খালি আছে,—
দশ-বিশ টাকা মাত্র মাইনে।
দু-একটা কি আমরা পাইনে।

(দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ২৭১)

নির্ঘণ্ট ১

নির্ঘণ্ট ২

দ্বিজেন্দ্র-রচনাবলী

(ক) কাব্যগ্রন্থ, বিদ্রূপাত্মক কাব্য, হাস্যরসাত্মক কবিতা ও গান

(গ) (বিদ্রূপাত্মক) নাটিকা ও প্রহসন

(ঘ) নক্‌শা, প্রবন্ধ, প্রবন্ধ-সঙ্কলন, সমালোচনা, বিলাতের বিবরণ ও অনুবাদ

(ঙ) রচনান্তর্গত কবিতা ও গান